বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

মানিকগঞ্জ

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

মানিকগঞ্জ

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

শফিকুর রহমান চৌধুরী

সংগ্রাহক

মো. মনজুরুল ইসলাম

সাইদুর রহমান বয়াতি

মো. আজহারুল ইসলাম

মো. মোশারফ হোসেন

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
মানিকগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/জুন ২০১৪

বাএ ৫৩০৮

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত বিশ টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : MANIKGONJ (Present state of Folklore in Manikgonj District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 320.00 only. US$: 10.00

ISBN-984-07-5317-7

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ.

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের

www.pathagar.com

ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/ মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), আটপাড়া, নেত্রকোনা, মানিক পির (সাতক্ষীরা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমরদের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, পার্বত্য ও অন্যান অঞ্চল। রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন অঞ্চল ও অনুষ্ঠান।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর),

www.pathagar.com

মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়ার সন্দেশ ; হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল ; বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা**। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি**। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান**।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর।

www.pathagar.com

১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক

www.pathagar.com

(মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান,

www.pathagar.com

সহকারী অনুবাদক রিফ্ফাত সামাদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ— Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে মানিকগঞ্জের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৬২
- ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা ২৩
- খ. ভৌগোলিক অবস্থান ২৫
- গ. বনভূমি ও গাছপালা ২৬
- ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৭
- ঙ. জনবসতির পরিচয় ২৯
- চ. নদ-নদী ৩০
- ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৪
- জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ৩৯
- ঝ. ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদ ৪৯
- ঞ. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ৫১
- ট. মুক্তিযুদ্ধ ৫৮

লোকসাহিত্য (folk literature) ৬৩-৯৭
- ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা ৬৩
- খ. কিংবদন্তি ৬৬
- গ. লোকপুরাণ ৭৩
- ঘ. কবিগান ৭৮
- ঙ. ভাটকবিতা ৮৮
- চ. লোকছড়া ৯১
- ছ. পুথিসাহিত্য ৯৬

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material folk culture) ৯৮-১০৯

লোকশিল্প

মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, কারু ও বেত শিল্প, খেজুর পাতার পাটি, সূচিশিল্প (কাঁথা), শাঁখাশিল্প

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১১০-১১৩

বাঁশের চাটাই ও পাটখড়ির বেড়া বিশিষ্ট বাড়ি, টিনের ঘর

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১১৪-১১৬
- ক. লোকপোশাক ১১৪

  ধুতি, লুঙ্গি, শাড়ি, ফতুয়া, ম্যাক্সি, গামছা
- খ. অলংকার ১১৬

লোকসংগীত (folk song) ১১৭-২৩৮
- ক. মানিকগঞ্জের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১১৭
- খ. মানিকগঞ্জের লোকসংগীত ১৪২
  - ১. সারিগান ১৪৪
  - ২. মেয়েলি গীত ১৫৩

www.pathagar.com

৩. ধুয়া গান ১৫৫
৪. জারিগান ১৫৭
৫. গোষ্ঠ গান ১৯২
৬. মর্সিয়া সংগীত ১৯৩
৭. অগ্নিগান ১৯৪
৮. মুর্শিদি গান ১৯৮
৯. ডাক বা সায়ের/কর্মসংগীত ১৯৮
১০. গাজীর গান ২০১
১১. মাদার পিরের গান ২০৩
১২. মরমি গান ২০৪
১৩. মারফতি গান ২২১
১৪. পল্লিগীতি ২২৬
১৫. গজল ২২৭
১৬. আসরি গান ২৩০
১৭. দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান ২৩১
১৮. নাম সংকীর্তন ২৩৪
১৯. দেশাত্ববোধক ও স্বদেশচেতনামূলক গান ২৩৫

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২৩৯-২৪৩

১. একতারা ২৩৯, ২. দোতারা ২৪০, ৩. বাঁশি ২৪০, ৪. ডুগডুগি ২৪১, ৫. ঢোল ২৪১, ৬. তবলা ২৪২, ৭. মন্দিরা ২৪৩

লোকউৎসব (folk festival) ২৪৪-২৭৫

১. নববর্ষ ২৪৪
২. চৈত্র সংক্রান্তি ২৪৬
৩. শারদীয় দুর্গোৎসব ২৪৬
৪. শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ২৫০
৫. রথযাত্রা ২৫২
৬. ঘুড়ি উৎসব ২৫৮
৭. মহররম অনুষ্ঠান ২৫৯
৮. বরকত মার থল ২৬৩
৯. ভেলা ভাসানো উৎসব ২৬৬
১০. মাদার বাঁশ অনুষ্ঠান ২৭৩

লোকমেলা (folk fair) ২৭৬-২৯৩

১. বৈশাখী মেলা ২৭৬
২. নিমাই চান্দের মেলা ২৭৭
৩. চান্দইর বুড়ির মেলা ২৭৮
৪. পুটাইলের লক্ষ্মীপূজার মেলা ২৮০
৫. মানতা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী গরু-ঘোড়া দৌড় মেলা ২৮১
৬. রথের মেলা ২৮৪
৭. সাহরাইল সিদ্ধাবাড়ির মেলা ২৮৫
৮. রাস মেলা ২৮৭

www.pathagar.com

৯. দিব্যচাঁন্দের মেলা ২৮৯
১০. দোলের মেলা (দোল পূজার মেলা) ২৮৯
১১. জসমের মা'র মেলা ২৯০
১২. মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা ২৯১
১৩. সাধুর মেলা ২৯২
১৪. মধুর মেলা ২৯৩
১৫. অন্যান্য মেলা ২৯৩
লোকাচার (ritual) ২৯৪-৩৩৭
১. লক্ষ্মীপূজা ২৯৪
২. কাত্যায়নী পূজা ২৯৫
৩. দোল পূজা ২৯৬
৪. নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠান ৩০০
৫. ত্রিনাথের পূজা ৩০২
৬. পাঁঠা বলি ৩০৪
৭. বুড়ি ঠাকুরের পূজা ৩০৫
৮. নিকাইন্দা পূজা ৩০৫
৯. সরস্বতী পূজা ৩০৯
১০. চৈত্র সংক্রান্তির পূজা ৩১০
১১. কাল বৈশাখী হাজরা পূজা ৩১২
১২. বিশ্বকর্মা পূজা ৩১৩
১৩. চড়ক পূজা ৩১৪
১৪. চাটি পূজা ৩১৫
১৫. শীতলা পূজা ৩১৬
১৬. নারায়ণ পূজা ৩১৭
১৭. অর্ধকালী পূজা ৩১৭
১৮. নিমাই চান্দের পূজা ৩১৯
১৯. খোদাই শিরনি ৩২০
২০. সাতশা ৩২২
২১. হালখাতা ৩২৩
২২. শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান ৩২৩
২৩. অন্নপ্রাশন ৩২৩
২৪. খতনা ৩২৫
২৫. চল্লিশা ৩২৫
২৬. বৃক্ষ উপাসনা ৩২৫
২৭. দুলী পাগলীর মাদারের আসন ৩২৬
২৮. নতুন ঘর তৈরি সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান ৩২৭
২৯. ওরস ৩২৭
৩০. বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান ৩৩০
৩১. গাস্যি ৩৩৩
৩২. মৃত্যুবার্ষিকী পালন ৩৩৫

www.pathagar.com

লোকখাদ্য (folk food) ৩৩৮-৩৫২
ঝিটকার হাজারি গুড়, খেজুরের রসের গুড়, মুড়ি, পিঠা, মিষ্টি, বাতাসা, চিনির ছাঁচ, শবেবরাতের হালুয়া ও রুটি, ছাতু

লোকনাট্য (folk theatre) ৩৫৩-৩৯৫
মুলুক চাঁন যাত্রা ৩৫৩

লোকক্রীড়া (folk games) ৩৯৬-৪০৮
১. নৌকাবাইচ ৩৯৬
২. হাডুডু খেলা ৪০২
৩. লাঠি খেলা ৪০৩
৪. মোরগ লড়াই ৪০৪
৫. সাত পাতা/পাতা খোঁজা খেলা ৪০৪
৬. কানামাছি ৪০৪
৭. বরফ পানি খেলা ৪০৫
৮. দড়ি লাফানো ৪০৫
৯. কুমির কুমির ৪০৫
১০. হাঁড়ি ভাঙা/কলস ভাঙা ৪০৫
১১. টুকি/লুকোচুরি ৪০৬
১২. চোর চোর খেলা ৪০৬
১৩. কুত কুত খেলা ৪০৬
১৪. ইচিং-বিচিং ৪০৬
১৫. ডাং-গুলি ৪০৭
১৬. উপেনটি বাইস্কোপ ৪০৭
১৭. ছি-বুড়ি ৪০৭
১৮. ঘুড়ি উড়ানো ৪০৭

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৪০৯-৪২০
১. কামার ৪০৯, ২. কারুশিল্পী ৪১১, ৩. ছাই থেকে সোনা তৈরির শিল্প ৪১২, ৪. শাঁখারি ৪১৬, ৫. প্রতিমা নির্মাণ শিল্পী ৪১৭

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্র-মন্ত্র (chant) ৪২১-৪৩৬
ক. লোকচিকিৎসা ৪২১
খ. তন্ত্র-মন্ত্র ৪২৫

ধাঁধা (riddle) ৪৩৭-৪৪৩

প্রবাদ-প্রবচন (folk saying & proverb) ৪৪৪-৪৫০

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৪৫১-৪৫৬

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৪৫৭-৪৬১
১. ঢেঁকি ৪৫৭, ২. লাঙল ৪৫৮, ৩. তাঁত ৪৫৯, ৪. হুঁকা ৪৫৯, ৫. সরিষা ভাঙার ঘানি ৪৬০, ৬. মাছ ধরার বাঁশের পলো ৪৬১

লোকভাষা (folk language) ৪৬২-৪৬৮

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

সংস্কৃত 'মাণিক্য' শব্দ থেকে 'মাণিক' শব্দটি এসেছে। মাণিক্য ও মানিক সমার্থবোধক শব্দ। মাণিক অর্থ চুণি, পদ্মরাগ, মণি কিংবা মুক্তা। মাণিকের ইংরেজি ruby বা jewel। মানিক শব্দটি মাণিকের তদ্ভব রূপ। 'গঞ্জ' শব্দটি ফার্সি যার অর্থ হাট, বাজার বা শস্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। সুলতানী আমল থেকে শুরু করে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ফার্সি ছিল এ অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলিত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন স্কুল কলেজে ফার্সি পড়ানো হতো। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক আরবি ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে পড়ে। 'গঞ্জ' শব্দটি এভাবেই আমাদের ভাষায় স্থান করে নেয়। 'মানিকগঞ্জ' নামকরণটি কখন হয়েছিল, সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কষ্টকর।

মানিকগঞ্জ নামের উৎপত্তি সম্পর্কিত ইতিহাস এখনও রহস্যাবৃত। স্থানীয় জনশ্রুতিই এর একমাত্র ঐতিহাসিক উৎস এবং তা বিতর্কিত। 'মানিকগঞ্জ' নামে কোনো গ্রাম, মৌজা বা পরগনার অস্তিত্ব নেই। ১৮৪৫ সাল থেকে 'মানিকগঞ্জ' নামের উদ্ভব দেখা যায়; এর পূর্বের কোনো ঐতিহাসিক বিবরণে, মানচিত্রে বা সরকারি নথি-পত্রে 'মানিকগঞ্জ' নামের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, বহু অলি আউলিয়ার পুণ্যভূমি ধামরাই থেকে জনৈক দরবেশের নির্দেশক্রমে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মানিক শাহ নামক এক সুফি দরবেশ সিংগাইর উপজেলার 'মানিকনগর' গ্রামে আগমন করেন এবং খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে তিনি এ খানকা ছেড়ে হরিরামপুর উপজেলায় দরবেশ হায়দার শেখ এর মাজারে গমন করেন এবং ইছামতির তীরবর্তী জনশূন্য চরাভূমি বর্তমান মানিকনগরে এসে খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এ খানকাকে কেন্দ্র করে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে। উক্ত জনবসতি মানিক শাহ'র পুণ্য স্মৃতি ধারণ করে হয়েছে 'মানিকনগর'। মানিক শাহ শেষ জীবনে ধামরাইতে অবস্থিত আধ্যাত্মিক গুরুর দরবার শরিফে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় দ্বিতীয় খানকা ছেড়ে ধলেশ্বরীর তীরে পৌঁছেন। জায়গাটির নৈসর্গিক দৃশ্য তাঁর পছন্দ হয়। তিনি এখানে খানকা স্থাপন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খানকার ভক্তবৃন্দও এখানে এসে দীক্ষা নিত। মানিক শাহর অলৌকিক গুণাবলীর জন্য জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। এমনকি দস্যু তস্করগণও কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে খানকার ধারে কাছে আসতো না। তাই ভক্তবৃন্দ ছাড়াও বণিকগণও এখানে বিশ্রাম নিত এবং রাত্রি যাপন করতো। সওদাগরী নৌকাগুলো নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে খানকার তীরে নোঙর ফেলে রাত্রি কাটাত। এভাবেই ধলেশ্বরীর তীরে মানিক শাহ'র খানকাকে কেন্দ্র করে জনবসতি ও মোকাম প্রতিষ্ঠিত হয়। মানিক শাহ এক রাতে সোনারগাঁওয়ের পথে উধাও হয়ে যান। মানিক শাহ চলে গেলেও তাঁর খানকা এবং তৎসংলগ্ন মোকাম বা গঞ্জ পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারেই 'মানিকগঞ্জ' হয় বলে ধারণা করা হয়। উক্ত

www.pathagar.com

মানিকগঞ্জ জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

খানকা ও তৎসংলগ্ন গঙ্গা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও ১৮৪৫ সালে সম্ভবত এ সুফি দরবেশের নামানুসারেই মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ করা হয়ে থাকতে পারে।[১]

মহকুমা ঘোষণা

ইংরেজ শাসক কর্তৃক ১৮৪৫ সালের মে মাসে মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রথমে ১৮১১ সালে সৃষ্ট ফরিদপুর জেলার অধীনে ছিল এবং প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনকল্পে ১৮৫৬ সালে মানিকগঞ্জ মহকুমাকে ফরিদপুর জেলা থেকে কেটে ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার লগ্নে তিনটি রাজস্ব থানায় বিভক্ত ছিল। উক্ত তিনটি থানা হলো— ১. মানিকগঞ্জ, ২. জাফরগঞ্জ এবং ৩. হরিরামপুর। উনিশ শতকের শেষ দিকে জাফরগঞ্জ থানার সদর টাউনসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নদী গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেলে এবং উক্ত ভাঙন অব্যাহত থাকলে জাফরগঞ্জ থানা সদর শিয়ালোতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে জাফরগঞ্জের পরিবর্তে থানা সদর 'শিয়ালো' নামেই পরিচিত হয়। অন্যদিকে কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত বিখ্যাত জাফরগঞ্জ ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক প্রয়োজনেই বৃহৎ মানিকগঞ্জ ও শিয়ালো রাজস্ব থানা ভেঙে অতিরিক্ত চারটি নতুন থানার সৃষ্টি করে। ফলে থানার সংখ্যা বেড়ে সাত এ উন্নীত হয়। থানাগুলো হলো :

১. মানিকগঞ্জ, ২. সাটুরিয়া, ৩. সিংগাইর, ৪. শিবালয়, ৫. ঘিওর, ৬. দৌলতপুর এবং ৭. হরিরামপুর

১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। মানিকগঞ্জ তৎকালীন পূর্ব বাংলা এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানের একটি মহকুমায় পরিণত হয়।[২]

জেলা ঘোষণা

তিরিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানী ও দু'লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানীর পর এক ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে এরশাদের সামরিক সরকার দেশের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সিদ্ধান্তের আলোকে সকল মহকুমাকে জেলায় এবং থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। মানিকগঞ্জ বাংলাদেশের জেলা হিসেবে গণ্য হয় ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ থেকে।[৩]

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

মানিকগঞ্জ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। এই জেলার উত্তর সীমান্তে টাংগাইল জেলা; পশ্চিম, পশ্চিম-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ সীমান্তে যমুনা এবং পদ্মা

www.pathagar.com

নদী যথাক্রমে পাবনা ও ফরিদপুর জেলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব-দক্ষিণে রয়েছে ঢাকা জেলার যথাক্রমে ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, দোহার এবং নবাবগঞ্জ উপজেলা। এই জেলা ২৩° ৫২´৪৫´´ অক্ষাংশ ও ৯০° ৪´১৫´´ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

বাংলার মধ্যভাটি অঞ্চলভুক্ত মানিকগঞ্জ জেলার ভূ-ভাগ নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত— বিশেষত : পদ্মা, গঙ্গা, ধলেশ্বরী, ইছামতি, করতোয়া, হোরাসাগর, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলের ভূমি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মানিকগঞ্জ জেলার ভূ-ভাগে কঠিন মাটির আস্তরণ নেই। বরং এর অভ্যন্তরে সাজানো রয়েছে বেলে, বেলে দো-আঁশ এবং নুড়িপাথর ও পাথরের পর্যায়ক্রমিক স্তর। ঢোলসাগরে সমুদ্র খাড়ি সদৃশ জলাশয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝিতেই জেগে উঠা ভূ-খণ্ডই প্রথম আবাসযোগ্য স্থলভাগ।

মানিকগঞ্জ জেলার আয়তন ১৩৭৮.৯৯ বর্গ কিমি.। জনসংখ্যা ১২,৭৮,৮২৯ জন। জনবসতির ঘনত্ব ৮৩৫ প্রতি বর্গ কিমি.। এখানকার গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮০ সে. এবং সর্বনিম্ন ১২.৭০ সে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৩৭৬ মিমি.।

মানিকগঞ্জ জেলা সর্বমোট ৬৬টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। জেলা শহর ৯টি ওয়ার্ড ও ৪৯টি মহল্লা নিয়ে গঠিত।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এ অঞ্চলে জলপথই ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। প্রবহমান অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল ভূ-খণ্ডকে জালের মতো সংযুক্ত করে রাখায় জলপথই ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। প্রবাহমান জলধারার উভয় পার্শ্বে জনবসতি গড়ে ওঠে। ঢাকা থেকে সড়ক পথে দূরত্ব ৬৮ কিমি.।[৪]

গ. বনভূমি ও গাছপালা

বর্তমানে মানিকগঞ্জে কোনো বনভূমি নেই। তবে উঁচু জায়গায় নানা ধরনের গাছপালা পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মানিকগঞ্জে প্রচুর বাঁশ জন্মে। প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে বাঁশঝাড় রয়েছে। এসব বাঁশের মধ্যে বওরা বাঁশ, জাওয়া বাঁশ, মাকলা বাঁশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে উৎপাদিত বাঁশ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রির জন্য সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া মানিকগঞ্জের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আম, জাম ও কাঁঠালের গাছ রয়েছে। এখানে প্রচুর কাঁঠাল উৎপাদিত হয়। মানিকগঞ্জে বায়রা, জামালপুর, গেরাদিয়া অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য লেবু বাগান। এলাচি লেবু, কাগজি লেবু, কলম্বো, গোরা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট মানের লেবু উৎপাদিত হয় এসব অঞ্চলে।

মানিকগঞ্জে রয়েছে অসংখ্য খেজুর ও তালগাছ। এখানকার খেজুর গাছের রস থেকে উৎপাদিত পাটালি গুড় সারাদেশে বিক্রির জন্য সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া তালগাছ থেকে হয় প্রচুর তাল। তালের রস থেকে তৈরি হয় তালের গুড়। কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা চিন্তা করে বর্তমানে কোনো কোনো এলাকায় মেহগনি, চাম্বল, দেবদারু, শিশু প্রভৃতি গাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হচ্ছে।

মানিকগঞ্জের প্রধান ফসল : ধান, পাট, গম, সরিষা, তিল, তামাক, মসুর, খেসারি, ভুট্টা, আলু, আখ, পিঁয়াজ, রসুন, বেগুন, শসা, গাজর, মরিচ, শাক সবজি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গঙ্গা-যমুনার অববাহিকায় পদ্মা, ধলেশ্বরী, কালীগঙ্গা, ইছামতি ও গাজীখালীর মত অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিলের পানি বিধৌত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি মানিকগঞ্জ জেলা। গবেষকদের মতে আজকের (২০১৪) মানিকগঞ্জ এক সময় ছিল বিশাল বিশাল নদীগর্ভে নিমজ্জিত একটি এলাকা। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে (৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে) মানিকগঞ্জের ভূমি নদীগর্ভ থেকে জেগে উঠেছিল এবং গড়ে উঠেছিল জনপদ। আশে পাশের অঞ্চল থেকে আগত প্রাচীন জনগোষ্ঠী এবং নদীপথে আগত দূরের জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সেই প্রাচীনকালে এখানে গড়ে উঠেছিল জনবহুল বন্দর আর গ্রাম।[৫] মানিকগঞ্জের আদি মানুষ সিংগাইর চারা ভাঙ্গায় বসবাস করতো বলে জানা যায়। তারা ছিল বনো সম্প্রদায় (বুইনা), যাদের কোনো অস্তিত্ব এখন আর নেই।[৬] নদী বেষ্টিত এই জেলাটি সেই আদিকাল থেকেই নদীর গতিপথ পরিবর্তনের অব্যাহত ধারার কাছে অসহায়। কখনও নদীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে জনপদ আবার এক সময় নদীর ভাঙনেই বিলীন হয়ে গেছে সবকিছু। এজন্য মানিকগঞ্জের ইতিহাস বহু পুরাকীর্তি, পুথি-পুস্তক ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য অবলম্বন করে কায়াহীন ছায়ার মত অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

ভৌগোলিক সুবিধার কারণে মানিকগঞ্জে পাঠান, মোঘল, বর্গী, নীলকর, পাল রাজা, সেন রাজা ও ঈশা খাঁর মত স্বাধীনচেতা সুলতানদের আগমন ঘটে।[৭] মানিকগঞ্জের আদি জনবসতি গড়ে ওঠার সময়টি এবং তার অব্যবহিত পরেও (৫০৭-৫০৮ খ্রিষ্টাব্দ) মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নামে গুপ্ত বংশীয় এক রাজা মানিকগঞ্জের শাসনকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়।[৮] ইছামতির তীরে যাত্রাপুর ও ডাকছাড়ায় (বর্তমানে হরিরামপুর উপজেলার অন্তর্গত) মোঘল বাহিনীর সাথে মুসা খাঁর নেতৃত্বে বার ভূঁইয়াদের সম্মিলিত বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বার ভূঁইয়াদের পরাজয় ঘটলে বাংলার মধ্য ভাটি অঞ্চলে মোঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] এছাড়াও বর্তমান মানিকগঞ্জ সদর থানার উত্তরে গড়পাড়ায় বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ এবং তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সিকান্দার শাহ পরাজিত ও নিহত হন। ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব গড়পাড়ায় দূর্গসহ বেশ কিছু প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। 'গড়' শব্দের অর্থ 'দূর্গ' থেকে জায়গাটির নাম হয়েছে গড়পাড়া। মোঘল আমলে গড়পাড়ার প্রশাসনিক গুরুত্ব বেড়ে যাবার কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দরে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে বন্দরটির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১০] মানিকগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে সরকারী হাই স্কুলের দক্ষিণে একটি মসজিদ ছিল (বর্তমানে সেখানে আধুনিক মসজিদ তৈরি করা হয়েছে) যেখানে একটি ফারসি শিলালিপি লাগানো ছিল। সে শিলালিপিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব সহ কয়েকজন মোঘল রাজ কর্মকর্তার নাম উৎকীর্ণ ছিল। অনুমিত হয় গড়পাড়ায় কোনো মোঘল কীর্তি যখন নদীতে বিলীন হচ্ছিল তখন হয়ত কেউ শিলালিপিটি মানিকগঞ্জ শহরে এনে ঐ মসজিদে সংরক্ষণ করেছিলেন।[১১]

www.pathagar.com

নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও বাংলার কৃষকের আর্থ-সামাজিক জীবনে এর বিরূপ প্রভাবের কথা ইতিহাস খ্যাত। মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওরের কুঠিবাড়ি, তেরশ্রী, কুষ্টিয়া, সদরের আটিগ্রাম, তিল্লি, জাগীর, বেতিলা, গড়পাড়া, দৌলতপুরের ধামসর, জাফরগঞ্জ, শিবালয়ের তেওতা, দশচিড়া এবং সাটুরিয়া ও সিংগাইরের বিভিন্ন এলাকায় ইটের তৈরি নীলকুঠি ছিল। কিছুকাল আগেও এসবের ভগ্নভবন দেখতে পাওয়া গেছে।[১২] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ জেলায় নীল বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে। এছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯৩২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জ শহরের হীরালাল মোহন্তের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীগণ ডাক সরবরাহ লুঠ করেন।[১৩]

১৯৮৯ সালের ২৬ এপ্রিল প্রলয়ঙ্করী এক টর্নেডোর আঘাতে মানিকগঞ্জে ১৩০০ জন লোকের প্রাণহানি ঘটে ও ১২০০০ জন আহত হন এবং গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।[১৪]

এক সময় জমিদারদের দ্বারা এ জেলা শাসিত হত। মানিকগঞ্জ জেলার এমনি দুটি ঐতিহাসিক জমিদার বংশ হলো বালিয়াটি ও তেওতা জমিদার বংশ। তৎকালীন মানিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে গনেষ রাম নামে এক হিন্দু সাহা শ্রেণির লোক ছিলেন। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে গোবিন্দরাম নামে একজন বালিয়াটি গ্রামে বিয়ে করে উক্ত গ্রামেই বসবাস করতে থাকেন। আনন্দরাম, দধিরাম, পণ্ডিতরাম ও গোলাপরাম নামে গোবিন্দরামের চার সন্তান হতে প্রসিদ্ধ গোলাবাড়ি, পূর্ব-পশ্চিম বাড়ি, মধ্য বাড়ি ও উত্তর বাড়ি নামে বালিয়াটি জমিদার বাড়ি সৃষ্টি হয়। আনন্দরামের বংশধরগণ গোলাবাড়ির জমিদার নামে খ্যাত। তারা মূলত সাহা সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তবে অর্থ বিত্তের মালিক হবার পরে তারা 'রায় চৌধুরী' উপাধি ব্যবহার করতে থাকেন। এই বংশের জমিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুখলাল রায় চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, নন্দলাল রায় চৌধুরী এবং বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। দধিরাম রায়-এর নিত্যানন্দ রায় ও রায়চাঁদ রায় নামে দুই পুত্র ছিল। নিত্যানন্দ রায় বালিয়াটির পশ্চিম বাড়ি ও এবং রায়চাঁদ রায় বালিয়াটির পূর্ব বাড়ির জমিদারদের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

বালিয়াটির জমিদার বংশের জমিদারগণ জমিদারি পরিচালনা ছাড়াও নানা জনহিতকর কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বৃন্দাবনধামে গোপাল জিউর মন্দির ও কুঞ্জ স্থাপন, তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ের জন্য কলকাতায় প্রাসাদ নির্মাণ, দুর্ভিক্ষের সময় লংগরখানা পরিচালনা সহ অনেক উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িয়ে আছে বালিয়াটি জমিদারদের নাম। এছাড়াও বালিয়াটির জমিদারদের এক গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি ছিল ধামরাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ যশোমাধব দেবের সুদৃশ্য ও বহু কারুকার্য খচিত সুবৃহৎ ও সুউচ্চ রথ। এরূপ রথ ভারতের আর কোথাও ছিল না। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই রথটি পুড়িয়ে ফেলে। তবে এই রথযাত্রা উপলক্ষে জমিদারগণ যে মেলা প্রচলন করেছিলেন তা এখন পর্যন্ত প্রতি বছর যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এই উপলক্ষে যাবতীয় খরচাদি জমিদারদের দানকৃত

www.pathagar.com

সম্পত্তি থেকেই পাওয়া যায়। এই বংশের উত্তরপুরুষগণ বর্তমানে কলকাতার বাগবাজার ও শোভা বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন।[১৫]

তেওতার জমিদারি স্থাপনকর্তার নাম পঞ্চানন চৌধুরী। ১৭৫৭ সালে ভাগ্যহত নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের মোকাবেলার ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত তখন পঞ্চানন চৌধুরীর বয়স ১৪ বৎসর। সে হিসাবে তাঁর জন্ম ১৭৪৩ সালে। পঞ্চানন চৌধুরী ব্যবসার উদ্দেশ্যে দিনাজপুর গমন করেন এবং সেখানে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থোপার্জনের পর জমিদারি ক্রয় করা শুরু করেন। পঞ্চানন রায়ের পূর্বপুরুষগণ নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ গঙ্গানন্দ নদীয়া থেকে যশোহরে এবং গঙ্গানন্দের পৌত্র বিশ্বনাথ যশোহর থেকে তেওতা এসে বসতি গড়ে তোলেন। তেওতা জমিদার পরিবারের সদস্যগণও বালিয়াটির জমিদারদের মত 'রায় চৌধুরী' উপাধি ব্যবহার করতেন। এই ধারার পরিবর্তন ঘটান হরশংকর রায়। তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং পেশায় ছিলেন একজন আইনজীবী। গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ছাড়া তিনি 'চৌধুরী' উপাধি-টি ব্যবহার করতেন না। হরশংকর রায়ই মানিকগঞ্জে প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় 'তেওতা একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের থাকার জন্য বোর্ডিংও তৈরি করেন তিনি। পারিবারিক রেওয়াজ অনুযায়ী তেওতার জমিদার পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যা শিক্ষা এই তেওতা একাডেমীতেই সম্পন্ন হতো।

একমাত্র কাঁচারী বাড়ি ছাড়া তেওতার জমিদারদের তৎকালীন পূর্ববঙ্গে আর কোথাও কোনো বাড়ি ছিল না। বালিয়াটি জমিদারদের মত তাদের কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না। জমিদারি থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যক্তিগত পেশা থেকে অর্জিত আয় ছিল তাদের জীবন ধারণের প্রধান সহায়। তেওতা জমিদারির স্থপতি পঞ্চানন চৌধুরীর একমাত্র পুত্র কালীশংকর রায় চৌধুরী মাত্র ২৯ বৎসর বয়সেই পরলোক গমন করেন। কালীশংকর রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়শংকর রায় চৌধুরী দিনাজপুর, পাবনা, রংপুর ও ফরিদপুর জেলায় জমিদারির বিস্তার ঘটান। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় তেওতার জমিদার বাড়ির সন্তানগণ তাদের শহরের বাসস্থান কলকাতায় আশ্রয় নেন।[১৬]

ঙ. জনবসতির পরিচয়

মানিকগঞ্জে বর্তমানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন। মানিকগঞ্জের জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে সানাইদার, যারা বাদ্যযন্ত্র বাজায়। মানিকগঞ্জের পালরা কুসুরিয়ায় রয়েছে অনেক সানাইদার পরিবার। মানিকগঞ্জে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সান্দার বা বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন। এরা মুসলমান। মানিকগঞ্জের বেউথা, বারহল গ্রামে রয়েছে সান্দার সম্প্রদায়ের অসংখ্য লোক। ভাটরা গোবিন্দপুর গ্রামে রয়েছে মুসলমান তাঁতি। এরা কাপড় বোনে। মুসলমানদের সবাই সুন্নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ, গোঁসাই, কপালী, পাটনি, শিল, ধোপা, পাল, ঋষি, মালাকার, শাঁখারি, জেলে ইত্যাদি।

www.pathagar.com

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তি, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মিলেমিশে বসবাস করছে।

চ. নদ-নদী

একসময় ছোটো বড়ো অসংখ্য নদী মানিকগঞ্জ জেলার ভূ-ভাগের উপর দিয়ে প্রবাহমান ছিল। কালের প্রবাহে অনেক নদীই হারিয়ে গেছে। স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে ছোটো বড়ো অনেক বিল, হাওড় ও জলাশয়। কোনো কোনো নদী বর্তমানে মৃতবৎ শীর্ণকায় রূপ ধারণ করেছে। আবার কোনোটি কেবলমাত্র বর্ষাকালীন ধারা ও খাত রূপে টিকে আছে। মানিকগঞ্জের নদ-নদীর মধ্যে পদ্মা, যমুনা, ইছামতি, কালীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

পদ্মা নদী

পদ্মা বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী। বর্তমানে শিবালয় ও হরিরামপুর উপজেলার পশ্চিম এবং দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে পদ্মা নদী প্রবাহমান। পদ্মা ও গঙ্গার প্রবাহকে অভিন্ন মনে করা হয়। প্রধানত গঙ্গা (বা পদ্মা) নদীকে অবলম্বন করে বাংলার সমস্ত নদ-নদী প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মা নদী মানিকগঞ্জ জেলায় যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে অতীতে তা ভিন্নভাবে প্রবাহিত হতো। পূর্বে তা প্রাচীন ধলেশ্বরীর খাতে বহমান ছিল। পদ্মার প্রবাহ মানিকগঞ্জকে ফরিদপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বিখ্যাত ফরাসি পর্যটক টাভার্নিয়ার পদ্মাপথে যখন ঢাকায় আগমন করেন তখন পদ্মা বর্তমান দৌলদিয়ার নিকট দিয়ে মানিকগঞ্জ জেলার সীমান্তে প্রবেশ করতো। সেই সময় হরিরামপুর উপজেলা সীমান্তে পদ্মা তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। উক্ত তিনটি প্রবাহের মধ্যবর্তীটি ছিল মূলখাত। হরিরামপুর উপজেলার ঐতিহাসিক যাত্রাপুরের নিকট দিয়ে যে বড়ো প্রবাহটি ছিল তার কোনো অস্তিত্ব আজ আর নেই।

উনিশ শতকের শেষে পদ্মা নদী মানিকগঞ্জ জেলার পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলের ঝিকুটিয়া, নেহালপুর, বোয়ালী, দক্ষিণ শেয়ালো, আরিচা, জামালপুর, এলাচিপুর, কাজীরচর, আলাইল, লক্ষ্মণপুর, গোপীনাথপুর, দেবীপুর, পাইকুরদিয়া, মালুচি, পাটোলী, কামার গাঁও, জগন্নাথপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি জনপদ স্পর্শ করে চলত, কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই পদ্মা অনেকটা উত্তর-পূর্ব দিকে সরে আসে।

বিগত ২০ বৎসরে পদ্মার প্রবাহ হরিরামপুর উপজেলার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে পাটগ্রাম, লেছড়াগঞ্জ, হরিরামপুর, হাজীনগর, বাইলাঘোপা, সুতালরী, হারিনা সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ গ্রাস করে। ফলে এ উপজেলার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং উপজেলা সদর স্থানান্তর করা হয় আন্দারমানিক গ্রামে।

যমুনা নদী

দৌলতপুর উপজেলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল বিধৌত করে যমুনা নদী জাফরগঞ্জ এবং গোয়ালন্দের সন্নিকটে পদ্মার প্রবাহে মিলেছে। মনে করা হয় ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের পর যমুনার এ খাতের সৃষ্টি। ১৭৮৭ সনের পূর্ববর্তী সময়ে তিস্তা নদীর একটি শাখা নিম্নগামী হয়ে পদ্মায় মিলিত হতো। তিস্তার মহাপ্লাবনের পর ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত

www.pathagar.com

হয় এবং তিস্তা সে শাখা খাতই যমুনার প্রবাহে রূপ নেয়। যমুনার বিশাল প্রবাহ দৌতলপুর উপজেলার পশ্চিম এলাকায় ব্যাপক ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলাখেলার মত।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত যমুনার ভাঙা গড়ার আবর্তে এলাকার ভৌগোলিক রূপ-রেখা বিপর্যস্ত ও পরিবর্তিত হয়েছে। কখনও প্রাচীন নগর-জনপদ বিলীন হয়ে গেছে; আবার কখনও নতুন বালুচর জেগেছে।

ইছামতি নদী

মানিকগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহমান ইছামতি নদী অন্যতম প্রাচীন নদী। যুগে যুগে পদ্মা, ধলেশ্বরী, যমুনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদ-নদীর খাত পরিবর্তন এবং ব্যাপক ভাঙাচোরার ফলে এলাকার ভূ-গঠনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাতে ইছামতি নদীর আদি খাত এবং তার উৎসমুখ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। মনে করা হয় বার ভূঁইয়া নেতা ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলার নামানুসারেই 'ইছামতি' নদীর নামকরণ হয়েছে।

মেজর রেনেলের মানচিত্রানুযায়ী (১৯৭৮ সনে প্রকাশিত) মানিকগঞ্জে ইছামতি নদীর উৎসমুখ ছিল জাফরগঞ্জের কাছাকাছি। সে সময় পদ্মা তীরবর্তী বিখ্যাত এলাচিপুরের নিকট থেকে উৎসারিত দুটি স্রোতধারা লক্ষ্য করা যায়। তার একটি নওয়াবখালী ক্রীক থেকে আগত একটি প্রবাহের সঙ্গে খাবাস খালীর নিকট ইছামতির সাথে মিলিত হতো। এখন ইছামতি নদী ঘিওর উপজেলা সদরের পশ্চিমে কুস্তার নিকট প্রাচীন ধলেশ্বরীর খাত থেকে উৎসারিত হয়ে রসুলপুরের নিকট দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাহিত। অতঃপর তা সসিনারা ও গোয়ালন্দের মধ্য দিয়ে শিবালয় উপজেলায় প্রবেশ করেছে এবং পাইপাড়া, চারিপাড়া, হরিহরপুর, ধুতরাবাড়ি, রূপসা, নীলগ্রাম, ত্রিলোচনপট্টী, বিলভরিত, চর বারুরিয়া, কোদালিয়া, ধিতপুর ও উত্তর সৌলজানার মধ্য দিয়ে হরিরামপুর উপজেলায় প্রবেশ করেছে। অতঃপর নদীটি মাচাইন, জগতবের, বাল্লা, কালিকাপুর, বাহাদুরপুর, হেমরাজপুর, পাঠানকান্দি, হরিরামপুর, কুমারডাহা, বাহিরচর, আন্দারমানিক রাজারা, পশ্চিম খলিলপুর, থানা যাত্রাপুর, পিপুলিয়া, বলরা, টানটুর খোলা, চর বংখুরী এবং বরঘোনার নিকট প্রবাহিত হয়ে নওয়াবগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে বিভিন্ন নগর-জনপদ স্পর্শ করে ধলেশ্বরীর মূল প্রবাহে মিলেছে। ঐতিহাসিক মাচাইন গ্রামের নিকট থেকে ইছামতির মূল স্রোতধারা থেকে একটি প্রবাহ উত্তর-পূর্ব দিকে ছোটো শাকরাইর, ইশাখাবাদ, টেটামারা, গাচলতা, বাঙালার উত্তর ও হেলাচিরার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বরুণা, বারথা, বাঘিয়া, বরুন্ডি, জামশার নিকট দিয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করেছে। বর্তমানে পদ্মা ও কালীগঙ্গা নদীদ্বয় ইছামতির প্রাচীন শাখা খাতের প্রবাহ অনেকটাই গ্রাস করেছে।

বিখ্যাত বন্দর কালিকাপুরের নিকট থেকে ইছামতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহ গোপালপুর ও যাত্রাপুরের নিকট দিয়ে হেলাচিয়ার দক্ষিণে ইছামতির অপর শাখা খাতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো। পরবর্তীতে এর মূল প্রবাহটি ক্ষীণ শাখা খাতে রূপ লাভ করে এবং মূল প্রবাহ সম্ভবত দক্ষিণে সরে যায়। বর্তমান শতাব্দীতে পদ্মার প্রবাহ হরিরামপুরের অনেক অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে ইছামতির প্রবাহকে বুকে ধারণ করে নিয়েছে। ফলে বিগত ১৯৭০-এর দশকে ইছামতির যে পুরনো গতিপথ ছিল তা

www.pathagar.com

দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। হরিরামপুরের দক্ষিণ পূর্বাংশের ইছামতির প্রবাহ এখন পদ্মার জলরাশিতে এবং পশ্চিমাংশ প্রাচীন ধলেশ্বরীর জলরাশিতে পুষ্ট।

কালীগঙ্গা নদী

কালীগঙ্গা প্রাচীন ধলেশ্বরীর অন্যতম প্রধান শাখা নদী। উনিশ শতকে এ নদীর উৎপত্তি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি সরু খাল বিশেষ ছিল। পরে প্রসারিত ও গভীরতা প্রাপ্ত হয়। ধলেশ্বরীর উৎস মুখ বার বার পরিবর্তিত না হলে হয়ত বা কালীগঙ্গার খাতেই ধলেশ্বরীর মূল প্রবাহ বাহিত হতো। পশ্চিম কুমলি এবং পূর্ব কুমলির মধ্যবর্তী স্থানে ধলেশ্বরীর প্রবাহ থেকে এ নদী উৎপন্ন হয়ে জাবরা, হরিপুর, তরা, খাগড়াকুড়ির নিকট দিয়ে বেউথার নিকট এসে দক্ষিণগামী হয়েছে। এর একটি শাখা মূল বর্গার পূর্ব প্রান্ত বেয়ে বিলপাইসার নিকট অপর শাখার সাথে মিলিত হয়েছে এবং এ মিলিত ধারা দক্ষিণ জাইল্যা, বড়ো বরুন্ডি, বাস্তা ও স্বল্প নন্দপুরের মধ্যবর্তী স্থানে দু'ভাগ হয়েছে। পারিল নওদা, দক্ষিণ জাইল্যা, উত্তর চারিগ্রাম, পশ্চিম জামশা, ছোটো জামশা, দক্ষিণ জামশা প্রভৃতি অঞ্চল মধ্যবর্তী স্থানে রেখে দু'বাহু দু'দিক থেকে ঘুরে দক্ষিণ চারিগ্রামের নিকট পুনরায় একত্রিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত মিলিত ধারা কুমলি, সিংজুরী, কোন্ডা চর, কালীগঙ্গা পাড়াগাঁয়ের মধ্য দিয়ে ধলেশ্বরীর মূল স্রোতধারায় মিলিত হয়েছে। বর্তমানে কালীগঙ্গা নব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। শুষ্ক মৌসুমে তা অত্যন্ত ক্ষীণ রূপ ধারণ করে। শুধুমাত্র বর্ষাকালীন সময়ে কালীগঙ্গা যৌবনপ্রাপ্ত এবং নৌ-চলাচলের উপযোগী হয়।

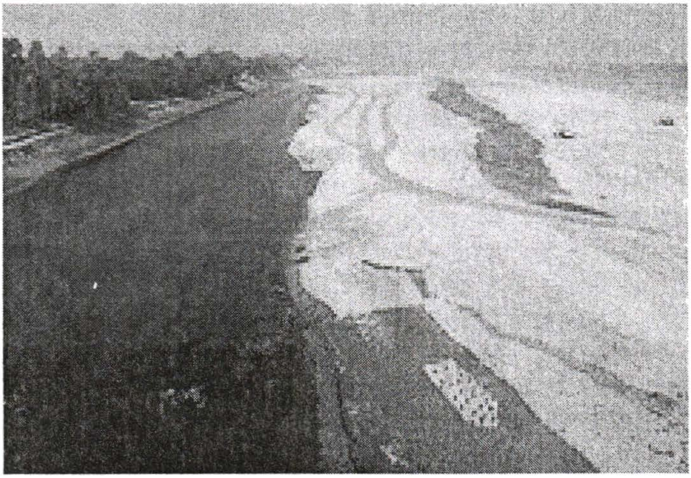

শুকনো মৌসুমে শীর্ণ কালীগঙ্গা নদী

ধলেশ্বরী নদী

সুদূর অতীত হতে ধলেশ্বরী নদী মানিকগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহমান। আঠারো শতকে এই নদীর গতিধারা ছিল পশ্চিম থেকে পূর্বাভিমুখী। কিন্তু উনিশ শতকে এর

www.pathagar.com

ভিন্ন প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত আদি ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ বর্তমান যমুনা খাতে প্রবাহিত হবার পর ধলেশ্বরী পুরাতন পশ্চিম-পূর্বমুখী গতিপথ ত্যাগ করে উত্তর এবং উত্তর-দক্ষিণমুখী হয় এবং বর্তমানে তা উৎস মুখ হতে দক্ষিণাভিমুখী হয়ে মানিকগঞ্জে প্রবেশ করেছে।

১৮৭২-১৮৭৫ সালের জরিপ মানচিত্রে ধলেশ্বরী টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যমুনা হতে বহির্গত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সামান্য অগ্রসর হবার পর কান্দি পাইকারিয়ার নিকট দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। বান্দুরবালিয়া ও রামচন্দ্রপুর মৌজা মধ্যে রেখে বিশমপুর ও চশহরিচরণের নিকট এই দুটি শাখা পুনরায় একত্রিত হয়ে অপোডাঙ্গা ও শ্যামপুরের মধ্য দিয়ে মানিকগঞ্জ জেলার সীমানায় প্রবেশ করেছে। কুষ্টিয়ার কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি শাখা গাজীখালী নাম ধারণ করে সাটুরিয়ার দক্ষিণ দিয়ে ক্রমশ পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বাহিত হয়ে সিংগাইর উপজেলায় ইসলামপুরের সীমানায় ধলেশ্বরীতে মিশেছে। প্রথম ধারাটি বিষ্ণুপুর, রঘুনাথপুর ও এক কালের পুয়াইল শহরের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে কোইষ্টা ঘিওরের উত্তর সীমানা হয়ে কুসুন্দা ও তিল্লির মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে সামান্য উত্তর পূর্বে বেঁকে তিল্লি, শিমুলিয়া ও পশ্চিমে কুষ্টিয়ার নিকট দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অপর একটি প্রবাহ হরগজ, বিশ্বনাথপুর, উশরার পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে প্রাচীন মানিকগঞ্জ শহর, জাগীর, মেঘশিমুল, বারই, বগজুরি, পশ্চিমে মত্ত ও পূর্বে চর মত্ত রেখে পূর্ব দিকে ধাবিত হয়েছে। অতঃপর ধলেশ্বরীর প্রবাহ বেতিলা, পাথরাইল এবং বারাহির বড়ো পাড়ার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বহমান থেকে সিংগাইর, আজিমপুর, জয়মন্টপ, ভাকুম দক্ষিণে ও পূর্ব-উত্তরে ফোর্ড নগরীর সীমা ঘেঁষে সাভারের নিকট এসে সোজা দক্ষিণে বাহিত হয়ে হান্টি ও দিঘাপাতিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি খাত মুসুরীখোলা, ফিরিঙ্গী পাড়ার পশ্চিম-দক্ষিণ পার্শ্ব বেয়ে বুড়িগঙ্গা নামে ঢাকার নিকট দিয়ে আলমগঞ্জ ও ফতুল্লার নিকট দক্ষিণ-পশ্চিমে পুনরায় ধলেশ্বরীর মূল খাতে পতিত হয়েছে। অপর শাখাটি চামটা, চান্দহর, পালপাড়ার নিকট দিয়ে চর কালীগঙ্গা ও পাড়াগাঁয়ের মধ্যবর্তী স্থান বেয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে একেবেঁকে চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় পড়েছে। হরগঞ্জের দক্ষিণ এবং চামারখাইর উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরী একত্রিত হয়ে চরফুকুরহাটি ও মাধবনগরের নিকট দিয়ে মানিকগঞ্জ সদরে প্রবেশ করেছে। বিশ্বনাথপুর বড়ো বাঙ্গালা, ছোটো বাঙ্গালা প্রভৃতি বড়ো বড়ো ভূ-খণ্ড নদী বক্ষে জেগে উঠলে নদীটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং দক্ষিণ কুষ্টিয়ার দক্ষিণে এবং উকড়ার উত্তর প্রান্ত ছেড়ে ধুকুলীর নিকট বিভক্ত ধারা দুটির পুনর্মিলন ঘটে। এই মিলিত ধারা গোলড়ার দক্ষিণ নয়া পাড়া, পশ্চিম পাড়া বিধৌত করে দক্ষিণ সাগর, বাসুদেবপুর, পাথরাইল, বেতিলা, ভিকরা, চাকদোনার উত্তর দিয়ে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গেছে। অতঃপর ঐ ধারাটি পূর্ব প্রান্তে বিভক্ত হয়ে একটি শাখা সোজা পূর্বগামী এবং অপর শাখাটি কৃষ্ণপুরের তীর ঘেঁষে পূর্বগামী হয়ে চাড়াভাঙ্গার পূর্ব প্রান্তে পুনরায় একত্রিত হয়েছে। বর্তমানে সোজা খাতটি ভরাট হয়ে গেছে। এই মিলিত ধারা উত্তর সিংগাইর, কাংশা, দিয়াবাড়িয়া, চর সিংগাইর ও চরগঙ্গা লালগঙ্গার পশ্চিম পার্শ্ব বেয়ে সিংগাইর ও জয়মন্টপের নিকট ধামরাই থানার ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করেছে।

www.pathagar.com

ধলেশ্বরীর অপর একটি বড়ো প্রবাহ চাড়াভাঙ্গা ও বিনোদপুর ঝাড়খন্ডের পাশ দিয়ে পূর্ব দক্ষিণে বারোতাল্লুক গোলড়ার কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি শাখা কাশিমনগর, বড়বাকা, বিরাম, পারিলের নিকট কালীগঙ্গার খাতে মিলিত হয়েছে। অপর প্রবাহটিও পূর্ব-দক্ষিণে একেবেঁকে চারিগ্রাম, দাশেরহাটির নিকট কালীগঙ্গায় পতিত হয়েছে। খাশের চর-এর নিকট ধলেশ্বরী হতে একটি প্রবাহ পানা, গোয়াতিপাড়া, কাশুরা, ভূমদক্ষিণ পৌছে পূর্বগামী হয়ে পানিশাইল, খালাশুর, আলোকদিয়ার নিকট বাহিত হয়ে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পতিত হয়েছে। সিংগাইর উপজেলার পূর্ব-উত্তর প্রান্তে ঐতিহাসিক ফোর্ডনগরের নিকট দিয়ে ধলেশ্বরীর একটি বড়ো দক্ষিণগামী খাত এক সময় উলাইল, ধল্লা, স্বল্প চৈল্যা, সুদক্ষিণা, রাজনাসুর, মাধবপুরের কূল বেয়ে ধলেশ্বরীর মূল স্রোতের সাথে মিলিত হতো। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ধল্লা হতে কালাবাক পর্যন্ত এই খাতের প্রবাহ পলিস্তরের কারণে চর জেগে সমভূমিতে রূপ নেয়। তিল্লির সীমান্তে ধলেশ্বরী নদীবক্ষে জেগে ওঠা পলিস্তর স্থিতিশীলতা লাভ করলে গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই সিংগাইর উপজেলার ফোর্ডনগর পর্যন্ত ধলেশ্বরীর বিশাল প্রবাহ শীর্ণাকায় হয়ে পড়ে।[১৭]

ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ

১৯৪২ সালে তেরশ্রী গ্রামের বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রী সিদ্ধেশ্বরী প্রসাদ রায় চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বৈন্যা প্রসাদ গ্রামের সন্তান হিমাংশুভূষণ সরকারের চেষ্টায় তেরশ্রীতে 'মানিকগঞ্জ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত বছরই কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথম দিকে কলেজটিতে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি ও হিসাবরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। তেওতার জমিদার কিরণশঙ্কর রায় এবং স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ বলধারা গ্রামের সন্তান ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সাথে জড়িত ছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তিরোহিত হয়ে যায় এবং কলেজটি আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়। ফলে মানিগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক খোরশেদ আলমের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজটি মানিকগঞ্জে স্থানান্তরিত করা হয়। অতঃপর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিমাংশু বাবু, মহকুমা প্রশাসক ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনুরোধে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রণদা প্রসাদ সাহা কলেজের আর্থিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন এবং ১৯৪৪ সালে তাঁর পিতার নামে কলেজটির নতুন নামকরণ করেন 'মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ'। ১৯৪৭ সালে কলেজটিতে ডিগ্রি পাস কোর্স চালু করা হয়। ১৯৬৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৬৪ সালে ডিগ্রি পর্যায়ে বাণিজ্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। ১লা মার্চ ১৯৮০ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। তখন থেকে কলেজটির নাম হয় 'সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ '।

www.pathagar.com

বর্তমানে কলেজটির চারটি ভবন রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে তিনটি ছাত্রাবাস। কলেজের সামনে রয়েছে বিশাল খেলার মাঠ। ২০০০ সালে কলেজটি ভালো ফলাফল ও শিক্ষার উচ্চ মানের জন্য সেরা জাতীয় কলেজের মর্যাদা লাভ করে। এছাড়াও জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এটি বেশ কয়েকবার সেরা কলেজ নির্বাচিত হবার খ্যাতি অর্জন করেছে। ৫২-র ভাষা আন্দোলনে শহিদ রফিক এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।[১৮]

সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ

মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পরপরই ১৯৭২ সালে মানিকগঞ্জ মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটির প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব মফিজুল ইসলাম খান (কামাল)। ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি কলেজটি জাতীয়করণ করা হয় এবং এর নাম হয় 'মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ'।

বর্তমানে মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ ক্যাম্পাস দুটি ব্লকে বিভক্ত : প্রশাসনিক বিভাগ ও প্রধান ভবন নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি ব্লক এবং অপর ব্লকটি বিজ্ঞান ভবন নামে পরিচিত। প্রধান ভবনটি মানিকগঞ্জ জেলা শহরের শহীদ রফিক সড়কের সাথেই অবস্থিত। মূল ভবনের উত্তরে গঙ্গাধরপট্টি নামক এলাকায় বিজ্ঞান ভবন অবস্থিত। একাডেমিক ভবন, খেলার মাঠ, পুকুর, ছাত্রীদের হোস্টেল, অধ্যক্ষের বাসভবনসহ কলেজটি সর্বমোট ৫.৩৮ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমানে নারী শিক্ষার উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজটি সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এ কলেজে পড়াশোনার মান ও

www.pathagar.com

পরীক্ষার ফলাফল সব সময়ই ভালো। এ অঞ্চলের একমাত্র মহিলা কলেজ হওয়ায় এ কলেজে ভর্তির চাপ বেশি থাকে। এটি বর্তমানে ডিগ্রি (পাস) পর্যায়ের একটি কলেজ। এ কলেজে মানবিক শাখায় ডিগ্রি (স্নাতক) শ্রেণি রয়েছে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক শাখা, বিজ্ঞান শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু আছে। মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজটি মানিকগঞ্জ জেলায় নারী শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।[১৯]

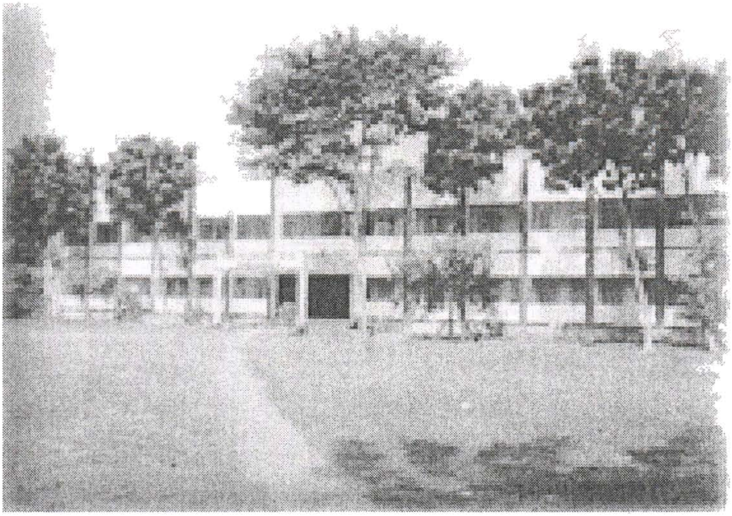

মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ

মানিকগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

১৮৮৪ সালে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও জমিদারদের সহায়তায় মানিকগঞ্জের কেন্দ্রে 'মানিকগঞ্জ মিডল ইংলিশ স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে যা 'মানিকগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়'-এ উন্নীত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধানশিক্ষক ছিলেন রজণীকান্ত রায়।

১৯৫৫ সালে বিদ্যালয়ের নাম থেকে ইংরেজি শব্দটি বাদ দিলে এটির নাম হয় 'মানিকগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়'। ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনামলে নির্মিত বলে একে 'ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল'ও বলা হতো। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষার উচ্চমানের জন্য একে জাতীয়করণ করে।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে নার্সারি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাতঃকালীন প্রাথমিক শিক্ষা সহ ষষ্ঠ শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়বার ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।[২০]

www.pathagar.com

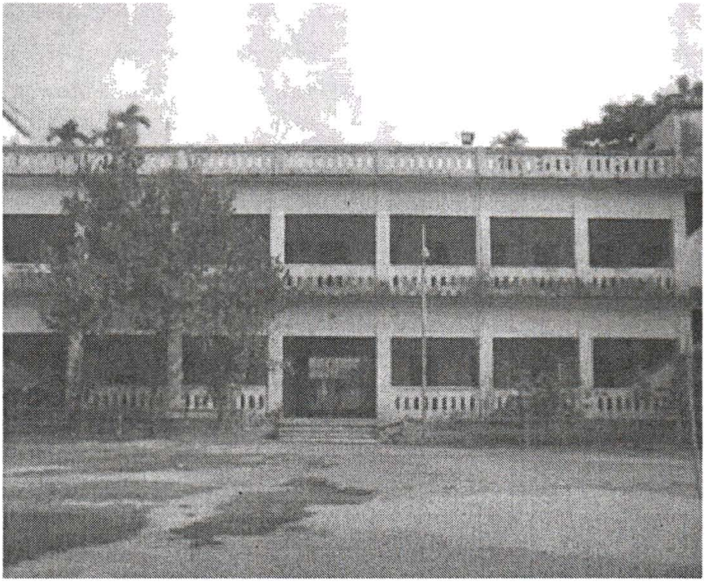

মানিকগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (পুরনো ভবন)

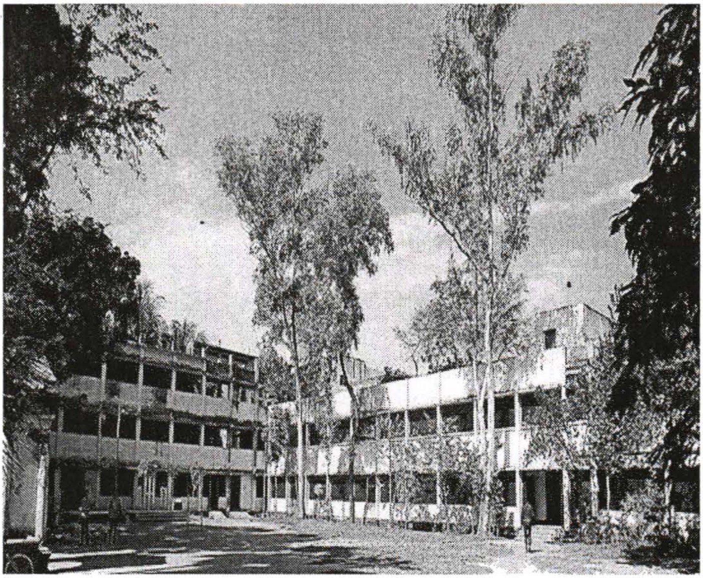

মানিকগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (নতুন ভবন)

www.pathagar.com

এস.কে. সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মানিকগঞ্জের প্রখ্যাত বালিয়াটি জমিদার বংশের সন্তান ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর দত্তক পুত্র সুরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ১৯৩০ সালে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কেন্দ্রে অবস্থিত এস.কে. সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টির পূর্ণ নাম সুরেন্দ্র কুমার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু পরবর্তীতে সুরেন্দ্র কুমারকে সংক্ষেপ করে এস.কে. করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি বিদ্যালয়টি মানিকগঞ্জ জেলায় নারী শিক্ষা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যালয়টিতে সকালে ও মধ্যাহ্নে দুই শিফটে যথাক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।[২১]

ঈশ্বর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

মানিকগঞ্জের পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাটুরিয়া উপজেলার বালিয়াটি ঈশ্বর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। বালিয়াটির জমিদার ঈশ্বর চন্দ্র রায় চৌধুরীর নামানুসারে স্কুলটির নাম ঈশ্বর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় হয়েছে। ১৯১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বর চন্দ্রের পুত্র হরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমত স্কুলটির নামকরণ করা হয়েছিল ঈশ্বর চন্দ্র হাই ইংলিশ স্কুল। হরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করে স্কুলটির সুদীর্ঘ এবং সুদৃশ্য পাকা ভবন নির্মাণ করে দেন। বর্তমানে এ স্কুলটি স্থানীয় স্কুল কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাটুরিয়া স্কুল কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।[২২]

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এছাড়াও মানিকগঞ্জের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– গড়পাড়া হাফিজ উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ, মানিকগঞ্জ সদর; বেগম জরিনা কলেজ, মানিকগঞ্জ সদর; খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন খান কলেজ, মানিকগঞ্জ সদর; বায়ড়া কলেজ, সিংগাইর; সিংগাইর ডিগ্রি কলেজ, সিংগাইর; ঘিওর সরকারি কলেজ, ঘিওর; তেরশ্রী ডিগ্রি কলেজ, ঘিওর; ভিখু মেমোরিয়াল সরকারি ডিগ্রি কলেজ, সাটুরিয়া; কালুশা ডিগ্রি কলেজ, সাটুরিয়া; মহাদেবপুর ইউনিয়ন ডিগ্রি কলেজ, বরংগাইল, শিবালয়; মতিলাল ডিগ্রি কলেজ, দৌলতপুর; তালুকনগর ডিগ্রি কলেজ, দৌলতপুর; ঝিটকা খাজা রহমত আলী কলেজ, হরিরামপুর; বিচারপতি নুরুল ইসলাম কলেজ, হরিরামপুর; এবং খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর; গড়পাড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর; মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, মানিকগঞ্জ সদর; জয় মন্টব হাই স্কুল, চারিগ্রাম; এস. এ খান হাই স্কুল, সিংগাইর; সাটুরিয়া আদর্শ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সাটুরিয়া; দরগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, সাটুরিয়া; সিংগাইর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিংগাইর; সাহরাইল উচ্চ বিদ্যালয়, সিংগাইর; শিবালয় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, শিবালয়; পাটগ্রাম অনাথবন্ধু সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, হরিরামপুর; ঝিটকা গাউছুল আজম আঃ কাঃ দাখিল মাদ্রাসা, হরিরামপুর; ঘিওর ডি.এন. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঘিওর; তেরশ্রী কে.এন ইন্সটিটিউশন, ঘিওর; ঘিওর সিনিয়র মাদ্রাসা, ঘিওর; দৌলতপুর পি.এস উচ্চ বিদ্যালয়, দৌলতপুর; বাঘুটিয়া কে.এস উচ্চ বিদ্যালয়, দৌলতপুর; বাঘুটিয়া আলীম মাদ্রাসা, দৌলতপুর।[২৩]

www.pathagar.com

জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

বালিয়াটি জমিদার বাড়ি

মানিকগঞ্জ জেলার পুরাকীর্তির ইতিহাসে বালিয়াটির জমিদারদের অবদান উল্লেখযোগ্য। বলিয়াটির জমিদারেরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বৎসর ধরে বহু কীর্তি রেখে গেছেন যা জেলার পুরাকীর্তিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তৎকালীন মানিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে ঘনেশ রাম নামে এক হিন্দু সাহা শ্রেণির লোক ছিলেন। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে একজন, গোবিন্দরাম বালিয়াটি গ্রামে বিয়ে করে উক্ত গ্রামেই বসবাস করতে থাকেন। আনন্দরাম, দধিরাম, পণ্ডিতরাম ও গোলাপরাম নামে গোবিন্দরামের চার সন্তান হতে প্রসিদ্ধ গোলাবাড়ি, পূর্ব-পশ্চিম বাড়ি, মধ্য বাড়ি ও উত্তর বাড়ি নামে বালিয়াটি জমিদার বাড়ি সৃষ্টি হয়। বালিয়াটির পাঠান বাড়ির জমিদার নিত্যানন্দ রায় চৌধুরীর দুই ছেলে বৃন্দাবন চন্দ্র রায় চৌধুরী এবং জগন্নাথ রায় চৌধুরীর মাধ্যমে বালিয়াটির নাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বালিয়াটিতে আজো দুই বেলা রাধা বল্লভ পূজা হচ্ছে। বালিয়াটিতে ১৯২৩ সালের দিকে জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরী নিজ ব্যয়ে একটি এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। জমিদার হীরালাল রায় চৌধুরী সাটুরিয়া থেকে বালিয়াটির প্রবেশ পথের পাশে কাউন্নারা গ্রামে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণ করেন এবং সেখানে দিঘির মাঝখানে একটি প্রমোদ ভবন গড়ে তোলেন যেখানে সুন্দরী নর্তকী বা প্রমোদ বালাদের নাচগান ও পানাহার চলতো। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে।[২৪]

বালিয়াটি জমিদারদের চারটি দালান

www.pathagar.com

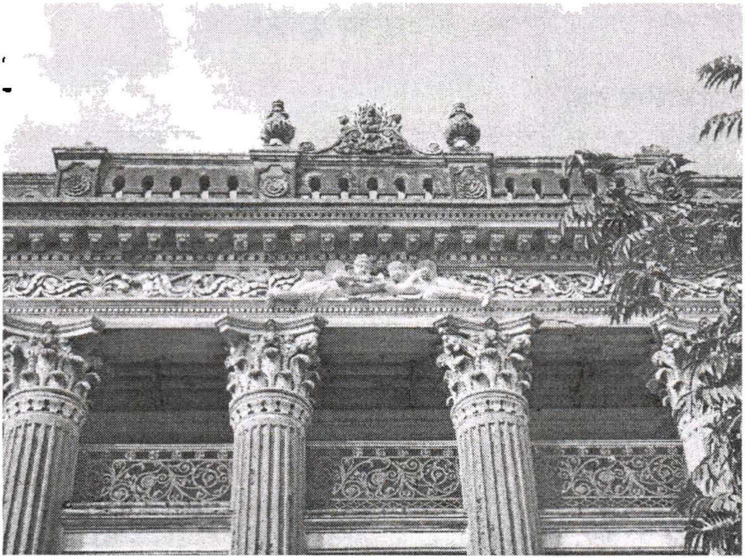

বালিয়াটি জমিদার বাড়ির স্থাপত্য নকশা

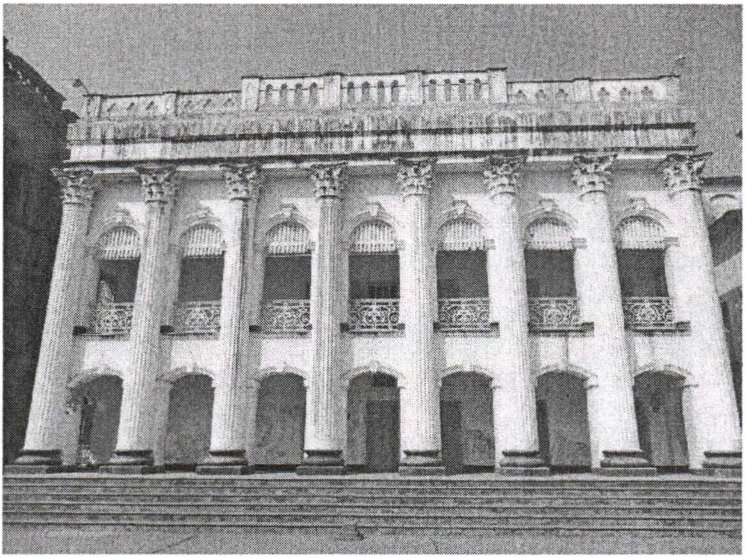

বালিয়াটি জমিদার বাড়ি

www.pathagar.com

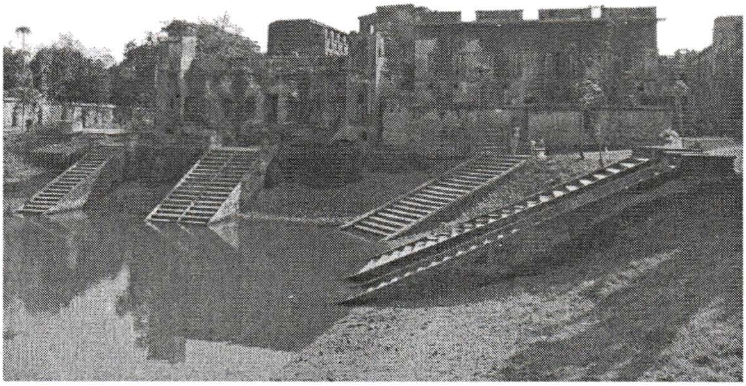

বালিয়াটি জমিদার বাড়ির পুকুর

তেওতা জমিদার বাড়ি

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় অবস্থিত তেওতার জমিদারির স্থাপনকর্তার নাম পঞ্চানন চৌধুরী। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের সময় পঞ্চানন রায়ের বয়স ১৪ বছর ছিল বলে জানা যায়। সে হিসাবে তার জন্ম ১৭৪৩ সালে। পঞ্চানন রায়ের পূর্বপুরুষগণ নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন। তার ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ গঙ্গানন্দ নদীয়া থেকে যশোহরে এবং গঙ্গানন্দের পৌত্র বিশ্বনাথ যশোহর থেকে তেওতা এসে বসতি গড়ে তুলেন। তেওতার জমিদার বাড়িটি বাবু হেমশংকর রায় চৌধুরী এবং বাবু জয় শংকর রায় চৌধুরী নামে দুই সহোদর ভ্রাতার নিজ বসত বাড়ি ছিল। তেওতা অবস্থান করে তারা জমিদারি পরিচালনা করতেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর তেওতার জমিদার বাড়ির সন্তানগণ কলকাতায় আশ্রয় নেন। বর্তমানে এই জমিদার বাড়ির মোট ৫৫টি কক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে এবং ৫৬টি নদীভাঙা পরিবার এখানে অবৈধভাবে বসবাস করছে।[২৫]

তেওতা নবরত্ন মঠ

তেওতা জমিদার বাড়ির দালানের ভিতরে দুটি মন্দির ও একটি মঠ আছে যা 'নবরত্ন' নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে তৎকালীন জমিদারগণ এদেশ ত্যাগ করে ভারতের কলকাতা গমন করেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জমিদারগণ চলে যাবার পর তাদের নামীয় সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে রেকর্ডভুক্ত হয়।

www.pathagar.com

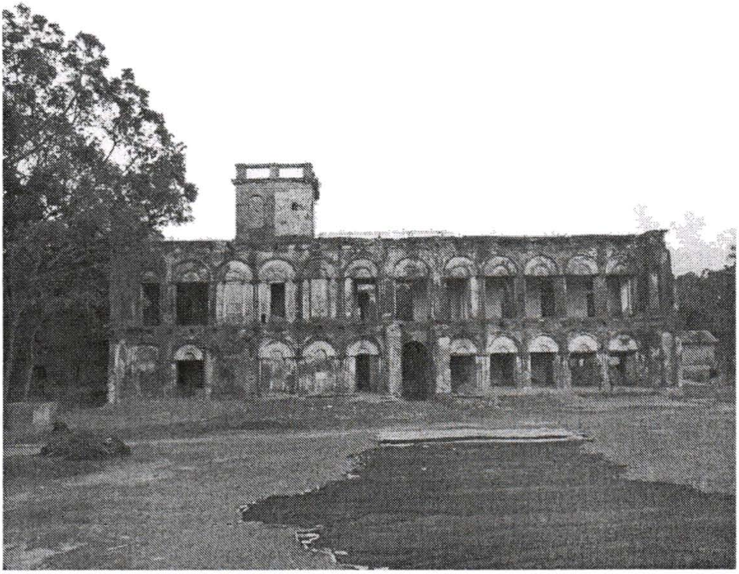

তেওতা জমিদার বাড়ি

নবরত্ন মঠটি বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। তবে পুরো বাড়িটি সংস্কারের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বাড়িটি উত্তরে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুটি পুকুর রয়েছে এবং পুকুরের পূর্ব পাশ দিয়ে একটি সরকারি পাকা রাস্তা চলমান আছে।[২৬]

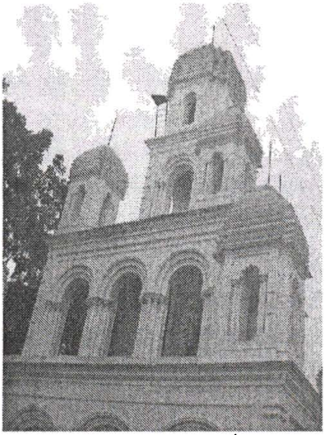

তেওতা নবরত্ন মঠ

www.pathagar.com

বেতিলা জমিদার বাড়ি

বেতিলা জমিদার বাড়িটি মানিকগঞ্জ সদর থানার বেতিলা গ্রামে অবস্থিত। তথ্যগত অভাবের কারণে এই বাড়ির ইতিহাস ভালো ভাবে জানা যায় না। বেতিলা জমিদার বাড়ি লোকে মুখে জমিদার বাড়ি বলে পরিচিত হলেও এটি আদতে সত্যবাবুর বসত বাড়ি। সেই সময়ে অজপাড়াগাঁয়ের এই বিশাল দালানকোঠা স্থানীয়দের কাছে জমিদারি বলেই মনে হতো। বেতিলার মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে বেতিলা খাল। এই বেতিলা খাল ছিল একসময় প্রবল খরস্রোতা। ধলেশ্বরী ও কালীগঙ্গাকে যুক্ত করেছে বেতিলা খাল। এ পথে একসময় বড়ো বড়ো বজরা ও মহাজনী নৌকা আসা যাওয়া করতো। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, জ্যাতিবাবু নামে কলকাতার একজন বণিক এই বাড়ির পূর্বপুরুষ। তিনি ছিলেন মূলত পাটের বণিক। ধারণা করা হয় পাটের ব্যবসার সুবাদেই এই অঞ্চলে তার আগমন ঘটে। বেতিলা জমিদার বাড়ি বর্তমানে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[২৭]

বেতিলা জমিদার বাড়ি

মত্তের মঠ

বর্তমান মানিকগঞ্জ সদরের দেড় মাইল পূর্বে মত্ত গ্রামটিতে এক সময় প্রতাপশালী জমিদারদের বসবাস ছিলো। প্রায় দুশো পনেরো বছর পূর্বে হেমসেন নামে একজন জমিদার তার পিতার শেষকৃত্য স্থলে এই মঠটি নির্মাণ করেন। জানা যায় ইরাক থেকে কারিগর এনে নিটল দিঘির পাড়ে প্রায় দুইশত ফিট উঁচু ও পনেরো শতাংশ জমির উপর অপরূপ মঠটি নির্মাণ করা হয়। সুনিপুণ কারুকার্য আর উচ্চতার কারণে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় মঠটি দর্শনার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বাংলা ১৩২৬

www.pathagar.com

সালে আশ্বিন মাসে এক ঝড়ের বিকেলে মঠটির উপরের পাঁচটি কলস সহ প্রায় ২০ ফুট অংশ ভেঙে নিটল দিঘিতে পড়ে যায়। শোনা যায় পাঁচটি কলসের মধ্যে তিনটি সোনার তৈরি ছিল যা হেমসেন তার পিতার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান স্থলে রেখেছিল।[২৮]

মত্তের মঠ

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

মানিকগঞ্জের পুরাকীর্তির ইতিহাসে সাটুরিয়া উপজেলার বালিয়াটি গ্রামের রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের সমাজ সচেতন জনগোষ্ঠীর উদ্দীপনায় শ্রী রাধিকা চরণ অধিকারী ওরফে শ্রী স্বামী সুন্দরানন্দজী মহারাজ সেবাশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের মধ্যে মোট দশটি মঠ ও মিশন কেন্দ্রীয় মঠ কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়ে আসছে–তার মধ্যে এটি অন্যতম। এখানে সুদৃশ্য পাকা মন্দিরে বিগ্রহের পূজা অর্চনা হয় এবং মন্দির সংলগ্ন ভবনে একটি গ্রন্থাগার আছে।[২৯]

শিব সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলে শিব সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। মানিকগঞ্জের শিব সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এ জেলার পুরাকীর্তির মধ্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট প্রস্তরময় সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি, একটি মাঝারি আকারের শ্বেত পাথরের শিবের বাহন ষাঁড় ও অষ্টধাতুর দুর্গা মূর্তি এবং আরো কিছু ভাস্কর্যের নিদর্শন ছিল। কিন্তু সবগুলোই ১৯৬১-৬২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চুরি হয়ে গেছে। বর্তমানে সিমেন্টের সিদ্ধেশ্বরী শিব পূজিত হচ্ছে। শিব সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটির নিজস্ব কোনো আয়ের উৎস না থাকায় দীর্ঘদিনের প্রাচীন মন্দির অর্থাভাবে মেরামতের কোনো কাজ হয়নি। মন্দিরের ছাদ যে কোনো সময় ধ্বসে পড়ার উপক্রম। বর্তমানে স্থানীয় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে মন্দিরটির ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম চলছে। নিত্য পূজা অর্চনা অনুষ্ঠানের জন্য একজন পুরোহিতকে মাসিক বেতন ও আবাসিক সুবিধার ভিত্তিতে নিয়োগ করে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।[৩০]

www.pathagar.com

মানিকগঞ্জের শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ী

মানিকগঞ্জ শহরে (তৃপ্তিপ্লাজা মার্কেটের পূর্বে) শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৫-৯৬ সালের দিকে। শ্রী শ্রী কালীমাতা শিব এবং রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপনের জন্য তিন কামরা বিশিষ্ট পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। উক্ত কামরাগুলোর সবচাইতে পূর্ব দিকের কামরায় শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীমায়ের প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালী মন্দিরে প্রাত্যহিক পূজা এবং বিভিন্ন পালা পার্বনে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি নির্বাচিত কমিটি ও স্থানীয় পুরোহিত কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্য মিলে মোট একুশ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দ্বারা সার্বক্ষণিক পূজা অর্চনা করার জন্য মাসিক বেতনে একজন পুরোহিত নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এ মন্দিরটির আয়ের উৎস হলো ভক্তবৃন্দের অনুদান ও সদস্যগণের চাঁদা। বর্তমানে রথের দিনগুলিতে মন্দির প্রাঙ্গণসহ শহরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মেলা বসছে এবং মঠ মন্দিরে মাঝে মাঝে ধর্মসভা, অষ্টপ্রহর, নামকীর্তন ও যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।[৩১]

মানিকগঞ্জের গৌরাঙ্গ মঠ

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বালিয়াটির নয়া তরফের জমিদার মনমোহন রায় চৌধুরী তার স্বর্গীয় পত্নী ইন্দুবালা এবং আদরের দুলালী সুনীতিবালার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে বালিয়াটির বিখ্যাত এবং ভারতের উল্লেখযোগ্য গদাই গৌরাঙ্গ মঠের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাখা মঠ স্থাপন করেন। সুউচ্চ চূড়া সমন্বিত মারবেল পাথরের গাত্রাবরণে উচ্চ পাদপীঠে নির্মিত এই গদাই গৌরাঙ্গ মঠটি মানিকগঞ্জের পুরাকীর্তির গৌরব। তবে ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তান বাহিনী মঠটি ভাঙার চেষ্টা করে এবং পাথরের তৈরি গদাই গৌরাঙ্গ মূর্তি ভেঙে ফেলেছে। এক সময় বৎসরান্তে এ মঠে সমারোহের মধ্য দিয়ে পূজা অর্চনা ও ধর্মালোচনা হতো। দূরদূরান্ত থেকে ভক্ত আর অনুরাগীরা এখানে এসে জমা হতো। বর্তমানে মন্দিরটি কালের সাক্ষী হিসেবে টিকে আছে।[৩২]

নারায়ণ সাধুর আশ্রম

মানিকগঞ্জের সদর উপজেলার মত্ত গ্রামের আরেকটি পুরাকীর্তি নারায়ণ সাধুর আশ্রম। সাধুর বাড়ি ছিল উড়িষ্যা। উড়িষ্যা থেকে সাধু একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড এনে আশ্রম স্থাপন করেন। এখানে পাথর আর ত্রিশূল পূজিত হচ্ছে। এখানে পাকা ভবন নির্মিত হয় বাংলা ১৩৪৮ সালে। সাধুর আশ্রম হিসাবে এখনো এখানে ভক্তরা জমায়েত হন।[৩৩]

মাচাইন গ্রামের ঐতিহাসিক মাজার ও পুরাতন মসজিদ

মানিকগঞ্জের মুসলিম পুরাকীর্তির বেশির ভাগই বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমল ও পরবর্তী মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি জামে মসজিদের মধ্যে মাচাইন গ্রামের মসজিদ অন্যতম। স্বাধীন সুলতানী আমলে মাচাইন একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। এখানে একজন দরবেশ একটি বাঁশের মাচায় বসে আধ্যাত্মিক

www.pathagar.com

চিন্তা করতেন। এই দরবেশের নাম হযরত শাহ্ রুস্তম। বর্তমানে মাচাইন গ্রামে শাহ্ রুস্তমের মাজার জিয়ারত মানিকগঞ্জ জেলাসহ আশেপাশের অঞ্চলের মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধার বিষয়। এই মাচাইন গ্রামের ঐতিহাসিক মাজার ও পুরাতন মসজিদটি মানিকগঞ্জের মুসলিম পুরাকীর্তির দু'টি বিশেষ নজির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।[৩৪]

হযরত গাজীউল মুলক ইকরাম ইব্রাহীম শাহ বোগদাদী (রহঃ)-এর মাজার

অলি, আওলিয়া ও সুফি-সাধকের স্মৃতিবিজড়িত জেলা মানিকগঞ্জ। মানিকগঞ্জের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মাজার। মহান সাধক ব্যক্তিদের পদস্পর্শে এলাকা হয়েছে ধন্য। মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রাম তেমনি একটি ঐতিহাসিক স্থান। রাজধানী ঢাকার অতি নিকটবর্তী এ গ্রামে রয়েছে সুফি সাধক হযরত গাজীউল মুলক ইকরাম ইব্রাহীম শাহ বোগদাদী (রহঃ) এর মাজার।

স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় ৮৭০ বছর আগে হযরত শাহ জালাল (রহঃ)-এর সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবার বড়ো ছিলেন হযরত গাজীউল মুলক ইকরাম ইব্রাহীম শাহ বোগদাদী (রহঃ)। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা পাথরে ভেসে সমুদ্র পথে এদেশে আসেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম শাহ (রহঃ) সিংগাইর উপজেলার পারিল (নওয়াধা) গ্রামে এসে তাঁর আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আনুমানিক ৬৩৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন এই মহান সাধক পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে পারিল গ্রামেই মাজার নির্মিত হয়।[৩৫] এক গম্বুজ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এ মাজারটির তিন দিকেই টিনের ছাউনি দেওয়া বারান্দা। সংস্কারের অভাবে টিনগুলো মরিচা ধরে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্বদিকে মাজারটির প্রধান দরজা। মাজার চত্বরে কালো রঙের নয়টি বড়ো পাথর সহ বেশ কিছু ছোটো পাথরের খণ্ড রয়েছে। পাথরগুলি হযরত ইব্রাহীম শাহ (রহঃ) সুদূর বাগদাদ থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। দর্শনার্থী এবং মানতকারীরা তাদের সন্তানদেরকে ঐ সকল পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে দুধ দিয়ে গোছল করিয়ে মানতের কাজ সমাধা করে থাকে।

প্রতি বছর বাংলা ফাল্গুন মাসের ১৩ ও ১৪ তারিখ মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার নারী পুরুষ এই মাজার জিয়ারত করতে আসেন। এই মহান আউলিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বহুলোক দান খয়রাত করে থাকে। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে আসা ১২ জন আওলিয়ার মধ্যে হযরত ইব্রাহীম শাহ বোগদাদী (রহঃ) সবার বড়ো হলেও অজপাড়াগাঁয়ে এ মহান সাধকের সমাধি হওয়ায় তেমন জাঁকজমকতা পায়নি এ মাজারটি। বর্তমানে সংস্কারের অভাবে ঐতিহাসিক পারিল ইব্রাহীম শাহ বোগদাদী (রহঃ)-এর মাজারটি অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে।

www.pathagar.com

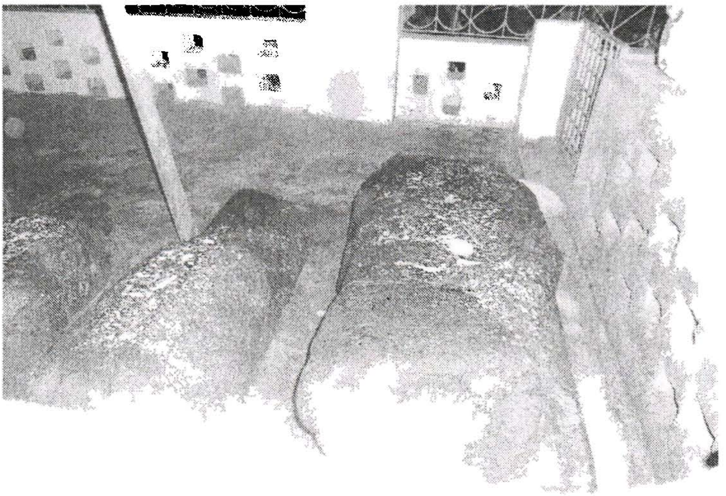

ইব্রাহীম শাহ বোগদাদী (রঃ) এর মাজারে সংরক্ষিত কিছু পাথর

অন্যান্য মাজার

বাঠইমুরি মাজার ঘিওর উপজেলায় অবস্থিত। এখানে সমাহিত আছেন আফাজ উদ্দিন পাগলা এবং তার শিষ্য শরীয়ত উল্লাহ। এটি আনুমানিক দেড় থেকে দুইশত বছরের পূর্বের মাজার বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে এখানে একটি বড়ো মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মান্তা গ্রামে রয়েছে আধ্যাত্মিক সাধক শাহ কানু প্রামাণিকের মাজার। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কোনো একদিন গ্রামের এক ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রতি বছর ১লা মাঘ কানু শাহের মাজারে ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়।

মানিকগঞ্জ শহর থেকে দুই কিমি. পশ্চিমে বাগজান গ্রামে রয়েছে হযরত শাহ সুফি তমেজ উদ্দিন দেওয়ান (রঃ) এর মাজার শরিফ। প্রতি বছর ২৩ কার্তিক এই মাজারে পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়। বাগজান গ্রামের ৩ কিমি. উত্তর পূর্বে অবস্থিত গড়পাড়া ইউনিয়নের পাঞ্জনখারা গ্রামে রয়েছে হযরত মোশাররফ আলী খান মজলিশ (রঃ) এর মাজার। সাটুরিয়া উপজেলার বরাইদ গ্রামের বিখ্যাত খান মজলিশ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই আধ্যাত্মিক সাধক ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জনখারার শ্বশুরালয়ে মৃত্যুবরণ করেন। প্রতি বছর ২৭ ফাল্গুন এই মাজারে তাঁর ওরস শরিফ অনুষ্ঠিত হয়। এই গড়পাড়া ইউনিয়নের আলীনগর গ্রামে রয়েছে উপমহাদেশের সুবিখ্যাত গড়পাড়া ইমাম বাড়ি। এই বাড়িতে রয়েছে হযরত শাহ খলিলুর রহমান (রঃ), শাহ আব্দুল গনি এবং শাহ্ হামিদুর রহমান (রঃ) ও তাঁর ছোটো ভাই হযরত শাহ হাবিবুর রহমানের মাজার শরিফ। প্রতি বছর ২৬ চৈত্র যৌথভাবে শাহ হামিদুর রহমান ও শাহ হাবিবুর রহমানের পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই ইমাম বাড়িতেই ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে হযরত শাহ খলিলুর রহমান (রঃ) খাজা বাবার পবিত্র দরবার শরিফ ও পবিত্র ওরস প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করেন। সেই থেকে প্রতি বছর ৬ রজব দরবার শরিফে যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬]

গড়পাড়া ইউনিয়নের চান্দাইর গ্রামে রয়েছে ফকির হারান শাহের মাজার। প্রতি বছর ১ ফাল্গুন এই মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ শহরের বান্দুটিয়ায় আছে মুনশি ছেল্লাল উদ্দিন (রঃ) এর মাজার। তাঁর জন্ম ১২৬৫ বঙ্গাব্দে ঘিওর থানার জাবরা গ্রামে। ১৩৫৫ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ তিনি পরলোক গমন করেন। পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম উপলক্ষ্যে তাঁর রওজা শরিফে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ দুধবাজারে রয়েছে হযরত মফিজউদ্দিন শাহ (রঃ) এর মাজার শরিফ। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার এই মাজারে পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া মানিকগঞ্জ সদরের বেউথায় রয়েছে করিম সাহের মাজার। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় এখানে ওরস হয়।

জয়মন্টপ ইউনিয়নের নয়ানী গ্রামে রয়েছে হযরত শাহ সুফি আব্দুর ওয়াহেদ ওরফে ডেঙ্গর পির (রঃ)-এর মাজার। বাংলা ১২৭৭ সনের ২২ পৌষ তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের প্রথম বুধবার তাঁর মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

সিংগাইরের আজিমপুর গ্রামে রয়েছে বাউল শিল্পী রশিদ সরকারের মাজার। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি তাঁর ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ওরস উপলক্ষে বসে তিন দিন ব্যাপী মেলা। চলে বাউল গানের জমজমাট আসর।

সাটুরিয়া উপজেলার কাউন্নারা গ্রামে রয়েছে বিখ্যাত সাধক ও সংগীতজ্ঞ কালু শাহ্ ফকিরের মাজার। কালু শাহ ফকিরের জন্ম ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে পাবনা জেলার উল্লাপাড়ার কালিগঞ্জ গ্রামে। শৈশবকালেই তিনি পিতা-মাতার সঙ্গে তার নানা বাড়ি কাউন্নারা গ্রামে চলে আসেন। তিনি বহু আধ্যাত্মিক গান রচনা করে গেছেন। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। প্রতি বছর মাঘ মাসের চাঁদের ১০ ও ১১ তারিখে তাঁর পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

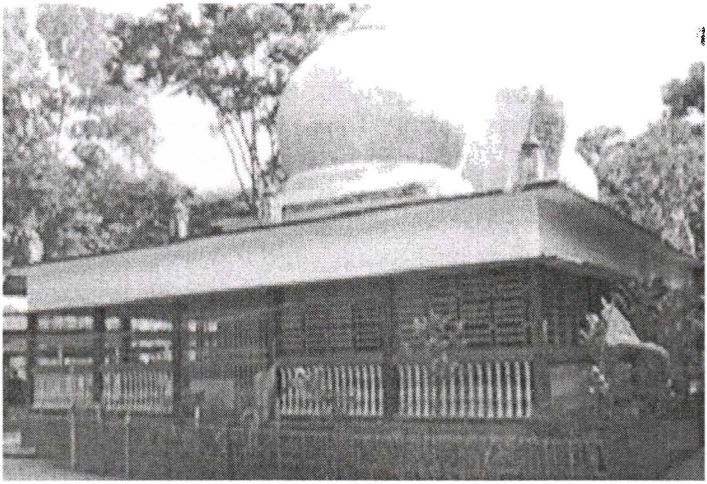

কালু শাহ ফকিরের মাজার

www.pathagar.com

কালু শাহ ফকিরের মাজারের অনতি দূরেই রয়েছে হযরত নিশি শাহ ও হযরত ইয়েমেনি শাহ (রঃ) এর মাজার শরিফ। সাটুরিয়া বাজারে রয়েছে কালুশাহ ফকিরের জ্যেষ্ঠ সন্তান নেধু শাহ (রঃ) এর মাজার। তিনিও পিতার মতো সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এই উপজেলার বরুণ্ডি গ্রামে রয়েছে হযরত শাহ্ সৈয়দ কদম রসুল শাহ্ বোগদাদী (রঃ) এর মাজার। বৈশাখ মাসের শেষ দিন তাঁর ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ১লা কার্তিক অনুষ্ঠিত হয় গাস্যি উৎসব।

ঝ. ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদ

ভাষার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে মানিকগঞ্জের যে সন্তান সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঋণী করেছেন তাঁর নাম শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদ। শহিদ রফিকের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০শে অক্টোবর মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের পারিল বলধারা গ্রামে (বর্তমানে রফিক নগর)। তাঁর পিতার নাম আব্দুল লতিফ ও মাতার নাম রাফিজা খাতুন। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে রফিক ছিলেন সবার বড়ো। শহিদ হবার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর।

শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদ

বাল্যজীবনে রফিক গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেন। শৈশবে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যাওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় যেতে হয়। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে কিছুদিন লেখাপড়া করার পর বাবার সাথে পারিল ফিরে এসে বিপ্লবী নেতা ও নেত্রী যথাক্রমে অনিলচন্দ্র ও লীলাবতী রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়রা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই তিনি ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ঐ বছরেই তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হন। দ্বিতীয় বর্ষে থাকাকালীন সময়ে লেখা-পড়ায় ইস্তফা দিয়ে ঢাকায় তাঁর বাবার বাবু বাজারের আকমল খান রোডে 'কমার্সিয়াল প্রেস' দেখাশোনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বিদ্যা অর্জনের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলে তিনি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ

www.pathagar.com

কলেজে ভর্তি হন। জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময়ে তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পাক সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভেঙে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে মিছিল করার সময় তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে) রফিকই প্রথম গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর লাশ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

রফিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালে তিনি পারিল-বলধারা যুবক সমিতির কার্যকরি পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরে উক্ত সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মুসলিম ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও যুবক সমিতি গঠিত হয়। রফিক শেষোক্ত সমিতির সহ-সম্পাদক ছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি ছড়া লিখতেন বলে শোনা যায়। রফিকের নিজ গ্রামেই নাসির উদ্দিন আহমেদের কন্যা পানু বিবির সাথে তাঁর বিয়ের দিন ধার্য করা নিয়ে কথাবার্তা চলছিল, ঠিক সেই সময়েই মাতৃভাষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন মানিকগঞ্জের এই অকুতভয় সন্তান।

শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদের স্মৃতি রক্ষার্থে রফিক-এর নিজ গ্রামে সরকার শহিদ রফিক আহমদ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি যাদুঘর নির্মাণ করেছে। এছাড়া তাঁর নিজ গ্রাম পারিলের নাম রাখা হয়েছে রফিক নগর। সিংগাইর উপজেলায় শহিদ রফিক স্মরণে গড়ে উঠেছে ভাষা সৈনিক রফিক গণ পাঠাগার, রফিক স্মরণী ও শহিদ রফিক নাট্যগোষ্ঠী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদকে মরণোত্তর ২১শে পদকে ভূষিত করে।[৩৭]

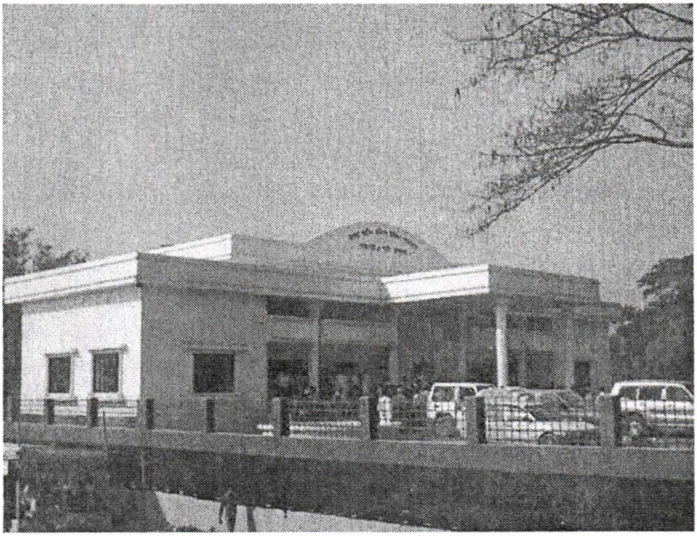

ভাষা শহিদ রফিকউদ্দিন গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর

www.pathagar.com

ঞ. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

কিশোরীলাল রায় চৌধুরী

যে কর্মবীরের কল্যাণে বাংলাদেশের অনেকেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁর নাম কিশোরীলাল রায় চৌধুরী। মানিকগঞ্জের এই মানিক ১৮৪৮ সালের ১৯শে নভেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার বালিয়াটি জমিদার পরিবারের প্রখ্যাত পশ্চিম বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহাত্মা জগন্নাথ রায় চৌধুরী।

কিশোরীলাল রায় চৌধুরী জনহিতকর কাজে একজন অগ্রনায়ক ছিলেন। তিনি ১৮৮৪ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁর পিতার নামে জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। তিনি ঢাকার বাংলা বাজারে ১৮৮৭ সালে নিজ নামে কিশোরীলাল জুবিলী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে কে. এল. জুবিলী হাইস্কুল এবং কলেজ নামে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন। নাট্যচর্চার উন্নতির জন্য তিনি ঢাকাতে মালঞ্চ নামে একটি রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলেন। সেই রঙ্গমঞ্চটি বর্তমানে লায়ন্স সিনেমা নামে পরিচিত। এখানে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হতো। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে জগন্নাথ কলেজকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে নামিয়ে ডিগ্রি পর্বের ছাত্র, শিক্ষক, মূল্যবান বইপত্র, আসবাবপত্র ও আর্থিক সুযোগ দানের বিনিময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সম্মানার্থে জগন্নাথ হল নামকরণ করেন।

কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ছিলেন অনেক বড়ো আত্মার মানুষ। জনহিতকর কাজে এমনকি সরকারও যদি তাঁর কোনো সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতো, সে সম্পত্তির মূল্য তিনি গ্রহণ করতেন না। বালিয়াটিতে তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন যা অদ্যাবধি সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯২৫ সালের ৩রা জুলাই বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী পরলোকগমন করেন।[৩৮]

হীরালাল সেন

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদ পুরুষ হীরালাল সেন মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামে ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী ও প্রভাবশালী জমিদার চন্দ্রমোহন সেন ছিলেন তাঁর পিতা। দীনেশচন্দ্র সেন ও হীরালালের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। ছোটো বয়সে তারা দুই ভাই মিলে কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করতেন।

হীরালাল সেনের শৈশব কেটেছে মানিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে পড়াশুনা করে। ছবি তোলার প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। বগজুরিতে হীরালাল সেনের কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে গড়ে ওঠে "অমরাবতী ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশন"। পরবর্তীকালে হীরালাল সেন সপরিবারে কলকাতা চলে যান।

হীরালাল ফটোগ্রাফির প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর মায়ের নিকট থেকে একটি দামী ক্যামেরা পেয়ে যান। কলকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি আরো একটি স্টুডিও'র ব্যবসা শুরু করেন। বগজুরি ও কলকাতার দুটি স্টুডিও দীনেশচন্দ্র সেন দেখাশুনা করতেন এবং নানাভাবে হীরালালকে উৎসাহ প্রদান করতেন।

www.pathagar.com

হীরালাল সেন

আলোকচিত্র শিল্পী হিসেবে হীরালাল সেনের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বি.কে পাল (ঔষধ প্রস্তুতকারক)-এর নিকট থেকে তিনি একটি মুভি ক্যামেরা সংগ্রহ করেন এবং নিজের দেশ বগজুরি গ্রামে ফিরে আসেন। ১৮৯৭ সালে তিনি গ্রাম বাংলাকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেন। ১৮৯৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত "রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি"-তে শুরু হয় নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এখানকার প্রদর্শিত প্রথম ছবি 'আলিবাবা' ১৮৯৮ সালে ১৭ই এপ্রিল ঢাকা শহরে প্রদর্শিত হয়। তিনি ক্রাউন থিয়েটারে প্রথম বায়োস্কোপ দেখিয়েছিলেন। ১৯০২ সালে হীরালাল সেন চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেন। বোম্বেতে তৈরি তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র 'হরিশচন্দ্র'। এরপর দাদা সাহেব ফলকে ছবিটি তৈরি করেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতে বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রায় ৮০টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর এই নির্মাণকাজ চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশ এবং উপমহাদেশে তিনি চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে বর্তমানে সুপরিচিত। ১৯১৭ সালের ২৯শে অক্টোবর হীরালাল সেন পরলোক গমন করেন।[৩৯]

প্রমিলা নজরুল

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী প্রমিলা নজরুলের জন্ম ১৩১৫ সালের ২৭শে বৈশাখ (মে ১৯০৮) মানিকগঞ্জ সদরের তেওতা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম বসন্তকুমার সেনগুপ্ত এবং মাতা গিরিবালা দেবী। বিয়ের পূর্বে প্রমিলা নজরুলের পারিবারিক নাম ছিল আশালতা সেনগুপ্তা আর ডাকনাম দোলন। পরিবারের সদস্যরা আদর করে তাঁকে

www.pathagar.com

দুলি বলে ডাকতেন। প্রমিলা নজরুল মাইনর পাস করার পর স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তাঁর পক্ষে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকায় তিনি যথেষ্ট জ্ঞানবতী এবং সংস্কার মুক্ত হতে পেরেছিলেন।

প্রমিলা নজরুলের পিতা বসন্তকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন কুমিল্লার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর ড. উমাকান্তের পেশকার। কর্মসূত্রে তিনি কুমিল্লাতেই থাকতেন। তবে প্রতি বছর পূজার সময় সপরিবারে নিজ গ্রামের বাড়ি তেওতা আসতেন। কাজী নজরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়েও প্রমিলা নজরুল একাধিকবার তেওতা গ্রামে এসেছিলেন। ১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হবার পর দীর্ঘ বিশটি বছর তিনি কবির সেবায় নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন। দীর্ঘ ৩৮ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি ৪ পুত্র সন্তানের মা হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্র আজাদ কামাল (কৃষ্ণ মোহাম্মদ) জন্মের কয়েক মাস পরে এবং দ্বিতীয় পুত্র অরিন্দম খালেদ (বুলবুল) অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী এবং কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধকে রেখে ১৯৬২ সালে প্রমিলা নজরুল পরলোকগমন করেন।[৪০]

অধ্যাপক আদালত খান

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার দাদরোখী গ্রামের জুলফিকার খানের তৃতীয় পুত্র আদালত খান। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৬১ সালে তিনি ইংরেজি এবং প্রাচ্য দেশীয় ভাষার (ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, আরবি) হায়ার টেক্সট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলা ছাড়াও তিনি ইংরেজি, ফারসি, উর্দু, আরবি এবং হিন্দি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এসব ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। সংস্কৃত, পালি এবং ল্যাটিন ভাষাও তিনি খুব ভালো জানতেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন তাঁর কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক। তাঁর রচিত কিছু গ্রন্থ লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে তিনি এতটাই সুখ্যাতি অর্জন করেন যে, তাঁর নাম ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ভাই আলহেদাদ খান ফরিদপুর দর্পণের সম্পাদক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। অন্য ভাই ডা. আকবর খান ছিলেন চিকিৎসক। ১৮৯৪ সালে আদালত খান মৃত্যুবরণ করেন।[৪১]

আবদুল লতিফ বিশ্বাস

মানিকগঞ্জের এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আবদুল লতিফ বিশ্বাস ১৩০০ বঙ্গাব্দে হরিরামপুর উপজেলার সোনাকান্দন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ও বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯২৫ সালে মানিকগঞ্জ শহরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। মানিকগঞ্জ ছাড়াও তিনি কলকাতা বার, করাচি হাইকোর্ট এবং ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুপ্রেরণায় তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন।

১৯২৬-১৯২৮ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং ১৯৩৭-১৯৪৬ পর্যন্ত বেঙ্গল কোরে লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের

www.pathagar.com

মনোনয়নে মানিকগঞ্জ মহকুমার থেকে পূর্ববঙ্গ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় তিনি ছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী হিসেবে তিনি জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর একটি যোগসূত্র ছিল। ১৩৭১ বঙ্গাব্দে ২৯শে কার্তিক ঢাকায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।[৪২]

ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও মানিকগঞ্জের কৃতি সন্তান ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী ১৯২৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি শিবালয় থানার এলাচিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় ১৯৫০ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ২২টি থানার সমন্বয়ে গঠিত ঢাকা সদর ও গাজীপুরের এরিয়া কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা এবং মুক্তবুদ্ধির অধিকারী এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট একজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের এই মহান বীর সেনা ১৯৮৭ সালের ৭ই অক্টোবর পরলোক গমন করেন।[৪৩]

খান আতাউর রহমান

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের অনন্যসাধারণ ব্যক্তি খান আতাউর রহমান। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিচালক, অভিনেতা, কবি ও সাহিত্যিক। খান আতাউর রহমান ১৯২৮ সালে সিংগাইর থানার রামকান্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খান আতা ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

খান আতাউর রহমান

www.pathagar.com

"এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা" তাঁর এই বিখ্যাত গানের মাঝেই দেশপ্রেমের বিষয়টি মূর্ত হয়ে উঠেছে। খান আতা পরিচালিত ও অভিনীত ছবিসমূহ হলো : জাগো হুয়া সাবেরা (১৯৫৯), যে নদী মরুপথে (১৯৬১), সূর্যস্নান (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩) নবাব সিরাজউদ্দৌলা, সোয়ে নদীয়া জাগে পানি, সাত ভাই চম্পা, জোয়ার ভাটা ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি অসংখ্য ছবিতে সংগীত পরিচালক, গীতিকার ও সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন। এই অনন্যসাধারণ ও সৃজনশীল ব্যক্তি ১৯৯৭ সালের ১লা ডিসেম্বর ঢাকায় পরলোক গমন করে।[৪৪]

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন ১৯০১ সালের ৩০শে অক্টোবর মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার চারিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র নয় বছর বয়সে মাতৃহারা এবং বারো বছর বয়সে পিতৃহারা হন। কিশোর বয়সেই কলকাতায় কর্মজীবন শুরু করেন এক বই বাঁধাইয়ের কারখানায়।

১৯২০ সাল। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখন 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক। নবযুগে নজরুলের দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ও দুঃখী মানুষের মর্মস্পর্শী লেখা পড়ে মঈনুদ্দীন মনে প্রাণে নজরুলের ভক্ত হয়ে যান। সেদিন থেকে নজরুলের স্মরণশক্তি বিলোপের সময় পর্যন্ত বিপদে আপদে, সুখে দুঃখে কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন নজরুলের সঙ্গী ছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তাঁর কাব্য প্রেরণার উৎস। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'আর্তনাদ'। উনিশ শ' তেতাল্লিশের মন্বন্তর-এর পটভূমিতে এই কাব্য রচিত। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হে মানুষ' ১৯৫৮ সালে এবং তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পালের নাও' ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

কবি মঈনুদ্দীন কবিতা, উপন্যাস, ছোটো গল্প ও শিশু সাহিত্যসহ সাহিত্যের বিচিত্র অঙ্গনে বিচরণ করেছেন। তিনি ১৯৬০ সালে শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রায় ২৪টি শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন। *মুসলিম বীরাঙ্গনা* (১৯৩৬), *স্বপন দেখি* (১৯৩৬), *আরব্য রজনী* (১৯৫৭), *খোলাফায়ে রাশেদীন* (১৯৫১), *বাবা আদম* (১৯৫৭) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

১৯৮১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন।[৪৫]

ড. দীনেশচন্দ্র সেন

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৬৬ সালে ৩ নভেম্বর মানিকগঞ্জের বগজুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাস ও সাহিত্য রচনা এবং প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এসব কাজে তাঁর মৌলিক চিন্তা এবং আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ড. দীনেশচন্দ্র সেন

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহু প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেন। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ থেকে তিনি প্রচুর পুথি সংগ্রহ করেন। এই পুথি সাহিত্যে আমরা মুসলিম কবি আলাওলের নাম পাই। বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে পুথি সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর লেখা 'বৃহৎবঙ্গ' সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৯৩৬ সালে 'বৃহৎবঙ্গ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীনেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একে অপরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েন। দীনেশচন্দ্রের প্রতিটি রচনাকে রবীন্দ্রনাথ মানব সমাজের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকার করেছেন। ১৯১১ সালে দীনেশচন্দ্রের History of Bengali Language and Literature নামে গ্রন্থখানি ইংরেজিতে প্রকাশিত হওয়ার পর পাশ্চাত্যের অনেক মনীষীর কাছ থেকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

চন্দ্রকুমার দে-এর সহযোগিতায় তিনি ময়মনসিংহ গীতিকার অনেক পালাগান সংগ্রহ করেন। এগুলির মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্কা ও নীলা, কাজল রেখা, দেওয়ানা মদিনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পুথি সংগ্রহ, পাঠ ও বিশ্লেষণ, গ্রন্থ রচনা ইত্যাদি কাজে অস্বাভাবিক পরিশ্রমের দরুণ তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৮৯৭ সালে চিকিৎসার জন্য কলকাতা চলে যান। ১৯৩৯ সালে ২০শে নভেম্বর মানিকগঞ্জের এই কৃতি সন্তান তাঁর বেহালার রূপেশ্বর ভবনে পরলোক গমন করেন।[৪৬]

ড. অমর্ত্য সেন

মানিকগঞ্জের মত্ত গ্রামের সন্তান অধ্যাপক ড. অমর্ত্য সেন ১৯৩৩ সালের ৩রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ সারদা প্রসাদ সেন ছিলেন ঢাকার সেশন জজ। ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে তিনি 'দেওয়ান বাহাদুর' খেতাব পেয়েছিলেন। সারদা প্রসাদের

www.pathagar.com

ছোটো ভাই অম্বিকা প্রসাদ ছিলেন জেলা জজ। তিনি পেয়েছিলেন রায়বাহাদুর খেতাব। দুই ভাই জজ হওয়ার কারণে তাঁদের বাড়িটি 'জজ বাড়ি' নামে খ্যাত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ট্রেজারার লর্ড লিন্ডসে ১৯২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ড সারদা প্রসাদ সেনকে অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দান করেন। ১৯২৩ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার ফিলিপ জন হার্ট সলিমুল্লাহ মুসলিম হল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করানোর দায়িত্ব সারদা প্রসাদ সেনকে অর্পণ করেন। ১৯২৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জে এইচ লিন্ডসে লন্ডন যাওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় চেক স্বাক্ষর করার গুরুদায়িত্ব তাঁকে দিয়ে যান।

সারদা প্রসাদ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র অমর্ত্য সেনের পিতা ড. আশুতোষ সেন কর্মজীবনের প্রথম দিকে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরে গগন মুখার্জির সাথে হাত মিলিয়ে ভারতের কৃষি গবেষণা ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিভাগ স্থাপন করেন। শান্তিনিকেতনের খোয়াই নদীর ভূমিক্ষয় রোধ, জলকষ্ট নিবারণ এবং কৃষিকাজের ব্যাপক উন্নয়ন তাঁর অমর কীর্তি। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ তিনি সেখানেই পরলোক গমন করেন।

অমর্ত্য সেনের কৈশোরকাল অতিবাহিত হয় ঢাকা শহরের ওয়ারী এলাকার লারমিনী স্ট্রিটের পৈত্রিক বাড়ি জগৎকুঠীতে। তিনি পড়াশোনা করেন লক্ষ্মীবাজারের সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৪৯ সনে ম্যাট্রিক, ১৯৫১ সালে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৫৩ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। এরপর চলে যান লন্ডনে। সেখানে ট্রিনিটি কলেজ থেকে দ্বিতীয়বার বি.এ পাস করেন ১৯৫৫ সালে। অতঃপর একই প্রতিষ্ঠান থেকে এম.এ এবং ১৯৫৯ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

অমর্ত্য সেন তাঁর শিক্ষাজীবনে ক্যামব্রিজ অ্যাডাম স্মিথ প্রাইজ (১৯৫৪), রেনবারি স্কলারশিপ (১৯৫৫), স্টিভেশন প্রাইজ (১৯৫৬), ট্রিনিটির সিনিয়র স্কলারশিপ (১৯৫৪) রিসার্চ স্কলারশিপ (১৯৫৫) এবং প্রাইজ ফেলোশিপ (১৯৫৭) লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ১৯৭৬ সালে মহলানবিশ প্রাইজ, ১৯৮৬ সালে সিডম্যান অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯০ সালে সিনেটর এগনোলি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ এন্ড অ্যালান শন ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯৩ সালে জিন মেয়ার গ্লোবাল সিটিজেনশিপ অ্যাওয়ার্ড, ১৯৯৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী গোল্ড মেডেল, অ্যাওয়ার্ড অব এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৭ সালে এডিনবার্গ মেডেল এবং ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত। তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতঃপর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজে এবং সর্বশেষে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও দর্শনের অধ্যাপক পদে শিক্ষকতা করেন।

অমর্ত্য সেন বিশ্বের সর্বাধিক ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। বিশ্বের শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ.ডি এবং এবং ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেছেন।

www.pathagar.com

পিতৃভূমির প্রতি তাঁর মমত্ববোধ অপরিসীম। তিনি মানিকগঞ্জ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।[৪৭]

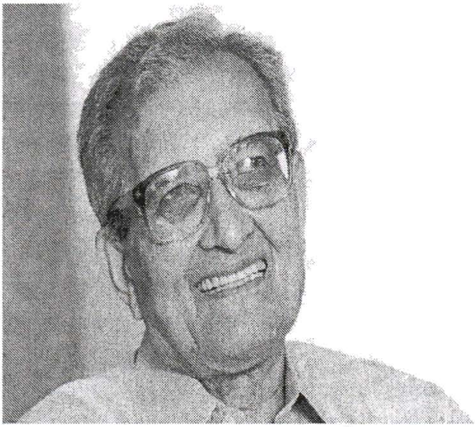

ড. অমর্ত্য সেন

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে কয়েকটি :
Choice of Techniques (1960), *Collective Choice and Social Welfare* (1970), *Growth Economics* (1960), *Implement, Technology and Development* (1975), *Choice Welfare and Development* (1995), *Resource, Values and Development* (1984), *Commodities and Capabilities* (1985), *The Standard of Living* (1984), *Hunger and Public Action* (1999), *India : Economic Development and Social Opportunity* (1966), *Liberty, Equality and Law* (1987)

ট. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল দেশবাসী। সমগ্র জাতির সঙ্গে মানিকগঞ্জের ছাত্র পেশাজীবী সহ আপামর জনসাধারণ পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানিকগঞ্জ ২ নং সেক্টরের আওতায় ছিল। তিনটি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। প্রথম পর্যায়ে মানিকগঞ্জ অঞ্চলে ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠিত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এদের একটি অংশকে ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। আর একটি অংশ ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে মানিকগঞ্জের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তৃতীয় পর্যায়ে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা মানিকগঞ্জের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সম্মিলিতভাবে গেরিলাযুদ্ধকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

২৫ শে মার্চে ঢাকায় পাকবাহিনীর বর্বরতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীর রাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সে বার্তা দ্রুত মানিকগঞ্জেও পৌছে। এরপর থেকেই মানিকগঞ্জের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের পর থেকে তারা পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে। ২ নং সেক্টরের অধীনে মানিকগঞ্জ জেলা, ধামরাই, নবাবগঞ্জ, সাভার সহ ২২টি থানার প্রধান হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসটি মানিকগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষের জন্য উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সিংগাইরের পাকবাহিনীর ক্যাম্প থেকে একটি সেনাদল নৌকাযোগে খাদ্য সমগ্রী সংগ্রহের জন্য মানিকগঞ্জ সদরে আসে। সংবাদ পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বায়রা গ্রামের কাছে ওৎ পেতে থাকে এবং বিকালের দিকে খাদ্য সমগ্রী নিয়ে পাকসেনারা ফিরে আসার সময় ধলেশ্বরী নদীর উভয় তীর থেকে একযোগে আক্রমণ করে পাকবাহিনীর নৌকাগুলো ধ্বংস করে দেয়। সেখানে বেশ কিছু পাক সেনা হতাহত হয়। ১৩ই অক্টোবর পাকবাহিনীর প্রবল বাধার মুখে মুক্তিযোদ্ধারা হরিরামপুর সি.ও অফিসে অবস্থিত পাকবাহিনীর ক্যাম্প দখল করে নেয়। ১৫ অক্টোবর রাতে পাকবাহিনী সুতালড়ী গ্রাম আক্রমণ করে। সারা রাত এবং পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সাথে তাদের তুমুল যুদ্ধ হয় এবং পাক সেনারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

ঐতিহাসিক গোলাইডাঙ্গা যুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গোলাইডাঙ্গা যুদ্ধ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৭১ সালের ২৯ অক্টোবর মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলা থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে গোলাইডাঙ্গা নামক স্থানে তিন খালের সংযোগ স্থলে পাকবাহিনীর সঙ্গে এ ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। পাকবাহিনীর বিশাল একটি বহর গোলাইডাঙ্গা ক্যাম্প দখল করতে আসছে এই খবরের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধকালীন কমান্ডার তোবারক হোসেন লুডুর নেতৃত্বে গোলাইডাঙ্গা খালের মোড় এবং খালের অপর পাড়ে অবস্থান নেয়। পাকবাহিনীর নৌকার বহর আওতার মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা এল.এম.জি, স্টেনগান, রাইফেল ও গ্রেনেডের সাহায্যে নৌকাগুলোর উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণে পাকবাহিনীর প্রায় সবগুলো নৌকাই ডুবে যায় এবং বিপুল সংখ্যক পাকসেনা গুলিতে ও পানিতে ডুবে মারা যায় এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। পরের দিন পাকবাহিনী সাভার, ঢাকা ও মানিকগঞ্জ থেকে বিরাট বাহিনী নিয়ে গোলাইডাঙ্গা গ্রাম আক্রমণ করে এবং গ্রামের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় ও নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। তারা ডুবুরী নামিয়ে খাল থেকে যুদ্ধে নিহত পাক সেনাদের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

মানিকগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র উপরিউক্ত স্থানগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জেলার প্রায় সব থানাতেই এর বিস্তৃতি ঘটেছিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই জেলার প্রায় সব থানা ত্যাগ করে পাকবাহিনী জেলা সদরের পি.টি.আই ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। ১৩ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ সম্পূর্ণভাবে হানাদার মুক্ত হয়।

তেরশ্রী গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর তেরশ্রী গ্রামের মসজিদে যখন আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল ঠিক তখন ঘিওর ক্যাম্প থেকে পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ঝাঁপিয়ে পড়ে তেরশ্রীর গ্রামের নিরীহ মানুষের ওপর। গ্রামের মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আতঙ্কিত গ্রামবাসী কিছু বুঝবার আগেই হানাদার বাহিনী বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু করে। শুরু হয় ছোটাছুটি। আহাজারি আর আর্তচিৎকারে তেরশ্রী গ্রাম ডুবে যায় নারকীয় অবস্থার মধ্যে। জ্বলতে থাকে বাড়ির পর বাড়ি। পাশাপাশি চলতে থাকে হত্যাযজ্ঞ। ঘাতকরা একের পর এক বেয়নেট চার্জ করে ও গুলি করে হত্যা করে ৪৩ জন গ্রামবাসীকে। বেলা ১২টা পর্যন্ত চলে হত্যাযজ্ঞ। এরপর হানাদার বাহিনী ফিরে যায় ঘিওরে। পুরো তেরশ্রী গ্রামটি পরিণত হয় একটি লাশের গ্রামে। ঘিওরের তেরশ্রী ছাড়াও সিংগাইরের গোলাইডাঙ্গা ও রামনগর, হরিরামপুরের সুতালড়ি, আজিমনগর, সাটুরিয়া থানা, শিবালয়ের দাসকান্দি, মানিকগঞ্জের তরা ও বানিয়াজুরি প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।[৪৮]

তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৭-৪০

২. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪০; http://www.manikgonj.gov.bd/node/445056

৩. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪২

৪. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার), *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৪-১৫; http://www.manikgonj.gov.bd/node/445047

৫. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার), *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৪৭

৬. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৩২

৭. ৬ নং দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

৮. ৫ নং দ্রষ্টব্য
৯. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Manikgonj_District
১০. http://www.ebanglapedia.com/en/article.php?id=3397=.vumqjPvumqj
১১. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৪৮
১২. ১১ নং দ্রষ্টব্য
১৩. ৯ নং দ্রষ্টব্য
১৪. ৯ নং দ্রষ্টব্য
১৫. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১১৯-১২২
১৬. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১২৮-১২৯
১৭. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১১১-১১৮
১৮. http://www.wikimapia.org/12494629/Government-Devendra-College
১৯. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৬১
২০. http://www.wikimapia.org/12494869/Manikgonj+Govt+High+School
২১. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১২১
২২. http://www.manikgonj.gov.bd/node/445039
২৩. http://www.manikganj.gov.bd/education-institutes
২৪. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১১৯-১২২
২৫. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১২৮-১২৯
২৬. ২২ নং দ্রষ্টব্য
২৭. ২২ নং দ্রষ্টব্য
২৮. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৩৪-১৩৫
২৯. ২২ নং দ্রষ্টব্য
৩০. ২২ নং দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

৩১. ২২ নং দ্রষ্টব্য

৩২. ২২ নং দ্রষ্টব্য

৩৩. ২২ নং দ্রষ্টব্য

৩৪. ২২ নং দ্রষ্টব্য

৩৫. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৪-৭৫

৩৬. http://www.lged.gov.bd/ DistrictPlaces. aspx?DistrictID=34

৩৭. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫৭৫

৩৮. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৬২

৩৯. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭২২

৪০. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫

৪১. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৩০

৪২. মোঃ আজহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, প্রথম খ-, ২য় সংস্করণ, সুলেখা লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৬০-১৬২

৪৩. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৪৪. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ২৬৯-২৭০

৪৫. চরিতাবিধান, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ১৯৪

৪৬. চরিতাবিধান, বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ২৬৭

৪৭. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ২৯৮-৩০১

৪৮. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজাহার) *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১২৩-১২৬, ১৩০, ১৪০-১৪৩

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

গোষ্ঠীসমাজ প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে যে মৌখিক সাহিত্যের জন্ম দেয়, তাই ব্যাপক অর্থে লোকসাহিত্য বলে প্রচারিত হয়েছে। যদিও একক মানুষ এর স্রষ্টা তথাপি সমগ্র সমাজ যখন একে মেনে নেয় তখনই বংশপরম্পরায় লোকসাহিত্য প্রবাহিত হয়। শুধু গ্রামীণ মানুষই নয়, নাগরিক শ্রমজীবী মানুষও লোকসাহিত্যের স্রষ্টা হতে পারে। মানুষের আটপৌড়ে জীবন যেমন লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে, তেমনি অলৌকিকতাও হয়ে উঠতে পারে লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু।

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

মানিকগঞ্জে একসময় কেচ্ছা-কাহিনির ব্যাপক প্রচলন ছিল। পুরুষ-মহিলা উভয়ই এসব কেচ্ছা বলতেন। বসে বসে অঙ্গভঙ্গি করে কেচ্ছা পরিবেশন করা হয়। কেচ্ছার ফাঁকে কেচ্ছারই গান পরিবেশন করা হয় দর্শক-শ্রোতার একঘেঁয়েমি দূর করে চিত্ত বিনোদনের জন্য। দর্শক-শ্রোতাগণ দারুণভাবে উপভোগ করে এসব কেচ্ছা, সবাই রাত জেগে শুনে। বর্তমানেও মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় কেচ্ছা পরিবেশিত হয়। বগজুরির মজিদ, মানতার আফছার মেম্বার, কাফাটিয়ার উকিলউদ্দি, ভাটরার করম আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কেচ্ছাকার। বর্তমানে বিভিন্ন চ্যানেলেও কেচ্ছা প্রচারিত হয়ে থাকে। পুথি পাঠ ও কেচ্ছা মানিকগঞ্জে বর্তমানেও জনপ্রিয়। সাইদুর রহমান বয়াতিও বর্তমানে কেচ্ছা পরিবেশন করেন। বিয়ে-শাদি উপলক্ষে 'তেলাইর' দিন (বিয়ের আগের দিনগত রাতে কনে বা বরের গায়ে হলুদের দিন), ফিরানের দিন, কোনো বাড়িতে বাচ্চাদের মুখে শিরনি দেওয়া উপলক্ষে, মুসলমানি উপলক্ষে ধোয়ানির দিন (খাওয়া দাওয়া যেদিন হয়), কোনো ফকির বাড়িতে শিরনি উপলক্ষে রাতে কেচ্ছা-কাহিনি পরিবেশনের জন্য তাঁকে দাওয়াত দেওয়া হয়। সাইদুর রহমান বয়াতি বলেন, 'আমার মা কুসুমি বিবির নিকট কেচ্ছা শিখেছি। ফাতাউল্লা দেওয়ান (ফৈতা দেওয়ান) ও আমার চাচা সধর আলীর নিকট কেচ্ছা শিখেছি। তখনকার দিনে ফতু দেওয়ান, দবির মোল্লা, ছানাউল্লা মুন্সি প্রমুখ বিখ্যাত কেচ্ছাকার ছিলেন। এদেরকে দাওয়াত করা হতো কেচ্ছা শুনার জন্য। কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হতো না। তারা সারারাত পান তামাক খেতেন এবং কেচ্ছা গাইতেন। বিখ্যাত কেচ্ছাগুলো হচ্ছে—রূপবান, সাত সিংগারা, সাত ভাইয়ের বোন বায়লা, তেরো কন্দলি চৌদ্দ উজির, বেহুলা-লখিন্দর, গুনাই বিবি, কালুগাজী, চম্পাবতি, ইউসুফ-জুলেখা, আইয়ুব নবী, বাহরাম বাদশা, লাইলি মজনু ইত্যাদি। কিছু কিচ্ছা কাল্পনিক, কিছু ঐতিহাসিক এবং কিছু বানোয়াট।'[১]

www.pathagar.com

১. পাইচা চোরা

০৫.০১.২০১২ তারিখ ভাটরা গ্রামে হাকিম আলীর বাড়িতে তাঁর নাতির বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন আসেন। আনন্দ বিনোদনের জন্য সেদিন রাতে কেচ্ছা-কাহিনির আয়োজন করা হয়। ভাটরা গ্রামের মোহাম্মদ করম আলী (৬৯) কেচ্ছা পরিবেশন করেন। করম আলী বলেন যে, তিনি তাঁর শ্বশুর ছেফারত আলীর নিকট আট/দশটা কেচ্ছা শিখেছেন। যেসব কেচ্ছা তিনি শিখেছেন তা হলো 'পাইচা চোরা' 'গরি মহেশ্বর', 'ডালিম কন্যা', বেহুলা-লখিন্দর, পঞ্চসতী ইত্যাদি। সেদিন তিনি পাইচা চোরা কেচ্ছা পরিবেশন করেন। তিনি মাঝখানে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন শতাধিক দর্শক-শ্রোতা। মেয়েছেলে ও যুবক-যুবতীদের সংখ্যা বেশি। কেচ্ছার ফাঁকে ফাঁকে তিনি গানও পরিবেশন করেন। কেচ্ছাটি হচ্ছে :

একদেশে ছিল মানিক্য নামে এক বাদশা। অনেক চিকিৎসা ও খোদার দরবারে ফরিয়াদের পর বাদশার একটা পুত্র সন্তান হলো। তাই বাদশা খুব খুশি। জ্যোতিষী ডেকে এনে ছেলের ভাগ্য পরীক্ষা করেন। জ্যোতিষী হঠাৎ চমকে উঠে এবং বলে মহারাজ আপনার এই ছেলেটা দুনিয়ার মস্তবড়ো চোর হবে। বাদশা রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে পড়ল। বাদশা ছেলের নাম রাখল পাইচা। বাদশা ভাবল, আমি বাদশা আর আমার ছেলে হবে চোর, আমি ওকে লেখাপড়া শিখাব না। সত্যি তাই হলো। আর পাইচা রাজভাণ্ডার থেকে কিছু টাকা পয়সা চুরি করে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে আর চুরিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকে। সে একজন মস্তবড়ো চোরের ওস্তাদের সন্ধান পায়।

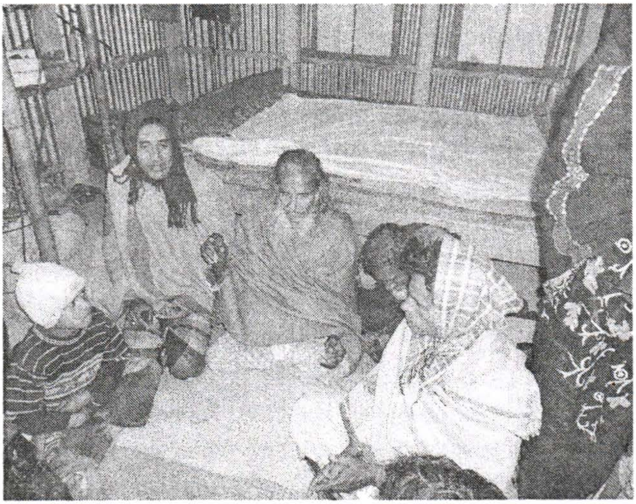

কেচ্ছা পরিবেশন করছেন ভাটরা গ্রামের মোহাম্মদ করম আলী (মাঝে)

তার কাছে বারো বছর চুরিবিদ্যা শিখল। একদিন ওস্তাদ বলে– পাইচা, তুমি কেমন চুরিবিদ্যা শিখলা এবার আমাকে দেখাও। আমার বাড়িতে তুমি চুরি করবা। পাইচা তাই

www.pathagar.com

করল। ওস্তাদ যে ঘরে খাটের উপর শোয়া ছিল পাইচা সেই খাটের চারটি পায়া খুলে নিয়ে আসে। ঐ খাটের উপর শোয়া ওস্তাদ মোটেই জানতে পারে না। পরদিন ওস্তাদ বলে—আমার বাড়িতে চুরি করে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, চুরি করলে না? পাইচা বলে, ওস্তাদজি ঘরে আপনি যে খাটের ওপর শুয়েছিলেন দেখেন খাটের সেই পায়াগুলি আর নাই। আমি খুলিয়া নিয়া গেছি। ওস্তাদ তাই দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেল এবং বলল—তুমি একজন পাকা এবং বিচক্ষণ চোর হইছ। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করলাম, তোমাকে কেউ ধরতে পারবে না। তুমি আমার নাম রাখতে পারবে।

২. কান্তিরাজা ও রূপপতির কেচ্ছা

কাফাটিয়ার মনু মিয়ার বাড়িতে শিরনি হয় ১৭.৯.২০১১ তারিখে। এদিন শিরনি উপলক্ষে কেচ্ছা গানের আয়োজন করেন মনু মিয়া। ঘরের বারান্দায় ২০/৩০ জন ছেলেমেয়ে নারী-পুরুষ বসেন কেচ্ছা শুনার জন্য। উকিল উদ্দিন সেদিন কেচ্ছা শুনান। তাঁর বাড়ি কাফাটিয়া গ্রামে। তিনি বর্তমানে জারিগানও গেয়ে থাকেন। তিনি বহু কেচ্ছা জানেন। সেদিন তিনি যে কেচ্ছা বলেন তা হলো :

অনেকদিন পূর্বে বানিস মুল্লুকে কান্তিরাজা নামে এক মস্তবড়ো রাজা ছিল। আর সেই কান্তিরাজার একটি রূপসী মেয়ে ছিল। তার নাম রূপসী। রাজা চিন্তা করল, আমার মাত্র একটি মেয়ে। দেখতে সুন্দরী। বড়ো বড়ো দেওগণ আমার মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী। কারণ আমার সম্পত্তি তারা পাবে। তাই রাজা দশ হাজার দেও দিয়ে মেয়েকে পাহারা দিয়ে রাখল এবং ঘোষণা করে দিল আমার পাহারাদারদের যে পরাজিত করতে পারবে সে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে। এদিকে রূপপতি নামে এক যুবক ছিল। সারা দুনিয়ায় তার নাম। সে কান্তিরাজার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য রওয়ানা দিল। রাস্তায় দেখে এক বেটা মহিষ দিয়ে হাল বাইতেছে। রোদ লাগবে এই জন্য একটা বটগাছ টান দিয়া উঠাইয়া মাজায় গুইজা রাখছে যাতে তার গায়ে রোদ না লাগে। তখন রূপপতি বলছে 'বা! তুমিতো মস্তবড়ো পালোয়ান'। তাই শুইনা কৃষক বলছে, আমি অত বড়ো পালোয়ান নই, আমার চেয়ে বড়ো পালোয়ান আছে। তার নাম রূপপতি। রূপপতি বলে যে, তুমিতো আমার কথা বলছ, চল আমরা কান্তিরাজার দেশে তার মেয়েকে বিয়ে করতে যাই। অনেক দূর যেয়ে তারা দেখে সামনে নদী। একটা লোক নদীর দুই পাড়ে দুই পাও রাইখা হাত দিয়া নদীর পানি সেচতেছে। তখন তারা বলে তুমিতো বড়ো পালোয়ান। ঐ লোকটি বলে– না, আমার চেয়ে বড়ো পালোয়ান রূপপতি। রূপপতি তখন বলে, তুমি আমার কথা বলছ। তাহলে চল আমরা কান্তিরাজার দেশে তার মেয়েকে বিয়ে করতে যাব। তিনজন রওয়ানা দেয় কান্তিরাজার দেশে। কান্তিরাজার দেশে পৌছাতে একশ মাইল দূর থাকতে একটি জায়গায় তারা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। আশিটি মহিষ আর আশি মণ চাউলের ভাত রান্না করার ব্যবস্থা করা হলো। আশিটি মহিষের মাংস যখন সম্ভার দিছে তখন ঐ সম্ভারের ঘ্রাণ পেয়ে কান্তিরাজার বাড়ি থেকে মেরা দেও নামে এক দেও আসে। আইসা আশি মণ মহিষের মাংস ও আশি মণ চাউল এক লোকমায় খেয়ে ফেলে। তখন তারা পুনরায় রান্না শুরু করে আশিটি মহিষের মাংস ও আশি মণ চাউল। আবারও রাজার বাড়ি থেকে এক দেও

www.pathagar.com

আসে। সে আইসা বলতেছে, বারো বছর যাবত অনাহারী আছি। কান্তিরাজার মেয়েকে পাহারা দিই। কান্তিরাজার মেয়েকে বিবাহ করতে আসবে যারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এই আশায়। সামান্য কিছু খাবার আমাকে দিলে একটু খাইতাম। যারা বিয়ে করতে আসে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতাম। এই কথা শুনে রূপপতি আর দেরি করে না। ঐ দেওয়ের ঘাড় ধইরা একটি আছাড় মারছে তাড়াতাড়ি। দেওয়ের দুই পাও ধইরা ফেইলা দিছে কান্তিরাজার বাড়ি। যারা কান্তিরাজার মেয়ের পাহারায় ছিল তাদের সামনে যাইয়া ঐ দেওটা পড়ল। এদিকে রূপপতিসহ তিনজন কান্তিরাজার বাড়ি গেল। শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ। যুদ্ধে রূপপতি কান্তিরাজার দেওদের পরাজিত করে রূপসীকে নিয়ে আসল। এরপর রূপপতি রূপসীকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে ঘর সংসার করতে লাগল। আমার কেচ্ছাও এখানে শেষ হয়ে গেল।

খ. কিংবদন্তি

কালু শাহ সম্পর্কে কিংবদন্তি

কালু শাহ ফকিরের পির হজরত সৈয়দ আতাউর রহমান একবার কালু শাহকে সঙ্গে নিয়ে মিরপুরে হজরত শাহ আলী বাগদাদীর মাজারে যান। তখন সেখানে জঙ্গল ছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে সাতদিনের চিল্লায় বসান। খাওয়া দাওয়া, পায়খানা-পেশাব সব বন্ধ। পিরের নির্দেশ ছাড়া কোথায়ও যাওয়া যাবে না। প্রথমদিন বিরাট এক হাতি আসে। উনার মাথার মধ্যে এক পা দিয়ে ভয় দেখান। কিন্তু তিনি সাধনা ভঙ্গ করেন না। পরের দিন বাঘ আসে। উনার সামনে হুংকার বা গর্জন করে উঠে। তিনি সাধনা ভাঙেন না। তৃতীয় দিন কুমির আসে, ভয় দেখায় কিন্তু সাধনার জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও নড়েন না। চতুর্থ দিন বিরাট সাপ আসে। উনাকে প্যাঁচ দেয়। দংশন করতে চায়। কিন্তু তিনি নড়েন না। পঞ্চম দিন ভাল্লুক আসে এবং ভয় দেখায়। কিন্তু সাধনায় তিনি অনড়। ষষ্ঠ দিন ও সপ্তম দিন অন্যান্য হিংস্র প্রাণী আসে কিন্তু তিনি ভয় পান না। এইভাবে সাতদিনের দিন উনার পির উনার সামনে উপস্থিত হন। কালু শাহ বলেন– আপনি যে জায়গায় আমাকে বসিয়ে রেখেছেন সেখানে আমি ভয় পাব কেন? কথিত আছে যে, হজরত শাহ আলী বাগদাদীর মাজারের দরজা বন্ধ ছিল। কেউ খুলতে সাহস করতো না। হজরত সৈয়দ কালু শাহ এই দরজা খোলেন। অছিমদ্দীন বলে পির তাঁকে ডাকতেন।

সৈয়দ কালু শাহ ফকির কোরানের হাফেজ ছিলেন। রাত নেই দিন নেই তিনি বাজনা বাজিয়ে গান করতেন। তৈজুদ্দিন মাওলানা কালু শাহ ফকিরের বিরুদ্ধে সভা বসায় পাকুইল্লায়। কালু শাহ-এর মাথায় ছিল লম্বা চুল। তৈজুদ্দিন মাওলানা কালু শাহকে প্রশ্ন করবে। উত্তর দিতে না পারলে মাথার লম্বা চুল কেটে দেওয়া হবে। তৈজুদ্দিন মাওলানা কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেন। কালু শাহ সব উত্তর দেন। হকিকতের কিছু নমুনা দেখাতে বলেন। লাল মিয়া সাবের লোহার ঘরে কালু শাহ ফকির এবং তৈজুদ্দিন মাওলানা ঢুকেন—দরজা বন্ধ করে দেন। সঙ্গে কোরান শরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন সৈয়দ কালু শাহ। কোরান খুলে দেখান মাকামু মাহমুদা পারায় লেখা আছে

www.pathagar.com

আপনার আর আমার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে মাথার চান্দি পর্যন্ত আছে চৌদ্দ পারা, চৌদ্দ পারার মধ্যে আর একটি পারা আছে তাই মিলে পনেরো পারা। এই পনেরো পারার মধ্যে নবীর আসন বা মোকামে মাহমুদা। মাওলানা বলেন আমি শুধু কোরানই পড়েছি কিন্তু আমার নিজের দেহের সঙ্গে কোরানের তুলনা করে দেখিনি। কালু শাহ বলেন–কোরান সারা জীবন পড়েছেন, আরো কিছু কথা শুনতে চান? কোরান থেকে উদাহরণ দিয়ে তিনি আরো কিছু বিষয় মাওলানা সাহেবকে বুঝিয়ে দেন। সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের এইসব গূঢ় তত্ত্বের কথা শুনে মাওলানা সাহেব আশ্চর্য হন এবং কালুশাহর সঙ্গে কোলাকুলি করেন। তাঁর মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন মাওলানা মৌলবিরা বলতে থাকে যে কালু শাহ ফকির একজন জাদুকর। এরপর তারা করটিয়ার জমিদারের নিকট যান এখানে বিচার না পেয়ে। তারা জমিদারের কাছে নালিশ করে যে সাটুরিয়ার কালু শাহ ফকির পাকুইল্লায় এসে সর্বনাশ করে দিচ্ছে। জমিদার দশজন লোক পাঠান কালু শাহ ফকিরকে ধরে আনার জন্য। বনের বাঘ ডরায়, পানির কুমির ডরায় জমিদার চান মিয়ার কথা শুনে। অথচ সৈয়দ কালু শাহ ফকিরকে তিনি চেয়ারে বসতে বলেন। লোকজন বলাবলি করতে থাকে যে, কালু শাহ ফকির জমিদার সাহেবকেও যাদু করেছে। জমিদার সাহেবের মসজিদের ইমাম এর পেছনে নামাজ পড়তে যান কালু শাহ। কিন্তু দুই রাকাত নামাজ পড়ে তিনি নামাজ ছেড়ে চলে যান। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি দেখতে পান– ইমাম সাহেব চিন্তা করছেন যে, তাঁর বাড়িতে সিন্দুকে ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা রেখে এসেছেন এবং চাবি আলমারির উপরে রেখে এসেছে। তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে ছোটো স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল। নামাজে বসে তিনি ভাবছিলেন তাঁর ছোটো স্ত্রী টাকা নিয়ে চলে যাবে।

একবার সাটুরিয়া উত্তর কাউন্নারা গ্রামের লোকজন কালু শাহ ফকিরের বিরুদ্ধে বালিয়াটির জমিদারের নিকট নালিশ করে যে কালু শাহ ফকির সব সময় গান বাজনা করে, নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না। জমিদার সর্দার পাঠিয়ে দেন কালু শাহকে আনার জন্য। জমিদারের কালিবাজুর বৈঠকখানায় সৈয়দ কালু শাহ ফকির উপস্থিত হন। বাবু বলেন যে তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে নালিশ করেছে গ্রামের লোকজন। তুমি কী গান গাও? তার দুই একটা গান আমাকে শুনাও। তখন তিনি গান গেয়ে শোনান।

গান শুনে জমিদার বাবু মাতব্বরদের বলেন, 'এই ব্যাটারা, সে (কালু শাহ) এগুলি গান গায় নাকি রে? তোরা উনার ভাব জানস না। ভিতরের খবর জানস না। কেন উনার বিরুদ্ধে নালিশ কইরবার আইছস আমার কাছে?' শেষে জমিদার বাবু মাতব্বরগণকে বলে দিলেন, 'খবরদার এরপর উনার বিরুদ্ধে আর কোনো নালিশ করো না'। কালু শাহকে বলেন, আপনার ভাব নিয়ে আপনি গান বাজনা করতে থাকেন। এরপর জমিদার কালি বাবু, নুপেন রায় চৌধুরী বলেন, এ গান নয়, এ সুর ভগবানের নাম কীর্তন। আমাকে আর একটা গান শুনাও। তখন তিনি তাদের আরো কিছু গান গেয়ে শোনান।

গানের পর জমিদার সাহেব তাঁর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং কাউন্নারা গ্রামবাসীকে কালু শাহর বিরুদ্ধে কোনো নালিশ না করার পরামর্শ দেন।

www.pathagar.com

কথিত আছে যে, একবার পদ্মার চরে একটি ঝিনুক থেকে মুক্তার সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের ভাগ্নেগণ মুক্তার ব্যবসা করতেন। মুক্তা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তারা নদী পথে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে ডাকাত দল নৌকা আক্রমণ করে। কিন্তু ডাকাতদের নৌকা এই নৌকার নিকট কিছুতেই আসতে পারে না। ডাকাতদের ছিল বাইচের নৌকা। ভাগ্নেদের সঙ্গে সৈয়দ কালু শাহও ছিলেন। তাদের ছিল এক মালিয়া নৌকা। একজনে বায়। অনেক চেষ্টার পরও ডাকাতদের নৌকা এক মালিয়া নৌকা ধরতে পারে না। ডাকাতের সর্দার চিন্তা করতে থাকে যে, নৌকায় নিশ্চয়ই কোনো মহৎ ব্যক্তি আছেন। আমতলি বাজারে এক মালিয়া নৌকা থামে। ডাকাতদল নৌকার নিকট আসে। একজন ডাকাত রাগ হয়ে রাম দা দিয়ে সৈয়দ কালু শাহকে কোপ মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু রাম দা উঠানোর পর তা আর নিচে নামে না। ডাকাতের সর্দারসহ দলের সদস্যরা সৈয়দ কালু শাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সবাই তাঁর শিষ্য হয়ে যায়। সেদিন থেকে তারা ডাকাতি ছেড়ে দেয়।

কথিত আছে যে, একবার সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের এক ভক্ত, মানিকগঞ্জের এসডিও'র পিতার সঙ্গে ছাও ফকির বা বাচ্চা ফকির পদ্মার পাড়ে বসবাস করতো। তারা যাদু টোনা জানত এবং তা দ্বারা মানুষকে বশীভূত করতো। একবার এদের ভক্ত এবং সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের ভক্তের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয় তাদের নিজ নিজ পির নিয়ে। শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, দুই ভক্তের পির এর মধ্যে বাহাছের আয়োজন করা হবে। কালু শাহ এই ধরনের বাহাছে অংশগ্রহণ করতে চান নি। কিন্তু ভক্তের পিড়াপিড়িতে এবং ভক্তের পির-এর মান সম্মানের প্রশ্ন জড়িত তাই তিনি রাজী হন।

প্রথমে 'ছাও ফকির বা বাচ্চা ফকির' একটি কবুতরকে যাদু মন্ত্র দিয়ে মেরে ফেলেন। সৈয়দ কালু শাহ বলেন তোমরা মারতে শিখেছ। এখন মৃত কবুতরটিকে বাঁচাও। কিন্তু তারা বলে যে মরা জিনিস কোনোদিন বাঁচে না। সৈয়দ কালু শাহ সেই মৃত কবুতরটিকে হাতে নিয়ে ফুঁ দিয়ে জীবিত করে আকাশে উড়িয়ে দেন। এরপর অন্য একটা কবুতর আনতে বলেন। সেই কবুতরটিকে তিনি নিজে পিঠে হাত বুলিয়ে ছাও ফকির বা বাচ্চা ফকিরকে দেন মারার জন্য। কিন্তু তাদের সব যাদু টোনা ব্যর্থ হয়। কবুতরের গায়ে না লেগে এই যাদু টোনা দুই ফকিরের শরীরে আঘাত করে। এক পর্যায়ে তারা মৃতপ্রায় হয়ে যায়। কিছু লোকের অনুরোধে সৈয়দ কালু শাহের ভক্তের পা ধোয়া পানি তাদেরকে খাওয়ানোর পর তারা ভালো হয়ে যান।

একবার পাকুইল্লার জমিদারের মেয়েকে জিনে ধরে। জমিদার ঘোষণা দেন যে, কোনো ব্যক্তি চিকিৎসা করে মেয়েকে সুস্থ করতে পারলে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের এক ভক্ত জমিদারের মেয়ের জিন ছাড়ানোর জন্য মেয়েটির নিকট যায়। মেয়েটি বলে যে, যদি আপনি সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের ছেলে লেদু শাহ-এর নিকট থেকে স্বাক্ষরিত একটি চিঠি আনতে পারেন তাহলে আমি চলে যাব। ভক্ত লেদু শাহ ফকিরের নিকট যায় এবং সব কথা খুলে বলে। লেদু শাহ একটি কাগজে স্বাক্ষর দেন। স্বাক্ষরিত চিঠি কোমরে গুঁজে নিয়ে ভক্ত জমিদারের মেয়ের নিকট যায় এবং চিঠিটি দেয়। জ্বিনে ধরা মেয়েটি লেদু শাহ স্বাক্ষরিত কাগজটি নিজের মাথায় রাখে এবং বলে যে, যার নামের গুণে আমি চলে যাচ্ছি সেই কাগজটি তুমি কোমরে

www.pathagar.com

গুঁজে রেখেছ। এই কথা বলে সে ভক্তের গালে থাপ্পড় মারে। জমিদার খুশি হন এবং সৈয়দ কালু শাহ ফকিরকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাঁকে দেখতে চান এবং তাঁর সেবা করতে চান। তাঁর হাতের প্রসাদ খেতে চান। ভক্তের অনুরোধে সৈয়দ কালু শাহ রাজি হন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি সেখানে যান ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে। জমিদার বিভিন্ন রকমের ফল কেটে একটি বড়ো প্লেটে সাজিয়ে উনার সামনে খাওয়ার জন্য দেন। জমিদারের ইচ্ছা ছিল সৈয়দ কালু শাহের হাতের স্পর্শ খাবারে দেওয়ার জন্য। সৈয়দ কালু শাহ সামান্য একটু খেলেন। বাকিটা তাদেরকে দিয়ে দেন। বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাসরত দুইজন ব্রাহ্মণ এই খাবার খেতে চাইলেন না। জমিদার তাদের খানাগুলো একটা পাত্রে সংরক্ষণ করে রেখে দেন। প্রসাদ না খাওয়ার কারণে তাদেরকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। ব্রাহ্মণদ্বয় অন্য হিন্দু জমিদারদের নিকট এই বিষয়টি অভিযোগ করেন। একজন মুসলমান ফকিরের স্পর্শ করা খাবার খাওয়ার কারণে পাকুইল্লার জমিদারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। জমিদার বলেন, "আমি একজন সাধারণ মানুষের হাতে খাইনি। আমি দেবতার হাতে খেয়েছি"। সেই দেবতাকে দেখার জন্য অন্য জমিদারগণ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পাকুইল্লার জমিদার সৈয়দ কালু শাহ ফকিরকে এইসব ঘটনা বলেন। নির্দিষ্ট সময়ে কালু শাহ অন্য জমিদারকে দরশন দিতে রাজি হন।

যথাসময়ে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিজের রূপ পরিবর্তন করে কালী দেবতার রূপ ধারণ করেন এবং সবার নিকট উপস্থিত হন। সবাই তাকে মাথা নিচু করে জোড়হাতে প্রণাম জানায়। কিছুক্ষণ পর তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে নিজের আসল রূপ ধারণ করেন। তাঁর তৃতীয় সন্তান সৈয়দ মাইনুদ্দিন শাহ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং সৈয়দ বাদশা আলম এই অলৌকিক ঘটনাটি মাইনুদ্দিন শাহ-এর নিকট থেকে শুনেন।[২]

একটি পুকুরের কিংবদন্তি

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রামে সুফি সাধক হযরত ইকরামুল হক ইব্রাহীম শাহ বাগদাদী (রহঃ)-এর মাজারের পূর্বদিকে একটি পুকুর রয়েছে। জনশ্রুতি আছে তৎকালীন সময়ে এলাকায় কারো বাড়িতে অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন জিনিসের যেমন—ডেক, থালা, জগ, চামচ, পাতিল ইত্যাদির দরকার হলে পুকুরঘাটে যেয়ে বাবার নাম ধরে চাইলে অলৌকিকভাবে পুকুর থেকে তা পাওয়া যেত। কাজ শেষে তা ভালো করে মেজে-ঘষে পুনরায় পুকুরে দিয়ে আসতে হতো। একবার মিয়াবাড়ির এক কাজের মেয়ে একটি পিতলের জামবাটি চুরি করে ছাইয়ের নিচে লুকিয়ে রেখে বাকি জিনিস পুকুরে নিয়ে ফেরত দেয়। কিন্তু যে পর্যন্ত ঐ জামবাটি ফেরত না দেওয়া হয় ততক্ষণ কোনো জিনিস পানিতে না ডুবে ভাসমান থাকে। এ এক অলৌকিক দৃশ্য। পরে কাজের মেয়ে উক্ত জামবাটি ফেরত দিলে সমস্ত মালামাল পানিতে ডুবে যায়। এ চুরির কারণে সেই থেকে বন্ধ হয়ে যায় এ অলৌকিক নেয়ামত।

একটি হিজল গাছের কিংবদন্তি

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার নালি ইউনিয়নের কুন্দুরিয়া গ্রাম। এই গ্রামের পূর্ব প্রান্তে ফসলি মাঠের মাঝখানে রয়েছে একটি হিজল গাছ। গাছটি বর্তমানে ২/৩ ফুট কাণ্ড

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ও অনেক ডালপালা যুক্ত হয়ে অনেকটা ভূমির উপর যেন শুয়ে আছে। এই গাছ কীভাবে এখানে জন্মালো সে কথা এখন আর কেউ বলতে পারে না। অনেকে বলেন এই হিজল গাছ তার বাপ-কাকারা এই একইভাবে দেখেছে। সুতরাং এই গাছের বয়স কত বৎসর তা কেউ বলতে পারবে না। তবে জানা যায় এক সময় এই গাছের চারপাশে ঝোপঝাড় ছিল এবং গাছের পশ্চিম পাশে বিল ও নিচু জলাভূমি ছিল। বর্তমানে নেই। কুন্দুরিয়া গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। এখানকার হিন্দু লোকরা বহু যুগ আগে থেকেই গাছটিকে মান্য করে পূজা দিয়ে থাকে। বিয়ে, সংসারে নতুন সন্তানের আবির্ভাব ইত্যাদি উপলক্ষে তারা এই হিজল গাছটিকে পূজা ও ভোগ দিয়ে আসছে। আজো এই ধারা অনেকে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিশ্বাস করে এই হিজল গাছটির বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এই জন্য তারা বংশ পরম্পরায় পূজা ভোগ দিয়ে আসছে।[৩]

কুন্দুরিয়া গ্রামের এই হিজল গাছটিকে নিয়ে বহু কিংবদন্তি রয়েছে। দিঘুলিয়া গ্রামের মুসলেম উদ্দিনের স্ত্রী সুফিয়া বেগম (৬৫) বলেন, "এই গাছ কাটলে রক্ত বাইর অয়। একবার এক ছেমড়ি ইনজেকশনের সুই বিন্দাইছিল। তাতে রক্ত আইছিল। এই গাছের ডাল কাটলে রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে। বিশ্বাস না হয় কাইটা দেহেন"। তিনি আরো বলেন, "কুন্দুরিয়া গ্রামের একজন ডাল কাটছিল, হে ব্যাটা জ্বর অইয়া মইরা গেছে।"

দিঘুলিয়া গ্রামের জিন্নাত আলী (৬০) বলেন, "এই গাছের আজগুবি এক ব্যাপার অইলো, বর্ষাকালে এই গাছের ডালপালা পানিতে ডুবে না। কত বন্যা হেই ছোটো বেলা থাইকা দেখতেছি। বন্যা হইলেও গাছ এই রকমই পানির উপর থাকে"। তিনি আরো জানালেন, এই গাছ অনেককে স্বপ্নে আদেশ দেয়। তিনি বলেন, "একবার আমারে স্বপ্নে দেহায়, গাছের গোড়ায় গজার মাছের ভোগ দিবি তা না হলে দেশের ক্ষতি অইবো। শেষে গজার মাছের ভোগ দেই। জানা যায় দিঘুলিয়া নইদা বেপারীর এক চাকর নবা দিনের বেলায় মাঠে কাজ করতে আইসা ঐ গাছের তলায় ভোগ দেয়া মিষ্টি খাইয়া তার ডান হাতের সামনের অংশ চিরদিনের মতো শক্ত হইয়া অকেজো হইয়া যায়। তার হাত আর কোনোদিন ভালো হয় নাই।"

কুন্দুরিয়া হিজল গাছে মাঝে মাঝে পাগল সাধু-দরবেশদেরও আনাগোনা ছিল বলে জানা যায়। গোপনে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে অনেকে এখানে আগমন করেছেন। মান্তা গ্রামের গেন্দু পাগলা (মান্তা গ্রামে গেন্দু পাগলার মাজার রয়েছে) মাঝে মাঝে একাকী এই নির্জন হিজল তলায় আসতেন বলে জানা যায়।

১৯৮৪ সালে দিঘুলিয়া গ্রামের মুসলেম উদ্দিনের স্ত্রী সুফিয়া বেগমের হঠাৎ নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চলাফেরা করতে পারতেন না। বহু ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েও কোনো লাভ হয় না। সুফিয়া বেগম খুব হতাশ হয়ে রাতে খুব কান্নাকাটি করে। ঐদিন রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন হিজলগাছে ভোগ দিতে হবে। তখন তার স্বামীকে স্বপ্নের কথা খুলে বলে। স্বামী স্ত্রীর কথা ভেবে কলতার হাট থেকে মোমবাতি, আগরবাতি ও ধূপ এনে দেয়। এইসব নিয়ে সুফিয়া বেগম রওয়ানা হতেই তার চলৎশক্তি ফিরে পায় এবং হিজল গাছের তলায় গিয়ে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে ভক্তি দিয়ে দেখে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। তার পায়ের অবশ ভাব নেই। এ-ঘটনায় সেদিন তার পরিবারের সবাই বিস্মিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এরপর তিনি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে হিজল তলায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দুই বছর ভোগ দেন। পরবর্তীতে সুস্থ হওয়ার পর আর ঢাক ঢোল

www.pathagar.com

না নিয়ে শুধু ভোগ দেন আর ছোটো করে শিরনি করতেন। এখন সুফিয়া বেগম প্রতি বছর ২১ শে চৈত্র শিরনি ও মেলার আয়োজন করে। এই মাঠে ঐ হিজলতলায় দূরদূরান্তের মানুষ এসে হাজির হয়। অত্র এলাকায় এই মেলা "জসমের মা'র মেলা" নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, সুফিয়া বেগমের বড়ো ছেলের নাম জসীম—এই জসীম সবার কাছে "জসম" নামে পরিচিত। সুফিয়া বেগমের নামটি উচ্চারিত না হয়ে এটি এখন 'জসমের মা'র মেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ফকিরনি বাড়ির কিংবদন্তি

১৮.০১.২০১৩ তারিখে সাইদুর রহমান বয়াতি (তথ্য সংগ্রাহক) ফকিরনি বাড়ির কিংবদন্তি সম্পর্কে জানার জন্য সাটুরিয়া থানার আয়নাপুর গ্রামে যান। উত্তর আয়নাপুরে ফকিরনি পাড়া নামে একটি বাড়ি বর্তমানেও আছে। এই বাড়িতে কাসেম বেপারি তাঁর চার ভাইসহ বসবাস করেন। কাসেম বেপারি, আবদুছ সোবহান বেপারি ও আবদুস ছামাদ বেপারির নিকট থেকে জানা যায় যে প্রায় দুশ বছর আগে চিরকুমারী আয়না নামে এক মহিলা এই বাড়িতে থাকতেন। এই বাড়িতে একজন বোবা লোকও বাস করতেন। রাতের বেলায় বাড়ির উঠানে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ শুনে তারা ঘুম থেকে উঠেন। তারা দেখতে পান একটা স্বর্ণের নৌকা, সাতটি মরিচ বাটার পাটা ও সাতটি পোতা বাজনার তালে তালে নাচছে। বাড়ির উত্তর দিকে একটা বিরাট পুকুর। বর্তমানেও পুকুরটি আছে। ছয়টি পাটা নৌকাসহ পুকুরে চলে যায়। একটি পাটা বোবা লোকটিকে নিয়ে পুকুরে চলে যায়। একরাত একদিন পর বোবা লোকটি পাটা পোতাসহ জীবিত উঠে আসেন। বর্তমানে এই পাটাটি বাড়িতে সংরক্ষিত আছে। সেই কিংবদন্তি এখনো মানুষের মুখে মুখে ফিরে। অনেকে মানত করতে আসেন দূরদূরান্ত থেকে।

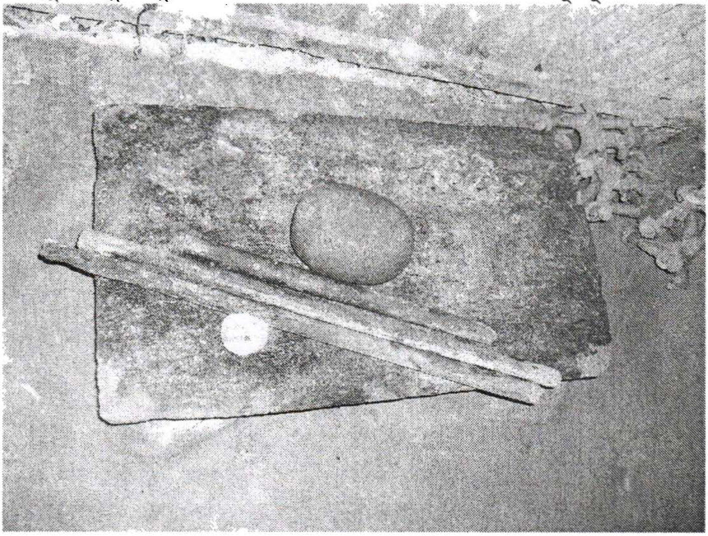

ফকিরনি বাড়িতে সংরক্ষিত পাটা

www.pathagar.com

মাদার মুনির কিংবদন্তি

মাদার পির হচ্ছেন একজন লৌকিক পির। মাদার মুনিকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। যেমন—ছোটোবেলা থেকেই মাদার পিরের নানা ধরনের অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হতে থাকে। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখনও হজরত আলী ছেলেটিকে দেখতে পাননি। হজরত আলী যখন বাড়ি ফিরেন তখন ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। দৈবচক্রে একদিন হজরত আলী ছেলেটিকে একঘর থেকে অন্যঘরে যাওয়ার সময় দেখতে পান। তখন হজরত আলী জ্যোতির্ময় দিব্য চেহারার অধিকারী ছেলেটি সম্পর্কে জানতে চান। মা ফাতিমা হজরত আলীকে বলেন, "ছয় বছর আগে যে অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মত বস্তু তুমি এনে দিয়েছিলে সেই বস্তু থেকে এই জ্যোতির্ময় শিশুর জন্ম। এই ছেলে আমার ছেলে। নাম তার মাদার মুনি। কেমন মাদার মুনি জানতে চাইলে মা ফাতেমা বলেন, দমের মাদার মুনি। অর্থাৎ মানব দেহে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে এই মাদার মুনি যাতায়াত করে। হজরত আলী এর প্রমাণ দেখতে চান। ফাতেমা বলেন যে, শ্যাম শহরে যেদিন এলিজাহিদের বিয়ে হবে সেদিনই এই শিশুর অলৌকিক ক্ষমতা জানতে পারবে।

মাদার মুনি ঝগড়া, ফ্যাসাদ দেখতে চায়। কিন্তু মা ফাতেমা নিষেধ করেন। মাদার মুনি বলে যে, আমি বরকত মায়ের অর্থাৎ মা ফাতেমার স্তনের দুগ্ধ পান করেছি। এই দুগ্ধের শক্তি বা গুণাগুণ যতদিন আমার দেহে আছে ততদিন আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না। এই অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে আমি পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারি। একদিন রাস্তায় বেড়ানোর সময় রাস্তার বালকগণ মাদার মুনিকে ভণ্ড ফকির বলে তিরষ্কার বা উপহাস করে। তখন মাদার মুনি বলে, এই বালকগণ তোমরা একবার মির মোদি নামটা বলো তো। তখন বালকগণ সেই নাম মুখে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মস্তক (মাথা) দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন মাদার মুনি ওই বালকগণের দেহ ও মাথা একত্র করে নিলেন। এরপর বললেন, যাও তোমরা জীবিত হয়ে যার যার গৃহে চলে যাও। সত্যিই তাই হলো। মাদার মুনি বালকদের মাথার চুলে একটি করে বাঁধন বা গিঁট দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

মাদার মুনি সম্পর্কে আরও কিছু কাহিনি শোনা যায়। একবার দামেস্কের রাজা সুলতান বাদশার একটি পুত্র মারা যায়। এই সময় মাদার মুনি ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় আযরাইল বা যমদূতের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। মাদার মুনি বলে, এই বেটা জান চোর, তুই তো শুধু মানুষের জান (প্রাণ) হরণ করে থাকিস, তবে জানের যে ছোরত বা চেহারা আছে তা কি দেখেছিস? আযরাইল বলে, না তো, জানের যে ছোরত আছে তা আমি জানিই না। মাদার বলে আমার হাতে এই জানটা দে, তোকে আমি জানের ছোরত দেখাচ্ছি। অনেক কথার পরে চালাকি করে মাদার আযরাইলের কাছ থেকে জানটি নিয়ে নিল এবং তাকে আর ফেরত না দিয়ে জানটা নিয়ে ওই সুলতান বাদশার মৃত ছেলের দেহে সংযোজন করে এবং মৃত ছেলেকে জীবিত করে দেয়।

এই কর্ম করে মাদার মুনি অন্যত্র রওনা দিল। এমন সময় গঙ্গাদেবী মাদার মুনিকে দেখে এবং তারা দু'জনেই অলৌকিক খেলায় নিয়োজিত হয়। মাদার মুনি তখন সাত দিনের একটি শিশুর রূপ ধারণ করে রাস্তার ধূলায় শুয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। গঙ্গাদেবী তখন শিশুটির কাছে এসে দয়াবশত মাতৃস্নেহে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে

www.pathagar.com

আর বলতে থাকে–আহা কোন অভাগিনীর পুত্র তুই এমনি ধূলায় পড়ে আছিস, সে মা যেন কতই নির্দয়–এই বলে যখন শিশুটির মুখে চুম্বন করতে উদ্যত হয়, আর তখনই মাদার মুনি কোল থেকে খিল খিল করে হাসতে থাকে। গঙ্গাদেবী তখন লজ্জা পেয়ে কোল থেকে মাদার মুনিকে নামিয়ে দেয় আর বলে–আরে দুষ্টু মাদার, তুই আমাকে এমনিভাবে ঠকিয়ে দিলি। তোকেও এমনি আমি একদিন ঠকিয়ে ছাড়বো।

এই মাদার মুনি একদিন তার নানা বড়ো পিরের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে নানা ও নাতি দু'জনে খেলে ও তামাশা করতে থাকে। বড়ো পির বলছে–ভাই মাদার, আমরা এখন লুকোচুরি খেলবো। আমি পালাবো, তুমি আমাকে তালাশ করবে। আবার তুমি পালাবে, আমি তোমাকে তালাশ করবো। তাই হলো। প্রথমবারে বড়ো পির পালালো আর মাদার মুনি সমস্ত দুনিয়া, বিশ্বজগৎ খুঁজে শেষে বেহেস্তে (জান্নাত) থেকে নানাকে বের করে নিয়ে এলো। এরপর মাদার মুনি পালালো আর বড়ো পির পৃথিবীর সমস্ত স্থানে খোঁজ করে মাদার মুনিকে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। শেষে বড়ো পির বলল–নারে ভাই মাদার মুনি, তোমার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। এবার তুমি নিজেই বের হয়ে যাও। তখন মাদার মুনি বড়ো পিরের সামনে হাজির হয়ে বলল–কেমন নানাজি, আমার কাছে আপনি পরাজিত হলেন তো। বড়ো পির বলল, হ্যাঁ, আমি পারলাম না, তবে এবার বলো তো তুমি কোথায় লুকিয়েছিলে? মাদার তখন হেসে হেসে বলে, নানাজি আমি আপনার নাসিকা পথে বাতাস রূপে আপনার মস্তকে লুকিয়ে ছিলাম। বড়ো পির মাদারকে তখন বলে, তুমি ভাই দমের মাদার। সেই থেকে মাদারের আরেক নাম হলো দমের মাদার।

শ্যাম শহরে এলিজাহিদের যেদিন বিয়ে হয় সেদিনই তাঁর স্বামী মারা যায়। মাদার মুনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে এলিজাহিদের স্বামীকে জীবিত করে এবং একশো একুশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত থাকেন। এইভাবে মাদার মুনি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর চিন্তা, দর্শন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য অনুসারী তৈরি করেন। এইভাবে মাদার মুনির আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে, যা বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত আছে। মাদার মুনি সংক্রান্ত শতাধিক অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে। এটি একটি ধর্মীয় লোককাহিনি যা বর্তমানে কিছু কিছু বই পুস্তকে পাওয়া যায়, যেমন–আদী কেছাল আম্বিয়া, লোককবিদের রচিত বিভিন্ন ধরনের পুথি, দরবেশনামা পুথি, খায়রুল হাশর পুথি। কলকাতার আব্দুর রহমান মুন্সী, রহিম মুন্সী, মোনছের আলী মুন্সী, বাংলাদেশের ডাকুরখালীর (হরিরামপুর থানা) শাহ আব্দুর রহিম ওয়ায়েছী রচিত পুথিতেও মাদার পিরের কাহিনি পাওয়া যায়।

গ. লোকপুরাণ

ডিম থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পুরাণ

হিন্দু শাস্ত্রে বলা আছে যে, পৃথিবী বাসকী নাগের ফনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহামায়া ও মনু এই পাঁচজন দেবতা। মুসলমানদের শাস্ত্রে পাঁচজনকে

www.pathagar.com

পাকপাঞ্জাতন বলে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ), শেরে খোদা হজরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসেন হচ্ছেন পাকপাঞ্জাতনের প্রতীক। সৃষ্টির আগে পৃথিবী ডিমরূপে থাকে। ডিম আপন ইচ্ছাতে ফেটে দুইভাগ হয়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ হয়। মাঝখানে যে ফাটল হয় তা ভৌগোলিক মতে বিষুব রেখা। পৃথিবীর সঙ্গে মানবদেহের তুলনা করে বলা হয় যে, বিষুব রেখা হচ্ছে নাক বরাবর দুটি অংশ–ডান এবং বাম। ডান হলো দক্ষিণ গোলার্ধ এবং বাম হলো উত্তর গোলার্ধ। পৃথিবী যেমন গোল তেমনি মানুষের চোখ দুটো গোল। পৃথিবী যেমন ভাসমান চক্ষুও ভাসমান। পৃথিবী ঘোরে, চক্ষুও ঘোরে। পৃথিবীতে অনেক দূর পর্যন্ত তাকালে দেখা যায় তেমনি একজনের চোখে আর একজন তাকালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

হিন্দু শাস্ত্র মতে আদি ডিম ফেটে গিয়ে প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহামায়া ও মনু এই পাঁচজন বেরিয়ে আসে। প্রজাপতি তার রুদ্র শক্তি দ্বারা ডিমটা ফাটিয়ে দেয় এবং তার ভিতর থেকে পাঁচজন বেরিয়ে আসে। মুসলমান শাস্ত্রমতে আল্লা নিরঞ্জন কুন ফাইয়াকুন শব্দ বলে ডিম ফাটায়। তারপর পাকপাঞ্জাতন বেরিয়ে আসে। হিন্দু শাস্ত্র মতে বিষ্ণু নিজেই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হয়ে বটপাতায় পানির উপর ভাসতে থাকে। তিনি সরযুগে নারায়ণ রূপান্তরিত হয়ে ত্রেতাযুগে রামরূপে অবতীর্ণ হন এবং রাম থেকে রূপান্তরিত হয়ে দাপরে শ্রীকৃষ্ণ হন। অবশেষে কলিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। তেমনি মুসলমানদের শাস্ত্র মতে সৃষ্টির সময় আল্লাপাক পাকপাঞ্জাতনকে নিজের নূর হতে সৃষ্টি করেন। তখন তাঁর নাম ছিল আহাদ। আহাদ থেকে তিনি আলো বা নূর বিচ্ছুরিত করে সেই আলোকে পাঁচভাগ করেন তাঁর কুদরতি শক্তি দিয়ে। আলোর এক ভাগ হলো পাকপাঞ্জাতন। দ্বিতীয় ভাগ হলো আরশ, কুরসি, লওহ মাহফুজ কলম ফেরেশতা, তৃতীয় খণ্ড দিয়ে তিনি পৃথিবীর আঠারো হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করেন যা তিনভাগে বিভক্ত : ছয় হাজার এজা বান্দা (মায়ের পেট থেকে সৃষ্ট বাচ্চা), ছয় হাজার গেজা যা মাটি থেকে উৎপাদিত হয় এবং ছয় হাজার বয়জা (ডিম) যা ডিম থেকে সৃষ্টি হয়। চতুর্থ খণ্ড দিয়ে আল্লাহ্ মানুষের রূহ বা আত্মা সৃষ্টি করেন। রূহ আলমে আরওয়াহায় রক্ষিত। পঞ্চম খণ্ড দিয়ে বেহেশত-স্বর্গ সৃষ্টি হয়। জান্নাতুল ফেরদাউস এর কথা পবিত্র কোরানে উল্লেখ আছে। পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাপাক আকাশে সিতারা অর্থাৎ ছয়তারা রূপে গোপন অবস্থায় ছিলেন। ৭২ হাজার বছর এইভাবে ডুবে থাকেন। আবার ৭২ হাজার বছর ডুবে থাকার পর আকাশে উদিত হয়ে থাকে ৭২ হাজার বছর। এইভাবে ৭২ হাজার বছর কেটে যায়। তারপর আল্লাপাক এই পাকপাঞ্জাতনকে ময়ূরী রূপে একিন গাছে রাখে (সাজারাতুন ইয়াকিন) ৭২ হাজার বছর। আল্লাপাক নিজে তখন আয়না হন। আয়না হয়ে (এব্‌ফান) ময়ূরের সামনে যান, তখন ঐ ময়ূর আয়নায় নিজের রূপ নিজে দেখে। আল্লা নিজে পারদ হয়ে ঐ আয়নার পিঠে লেগে যান। তখন ময়ূর ঐ আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে এবং পূর্ব দিকে মুখ করে পাঁচটি সেজদা দেয়। সেই হতে পাঞ্জেগানা নামাজ নাজেল হয় এবং পূর্ব দিকে ময়ূর রূপে বসা আছে আজ অবধি। তাই মসজিদে পূর্ব দিকে মুখ করে খোতবা পড়তে হয়।

ময়ূর রূপে ছিলেন নবী করিম (সাঃ) নিজে। দুই কানে অলংকার বা বালি ছিল হাসান এবং হোসেন। গলার হার ছিল হজরত আলী। মাথায় তাজ ছিল নবী করিম

www.pathagar.com

এবং ময়ূর হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ। হিন্দু মতে মনু হচ্ছে পুরুষ আর মহামায়া মেয়ে এবং মুসলমান মতে বাবা আদম ও মা হওয়া।

সাপের মন্ত্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত পুরাণ

ক. চাঁদ সওদাগরের ছেলে লখাই সওদাগর। বেহুলার বাপের নাম সায়মন সওদাগর। মনসা দেবী হচ্ছে সাপের দেবী। সবাই মনসা দেবীকে পূজা দেয়। কিন্তু চাঁদ সওদাগর পূজা দিতে রাজী হয় না।

যে হস্তে পূজিয়াছি ধর্ম চূড়ামণি
সেই হস্তে পূজিব না আমি ব্যাঙ খেকো কানি।

এই কথা শুনে মনসা দেবী ক্ষিপ্ত হয়। অন্যান্য দেব-দেবী দুধ-কলা-ফলমুল ইত্যাদি ভোগ গ্রহণ করে। কিন্তু মনসা দেবী অন্য কোনো ভোগ গ্রহণ করে না। তার ভোগ হচ্ছে ব্যাঙ। উল্লেখ্য সাপও ব্যাঙ দেখলে পাগল হয়ে যায়। চাঁদ সওদাগর তাই মনসা দেবীকে পূজা দিতে অস্বীকার করে। এতে মনসা দেবী ক্ষিপ্ত ও রাগান্বিত হয়ে চাঁদ সওদাগরের ছয় ছেলেকে দংশন করে। ছয়টি ছেলে মারা যায়। অবশেষে লখিন্দর বা লখাই সওদাগরের জন্ম হয়। তার সঙ্গে বেহুলার বিয়ে হয়। তাদের বাসর ঘরটা ছিল লোহার মন্দিরের, যাতে সর্প দংশন করতে না পারে। বেহুলা-লখিন্দর বাসর রাত কাটাবার জন্য লোহার মন্দিরের তৈরি বাসর ঘরে ঢুকে। কিন্তু মনসা দেবী সুকৌশলে বিশেষ একটি ছিদ্র পথে মন্দিরে ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করে। সর্প দংশনে লখিন্দর মারা যায়। বেহুলা কলাগাছের ভেলা তৈরি করে তার মৃত স্বামীকে ভেলার উপর নিয়ে ভাসতে ভাসতে মহাদেবের ঘাটে গিয়ে পৌঁছায়। মহাদেব হচ্ছেন দেবতার দেবতা। বেহুলা মহাদেবের ভক্ত হয়ে যায় এবং গুরুদেবের আশীর্বাদে তার স্বামীর জীবন ফিরে পায়। বেহুলা লখিন্দর-এর ঘটনা এবং কীর্তিকলাপকে কেন্দ্র করে সাপের মন্ত্রের সৃষ্টি। বর্তমান যুগেও সাপুড়ে যখন লখিন্দরের গান করে তখন সাপ আনন্দ পায়, ফণা ধরে। মহাদেব যে কৌশল অবলম্বন করে লখিন্দরের দেহ থেকে বিষ নামায় সেই প্রক্রিয়া বা কৌশল এককালে মন্ত্রে পরিণত হয়। এখান থেকেই সাপের মন্ত্রের উৎপত্তি হয়ে মুখে মুখে চালু হয়ে আসছে বলে ধারণা করা হয়।

খ. কংস রাজার কারাগারে আতুর ঘরে যখন শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নেয়, তখন থেকেই সাপের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক। কংস রাজার ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের জীবন রক্ষা করার জন্য তাঁকে একটি ঝাঁকার মধ্যে উঠিয়ে বসুদেব (শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত) নিরাপদ স্থানে নেওয়ার জন্য রওয়ানা দেন। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি ও তুফান শুরু হয়ে যায়। বাসকী নাগ ফণা বিস্তার করে শিশু কৃষ্ণকে ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন। সাপের মন্ত্র এখান থেকে উৎপত্তি হয়।

আবার বালক অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে রাখালগণ যখন গোচারণে যায় তখন শ্রীকৃষ্ণকে সাপে দংশন করে। সাপের বিষ নামানো জন্য তখন থেকেই সাপের মন্ত্রের উৎপত্তি হয় বলে অনেকে মনে করেন। মন্ত্রের মধ্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন :

কৃষ্ণ গেল গোচারণে খেদাইয়া পাল
দুচুইরায় কামড়াইয়া মারে যতেক রাখাল

www.pathagar.com

বইল বাদ্যর গোঁসাই তুই জন্ম নিলি কিসে
শ্রীকৃষ্ণ মরবে কি দুচুইরারই বিষে।

গ. সাগর মন্থনে যখন বাসকী নাগ তার বিষ উদগীরণ করে তখন সমুদ্রের পানির মধ্যে সেই বিষ মিশ্রিত হয়ে ভাসতে থাকে। দেবের মহাদেব চিন্তা করতে থাকেন যে, যদি সমুদ্রের এই পানি পৃথিবীর মানুষ পান করে তাহলে বিষক্রিয়ায় মানুষ মারা যাবে। তাই মহাদেব নিজের দুই হাতের অঞ্জলি দিয়ে সমুদ্রের বিষ একত্রিত করে নিজে পান করেন। বিষক্রিয়ায় তার দেহ নীল বর্ণ ধারণ করে। এই জন্য মহাদেবের আর এক নাম নীলকণ্ঠ। সেখান থেকেই সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র আবিষ্কার হয় এবং সেই মন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ং মহাদেব মুক্তি পান। যেমন—

কালিয়ারে কালিয়া নিদয়া কালিয়া
শীঘ্র আয় চলিয়া বিষের ঝাড়ি মাথায় লইয়া
মহাদেব মইল পরানে যারে বিষ তুই উজানে।[৪]

শঙ্খের পুরাণ

গণেশ ঠাকুর হিন্দুদের একজন সিদ্ধ দেবতা। যার গজমুণ্ড (হাতির মাথা)। তিনি দুর্গার সন্তান হিসেবে যুদ্ধ করেন অসুরদের সঙ্গে। সিদ্ধ গণেশ ঠাকুর হিন্দু মহাসতী তুলসী দেবীকে বিয়ে করার জন্য ধ্যানমগ্ন হন। ধ্যান ভাঙার জন্য গঙ্গা নদী থেকে জল এনে ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাঁর চোখে মুখে। তাঁর ধ্যান ভাঙে। তুলসী দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে গণেশ ঠাকুর তাঁকে বিয়ে করতে চান। তুলসী দেবী হচ্ছেন মহাসতী। যার তার সাথে তাঁর বিয়ে হতে পারে না। দেবতাদের অভিশাপের ফলে অসুর বংশের শঙ্খসূরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তুলসী দেবীর স্বামী শঙ্খসূরকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। সব দেবতা ভগবান নারায়ণের নিকট বিচার চায়। ভগবান নারায়ণ তুলসী দেবীর স্বামী শঙ্খসূরের রূপ ধারণ করে তুলসী দেবীর সঙ্গে কাম আলিঙ্গন করে। তুলসী দেবী বুঝতে পারে এটি তার স্বামীর কাম আলিঙ্গন নয়। তুলসী দেবী ভগবান নারায়ণকে জিজ্ঞেস করেন— আপনি কে ? ভগবান নারায়ণ বলেন, আমি তোমার সতীত্ব হরণ করার জন্য এই কাজে লিপ্ত হয়েছি। সতীত্ব হরণ করতে পারলেই তোমার স্বামী দেবতাদের হাতে নিহত হবে। দেবতারা তুলসী দেবীর স্বামী শঙ্খসূরকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। তুলসী দেবী দুঃখে বেদনায় কান্নাকাটি শুরু করে এবং বলে, আমি একজন সতী নারী। আমার স্বামী এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আমি এটি মানতে পারি না। আপনার নিকট আমি বিচার প্রার্থনা করি। তখন নারায়ণ বর দেয় এবং বলে, "তুলসী দেবী তুমি দুঃখ করো না। তোমার স্বামীর দেহাবশেষ থেকে একটি বস্তু সৃষ্টি হবে। তোমার স্বামীর নামে সেটির নাম হবে শঙ্খ। এই শঙ্খ থেকেই শাঁখা তৈরি হবে। সেই শাঁখা হিন্দু বিবাহিত রমণীগণ চিরদিন হাতে ব্যবহার করবে এবং দেবতার পূজায়ও দেবে তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য।"

www.pathagar.com

বর্তমানেও হিন্দুদের মধ্যে এই রেওয়াজ চলে আসছে। মন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি দিয়ে দেব দেবতাদের আহ্বান জানানো হয়। উলুধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, হরি ধ্বনির মত শঙ্খধ্বনিও তাৎপর্যপূর্ণ। শঙ্খ দিয়ে শঙ্খধ্বনি তৈরি করা হয়। তুলসী তলায় মেয়েরা গায়ত্রী করে শঙ্খধ্বনি দেয়। প্রত্যেক পূজায় শঙ্খধ্বনি ব্যবহার করে দেব দেবীদের আহ্বান জানানো হয়। তাছাড়া হিন্দু বিবাহিত রমণীগণ আজো শঙ্খের তৈরি শাঁখা হাতে পড়ে থাকেন যা তাদের সতীত্বের প্রতীক বলে বিবেচিত হয়।

দুর্গাপূজার উৎপত্তি সংক্রান্ত পুরাণ

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই দেবতা এবং অসুরের সৃষ্টি। দেবতা হচ্ছেন শুভ শক্তি এবং অসুর হচ্ছে অশুভ শক্তির প্রতীক। দুর্গা দেবী দশটি হাতে জীবের কল্যাণ সাধন করেন। দশটি হাত হচ্ছে মানুষের দশ ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। দুর্গা দেবী দশটি হাতে দশটি অস্ত্র ধারণ করে আছেন। তাঁর প্রথম ডান হাতে খড়্গ—যা দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা যায়। অন্য হাতে অজগর সাপ—সর্প বিষে অসুর দুর্বল হয়ে যায়, অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য অদৃশ্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। সর্পের বিষক্রিয়া হচ্ছে সেইরূপ অদৃশ্য শক্তি। আর একটি হাতে থাকে সুদর্শন চক্র, এক হাতে গদা, এক হাতে পদ্ম, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে বল্লম, এক হাতে ঢাল, এক হাতে অসুরের চুল ধরে থাকে আর এক হাতে তীর। দশটি অস্ত্র হচ্ছে জীবের দশ ইন্দ্রিয় দমনের অস্ত্র। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, অহংকার, দেমাগ, মান, রাগ— এই দশটি ইন্দ্রিয় দমন করতে পারলেই মানুষ দেবতার মধ্যে গণ্য হয়।

হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে যে, দুর্গা দেবী অশুভ শক্তি, অকল্যাণ, অত্যাচার এবং নির্যাতন থেকে জীবকে রক্ষা করেন। তাই দুর্গার অপর নাম দুর্গতিনাশিনী। হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কৈলাশ পর্বত বা হিমালয় পর্বতে গীরি রাজার স্ত্রী মেনকা দেবীর গর্ভে দুর্গার জন্ম হয়। দুর্গার বিয়ে হয় কৈলাস পর্বতে ভোলানাথ বা মহাদেবের সঙ্গে। দুর্গার গর্ভে একটি ছেলে সন্তান জন্ম হয়। তার নাম গণেশ। ঐ ছেলেকে নিয়ে তিনি বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে যান। বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে যাওয়া এবং স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে যাওয়ার ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে দুর্গা পূজার সূচনা হয় বলে হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ব্রাহ্মণ বৈবর্ত পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে সুরত রাজা দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন।

লঙ্কার রাজা রাবণ পঞ্চবটি বন থেকে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যান লঙ্কায় যা বর্তমানে শ্রীলংকা। পঞ্চসতীর মধ্যে সীতা হচ্ছেন অন্যতম। অন্য চারজন হলেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, তুলসী ও অহল্যা। রাবণ ছিলেন অসুরজাতীয়। তিনি হরিণ শিকারে এসে সতী, সাধ্বী ও সুন্দরী রমণী সীতাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সীতাকে অপহরণ করে লংকায় নিয়ে যান। রামের ভক্ত বীর হনুমানের মাধ্যমে রামচন্দ্র এই খবর জানতে পারেন। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাবণ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন রাম। রাবণ রাজার ভক্তি, অর্চনা ও পূজায় মুগ্ধ হয়ে দশভুজা দুর্গা দেবী রাবণ রাজার মন্দিরে থাকতেন। দুর্গা দেবী হচ্ছেন মহাশক্তির প্রতীক। রাবণ রাজার মন্দির থেকে মহাশক্তির প্রতীক দুর্গাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রামচন্দ্র দুর্গা দেবীর পূজা শুরু করেন। এটি হচ্ছে অকালবোধন পূজা। রাবণ রাজা

www.pathagar.com

দুর্গাপূজা করতেন চৈত্র সংক্রান্তির দিন। রামচন্দ্র মা দুর্গার পূজা করেন আশ্বিন মাসে। এইজন্য একে অকালবোধন পূজা বলা হয়। রামচন্দ্রের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে মা দুর্গা রাবণকে ত্যাগ করে রামের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই কারণেই রাবণের বংশ ধ্বংস হয়ে যায় রামচন্দ্রের হাতে।

জন্মাষ্টমী বা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সংক্রান্ত পুরাণ

দাপর যুগে যখন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় তখন মথুরার রাজা ছিলেন কংস রাজা। কংস রাজা রথে চড়ে বেড়াতে বের হন। তখন তিনি দৈববাণী শুনতে পান।

তোমাকে বধিবে যে
শীঘ্রই জন্মিছে সে।

এই কথা শুনে কংস রাজা তাঁর রাজত্বের এলাকায় যত গর্ভবতী নারী ছিল তাদের গর্ভের সন্তান নষ্ট করে দেন। কংস রাজার এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজি না হওয়ায় তাঁর নিজের বোন দেবকী ও ভগ্নিপতি নন্দঘোষকে কারারুদ্ধ করে রাখে। কারাগারে দেবকী গর্ভবতী হন। এই খবর কংস রাজা জানে না। দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। এটি ছিল তাঁর অষ্টম সন্তান। সন্তানকে রক্ষা করার জন্য স্বামী স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন সময় বসুদেব নামে এক দেবতা সন্তান রক্ষায় এগিয়ে আসেন। শিশু সন্তানকে একটি ঝাঁকার মধ্যে ভরে গঙ্গা নদীর ওপারে নিয়ে যান। সেদিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হতে থাকে। অষ্টনাগ সর্প তার ফণা বিস্তার করে ঝাঁকার ওপর ছায়া দিয়ে ঝড় তুফান থেকে শিশু শ্রী কৃষ্ণকে রক্ষা করে। নদী পার হয়ে গোকুল নগরে যশোদার ঘরে শ্রীকৃষ্ণকে লালন পালনের জন্য রেখে আসে। যশোদার স্নেহ মমতায় শ্রীকৃষ্ণ বড়ো হয়ে উঠেন। সেই দিনক্ষণকে স্মরণ করে হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোকজন জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন।

ঘ. কবিগান

লোকসংগীতের একটা প্রধান স্তম্ভ হলো কবিগান। কবি শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাব বিস্তার করা। অর্থাৎ কোনো বিষয়কে কল্পনার মাধ্যমে বিস্তার করা। কবি=ক+বি। ক শব্দের অর্থ কল্পনা এবং বি শব্দের অর্থ বিস্তার। কবিগানে গানের কথা পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায়। শুদ্ধ ভাষায় গান গাওয়া হয়। আসরে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে মূল গায়ক কবিগান রচনা করেন এবং দোহাররা গান। বিপক্ষের সরকারও উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে উত্তর দেন। কবিগানের বিষয় সম্পর্কে আগে থেকেই কিছু জানতে হয় এবং বই পুস্তক পড়তে হয়। কবিগানে বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রকে নিয়ে কবিয়ালরা তাৎক্ষণিকভাবে কথা বলেন। কোনো ভুল তথ্য পরিবেশিত হয় না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবিগণ তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দর্শক শ্রোতাকে জ্ঞান দেন, আনন্দ দেন। একটি প্রবাদ আছে–যাত্রা শুনে ফাতরা লোকে, কবি শুনে ভদ্রলোকে। কবিগান মানুষকে জ্ঞানী করে। জ্ঞানের জগতকে আলোকিত করে। কবিগানে হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা পরচর্চা ও ধর্মান্ধতা নেই বরং মানুষকে ভালোবাসার কথা, মানবতার কথা প্রচার করা হয়। ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার কথা উচ্চারিত হয় কবিগানে।

www.pathagar.com

কবি গানের নমুনা—

আমি গীতি কাব্যে সাজলাম ভক্ত
তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
বুঝাইয়ে বল আমাকে
বাংলা একাডেমির কি অর্থ থাকে
এর সত্য তথ্য সব বল গোঁসাই।
শুনি এটা নাকি কোন জমিদার বাড়ি কোনোদিন ছিল
এখন কি কৌশলে কি নাম বলে একাডেমি হলো
আগে ছিল বসতবাড়ি এখন করে কোটকাছারি (অফিস অর্থে)
এইসব আমি দেখতে পাই।
সত্য তথ্য সব বল ওহে গোঁসাই
হাজার লোকের অন্ন জোটে হেথায় করে চাকরি
উচ্চশিক্ষিত আরো অশিক্ষিত করে আনাগোনা
তাই ভেবে মরি।
তুমি বল বল হে পণ্ডিত গোঁসাই
আছে এর মধ্যে কি বলিহারি
আমি শুনে তাপিত প্রাণ জুড়াই।

ইংরেজ আমলে কবিগানের মধ্যে অশ্লীল ভাষা ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ হতো। দর্শক-শ্রোতা হাস্যরস ও আনন্দ পেত। ইংরেজ আমলের শেষ দিকে বিখ্যাত কবিয়াল–রাজেন সরকার, বীরেন সরকার, অভয়চরণ সরকার, শান্ত সরকার, কুমোদ সরকার, বিজয় সরকার, রাধা বল্লভ সরকার, উপেন সরকার, হরেন্দ্র সরকার, ভাসান সরকার প্রমুখ সরকারগণ কবিগানের একটি মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন ধারা সৃষ্টি করেন। তাঁরা ভাষা, উপমা ব্যবহার, উপস্থাপনা, পরিবেশনা রীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। এই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। মানুষ যদি গান শুনতে এসে প্রস্ফুটিত, আলোকিত জ্ঞান না পায় তাহলে গান গাওয়াই বৃথা, মূল্যহীন।

ধর্মীয় বাণী, তত্ত্বকথা, বিশুদ্ধ ভাষা, কোরান-হাদিসের কথা, গীতা-পুরাণের কথা, ইঞ্জিলের কথা, নবী-রসুলের কথা, ভগবান-ঈশ্বরের কথা, কৃষ্ণ-বুদ্ধের কথা, যীশুর কথা, যোহনের কথা, পিতা-মাতার কর্তব্যের কথা, সন্তানের মঙ্গলের কথা, আদি এবং অনন্ত কালের কথা, জীবাত্মা থেকে পরমাত্মার মুক্তি বিষয়ক গভীর আধ্যাত্মিক আলোচনা, ইহকাল-পরকালের কথা, স্বর্গ-নরক উত্থান ও পতনের কথা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় কবিগানে যুক্ত হয়। সাধারণ ভাষায় ও আঞ্চলিক ভাষায় এই গান গাওয়া হয় বলে মানুষের নিকট এই গান এত জনপ্রিয়। কবিগান সমন্বিত সংস্কৃতির কথা বলে।

কবিগানের ব্যাখ্যা হচ্ছে বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা। একটি বিষয়ের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। জুড়ির পাল্লা কবিগানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দুইজন কবিয়াল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উপস্থিত বক্তব্যের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান বা ঐকমত্যে পৌঁছান সর্বধর্মী ও সর্বজন গৃহীত সিদ্ধান্তের

www.pathagar.com

মাধ্যমে। গান হচ্ছে মানুষের জানার জন্য এবং জ্ঞান আহরণের বিশেষ মাধ্যম। তাই কবিয়ালরা একটি বিষয়ের বিস্তৃত, বিশদ ও অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন এবং যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন। একটি বিষয়কে সাদামাটাভাবে উপস্থাপন করে কবিয়ালরা বিভিন্ন হেঁয়ালি, উপমা, ভণিতা, শ্লোক, হাস্যরসাত্মক বাণী ও বক্তব্য শাস্ত্রীয় বিধানমত প্রয়োগ করেন গানকে আকর্ষণীয় করার জন্য। তাই গানের অপর নাম জ্ঞান।

মানিকগঞ্জের জাবরা গ্রামে কবিগানের আসর

মানিকগঞ্জ জেলা শহর থেকে ১৫ কিমি. পশ্চিমে জাবরা গ্রাম। জাবরা গ্রামে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজবংশী বা জেলে পরিবারের লোকজন হরিসভা উপলক্ষে কবিগানের ব্যবস্থা করে। ভিক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত নগদ টাকা, চাল-ডাল-লবণ ইত্যাদি দ্বারা মহোৎসব বা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। বৈরাগী বা বৈষ্ণবরা রান্না করেন। তারা নিরামিষভোজী। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাড়িতে গিয়ে তারা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে। 'জয় রাধে গোবিন্দ' বলে তারা ভিক্ষা চায়। জাবরা গ্রামে হরিসভা উপলক্ষে খণ্ডবাসী বৈরাগীর ছেলে তাঁর বাড়িতে কবিগানের আয়োজন করেন। 'হরিসভা'র মূল কথা হচ্ছে–হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে–এই মূলমন্ত্র গানের মাধ্যমে গীত হয়। হরিসভা উপলক্ষে ভগবত পাঠ হয় প্রথমদিন। এরপর কৃষ্ণ নাম প্রচার করা হয়। খাওয়া-দাওয়া বা মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ভক্তবৃন্দ ও শিল্পীদের ডাল, লাবড়া ও ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে সমবেত হয়।

জাবরা গ্রামে শ্রী শ্রী মহাপ্রভু খণ্ডবাসী সেবাশ্রমে প্রতি বছরের ২২ শে আষাঢ় কবিগানের আসর বসে। ৭ জুলাই ১৯৯৯ তারিখে খণ্ডবাসী সেবাশ্রমে কবিগানের আসরে কবিগান পরিবশেন করেন মানিকগঞ্জের বিখ্যাত কবিয়াল সাইদুর রহমান বয়াতি, অমর সরকার, চান মোহন সরকার ও নিতাই সরকার। গান শুরু হয় দুপুর ১২টার দিকে। গানের ধারা মোতাবেক যন্ত্রসংগীত দল আসরে বসে যায়। এরপর শুরু হয় বন্ধনা মূলক গান। বন্দনা একটি বিশেষ গুরুত্ববহ ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে বন্দনা পরিবেশিত হয় আসরের সূচনা সংগীত হিসেবে। আর এর অর্থ প্রণাম বা প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেই এই বন্দনা গান পরিবেশিত হয়। বিখ্যাত কবিয়াল রাধা বল্লভের ছাত্র প্রিয়নাথ সরকার বন্দনা মূলক গান পরিবেশন করেন। 'বৈতরণী নদীর খেয়াঘাট' অমূল্য সরকারের লেখা এ গানটি দোহারীরা সকলে মিলে আসরের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে গাইতে থাকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে কবিগান শুরু হয়। মূল কবিয়াল আসরে যেয়ে পাল্লার ধারামত প্রশ্ন, উত্তর, তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে আসরকে চাঙ্গা করে তুলে। প্রশ্নের পালায় তিনজন–অমর সরকার, চান মোহন সরকার ও নিতাই সরকার। খণ্ডনের অর্থাৎ উত্তরদাতার ভূমিকায় সাইদুর রহমান বয়াতি। হিন্দু শ্রোতারা মুহুর্মুহু উলুধ্বনি দিয়ে মুখরিত করে তুলে কবিয়ালদেরকে। মানিকগঞ্জের সাইদুর রহমান বয়াতি ও তাঁর দল এবং জাবরা গ্রামের অমর সরকার ও তাঁর দল কবিগানে অংশগ্রহণ করেন। গানের

www.pathagar.com

বিষয় ছিল জীব-পরম (শিব ও নারদ)। সাইদুর রহমান বয়াতি নারদ এবং অমর সরকার শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

আসরের ধারাবাহিক বর্ণনা

কবিগানের নিয়ম হলো প্রথমে কনসার্ট, এরপর আসরি গান তারপর টপ্পা বা কবি। দোহার প্রিয়নাথ সরকার ডাকগান বা আসরি গান পরিবেশন করেন। হিন্দু দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এই গানে। উল্লেখ্য, বিখ্যাত মরমি কবি ও কবিয়াল রাধা বল্লভ সরকার ও বিখ্যাত কবিয়াল উপেন্দ্র সরকারের নামকরা দোহার ছিলেন প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ সরকার ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সংসারে সং সেজে
মন তুমি করিতেছ খেলা
এই সংসার কারো না
এই যে পান্থশালা
তুমি এসেছ একা
যেতে হবে একা
মিছে কার পানে তাকাও?

রাধা বল্লভ সরকার রচিত এই ডাকগানটি সুরের মূর্ছনায় ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। দর্শক-শ্রোতা-ভক্তবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গায়কদের ফুলের মালা পড়িয়ে দেন।

এরপর শুরু হয় মূল কবিগান। সাইদুর রহমান বয়াতি সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে মঞ্চে উপস্থিত হন এবং প্রথমে বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন বৈষ্ণব শব্দের অর্থ যার মধ্যে দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, উষ্ণতা (কাম শক্তি) নেই তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব। এরপর তিনি টপ্পা বলেন—

কবির কাব্যে সাজলেম নারদ
তুমি পঞ্চানন।
শুনতে শিবতত্ত্ব জীবতত্ত্ব
মন আমার হয়েছে ক্ষিপ্ত
তুমি বল সকল তত্ত্বের মাহাত্ম্য
শুনে প্রাণ জুড়াই।
জানি জীব দেহটা একটা তরণীর মতো তুমি দ্বারের দ্বারী কর্ণধার।
তুমি থাকতে হাল মাচায়
মাল কোঠার ধন চুরি হয় কি কারণ ॥
জানি শক্তি করে ভক্তিদান তুমি কর জ্ঞানদান
মুক্তির বিধান করে নারায়ণ
তোমরা তিনজন থাকতে জীব দেহেতে

www.pathagar.com

জীব নরকে যায় কি কারণ ॥

টপ্পার পর তিনি বন্দনা পরিবেশন করেন।

প্রথমে বন্দনা করি
ফাতিমার চরণতরী
ত্বরিতে তরণী ঐ পায়
তোমার নাম নিলে পরে
আপদ বিপদ যায় দূরে
দুর্গতির হয় সদুপায়
এসো মা সরস্বতী
মম কণ্ঠে কর বসতি
যুগাও মা গুরুনামের গান
যেমনে নাচাও তেমনি নাচিব
যাহা বলাও তাহাই বলিব
যায় যাবে মা মান তোমার ॥

বন্দনা শেষে তিনি প্রতিপক্ষ কবিয়াল অমর সরকারকে মুসলমানী তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করেন— মাটির ঘোড়াতে সওয়ার হয়ে হজরত আলী কোনদিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল? এর সার্বিক ব্যাখ্যা কী? ইসলাম ধর্মমতে আল্লা, আদম, মোহাম্মদ এই তিনজন এবং হিন্দু শাস্ত্র মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনজনই মানবদেহের পরিচালক। তবে মানুষ অসৎ কার্যে লিপ্ত হয় কেন? কেউ ধনী, কেউ গরীব কেন? হিন্দু মতে তিনি প্রশ্ন করেন-জাগতিক জগতে সতী নারী পতির পূজা করে থাকে কিন্তু কালীমন্দিরে দেখা যায় উল্টো। মন্দিরে স্বামী তার স্ত্রীর পায়ের নিচে শুয়ে আছে। এখানে তাহলে কে কার পূজা করে? প্রশ্ন শেষে তিনি বিজয় সরকার রচিত ধুয়া পরিবেশন করেন—

ওরে আমার জীবন নদীর নাইয়া।
তুমি কবে আমার কূলে ভিড়াবে নাও ধীরে ধীরে বাইয়ারে।

ধুয়া সুরের মূর্ছনায় দর্শক-শ্রোতা ও ভক্তবৃন্দ একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে। মেয়েরা উলুধ্বনি দিতে থাকে। এরপর তিনি মুখছড়া বলেন—

যাক চলে বেশি বলে
নাই প্রয়োজন
সংক্ষেপে কিছু বলি
তত্ত্বের বিবরণ
এদিকে ওদিকে যত মুসলমান ভাই
সকলের জনাবেতে সালাম দিয়ে যাই

www.pathagar.com

তারপরে আছে যত হিন্দু ভদ্রগণ
শ্রেণিমত সালাম জানাই আমি অভাজন।
কবিশিক্ষা গুরু আমার
রাধা বল্লভ সরকার
অকূল কবিতরঙ্গে লাগাইও পাড়
পিতামাতা ওস্তাদ পিরে
ভক্তি জানাইয়া
এখনই যাব আমি এই আসর ছাড়িয়া
নতশিরে সালাম জানাই পিতামাতার পায়
জগত ব্রহ্মাণ্ড দেখলাম যাদের কৃপায়
মাতৃ ভগ্নি সামনে যত হেরি
সকলের চরণেতে শির নত করি
ছোটো ছোটো ভাইবোন যাহা দেখিবারে পাই
স্নেহ ভালোবাসা সকলকে জানাই
হিন্দু-মুসলমানী শাস্ত্রমতে যাহা জিজ্ঞাসিলাম
সাধ্যমত উত্তর পাব এই আশায় বিদায় নিলাম।

এরপর বিপক্ষদলের কবিয়াল অমর সরকার মঞ্চে প্রবেশ করেন। উভয় দলের দোহার উপেন চন্দ্র দাস ও তাঁর সঙ্গী বলাই ডাক ধুয়া পরিবেশন করেন। এরপর কবিয়াল অমর সরকার কবির টপ্পায় প্রশ্নের উত্তর দেন। একই ব্রহ্মা। ব্রহ্মার তিন শক্তি। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। তাঁর কাজ হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। এই তিনশক্তি নিয়ে তাঁর খেলা। দেহ পবিত্র না রাখলে জীবের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল সাধিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ : চন্দন কখনো তামার পাত্রে রাখা যায় না। এটি চন্দনের দোষ নয়, পাত্রের দোষ। জীব দেহপাত্র যদি পবিত্র থাকে তাহলে জীব ঊর্ধ্বগতি লাভ করতে পারে। যেমন, টর্চলাইটের আলো যেখানে ফোকাস করা হয়, সেখানে পড়ে। পায়খানায়ও আলো দেয়। যদিও আলো দেয়, আলো ও টর্চের দোষ না, দোষ হলো জায়গার। স্বর্গ, নরক ও মর্তে আমি পরমসত্তা বিরাজিত, তুমি (জীব) আমাকে যেভাবে পরিচালিত কর আমি সেভাবেই চলি, প্রতিটি জীবে প্রভু আছেন। আমার কোনো দোষ নেই, দোষ তোমার (জীবের)। উত্তর শেষে অমর সরকার ধুয়া পাঁচালি গায়। ধুয়া পাঁচালির মধ্যে তিনি জীবকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ধুয়া শেষে তিনি মুখছড়া দিয়ে আসর ত্যাগ করেন।

জীবের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সাইদ বয়াতি মঞ্চে আসেন। তিনি রাধা বল্লভ সরকার রচিত একটি গান পরিবেশন করেন। গানটি হলো :

সিন্ধু পাড়ের বন্ধু যে জন
পার করে যে দরিয়ায়

www.pathagar.com

জাননি সে বন্ধুর বাড়ি কোন জায়গায়
সে যে মুরশিদপুর লুকিয়ে থেকে
রসুলপুর খেলা দেখায় ॥
যাগ যজ্ঞ আর পূজা পার্বণ
আর যত সব ব্রত হোম
শুধু স্বভাব শুদ্ধ রিপু বাধ্য
করতে এইসব আয়োজন
নফ্সের কোঠায় খিল পড়িলে
আশেক মাশেক আপনি মিলে
নবী দেয় দরজা খুলে
সেইতো নবীর খবর পায় ॥
সত্য পিরের খান্দানে যাও
তাকে যদি পেতে চাও
যার সম্পত্তি তাকে দিয়া
ঐ চরণে বিকিয়ে যাও
বল্লভ বলে সাইদ পাগলা
জানবি যদি প্রেমের খেলা
ঘুচে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা
ঐ দেখ তোর বেলা যায় ॥

এরপর সাইদ বয়াতি জীবদেহের ব্যাখ্যা করে বলেন :

চূড়াতে চূড়ামণি
ব্রহ্ম পাশে স্থিতি
জিহ্বাতে বসত করে
লক্ষ্মী সরস্বতী
চক্ষেতে কালাচান
সদা করে ধ্যান
নাসিকাতে নিত্যানন্দ
মধু করে পান
আলেফে হইল নাক
বে হরফে মুখ
তে হরফে হইল তালু
ছে হরফে চোখ

www.pathagar.com

'দা' লে দন্ত 'জা' লে বদনখানি
কোরানের ত্রিশটি শব্দ দেহের
তিরিশটি জায়গায় রয়
তবু কেন মানুষ সৎ মানে না
অসৎ হয়ে যায় ॥

যদি চূড়াতে (মস্তকে) নারায়ণ (পরমসত্তা) থেকে থাকে, চোখেতে যদি স্বয়ং কালাচান বা শ্রীকৃষ্ণ, জিহ্বাতে যদি সরস্বতী আর নাসিকাতে যদি নিত্যানন্দ থেকে থাকে তাহলে চোখ দিয়ে কুদৃষ্টি কেন হয়, তখন কালাচান কোথায় থাকে? মুখে যখন অকথ্য, অশ্লীল ভাষা বা মিথ্যা কথা বলি তখন লক্ষ্মী সরস্বতী কোথায় থাকে? তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দেবতার কথাটা ভুয়া, জীবের কথাই সত্য। তেমনিভাবে নাকই যদি 'আলিফ' হয় সেই নাসিকাতে কখনো দুর্গন্ধ আসতে পারে না। মুখই যদি (ওষ্ঠ) 'বে' হরফ হয় তাহলে এইমুখে মিথ্যা কথা হতে পারে না। 'তে' হরফ যদি হাতের তালু হয় তাহলে এই হাত দিয়ে কুকর্ম হতে পারে না। 'ছে' হরফ যদি চক্ষুযুগল হয়ে থাকে তাহলে চোখ দিয়ে কুদৃষ্টি কেন হবে? কোরানের হরফগুলোর কী দাহিকা শক্তি নেই? আরো জানা আছে শ্বাস-প্রশ্বাস বা দম হচ্ছে হকিকত, জবান হচ্ছে শরিয়ত। এই মুখে বসত করে জিব্রাইল। নাসিকাতে ইস্রাফিল অধিষ্ঠিত, শিঙ্গা হাতে। কর্ণে অধিষ্ঠান হচ্ছে আজরাইল। চোক্ষে মিকাইল, যেহেতু চোখ দিয়ে পানি বর্ষণ হয়। মুনকির-নকির এই মানবদেহের অগ্রপশ্চাতে। কেরামন-কাতেবিন মানবদেহে ডান এবং বাম কাঁধে অধিষ্ঠিত। আল্লার মনোনীত আটটি ফেরেশতা জীবদেহে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও কেন জীব নরকের কাজে লিপ্ত হয়। তাহলে কেন তোমরা সঠিকভাবে জীবদেহ পরিচালনা কর না।

অতএব, এগুলো সব ভুয়া কথা, জীবই সর্ব ক্ষমতার উৎস, সর্ব মূলাধার। এরপর জোটকের পাল্লা বা জুড়ির পাল্লা। দুই সরকার মুখোমুখি হয়ে জোটক পাল্লা পরিবেশন করে। দুইজন কবিয়াল আসরে দাঁড়িয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করে। এইভাবে এক/দেড় ঘন্টা চলে। শেষ পর্যন্ত দুই সরকার ঐকমত্যে পৌঁছেন এবং কবিগানের আসর শেষ হয়।

জোটকের পাল্লায় সাইদ বয়াতি প্রশ্ন করেন— স্বয়ং নারায়ণ একদিন বিড়াল মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ নারায়ণের স্বরূপ থাকে, কিন্তু মুখটি থাকে বিড়ালের। সেটি কোনদিন এবং কেন হয়েছিল?

উত্তর : যশোদা হচ্ছে কৃষ্ণের মা। গর্ঘমুনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর মায়ের দীক্ষাগুরু। যশোদা নিজগৃহে গর্ঘমুনিকে সেবা দিতে যান। তিনি শিশু কৃষ্ণকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে যান। যখন গর্ঘমুনি নিবেদন করেন নারায়ণের নামে তখন কৃষ্ণ নিজের মূর্তি ত্যাগ করে বিড়ালের রূপ ধরে নিবেদন করা প্রসাদ নেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য জম্বুদ্বীপে বিড়াল নারায়ণ রূপ ধারণ করে। এর তাৎপর্য হচ্ছে ভক্তের মনস্কামনা পূরণের জন্য নারায়ণ বহুরূপ ধারণ করতে পারেন। এইজন্য তাঁর নাম বিশ্বরূপা।

রূপের কোনো নাই তুলনা

www.pathagar.com

তাতেই বলে লোকে নিরাকার
মনোময় মুরতি গড়ে হৃদয় দিয়ে
দেখ রূপ তাহার।

সাইদ বয়াতি জোটক পাল্লায় প্রশ্ন করেন— শিব হচ্ছে কালীর স্বামী। কালী নিজের স্বামীর বুকের ওপর উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে কেন?

উত্তর: শিব হচ্ছেন কামশক্তির প্রতীক। সর্বসময় উন্মাদনায় থাকে। কালী হচ্ছেন সতঃ রজঃ তমঃ গুণের প্রতীক। অর্থাৎ সতঃ হচ্ছে সততা, সদগুণ, সদাচরণ; তমঃ হচ্ছে লোভ লালসা, মান অভিমান, অহঙ্কার, ঘৃণা এবং রজঃ হচ্ছে রক্ত। রক্ত থেকে মানবদেহের সৃষ্টি। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, কালী নিজের পদাঘাতে স্বামীর কামশক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তাই জগতে নরনারী যদি নারীর ত্রিগুণ শক্তি এবং পুরুষের কামশক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সেইভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তাহলে তারাই হতে পারে মহাপুরুষ বা সাধক। আধ্যাত্মিক মতে সাধক যখন সাধনার মাধ্যমে কামশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বভাবে স্বভাবান্বিত হতে পারে তখন ঐ সাধকই নারীরূপে ত্রিগুণ শক্তিকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে রাখতে পারে।

জোটক পাল্লার এক পর্যায়ে সাইদ বয়াতি ও রনজিত সরকার প্রশ্ন করেন— মাটি, পানি, আগুন, হাওয়া এই চারটি বস্তু বা উপাদানকে চারজন ফেরেশতা-ইস্রাফিল, মিকাইল, জিব্রাইল ও আজরাইল রক্ষণাবেক্ষণ করছে। তা সত্ত্বেও মানবদেহের মাল বা পরমবস্তু (কবিয়ালরা গুদামের মাল বলেন) স্খলন বা নষ্ট হয় কেন? এই প্রসঙ্গে তারা বলেন— নবী করিম (সাঃ) হজরত মুয়াবিয়াকে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আশি বছরের এক বুড়িকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। নবীর বাক্য রক্ষা করার জন্য মুয়াবিয়া বুড়িকে বিয়ে করেন। আশি বছরের বুড়ি ষোল বছরের মেয়ে হয়ে যান এবং তারই গর্ভে এজিদের জন্ম হয়।

অন্তর্নিহিত (পরম) ইচ্ছামত সব কিছু করে। দোষ দিয়ে যায় জীবের। যেমন বলা হয়ে থাকে আল্লার নূরে নবী পয়দা। স্বর্গ, নরক একই নূরে পয়দা। তবে আল্লার পবিত্র নূর থেকে কী দোজখ সৃষ্টি হতে পারে? অতএব জীবের কোনো দোষ নেই। তোমরা (পরম) ইচ্ছামাফিক কাজ কর।

জীব প্রশ্ন করে পরমকে। তুমি মানবদেহের মধ্যে সংহার কর কী। অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে কে? পরম উত্তরে বলে— জীব তুমি এই রহস্য বুঝবে না। আমি ভালোকে মন্দ করতে পারি আবার মন্দের মধ্যে ভালোকে স্থান দিতে পারি। পরম প্রবোধ দিচ্ছে এই বলে যে, মুয়াবিয়ার পুত্র সন্তান এজিদের নামে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ ধিক্কার দিতে থাকবে। কাজেই যেটি খারাপ সেটি চিরদিনই খারাপ।

'সংহার কর কাকে?' —এ প্রশ্নের উত্তরে পরম বলে, মহাকালকে আমি সংহার করে থাকি। অর্থাৎ তমঃগুণ, রজঃগুণ, সতঃগুণ-এই তিনগুণের সমাহারে মহাকালের সৃষ্টি হয়। সেই মহাকালকেই আমি সংহার করি। যার অপর নাম মৃত্যু যন্ত্রণা।

জীব পুনরায় প্রশ্ন করে বাবার বীর্য ও মায়ের রজঃ দুটি বস্তুই পবিত্র। পাত্রও পবিত্র, পানিও পবিত্র। সেই পানি থেকে জন্ম নিয়েছি আমি। তাহলে গুরু বা পিরের

www.pathagar.com

কাছে গিয়ে পবিত্র হতে হবে কেন? উত্তরে পরম বলে–এই রজঃ এবং বীজ কোথা থেকে আসে এবং পিতা-মাতা তোমার কেমন আত্মীয়? এদের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? —এটা জানার জন্যই তোমার পিরের কাছে যেতে হবে। যেমন—

মাতাগুরু, পিতাগুরু
গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই।
তার চাইতে অধিক গুরু
ভজিলে সে পাই।

আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হলো এই যে— পিতা, মাতা, ভাই এবং মানুষ তত্ত্ব জানা হয়ে গেলে পরমের তত্ত্ব জানা যাবে। গুরু বা পিরের কাছে না গেলে তুমি কোনো তত্ত্বই জানতে পারবে না। রসগোল্লা অতীব প্রিয় মিষ্টি খাদ্য। আসলে তুমি যদি না খেয়ে মিষ্টি সারা গায়ে মেখে রাখ তাহলে মিষ্টির স্বাদ বুঝতে পারবে না। তেমনি গুরু বা পিরের কাছে না গেলে তুমি নিজেকে চিনতে বা জানতে পারবে না। জীবের পক্ষে উভয় সরকার তাদের স্ব স্ব বক্তব্য তুলে ধরেন অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে এবং দর্শক শ্রোতাকে প্রচুর আনন্দ দেন। জোটক পাল্লার এক পর্যায়ে রনজিত সরকার নিম্নলিখিত গানটি পরিবেশন করেন।

আমার এই জনম গেল বিনা সাধনে
সারা জনমের ভুল এখন আমার পড়েছে মনে
আমি করি হায় হায়
এই অবেলায়
সময় গেল মোর কাল ঘুমে।

দর্শক-শ্রোতা ও ভক্তের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে রনজিত একাত্ম হয়ে যান। তিনি ভক্তের সঙ্গে কোলাকুলি করেন গান গাওয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে। বিজয়ের গান গাওয়ার সময় তাঁর চোখে পানি এসে যায়। সমগ্র আসরে এক অবর্ণনীয় অনুভূতির দৃশ্য। বিজয়ের ও রাধা বল্লভের গানের আবেদন বর্তমান সমাজেও যে কত বেশি এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেদিন কবিগানের আসরে তা প্রতীয়মান হয়। জাবরা গ্রামে কবিগানের আসরে কয়েক হাজার দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এই গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন। গান শুনার জন্য বহু জনসাধারণ উপস্থিত হয়েছিলেন। খেলাফতপ্রাপ্ত কয়েকজন পিরও গান শুনার জন্য এসেছিলেন।

কবিগানের বিষয় পরিবর্তন সম্পর্কে সাইদ বয়াতি বলেন, "হিন্দু ধর্মের বিষয় নিয়ে কবিগানে আলোচনা হতো বেশি ৩০/৩৫ বছর আগে। সমাজে তখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকজনের সংখ্যা ছিল বেশি। কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিল হিন্দু জমিদার ও ধনী শ্রেণির লোকজন। পূজা পার্বণে কবিগান বেশি হতো। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী

www.pathagar.com

পূজা, শ্যামা পূজা, দেবীনিতা মনসা পূজা ও হরিসভা উপলক্ষে বিভিন্ন আশ্রম, আখড়াতে কবিগান হতো বেশি। হরানন্দ প্রভুর আশ্রম (খাবাসপুর), জগানন্দ প্রভুর আশ্রম (কলতা), বড়ো গোপাল গোসাইর আশ্রম (বেতিলা), পুটু গোসাইর আশ্রম (পারাগ্রাম), দূর্গাচরণ সাধুর আশ্রমে (কলাকুবা) মে মাসে কবিগানের আসর বসতো। বর্তমানে এসব আশ্রমে সেবাদাস/সেবাদাসীগণ অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় জীবনযাপন করছেন। পূজা পার্বণে কবিগান কম হয়। পূজা পার্বণে অনেক অর্থের দরকার। বর্তমানে সেই অবস্থা নেই। তখনকার দিনে একশত টাকা বায়না নিয়ে কবিগান করতাম। এটি অনেক টাকা। হিন্দু জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা জায়গা জমি বিক্রি করে ভারতে চলে যায়। এর ফলে একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছর পূর্ব থেকে মুসলমান ফকির বাড়ি, পিরের বাড়ি, নতুন হাটবাজার ও মাজার শরিফে কবিগান হতে থাকে। ফলে গানের বিষয়েও পরিবর্তন হতে থাকে। হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কবিগানে আলোচনা হতে থাকে। বর্তমানেও এই ধারা অব্যাহত আছে।"[৫]

জাবরা গ্রামে কবিগানের আসরে লক্ষ্য করা যায় যে— কবিয়ালরা স্বরচিত গান গাওয়া ছাড়াও লালনশাহ, বিজয় সরকার, রাধা বল্লভ সরকার, উপেন সরকার, রাজেন্দ্র সরকার, হেমন্ত সরকার রচিত গান আসরের ফাঁকে ফাঁকে গেয়ে থাকেন। গানের বিষয় বা পাল্লার প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কবিয়ালরা এসব গান গেয়ে থাকেন। দর্শকশ্রোতাও এসব গান উপভোগ করেন। আসরে তাৎক্ষণিকভাবে কবিয়ালরা পূর্বনির্ধারিত গানের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর দিয়ে থাকেন।

ঙ. ভাটকবিতা

পথে ঘাটে, হাটে-মাঠে, শহর-বন্দরে, রাস্তার মোড়ে ও দোকানের সামনে চারণ কবি বিশেষ এক ধরনের সুরে ভাটকবিতা গেয়ে থাকেন। বহু আগে থেকেই ভাটকবিতার প্রচলন ছিল। যে কোনো আশ্চর্যজনক ও দুঃখজনক ঘটনাকে নিয়ে চারণ কবি ভাটকবিতা রচনা করেন। যেমন বেদের মেয়ে তারার প্রেম বিষয়ক ভাটকবিতা, গুরুদাসের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা, পরকীয়া প্রেমের কুফল, ভ্রাতৃহত্যা, মাতাকে হত্যা, প্রেম কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে ভাটকবিতা রচিত হয়ে থাকে। গ্রামেগঞ্জের এই ধরনের ঘটনাকে চারণ কবি তাঁর কল্পনা শক্তির সাহায্যে রূপ রস দিয়ে ভাটকবিতাতে পরিবেশন করেন। লোকজন এসব কবিতা ক্রয় করেন। এক সময় চার আনায় একটি কবিতা বিক্রি হতো। মানুষের চিত্ত-বিনোদন ছাড়াও মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, প্রেম-ভালোবাসা, অর্থ সম্পত্তি নিয়ে মারামারি ও সমাজের নানাবিধ চিত্র ফুটে উঠতো এই কবিতার মাধ্যমে। মানিকগঞ্জের পুটাইল গ্রামে ২০১৩ সালে ১২ই জুন মঙ্গলবার সাইজুদ্দিন (৬৫) নামে জনৈক ব্যক্তি তার ভাইয়ের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লোককবি সাইদুর রহমান বয়াতি 'ভাইয়ের হাতে ভাই খুন' শীর্ষক একটি ভাটকবিতা রচনা করেন। কবিতাটি নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

পাক নিরঞ্জন পতিত পাবন
নামটি করে সার
কাগজ কলম হাতে নিলাম
মুরশিদ হও কাণ্ডার
লিখি দুঃখের কথা (২)
নাম কবিতা চমকে উঠে প্রাণ
ছোটো ভাইয়ের হাতে গেল
বড়ো ভাইয়ের জান।
২০১৩ সালে (২)
১২ই জুন মঙ্গলবার আছিল
সকালবেলা আটটার সময়
খবর পাওয়া গেল
পুটাইল গ্রামের নামটি (২)
উজান ভাটি কালীগঙ্গা নদী
পশ্চিম পাড়ে সবুজ ঘেরা পুরনো বসতি
সবাই স্বনামধন্য (২)
গণ্যমান্য খৈমুদ্দি মেম্বার নাম
চারটি ছেলে ভরে রেখে গেছে পরধাম
সাইজুদ্দিন বড়ো ছেলে (২)
পৃথক হলে আট ডসিমল জমি
তিন ভাইয়ের চাইতে বেশি আছে
এইত মূল কাহিনি।
গ্রামের বিচার মতে (২)
কোনোমতে মীমাংসা না হলো
বাকি তিন ভাই একজোট হইয়া
বুদ্ধি ঠিক করিল
দেব যমের ঘরে (২)
ভবের ঘরে বাঁচতে না দেব
পরকালের ভয় করি না
দোযখেতে যাব।
একদিন পিঠার সাথে (২)
আপনহাতে তিন ভাইয়ে মিলিয়া
সাইজুদ্দিনকে খেতে দিল
পুরাডান মিশাইয়া
সেইদিন বেঁচে গেল (২)
প্রমাণ হইল ষড়যন্ত্রের কথা
সাইজুদ্দিন সব ভুলে গেছে

www.pathagar.com

মনে নাই তার ব্যথা।
মাত্র দুইমাস পরে (২)
মাড়াই করে জমির ইরিধান
বাড়ি পাশে খলা করে
চিন্তামুক্ত প্রাণ
সবাই পাশাপাশি (২)
হাসিখুঁশি নতুন ফসল পাইয়া
এরই মধ্যে দুঃখের অনল
উঠিল জ্বলিয়া।
দুলু আর সাহেরউদ্দি (২)
করে বুদ্ধি সেলিম ও জিল্লুর সাথে
লাঠি শাপল তুলে নিল
যার যার মতো হাতে
এক সাথে চালাইল (২)
বাড়ি মারল সাইজুদ্দিনের গায়
জমিনে পড়িয়া অমনি
ধুলাতে লুটায়
ছোটো ভাই দুলু তখন
ইচ্ছামতো শাপল হাতে ধরে
বড়ো ভাইয়ের বুকের মধ্যে
আঘাত করে জোরে
শাপল ঢুইকা পড়ে (২)
রক্ত ঝরে লালে লাল হইল
ফুসফুস ছিদ্র হইয়া তখন
সাইজুদ্দিন মরিল।
থানায় খবর গেল (২)
পুলিশ এলো শাপলটা লইয়া গেল
বারোজন আসামি করে
মামলা দায়ের হলো
এস আই আসগর আলী (২)
দিল বলি হাজির হও সবাই
তা না হলে কারো কিন্তু বাঁচার উপায় নাই।
সবাই হাজির হলো (২)
জামিন নিল বছর ঘুরে এলো
ছোটো ভাই আজ অবধি
হাজতে রহিল
মামলার খবর হয় না (২)

www.pathagar.com

জামিন পায় না দুলু একা আছে
এগারোজন জামিন পাইয়া
সংসার করিতেছে।
হায়রে কলির দশা (২)
বুদ্ধিনাশা ভবের দেখতে পাই
ভাই হইয়া মারতে পারে
সহোদর ভাই।
বলে সাইদ মিয়া (২)
দেখি চাইয়া কিসের জমিদারি
কেহ্ কারো নয়রে আপন
সবাই যে পর
মিছা বাহাদুরি।
কবিতা ইতি হলো (২)
আল্লা বলো হিন্দুরা ভগবান
মানুষ হইয়া মানুষ মারে
সেইতো সিমার সে পাষাণ।

ভাটকবিতা রচনা প্রসঙ্গে সাইদ বয়াতি বলেন, "এই মর্মান্তিক ঘটনা চিরদিন মানুষের মনে থাকবে না। আমি যদি এই ভাটকবিতা লিখে ছাপাতে পারি তাহলে ঘটনাটা মানুষের মনে থাকবে। মানুষ এই ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।" এই কবিতাটি ঘটনার কয়েকদিন পর তিনি লেমুবাড়ির হাটে উকিল উদ্দিনের দোকানে পরিবেশন করেন। দর্শক-শ্রোতা এই কবিতা শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।[৬]

বর্তমানে মানিকগঞ্জ অঞ্চলে আগের মতো ভাটকবিতা ব্যাপকভাবে প্রচলিত নেই। কিন্তু এই কবিতা সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে একেবারে হারিয়ে গেছে বলা যায় না।

চ. লোকছড়া

মানিকগঞ্জ জেলার ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা ও বিভিন্ন উপলক্ষে ছড়া বলে থাকে। এসব ছড়ায় ফুটে উঠে মানুষের সহজ সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি। শুধু শিশু-কিশোরই নয়, প্রবীন ব্যক্তিরাও ছড়ার মাধ্যমে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে থাকেন। নিম্নে মানিকগঞ্জ জেলায় প্রচলিত কতগুলো ছড়া তুলে ধরা হলো :

বুড়ির বুগালে নড়ে চড়ে,
বেং পুড়া ভাত খাইয়া মরে,
বেল কাঁটা দিয়ে বেরুম চোরুম,
চোরের মায়রে বারি করুম,

www.pathagar.com

যত চুর আছে,
থালের আগে বসে,
থাল থাল কদমের ডগা,
বুড়িল তোর হুসা নিল, হুস।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : বুরালে = কাছে, বেরুম চোরুম = জড়িয়ে দেওয়া, মায়রে = মাকে, হুসা = শসা, হুস = তাড়িয়ে দেওয়া

খেলাধুলার ছড়া

১

সুলতানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
সাহেব বলেছে যেতে
পান সুপারি খেতে
পানের আগায় মরিচ বাটা
স্পিরিং এ চাবি আটা
যার নাম বেনুবালা
গলায় দিলাম মুক্তার মালা।

২

ইচিং বিচিং তিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা
এক ফোঁটা মধু দিয়ে যা।

৩

আমার নাম মিতা
চুলে পড়ি ফিতা
কানে পড়ি দুল
ভালোবাসি ফুল
ঐ বাড়ির সখিনা
তার সঙ্গে খেলি না
তার সঙ্গে আড়ি
যাই না তাদের বাড়ি।
ওই আমাদের দোতলা বাড়ি
কাক ডাকে সারি সারি
মাগো তোমার পায়ে পড়ি
পুতুল এনে দাও খেলা করি।[৭]

www.pathagar.com

ছেলে ভুলানো ছড়া

১

তাই তাই তাই
মামা বাড়ি যাই
মামা দিল দুধ-ভাত
পেট ভরে খাই,
মামি এলো লাঠি নিয়ে
পালাই, পালাই।

২

ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী
মোদের বাড়ি এসো,
খাট নেই পালং নেই
চোক্ পেতে বসো।
বাটা ভরে পান দিব
গাল ভরে খেয়ো
খোকার চোখে ঘুম নেই
ঘুম দিয়ে যেও।

৩

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দিব,
ধান ভানলে কুড়ো দিব,
কালো গায়ের দুধ দিব
দুধ খাবার বাটি দিব
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।[৮]

এছাড়াও মানিকগঞ্জ জেলার শিশু-কিশোররা যেসব ছড়া আবৃত্তি করে থাকে সেগুলোর কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলো :

১

ওয়ান টু থিরি
পাইলাম একটা বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন
পাইলাম একটা বেগুন

www.pathagar.com

বেগুনে নাই বিচি
পাইলাম একটা কেচি
কেচিতে নাই ধার
পাইলাম একটা হার
হারে নাই লকেট
পাইলাম একটা পকেট
পকেটে নাই টাকা
কেমনে যামু ঢাকা
ঢাকায় নাই গাড়ি
কেমনে যামু বাড়ি
বাড়িতে নাই ভাত
দিলাম একটা পাদ
পাদে নাই গন্ধ
হাই স্কুল বন্ধ
হাইস্কুলে যামু না
বেতের বাড়ি খামু না
বেত গেল ভাইংগা
স্যারে দিল কাইন্দা।

২
আড়ি আড়ি আড়ি
কাল যামু বাড়ি
পরশু যামু ঘর
কি করবি কর
হনুমানের ল্যাজ ধইরা
টানাটানি কর।

৩
রহিম করিম দুই ভাই
পথে পাইল মরা গাই
এক ভাই কয় খাইয়া যাই
এক ভাই কয় নিয়া যাই।

৪
আকাশ থেকে নেমে এলো
ছোট্ট একটা প্লেন

www.pathagar.com

সেই প্লেনে বসে ছিল
ছোট্ট একটা মেম
মেম বলল–
হোয়াট ইজ ইউর নেম?

৫

চড়ুই পাখি বারোটা
ডিম পেড়েছে তেরোটা
একটা ডিম নষ্ট
চড়ুই পাখির কষ্ট।

৬

ফুলের বনে মৌমাছি
করছে কেমন নাচানাচি
ঘাসের বনে ঘাস ফড়িং
লাফায় কেমন তিড়িং বিড়িং
খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি
চলছে দেখো পিঁপড়া সারি।

৭

নদীর আছে জলের ধারা
সূর্যের আছে চাঁন
তোমার আমার প্রেমের ধারা
রইবে বহমান।

৮

পুকুরেতে পানি নাই
পাতা কেন ভাসে?
যার সাথে কথা নাই
সে কেন হাসে?[৯]

মুখে মুখে ছড়া ব্যবহার বা ছড়া সৃষ্টি করা

শহর আলীকে তার মা রাতের খানা খাবার জন্য ডাক দিয়ে বলছে— শহর আলী কোথায় গেলে, এসো, ভাত খেয়ে যাও বা এসো খানা খাবে। আর ছেলে শহর আলী মায়ের ডাকে উত্তর দিচ্ছে–

মা : শহরে ? কোথায় গেলা শহরে ?
ছেলে : ডাক পাড়শ তুই কিয়ারে ?

www.pathagar.com

মা : ভাত খাইয়া যা খাচরে।

ছেলে : থুইয়া দে ছিকার উপরে।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : কিয়ারে= কিজন্য, খাচরে= দুষ্ট ছেলে, থুইয়া= রেখে দাও, উপরে= ওপরে, ডাক পাড়শ= ডাকতেছ, কিয়ারে=কেন

ছ. পুথিসাহিত্য

মানিকগঞ্জে প্রাচীনকাল থেকেই সাধু, ফকির, মরমি কবি, ভাবুক, হিন্দু-বৈষ্ণব ও লোককবিদের আবাসভূমি। সারা বছর রাতের বেলায় কীর্তন, জারিগান, কবিগান, কেচ্ছা, লাটিম খেলা, দাড়িয়াবান্ধা খেলা, হাডুডু খেলা এবং মুরুব্বিদের পুথি পাঠের আসর বসতো।

পুথিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি অংশ। গ্রামের সাধারণ মানুষ সারাদিন কাজকর্ম করে রাতের বেলায় খাওয়া দাওয়া শেষ করে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পুথি শুনতেন। কম শিক্ষিত গ্রামের মোল্লা মুনশি এই পুথি পাঠ করতেন। নানা ধরনের পুথি রয়েছে, যেমন–সোনাভানের পুথি, জঙ্গনামা, হাতেম তাইয়ের পুথি, কালু গাজীর পুথি, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামানের পুথি, খয়রুল হাশরের পুথি, হানিফ পালোয়ানের পুথি ইত্যাদি। পুথি পাঠের আসরে পাঠকের চারপাশে দর্শক-শ্রোতা বসে যান এবং মনোযোগের সঙ্গে পুথি পাঠ শুনেন।

২০.০৯.২০১১ তারিখ মঙ্গলবার কাফাটিয়া গ্রামের ভেটকু মিয়ার বাড়িতে পুথি পাঠের আসর বসে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে ও নারী-পুরুষ পাঠকের চুতর্দিকে বসে পড়েন। সেদিন পুথি পাঠ করছিলেন লাল মিয়া মুনশি। তাঁর বয়স ৭০ বৎসর। তাঁর স্ত্রী কালু গাজীর পুথি এনে দেন। লাল মিয়ার পরনে লুঙ্গি, গেঞ্জি ও মাথায় টুপি এবং মুখে লম্বা দাড়ি। সামনে একটি বালিশের ওপর পুথি রেখে তিনি পাঠ করা শুরু করেন। তিনি পয়ার পাঠ করেন—

রজনী প্রভাত হইল ভানু উদয়
হেনকালে মাকে ডাইকা চম্পাবতি কয়
শুনগো জননী নিবেদন মোর
নামের চিন্তায় তনু হইল জরজর।

রাত আটটায় পুথি পাঠ শুরু হয়। বারোটা পর্যন্ত চলে। লাল মিয়া বলেন, "কামের দিন। পুথি পড়া এখন রাখি।"

সাক্ষাতকারে লাল মিয়া জানান যে তিনি তাঁর বড়ো ভাই চানবর আলীর নিকট থেকে পুথি পাঠ শিখেছেন। তিনি আরো বলেন, "লেখাপড়া বেশি জানি না, পুথিটা কোনোরকম পড়তে পারি। মাইনষেও শুনতে চায়।" আগের দিনে যারা পুথি পাঠ করতো তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেন। তিনি জানান দয়াল মোল্লা, দবির মোল্লা,

www.pathagar.com

সোনাই মুনশি, আশাক আলী, বরনদি–এরা ভালো পুথি পড়তেন। সেদিন পুথি পাঠের আসরে দর্শক-শ্রোতার মধ্যে ছেলে মেয়েদের সংখ্যা ছিল বেশি। তারা মনোযোগ সহকারে পুথি পাঠ শুনেন।

বর্তমানে মানিকগঞ্জের খুসতা, পুটাইল, কাফাটিয়া দক্ষিণপাড়া ভট্রী এলাকায় পুথি পাঠ বেশি হয়। অবসর সময়ে আনন্দ উপভোগের জন্য পুথি পাঠের আসর বসে।[১০]

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮২ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২১.০৫.২০১৩

২. সৈয়দ বাদশা আলম, পিতা : সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ শাহ, মাতা : তারাজান বিবি, তারিখঃ ২৫.০৫.৯৮ স্থানঃ কালু শাহ ফকিরের মাজার, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ; আবদুল মোতালেব (সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের চতুর্থ পুরুষ ও শিষ্য), বয়স : ৯০ বৎসর, তারিখ : ২৫.০৫.৯৮, স্থানঃ কালু শাহ ফকিরের মাজার, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

৩. শুকুর আলী, গ্রাম : নবগ্রাম, থানা : ঘিওর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৫.০৪.২০১২

৪. ১ নং দ্রষ্টব্য

৫. ১ নং দ্রষ্টব্য

৬. ১ নং দ্রষ্টব্য

৭. রোক্সানা, পিতা : গোলাম ফারুক, মাতা : কুলসুম বেগম, বয়স : ১২ বৎসর, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, গ্রাম : বান্দুটিয়া, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৩.১০.২০১২, সময় : সকাল ১০টা

৮. আশালতা, পিতা : মো. আব্দুস সালাম, মাতা : পরী বানু, বয়স : ১৫ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, গ্রাম : বেউথা : থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৯. আরিফ রহমান, পিতা : মোকলেসুর রহমান, বয়স : ১৬ বৎসর, শিক্ষা : এস.এস.সি, পেশা : শিক্ষার্থী, গ্রাম : গড়পাড়া, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৫.১০.২০১২

১০. লাল মিয়া মুনশি, বয়স : ৭০ বৎসর, পেশা : লোককবি, গ্রাম : কাফাটিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০.০৯.২০১১, স্থান : নিজ বাড়ি

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি যেমন গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাহায্য করে, তেমনি এর মধ্য দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মানসিক রুচি ও সৌন্দর্যবোধেরও প্রকাশ ঘটে থাকে। গ্রামীন মানুষের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা লোকশিল্পের উপাদান। মানিকগঞ্জেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানিকগঞ্জে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন বস্তু হাত ও হস্ত চালিত প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন করে তা হাটে-বাজারে বিক্রি করা হতো। বর্তমানে শিল্প ও প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে অনেক লোকশিল্পই বিলুপ্তপ্রায়। মানিকগঞ্জ জেলায় আজো যেসব শিল্প টিকে আছে তার মধ্যে মৃৎশিল্প, কারুশিল্প, সূচিশিল্প (কাঁথা), খেজুর পাতার নকশাদার পাটি, শাঁখাশিল্প ইত্যাদি প্রধান।

মৃৎশিল্প

কালীগঙ্গা নদীর পূর্ব পাড়ে পূর্ব সানবান্দা গ্রাম অবস্থিত। ২৮.১১.২০১২ তারিখে প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং তথ্যসংগ্রাহক সাইদুর রহমান বয়াতি পূর্ব সানবান্দা গ্রামে মাটির কাজ দেখার জন্য যান। সেখানে রাজেন্দ্র পাল-এর সঙ্গে মাটির কাজ নিয়ে আলাপ হয়। এই গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের আগে পালদের কোনো বসতি ছিল না। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্র পাল বলেন, "আমরা আসছি হরিরামপুরের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে। নদীভাঙনের ফলে আমরা রামকৃষ্ণপুর ছেড়ে সানবান্দা গ্রামে চলে আসি।"

মাটি সংগ্রহ

কালীগঙ্গা নদীর পাড়ে চক থেকে আঠাইল্যা মাটি বা এঁটেল মাটি সংগ্রহ করা হয়। এক বছরে ২০ ট্রলার মাটির প্রয়োজন হয়। এক ট্রলার মাটি দিয়ে এক সেরি/দুই সেরি দশ হাজার দইয়ের পাতিল তৈরি করা যায়। এক সেরি পাতিল প্রতি হাজারের মূল্য ২৫,০০০/- টাকা। দুই সেরি পাতিল প্রতি হাজারের মূল ৪,০০০/- টাকা। বৈশাখ মাসে পালরা মাটির কাজ করে না। একে বলা হয় 'পালনি'। এটি পূর্বপুরুষদের সংস্কার বা বিশ্বাস বলে তারা মনে করেন। একমাস পর বিশ্বকর্মার পূজা দিয়ে কাজ শুরু করেন। মাঘ ফাল্গুন এবং চৈত্র মাসে মাটির কাজ বেশি হয়। কারণ এসময় আবহাওয়া ভালো থাকে।

মাটি প্রক্রিয়াজাতকরণ

এঁটেল মাটি সংগ্রহ ও ক্রয় করে নদীর পাড়ে আনা হয় ট্রলারযোগে। সেখান থেকে শ্রমিকরা মাটি বাড়িতে নিয়ে আসে। মাটি এক জায়গায় স্তূপাকার করে রাখা হয়। এরপর কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে ঝুরা করতে হয়। এরপর মাটির সঙ্গে পানি মিশিয়ে

www.pathagar.com

পা দিয়ে মাড়িয়ে 'ছেনা' হয়। ছেনার মাধ্যমে ইটের ভাঙা টুকরো, চারা, পাথর, কাঠের টুকরো, শামুক ভাঙা/ঝিনুক ভাঙা পরিষ্কার করে নিতে হয়। ছেনার পর মাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। কামলা বা শ্রমিক এই পরিষ্কার মাটি বাড়ির ভেতরে নিয়ে যান। বাড়ির ভেতরে মাটি পাড়িয়ে মোলায়েম ও মসৃণ করা হয়। মাটির দলা বানায় মহিলারা, অনেকটা আটার দলার মতো। যে পরিমাণ মাল বা জিনিস তৈরি করা হবে সেই পরিমাণ মাটির দলা বানাতে হয়। এই দলা মাটির তৈরি সাজের মধ্যে রেখে বাম হাত দিয়ে পারা ঘুরিয়ে ডান হাত দিয়ে ভেজা একটি তেনা বা ন্যাকড়ার সাহায্যে পাতিলের আকৃতি তৈরি করা হয়। এরপর বালি ছিটিয়ে দেন। মাটির দলাকে বইলা দিয়ে ছেঁচে 'খাজি' তৈরি করা হয়। খাজিকে আতাইলের উপর রেখে পাতিলের আকৃতি দেওয়া হয়।

পইন

কাদা মাটি দিয়ে পইন বা পণী (মৃৎপাত্র পোড়ানোর বৃহৎ চুল্লি) তৈরি করা হয়। বুক সমান গভীরতা পইনের। পাশের দৈর্ঘ্য আড়াই থেকে তিন হাত। পইনের এক বা একাধিক দরজা থাকে। দরজা দিয়ে জ্বালানি প্রবেশ করানো হয়। মাটির পাত্রগুলো তিনদিন থেকে চারদিন পোড়াতে হয়। পোড়ানোর পর পইন থেকে পাত্র বের করে আনা হয়।

রোদে শুকানো ও কান্দা যুক্তকরণ

পোড়ানোর পর পাতিল রোদে শুকানো হয়। এরপর কান্দা বানিয়ে পাতিলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এরপর আবার দু'দিন রোদে শুকানো হয়।

রঙের কাজ

লালমাটি, খয়ের ও সোডা মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে রং তৈরি করা হয়। ন্যাকড়া দিয়ে রং করা হয় পাত্রের গায়ে। পাত্রের গায়ে রং লাগানোর পর পুনরায় রোদে শুকানো হয়।

এই বাড়িতে বছরে দুই/চার/পাঁচশত পিঠা বানানোর সাজ তৈরি হয়। চিতই পিঠার সাজ আর ভাপা পিঠার সাজ আলাদা। আবার কুলি পিঠা বানানোর সাজও আলাদা।

শ্রমিকের মজুরি

প্রতিদিন ১০০/- টাকা খাওয়া খরচ সহ ৪০০/- টাকা থেকে ৫০০/- টাকা শ্রমিকের মজুরি দেওয়া হয়।

জ্বালানি

খেজুর গাছের লাকড়ি বা চলা, ধইঞ্চা, খড়, নাড়া, আম কাঠের লাকড়ি প্রভৃতি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক পইনে পাতিল পোড়ানোর জন্য ৭,০০০/- টাকা ব্যয় হয়। এক পইনে ১১,০০০/- টাকার মাল নামে।

লাকড়ি খরচ—	৭,০০০/-
মাটি খরচ—	৪,০০০/-
	১১,০০০/-

এক পইনের পাতিল প্রায় ১৪,০০০/- টাকা থেকে ১৫,০০০/- টাকায় বিক্রি হয়।

www.pathagar.com

রাজেন্দ্র পাল বলেন, রোদ থাকলে এক পইন মাল তৈরি করতে ১৫ দিন সময় লাগে। মাসে ১০,০০০/- টাকা আয় হয়। বাজারের পাইকারি মূল্য জোড়া ৬০/- টাকা, খুচরা বিক্রি হয় ৮০/৯০ টাকা। দইয়ের পাতিল ঢাকা থেকে মহাজন এসে নিয়ে যায়। পাঁচসেরি এক হাজার দইয়ের পাতিলের মূল্য ১০,০০০/- টাকা।[১]

কুমারের তৈরি মাটির সরঞ্জাম

দারুশিল্প

পৃথিবীর আদিম পেশাগুলোর মধ্যে কাঠ মিস্ত্রি একটি। আসবাবপত্র, কৃষি এবং অন্যান্য পেশার উপকরণ হিসেবে কাঠের কোনো বিকল্প নেই। শুধু আসবাবপত্রই নয়–কৃষক, কামার, কুমার এবং তাঁতিসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর উপকরণ তৈরি ছাড়াও গৃহস্থালির অসংখ্য কাজে কাঠের তৈরি উপকরণ প্রয়োজন হয়। একারণে মানিকগঞ্জে গড়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসবাবপত্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। হাজার হাজার মানুষ এই সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। মানিকগঞ্জের মেলাগুলোতেও কাঠের বিভিন্ন আসবাবপত্রের চাহিদা রয়েছে।

দারুশিল্পের জন্য উপযুক্ত কাঠ

সব গাছের কাঠ দারুশিল্পের জন্য উপযুক্ত নয়। তবে কাঠের কাজের জন্য মেহগনি, শাল, সেগুন, রেইন ট্রি, কাঁঠাল, নিম, সুন্দরী, জাম, আম, ছাতিম খুবই উপযুক্ত।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

হাতুড়ি, বাটালি, মাটাম (ইংরেজি L আকৃতির স্কেল), মার্তুল, গেজ, কালি ফিতা, ড্রিল, রেদা, হস্ত-চালিত করাত ইত্যাদিসহ মোট প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের এক সেট উপকরণের প্রয়োজন হয়।

www.pathagar.com

কাঠ প্রস্তুতকরণ

গাছ কাটার পর পরই আসবাব তৈরির কাজ করা যায় না। প্রথমে কাঠের গুঁড়ি স-মিলে নিয়ে গিয়ে তক্তা এবং প্রয়োজনীয় আকৃতি ও পুরত্ব অনুসারে খণ্ড খণ্ড করে কেটে নেয়া হয়। কাজের সুবিধা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রেদা দিয়ে উপরিতল সমান ও মসৃণ করে নেয়া হয়। এরপর কাঠের তক্তাগুলো পানিতে বেশ কিছু দিন ভিজিয়ে রাখা হয়। একে সিজনিং করা বলে।

আসবাবপত্র প্রস্তুতকরণ

এরপর যে আসবাব বা উপকরণ তৈরি করা হবে তার বিভিন্ন অংশের আকৃতি অনুযায়ী তক্তাগুলো হস্তচালিত করাত দিয়ে কেটে নেয়া হয় এবং আবার তা রেদা দ্বারা মসৃণ করে নেয়া হয়। এরপর নকশার কারুকাজ করা হয়। কিছু কিছু নকশা কাঠের উপরে পেন্সিলের দ্বারা এঁকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বিভিন্ন প্রকার বাটালি দিয়ে কেটে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। নকশা করার পর বার বার সিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হয়।

মোটিফ

কাঠের উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে কাঠ মিস্ত্রির শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈরি করে থাকেন আসবাবপত্রের গায়ে। এক্ষেত্রে পাতা, ফুল, লতা, গাছ, সূর্য, শাপলা, রজনীগন্ধা, কলসীবাহার, টব বা ফুলদানিসহ ফুল অন্যতম। এছাড়া জ্যামিতিক আকৃতির ডিজাইন তো রয়েছেই।

বিভিন্ন অংশ জোড়া দেবার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ আসবাব তৈরি

কাঠের তৈরি সকল উপকরণ খণ্ডাংশেরই পূর্ণরূপ। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, টুল, খাট, আলনা, আলমারি, শো কেস, সোফা, বাক্স ইত্যাদি যেটিই বানানো হোক না কেন বিভিন্ন অংশ জোড়া দেবার মাধ্যমে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করা হয়। কাঠের আসবাব জোড়া দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার জোড়া রয়েছে যেমন : কোণাকাটি জোড়া, খাবলি কাটা জোড়া, আলবিন/খাঁচা, কলম জোড়া, ফ্লাশ জোড়া, আন্ধারি জোড়া ইত্যাদি।

কাঙ্ক্ষিত আসবাবপত্রটির সকল অংশ তৈরি হবার পর উপযুক্ত পদ্ধতির জোড়া দেয়া হয়। কিছু কিছু আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে জোড়া আটকানোর জন্য পেরেকের বদলে পাকা বাঁশের কীলক বা খিল ব্যবহার করা হয়। পেরেকে অনেক সময় মরিচা ধরলে জোড়া দুর্বল হয়ে আসবাবপত্র নড়বড়ে হয়ে যায় বলে বাঁশের কীলক বা খিল ব্যবহার করা হয়। জোড়া দেবার পর সিরিষ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে নেয়া হয়। তারপর কাঠের মধ্যে কোনো ফাটল বা চিড় বা ছোটো-খাটো ছিদ্র কিংবা সমতল না হলে সেই জায়গায় মোম লাগিয়ে ভরাট করে দেয়া হয়। একে অনেক সময় পুটিং করার কাজ বলা হয়ে থাকে। এতে করে কাঠের উপরিতল সমান হয়ে যায়। পুটিং করার পর পুনরায় সিরিষ দিয়ে মসৃণ করে নেয়া হয়। শেষে মিহি কাঁচ দানাযুক্ত সিরিষ দিয়ে আরো মসৃণ ও পিচ্ছিল করে নেয়া হলে রং করার উপযুক্ত হয়।

www.pathagar.com

রং করা

কাঠের আসবাবের রং করতে যেসব উপকরণ লাগে তা হলো : স্পিরিট, রং, চাঁচ এবং পুরাতন ন্যাকড়া অথবা পেইন্ট ব্রাশ। প্রথমে রঙের পাউডারের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্পিরিট মিশিয়ে তরল করে নেয়া হয়। এরপর তাতে চাঁচ মেশানো হয়। স্পিরিট রংকে তরল করে এবং চাঁচ আঠাযুক্ত করে। ফলে কাঠের উপর প্রলেপ দিলে কিছুটা স্পিরিট দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং কিছুটা উবে যায়। আর রঙে মেশানো চাঁচ আঠার কাজ করায় তা কাঠের সাথে দ্রুত লেগে যায়। প্রথমবার যে রং তৈরি করা হয় তা একটু পাতলা ধরনের হয়। এরপর আরো দুই-তিনবার রং দিয়ে তা স্থায়ী ও উজ্জ্বল রঙে পরিণত করা হয়। পরিশেষে তা ব্যবহারের উপযুক্ত হিসেবে পরিগণিত হয়।[২]

কারু ও বেত শিল্প

০৯.০১.২০১২ তারিখে প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী ও তথ্য সংগ্রাহক সাইদুর রহমান বয়াতি মানিকগঞ্জে হরিরামপুর থানার কালই গ্রামে বাঁশ ও বেতের কাজ দেখতে যান। বাঁশের ঢুলা, চালন, কুলা, ঝাঁকা, খালই, টুকরি ইত্যাদি এই গ্রামে তৈরি হয়।

কাঁচামাল

কারুশিল্পের প্রধান উপকরণ বাঁশ স্থানীয় বাঁশঝাড় থেকে সংগ্রহ করা হয়। আবার বাজার থেকেও বাঁশ কেনা হয়ে থাকে। একটি বাঁশের মূল্য ১২০/- টাকা। ঝোপ, জঙ্গলে বেত উৎপাদিত হয়। শনিবার ঝিটকা হাট থেকেও বেত ক্রয় করা হয়। ৮০টি বেতে এক পুন। একটা বেত দশহাত লম্বা হয়। দশহাতি মোটা বেত এক পুনের মূল্য ২,০০০/-টাকা। দশহাতি চিকন বেত এক পুনের দাম ১৩,০০/- টাকা।

যন্ত্রপাতি

ভুর : বেতের ধামা, কাটা, পালা, টুরি, সের ইত্যাদি বানাতে ভুর লাগে। কাঠের বাটের মাথায় লোহার ফাল লাগানো থাকে। এটি দিয়ে বেত ছিদ্র করে বাঁশের খিল দেওয়া হয়। তাছাড়া দা, কাঁচি, সিরিষ কাগজ, তার প্রভৃতি উপকরণও প্রয়োজন হয়।

পদ্ধতি

কাঠের তৈরি একটি ঠেকনার উপরে দা দিয়ে বাঁশ-বেতের চাঁছার কাজ করা হয়। মেয়েরা আচাঁছা বেত চাঁছে। এরপর 'গিরা' মারতে হয়। একাজও মেয়েরা করে। পুরুষরা যেসব জিনিস বানিয়ে দেয় মহিলারা সেসব জিনিস বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ট্রিটমেন্ট করে। যেমন– আঠা লাগানো, ছেঁকা দেওয়া, গাব দেওয়া, বান দেওয়ার কাজ মহিলারা করে।

একটি এক সেরি সের বানাতে দশহাতি তিনটি বেত ও একটি বেতের অধিক লাগে। থালা বানাতে পাঁচটি বেত ও একটি বেতের অর্ধেক লাগে। বেতের থালা তৈরি হওয়ার পর অফিস থেকে এক ধরনের ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থ দেওয়া হয়। এই ঔষধ জলের সঙ্গে মিলিয়ে লু ল্যাম্প দিয়ে বেতের পশমগুলো পরিষ্কার করা হয়। এই কাজটি পুরুষরা করে। মালটায় যাতে কোনো পোকা না ধরে সেই জন্য পানি মিশ্রিত

www.pathagar.com

ঔষধ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। তারপর বার্নিশ করে মসৃণ ও চকচকে করা হয় কাঠ বার্নিশ দিয়ে। এরপর রোদে শুকাতে হয়। স্থানীয় ক্রেতাদের জন্য সাধারণ মানের পণ্য গাব দেওয়া হয়। গাবের রস দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়। এই কাজ মেয়েরা করে।

উৎপাদিত পণ্য

তল্লা বাঁশ দিয়ে চালুন তৈরি করা যায়। ভালো একটি বাঁশ দিয়ে ১০/১২টি চালুন তৈরি করা যায়। ১২টি চালুনের মূল্য ৩০০/- টাকা। প্রতিদিন ৬/৭টি চালুন তৈরি করা যায়। চালুনের ওপর বাঁশের চাক দিয়ে বাঁধা হয়। প্রথমে জো উঠিয়ে চালুন বানানো হয়। বাঁশের চাক তার দিয়ে বাঁধা হয়। বাঁশ রোদে শুকিয়ে পানিতে ভিজাতে হয় ২/৩/৪ মাস। তাছাড়া বাঁশের টুকরি, মাটি কাটা টুকরি, গোবরের টুকরি এই গ্রামে তৈরি হয়।

এক একটা বেতের সের স্থানীয় বাজারে পঞ্চাশ/ষাট টাকা বিক্রি হয়। ক্যাটালগে ছবি দেখে অনেক বিদেশি পর্যটক অর্ডার দেন। বেতের সিলিন্ডার মুখ ৬" ও উচ্চতা ৫"। ছয়টি সিলিন্ডারে একটি সেট। বড়োটির মুখ ১৬"। তারপর অন্যগুলোর মুখ ক্রমান্বয়ে ছোটো হয় : ১৪", ১২", ১০", ৮" ও ৬"। বড়োটির উচ্চতা ১৪"। এরপর ক্রমান্বয়ে যথাক্রমে ১৪", ১২", ১০", ৮" ও ৬" উচ্চতা বিশিষ্ট। এগুলো দালানে ফুলগাছ লাগিয়ে রাখার জন্য ফুলের টব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোনো অনুষ্ঠানের গেইটে সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

বেতের থালায় টিসু বা কাপড় বিছিয়ে শুকনো খাবার পরিবেশন করা হয়। ঢাকা শহরে নামিদামি হোটেলে এসব থালা ব্যবহৃত হয়।[৩]

বাঁশ ও বেতের সামগ্রীর দোকান

www.pathagar.com

খেজুর পাতার পাটি

খেজুরের পাতা থেকে যে পাটি তৈরি হয় তাকে বলে খেজুর পাটি, বিছানা বা চাটাই। এই পাটি বেশির ভাগ মেয়েরা তৈরি করে। শীতকালে তিন মাস এই খেজুরের পাটি বানানোর মৌসুম। অগ্রহায়ণ মাসে খেজুর গাছ থেকে পাতা নামানো হয় এবং পৌষ মাঘ মাসে মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে বসে বসে এই পাটি তৈরি করে।

খেজুর পাতার পাটি তৈরি করছেন হাসুলি গ্রামের এক গৃহিণী

উপকরণ

খেজুর পাতার পাটি তৈরিতে সাধারণত খেজুর গাছের পাতা, দা ও রং প্রয়োজন হয়।

পদ্ধতি

প্রথমে খেজুর গাছ থেকে ডগাসহ পাতা কেটে রোদে শুকাতে হয়। কুয়াশা ও শিশির থাকলে সেদিন পাতা ঘরের ভেতরে রাখতে হয়। শিশির ও কুয়াশা পড়লে খেজুর পাতা কালো রং ধারণ করে। ডগা থেকে পাতা আলাদা করে নিয়ে প্রতিটি পাতা দুভাগে ভাগ করা হয়। দু'পাশের পাতা রাখতে হয়। মাঝখানে ডাটা বা শিষ ফেলে দিতে হয়। এই পাতা থেকে মাপ অনুযায়ী ফালি বা ফাইল তৈরি করা হয়। একটি পাটি বানাতে ৮/১০ দিন সময় লাগে। এই পাটিতে জো অনুযায়ী কিছু নকশা করা হয়।

প্রকার

বিভিন্ন রকম খেজুর পাতার পাটি তৈরি করা হয়, যেমন–সোজা পাটি, জোড় পাটি, তেওরা পাটি, কৈরা পাটি ইত্যাদি। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় এই পাটিকে ধারিও বলা হয়। তাছাড়া নীল, কালো, লাল রং দিয়ে পাতাকে রঙিন করে যে পাটি বানানো হয় তাকে রঙিলা পাটি বলা হয়।

www.pathagar.com

ব্যবহার
এই পাটি সাধারণত খাট, পালঙ্ক, জায়নামাজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া খাবারের সময় মানুষের বসার জন্য লম্বা পাটি ব্যবহৃত হয়।

বাজার দর
চার-পাঁচ হাত লম্বা একটি পাটির মূল্য ৫০/৬০ টাকা। রঙিন পাটির মূল ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা। খেজুর পাটি গ্রাম থেকে বেপারিরা ক্রয় করে নিয়ে যায় এবং শহরে বিক্রি করে।[৪]

সূচিশিল্প (কাঁথা)

শীত নিবারণের জন্য কাঁথার ব্যবহার বাংলাদেশের সব জেলাতেই দেখা যায়। কাঁথা তৈরির মূল কারিগর গ্রামীন নারীগণ। দৈনন্দিন গৃহস্থালী কাজের ফাঁকে ফাঁকে, বিকেলের অবসরে তাদের নিপুন হাতে তৈরি হয় সুদৃশ্য শিল্পগুণ সমৃদ্ধ কাঁথা। মানিকগঞ্জের প্রায় সব গ্রামেই নারীরা কাঁথা সেলাই করে থাকেন। ব্যক্তিগত ব্যবহার ছাড়াও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও কাঁথা নির্মাণ করে থাকেন। নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কাঁথার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়।

উপকরণ

১. কাপড় (সুতি কাপড়)
২. সুঁচ
৩. সুতা (বিভিন্ন রঙের সুতা)
৪. কাপড় টান টান করে রাখার জন্য শিল/ইট
৫. আলগা পাড়

কাঁথার ফোঁড়
কাঁথা সেলাইয়ে বিভিন্ন ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। যেমন : রান ফোঁড়, চেন ফোঁড়, ডবল রান ফোঁড়, তেরছা ফোঁড়, বখেরা ফোঁড়, বাঁশপাতা ফোঁড়, বরফি ফোঁড়, চাটাই ফোঁড়, বোতাম ফোঁড় ইত্যাদি।

মটিফ
সূর্য, চাঁদ-তারা, বলাকা, পদ্ম, বৃক্ষ, শঙ্খ, পালকি, নৌকা, লতা, জ্যামিতিক চিহ্ন, কলমি, রথ, ডুগডুগি, রাম-লক্ষ্মণ, সীতা, হাতের চালুনি, মন্দির, কুলা, পানপাতা, হাঁস, পেঁচা, ঢেউ, পায়রা, হাতি, ময়ূর, তালগাছ, প্রজাপতি ইত্যাদি।

রং
মানিকগঞ্জ জেলার কাঁথাগুলোতে লাল, সাদা, কালো সুতার ব্যবহার বেশি। এছাড়া হলুদ, কমলা, নীল, আকাশি, বেগুনি, সবুজ রঙের সুতাও ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

নির্মাণ কৌশল

প্রথমে মাপ অনুযায়ী কাপড় কেটে সমান জায়গাতে বিছানো হয়। এরপর প্রথমে ফেলা কাপড়ের উপর একটু পাতলা কাপড় বিছানো হয় এবং এর উপর প্রথম কাপড়ের বাকি অংশ বিছিয়ে পাটার শিল দিয়ে টান-টান করে রাখতে হয়। এরপর বিছানো কাপড় চারদিকে মুড়ে সেলাই দিতে হয়। তারপর সাবধানে তুলে সুবিধামত ডালা বা চাঙ্গারিতে নিয়ে বা বিছিয়ে রেখে পাড় সেলাই করতে হয়। এই পর্যায়ে সাবধান থাকতে হয় যাতে করে ভিতরে কাপড় (ভেন্না) সরে বা আলগা হয়ে না যায়। এরপর সেলাই শুরু করতে হয়।

সময়

একটি কাঁথা সেলাই করতে এক মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।[৫]

কাঁথা সেলাইয়ে ব্যস্ত হাসুলি গ্রামের নারীগণ

শাঁখা শিল্প

শাঁখা শিল্পের জন্য মানিকগঞ্জ সদর থানার বগজুরি (সোনাকান্দন) গ্রাম বেশ বিখ্যাত। এই গ্রামে বর্তমানে ২০/২২ ঘর শাঁখারি শাঁখার কাজ করেন। যারা এই পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে শাঁখারি বলা হয়। ভগবান নারায়ণের আশীর্বাদ স্বরূপ নিহত শঙ্খসূরের দেহ থেকে পানিতে শঙ্খের জন্ম হয় বলে হিন্দুশাস্ত্রে লেখা আছে। তাই এই শঙ্খ/শাঁখা হিন্দুদের নিকট পবিত্র।

কাঁচামাল

শাঁখা তৈরির প্রধান উপকরণ শঙ্খ যা মূলত শ্রীলঙ্কা থেকে আমদানি করা হয়। আমদানিকারকদের কাছ থেকে শাঁখা শিল্পীরা শঙ্খ কিনে নেন। এক একটি শঙ্খের মূল্য পাঁচশত টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। খুঁত যুক্ত বা নষ্ট

www.pathagar.com

শঙ্খের মূল্য পাঁচশত টাকা। তবে উন্নতমানের শঙ্খের মূল্য প্রকারভেদে এক হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

শাঁখা তৈরির মূল উপকরণ শঙ্খ

শাঁখা তৈরি যন্ত্রপাতি

লোহার তৈরি রেদা, লোহার তৈরি দেরাল এবং লোহার তৈরি বাটাল–এই তিনটি হচ্ছে শাঁখা তৈরির প্রধান যন্ত্র।

পদ্ধতি

শঙ্খ থেকে শাঁখা প্রস্তুতের জন্য শঙ্খকে প্রথমে কেটে নিতে হয়। ঢাকার শাঁখারি বাজারে শঙ্খ মেশিনে কাটা হয়। কিন্তু বগজুরি শাঁখারি বাড়িতে শঙ্খ কাটার ব্যবস্থা নেই। এখানকার শাঁখারিরা যশোর নোয়াপাড়া থেকে কাটা শঙ্খ ক্রয় করে আনেন। কাটা শঙ্খ মেশিনে কাজ করিয়ে ভেতরে বাইরে পরিষ্কার করা হয়। শঙ্খ পরিষ্কার করে দেরালের ওপর রেখে রেদা দিয়ে ঘষে নকশা করতে হয়। বাটাল দিয়েও নকশা করা হয়, যেমন : কনকন নকশা, পাতা নকশা, ধানছড়া নকশা, চান নকশা ইত্যাদি।

প্রকার

তিন রকমের শাঁখা তৈরি করা হয়। যেমন–

১. লাল শাঁখা : এটি পূজার কাজে ব্যবহৃত হয়। কালী এবং দুর্গাদেবীর হাতে লাল শাঁখা পরিয়ে দেওয়া হয়।
২. সাদা শাঁখা : সাধারণত বিবাহিত হিন্দু মেয়েদের বিয়ের দিন এই শাঁখা পরা অত্যাবশ্যক।
৩. কড়ি শাঁখা : সাদা শাঁখা ছাড়াও হিন্দু রমণীরা হাতে কড়ি শাঁখা পড়ে থাকেন।

www.pathagar.com

বাজারজাতকরণ

বগজুরি গ্রামে প্রস্তুতকৃত শাঁখা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় এই শাঁখা বিক্রি করা হয়। একজোড়া শাঁখার খুচরা মূল্য ছয়শত পঞ্চাশ টাকা থেকে আটশত টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।[৬]

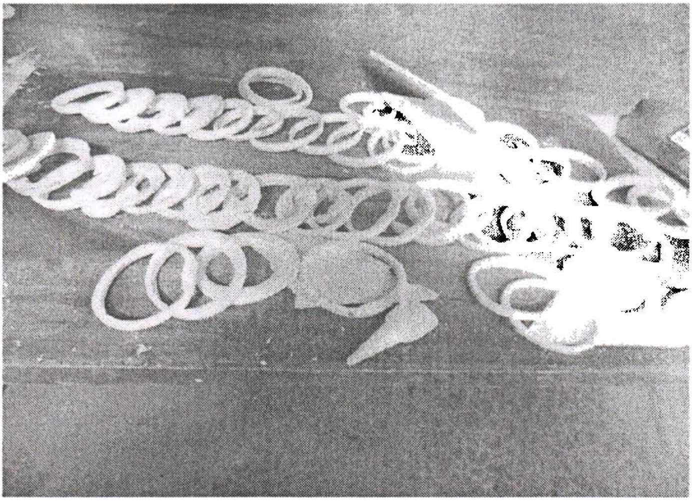

বগজুরি গ্রামে শাঁখারি বাড়িতে প্রস্তুতকৃত শাঁখা

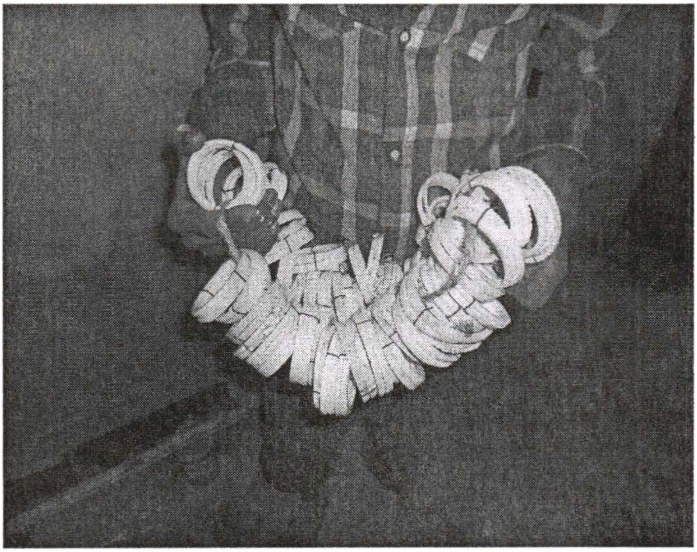

নকশা ও রং করার পর প্রস্তুতকৃত শাঁখা

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. রাজেন্দ্র পাল, বয়স : ৫৫ বৎসর, পেশা : মৃৎশিল্পী, গ্রাম :পূর্ব সানবান্দা, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৮.১১.২০১২; চন্দনা রানী পাল, স্বামী : সুকুমার পাল, শিক্ষা : নবম শ্রেণি, পেশা : মৃৎশিল্পী, গ্রাম : পূর্ব সানবান্দা, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৮.১১.২০১২

২. আব্বাস মিয়া, পিতা : মজিদ মিয়া (মৃত), বয়স : ৫৮ বৎসর, শিক্ষা : স্বাক্ষর, পেশা : কাঠমিস্ত্রি, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২২.০৮.২০১৩

৩. মনিন্দ্র দাস, স্ত্রী : শিল্পী, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : কারুশিল্পী, গ্রাম : কালই, থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৯.০১.২০১২; শিল্পী, স্বামী : মনিন্দ্র দাস, বয়স : ৩৫ বৎসর, পেশা : কারুশিল্পী, গ্রাম : কালই, থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৯.০১.২০১২

৪. করিমন নেসা, বয়স : ৪৪ বৎসর, শিক্ষা : স্বাক্ষর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর: লেমুবাড়ি , জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৩.১১.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

৫. রহিমা খাতুন, স্বামী : সিদ্দিক মিয়া, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৫.১১.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

৬. গনেশচন্দ্র সেন, পিতা : নিমাই চন্দ্র সেন, শিক্ষা : আই. এ পাস, পেশা : শাঁখারি, গ্রাম : বগজুরি (সোনাকান্দন), থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ৩০.০১.২০১৩ ও ২৯.০৫.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

মানিকগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে বাড়ি-ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের রুচি এবং রূপ দেখা যায়। নীচু এলাকা হবার কারণে সাধারণত বর্ষা-বন্যাতে জনপদগুলো পানিতে প্লাবিত হয় বলে অধিকাংশ বাড়ি ঘর নির্মাণ করা হয় অপেক্ষাকৃত উঁচু ভিটির উপর। মানিকগঞ্জের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতে ৫০/৬০ বছর আগে ছনের ঘর ও মাটির দেয়াল ছিল। গ্রামে ধনীদের ছিল ছনের চৌচালা ঘর। দোচালা ও চৌচালা ছনের ঘর তৈরি করা হয় কাঁচা মাটির ভিটির ওপর। পাটখড়ি দিয়ে বেড়া তৈরি করা হতো। মানিকগঞ্জ থানার ঘরটিও ছিল ছনের চৌচালা ঘর। ছনের ঘর থেকে পরিবর্তিত হয়ে টিনের ঘর তৈরি শুরু হয়। তবে টিনের ঘরে শীতের দিনে শীত ও গরমকালে গরম লাগতো বেশি। কিন্তু ছনের ঘরে অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা কোনোটাই লাগে না। সে কারণে ধনী ব্যক্তিগণ বাড়িতে কম করে হলেও কাচারি বা বাংলো ঘরটি ছন আর পাটখড়ির বেড়া দিয়ে তৈরি করতো। ছনের ঘর প্রতি দু বছর অন্তর অন্তর ছাউনি দিতে হতো। ছন আনতে হতো মানিকগঞ্জের কলতার হাট থেকে। ঐ এলাকায় তখন ছনের আবাদ হতো। প্রতি বৎসর মালিকেরা ক্ষেতের ছন চৈত্র মাসে কেটে তারপর শুকিয়ে হাটে বাজারে বিক্রি করতো। বর্তমানে ছনের ঘর না থাকায় ছনের চাহিদাও নেই। তাই ছনের আবাদও নেই।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মানুষের ঘর বাড়ি নির্মাণেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ছনের ঘর ও পাটখড়ির দেয়ালের পরিবর্তে তারা উন্নতমানের দোচালা ও চৌচালা টিনের ঘর তৈরি করতে থাকেন।

বাঁশের চাটাই ও পাটখড়ির বেড়া বিশিষ্ট বাড়ি

পূর্বে মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামেগঞ্জে পাটখড়ির বেড়া বিশিষ্ট বাড়ি চোখে পড়তো। বর্তমানে পাটখড়ির বেড়ার চাইতে বাঁশের চাটাই বা বাতার তৈরি বাড়ি দেখা যায়। গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা ছাড়াও হাট-বাজার, ইটের ভাটা ইত্যাদি স্থানে কর্মরত শ্রমিকেরা বসবাসের জন্য অস্থায়ীভাবে বাঁশের চাটাইয়ের বাড়ি নির্মাণ করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থ বাড়িতে আজো বাঁশের চাটাইয়ের তৈরি ঢেঁকিঘর, রান্নাঘর ও বৈঠকখানা বিদ্যমান।

প্রধান উপকরণ

বাঁশ ও বাঁশের তৈরি বাতা বা চাটাই, পাটের দড়ি বা তাইতা, পাটখড়ি, পেরেক, গুনা বা তার ইত্যাদি। এলাকার বাঁশঝাড় থেকে বা বাজার থেকে বাঁশ/পাটখড়ি ক্রয় করে আনা হয়। অন্যান্য উপকরণও স্থানীয় বাজার থেকেই সংগ্রহ করা হয়।

www.pathagar.com

নির্মাণ প্রক্রিয়া

বাঁশের চাটাই ও পাটখড়ির বেড়া বিশিষ্ট বাড়ি সাধারণত মাটির উঁচু ভিটির উপর তৈরি করা হয়। এজন্য নির্ধারিত স্থানে মাটি ফেলে ভিটি তৈরি করা হয় ও মাটিকে ভালোভাবে শক্ত করা হয়। এরপর ভিটির উপর বাঁশ ও কাঠের খুঁটি গেড়ে ঘরের কাঠামো নির্মাণ করা হয়। এরপর বাঁশের খুঁটির সাথে বাঁশের চাটাই বা বাতা দড়ি, গুনা বা তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ঘরের বেড়া তৈরি করা হয়। দড়ি বা তারের বাঁধন সাধারণত নিচের দিক থেকে উপরের দিকে এক ফুট অন্তর অন্তর দেয়া হয়ে থাকে। বাঁশের বাতা বা চাটাইয়ের ভেতর কঞ্চি দিয়ে তা আরো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়। এসব ঘরের ছাউনি বাঁশের বা পাটখড়ির বাতা অথবা টিনেরও হয়ে থাকে।

এসব ঘরের মেঝে কাঁচা মাটির হলে তা ফাটলমুক্ত রাখতে মাঝে মাঝে গোবর ও পানি মিশিয়ে লেপে দিতে হয়। কখনও কখনও ঘরের ভেতর একপাশে মাচা তৈরি করা হয় যা গোলা ঘরের বিকল্প হিসেবে ধান, আলু সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য, বীজ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ঘরের দরজা ও জানালা কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। সৌখিন ও রুচিশীল মানুষেরা নকশা ও কারুকাজ খচিত কাঠের দরজা ব্যবহার করে থাকেন। গরম ও শীত উভয় সময়েই ঘরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা না হওয়ায় বসবাসের জন্য এ ধরনের বাড়ি খুবই আরামদায়ক।

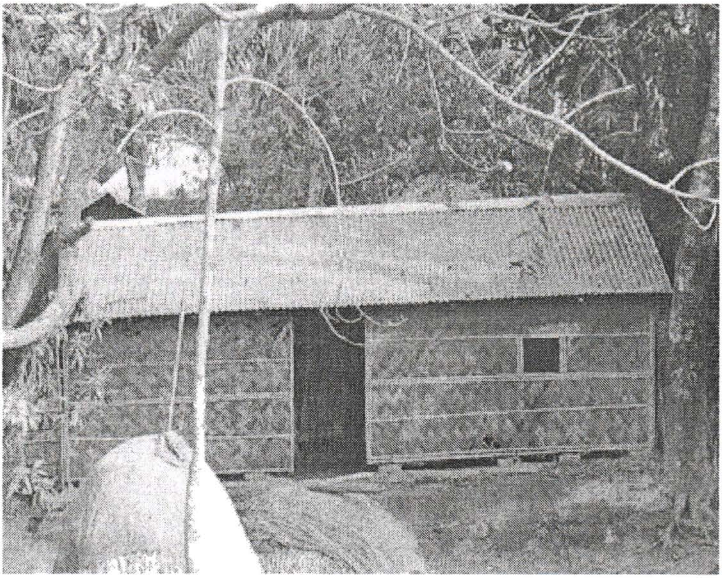

বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া বিশিষ্ট বাড়ি

www.pathagar.com

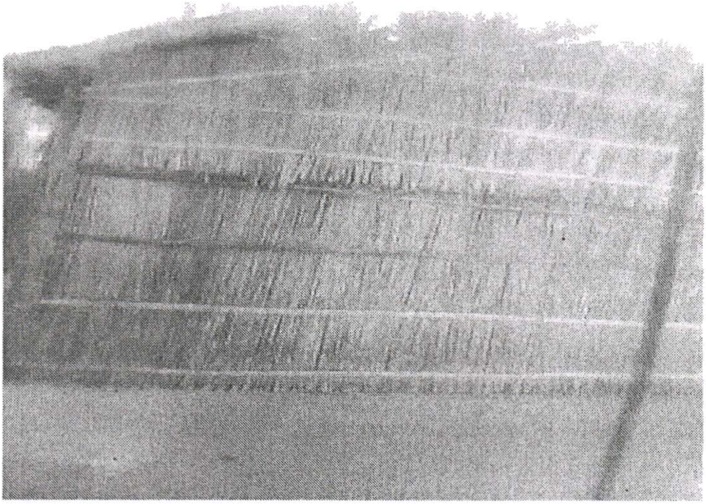

পাটখড়ির বেড়া বিশিষ্ট বাড়ি

টিনের ঘর

মানিকগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে টিনের তৈরি দোচালা ও চৌচালা বাড়িই বেশি চোখে পড়ে। এসব বাড়ি তৈরির প্রধান উপকরণ টিন, বাঁশ, কাঠ, দড়ি, পেরেক ইত্যাদি।

নির্মাণ কৌশল

মাটির ভিটির উপর টিনের বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রথমে বাঁশের খুঁটি গেঁথে নিতে হয়। এরপর টিনের শিট বাঁশের খুঁটির সাথে পেরেকের সাহায্যে আটকে বেড়া তৈরি করা হয়। দোচালা বা চৌচালা টিনের ঘরের চাল বা ছাউনি তৈরির জন্য বাঁশ বা কাঠ দিয়ে চালের কাঠামো নির্মাণ করে নিতে হয়। সেই কাঠামোর সাথে টিনের শিট পেরেক দিয়ে আটকে ঘরের চাল বা ছাউনি তৈরি হয়। এসব ছাউনি বা চাল দুপাশে ঢালু থাকে ফলে বৃষ্টির পানি সহজে গড়িয়ে পড়তে পারে। ঘরের ভেতর টিনের চাল ও বেড়ার মাঝে বাঁশের চাটাই বা বাতা দিয়ে চাঙ্গ (সিলিং) তৈরি করা হয় ফলে চাল অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলেও সিলিং ও চালের মাঝে উত্তাপ আটকে থাকে, ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না। মরিচার হাত থেকে টিন রক্ষার জন্য টিনের উপর অনেক সময় আলকাতরার প্রলেপ দেয়া হয়। দরজা ও জানালা তৈরির জন্য টিনের বেড়া কেটে কাঠের ফ্রেম বা কাঠামো লাগানো হয় এবং দরজা ও জানালার কপাট কাঠ দিয়েই নির্মাণ করা হয়।

বর্তমানে মানিকগঞ্জের গ্রামে অত্যাধুনিক পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণ শুরু হয়েছে। মানিকগঞ্জের অসংখ্য মানুষ মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। এসব প্রবাসী বাঙালিরা তাদের গ্রামে আধুনিক বিল্ডিং, সুপার মার্কেট প্রভৃতি তৈরি

www.pathagar.com

করছেন। বর্তমানে মানিকগঞ্জে কোথায়ও একটি ছনের ঘর খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে টিনের ঘর ও পাকা ঘর। বর্তমানে শহর ছাড়াও গ্রামে নির্মিত হচ্ছে বহুতল বিশিষ্ট পাকা বিল্ডিং। মানিকগঞ্জে গ্রামে ও শহরে ঘর বাড়ি নির্মাণে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।[১]

পুটাইল ইউনিয়নের নাগরা গ্রামে মাটির ভিটির উপর নির্মিত টিনের ঘর

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮২ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২১.০১.২০১৪

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

ক. লোকপোশাক

একশ বছর আগেও মানিকগঞ্জ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহারে নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে পোশাকে এসেছে নানা ধরনের ফ্যাশন। এই পরিবর্তনের ঢেউ গ্রামকেও প্রভাবিত করেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সাধারণত ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবি ও গেঞ্জি পরিধান করে। ধনী হিন্দু মেয়েরা সাদা দোপাইরা কাপড়, ব্লাউজ বা কোর্তা ব্যবহার করেন। মুসলমান কৃষক চকে বা মাঠে কাজ করার সময় লুঙ্গি ও গামছা ব্যবহার করেন।

ঈদ উপলক্ষে মুসলমানরা পাজামা, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। মহিলারা বিভিন্ন ধরনের শাড়ি ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য ১৫/২০ বছর আগে থেকে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা শহরে ও গ্রামে সালোয়ার কামিজ ব্যবহার করছেন। ছেলেরা প্যান্ট, শার্ট পরিধান করে। পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন সংযোজন। বিয়ের সময় মুসলমান বর মাথায় পাগড়ি আচকান, পাজামা পরতেন। বর্তমানে এসব ঐতিহ্যবাহী বিয়ের পোশাকের ব্যবহার অনেকটা কমে গেছে। বিয়ের সময় হিন্দু বর ও কনে মাথায় ব্যবহার করেন শোলার মুকুট। বর্তমানেও এর প্রচলন রয়েছে।

ধুতি

বহুকাল আগে থেকেই সনাতন ধর্মাবলম্বী পুরুষরা ধুতি ব্যবহার করে আসছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন একশ বছর আগে ধুতি কাপড় ব্যবহার করতেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐতিহ্যবাহী ধুতি কাপড়ের পরিবর্তে লুঙ্গির ব্যবহার শুরু হয় মুসলমানদের মধ্যে। ধনী হিন্দুরা এক ধরনের বিশেষ ধুতি কাপড় ব্যবহার করেন, যা চিকন ধুতি নামে পরিচিত। বর্তমানে লুঙ্গির প্রচলন বেশি হলেও মুরুব্বীগণ ধুতি পরে থাকেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বাড়িতে লুঙ্গি, গামছা ব্যবহার করেন। তবে বিয়ে, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আজো ধুতি পরে থাকেন অনেকেই। সাধারণত ধুতির রং সাদা হয়। তবে, অন্য রঙের চিকন পাড় বিশিষ্ট ধুতিও রয়েছে। ধুতির বহর দুই থেকে তিন হাত হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্য আট থেকে বারো হাত হতে পারে। বর্তমানে বাজারে শিশুদের উপযোগী ধুতিও পাওয়া যায়।

লুঙ্গি

এটি গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের পরিহিত সর্বাধিক ব্যবহৃত লোকপোশাক। লুঙ্গির দৈর্ঘ্য সাধারণত সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাত হয়ে থাকে, অর্থাৎ সেলাই করলে এর পরিধি বা

www.pathagar.com

ঘের ওই পরিমাণ দৈর্ঘ্য হয়। স্থানীয় ভাষায় বহর বা কোমর থেকে পা পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্য তার পরিমাণ আড়াই হাত। তাঁতিরা এটি বুনে থাকে। এক সময় এক রঙের লুঙ্গি অনেকেই পড়ত। বর্তমানে চেক লুঙ্গির প্রচলন বেশি। এগুলো সাধারণত বিভিন্ন চেকের হয়ে থাকে। নিজস্ব ব্যবহার ছাড়াও জামাইকে দাওয়াত করলে লুঙ্গি উপহার দেয়ার প্রচলন রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে আজকাল সেলাই করা লুঙ্গিও বাজারে পাওয়া যায়।

শাড়ি

শাড়িই হচ্ছে সাধারণ নারীসমাজের প্রধান পোশাক। হিন্দু নারীরা শাড়ি বেশি ব্যবহার করেন। তবে কুমারী মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ এবং বিধবা নারীরা সাদা শাড়ি পরেন। মুসলিম নারীদের মধ্যে বিধবা মহিলারা এক রঙের শাড়ি ব্যবহার করেন। তবে ইদানিং রঙিন প্রিন্ট, চেক শাড়িও পরছেন। আগের দিনে মহিলারা মোটা শাড়ি ব্যবহার করতেন। ছায়া বা পেটিকোট এবং ব্লাউজ বা কোর্তা কম ব্যবহার করতেন। মেয়েদের বিয়ের সময় শাড়ি, ছায়া বা পেটিকোট ব্লাউজ দিতে হয়। আগের বিয়ে সময় মেয়েদের উল্লেখযোগ্য শাড়ির মধ্যে ছিল আলপাকা, বেনারসি, দোপাইয়া শাড়ি, কানা কুয়া শাড়ি ইত্যাদি। বর্তমানে বিয়ের মধ্যে জর্জেটের শাড়ি, টাঙ্গাইল শাড়ি, ছাপা শাড়ি দিতে হয়।

ফতুয়া

ফতুয়া দেখতে হাফ শার্টের মতো। এই পোশাকটি পাতলা ও নরম কাপড়ের তৈরি এবং গলায় কলার থাকে না। অতি সাধারণ এর সেলাই। ফতুয়ার সামনের দিকে নিচে দুই পাশে দুইটি পকেট থাকে। ব্যবহার কম হলেও বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের সময় শিশু, কিশোর, যুবক ও সংস্কৃতিমনা মানুষেরা ফতুয়া পড়ে। সে সময় বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের ছাপ থাকা ফতুয়া যেন শিশু-কিশোরদের একমাত্র চাওয়া হয়ে দাঁড়ায়, যা অকৃত্রিম দেশ প্রেমের পরিচায়ক।

ম্যাক্সি

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোশাক শাড়ির পাশাপাশি ইদানিং মহিলাদের ব্যবহৃত পোশাক হিসেবে দিন দিন ম্যাক্সির চাহিদা বাড়ছে। এটি দেখতে অনেকটা বোরকার মতো। এটি গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। হাফ হাতা অথবা ফুল হাতা–ম্যাক্সি দুরকমই হতে পারে। এর ডান এবং বাম পাশে দুটো পকেটও থাকে। ম্যাক্সি সাধারণত নকশাযুক্ত কাপড় দিয়ে তৈরি হয়।

গামছা

গ্রামীণ মানুষের নিত্যসঙ্গী গামছা। তবে শুধু গ্রামীন মানুষই নয়, শহরাঞ্চলেও গামছার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। মানিকগঞ্জের হরিরামপুর, ঘিওর ও অন্যান্য থানায় কয়েক ঘর তাঁতি রয়েছে যারা গামছা তৈরি করে থাকেন। এসব গামছা তারা বাজারেও বিক্রি করে থাকেন। প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গামছা তৈরি হয়ে থাকে, যেমন–

www.pathagar.com

১. দৈর্ঘ্য ১ হাত এবং প্রস্থ অর্ধ হাত : ছোটো ধরনের এই গামছা ৮টি তে এক থান হয়। তবে কখনো কখনো এ ধরনের গামছা কদাচিত প্রয়োজনের খাতিরে তৈরি করা হয়। হিন্দুধর্মের লোকেরা পূজার কাজে এটা ব্যবহার করে থাকে।

২. দৈর্ঘ্য দেড় হাত এবং প্রস্থ পৌনে এক হাত : ছোটো শিশুদের জন্য এটি বুনন করা হয়ে থাকে। এ ধরনের গামছা নিয়মিত বুনানো হয় না।

৩. দৈর্ঘ্য ৩ হাত এবং প্রস্থ ১, ১/৪ হাত : এ ধরনের ৬টি গামছা নিয়ে এক থান হয়।

৪. ৩, ১/২ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১, ১/২ হাত প্রস্থ : এ মাপের ৪টি গামছা নিয়ে এক থান কাপড় হয়।

৫. ৪ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১, ৩/৪ হাত প্রস্থ : এ মাপের ৪টি গামছা নিয়ে এক থান কাপড় হয়ে থাকে।

৬. ৫ হাত দৈর্ঘ্য এবং ২ হাত প্রস্থ : এ মাপেরও ৪টি গামছা নিয়ে এক থান কাপড় ধরা হয়।

গামছার আকৃতি অনুযায়ী এর মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যেই ভালো গামছা পাওয়া যায়।

খ. অলংকার

বিবাহিত হিন্দু মেয়েদের বিয়ের দিন শাঁখা পরা অত্যাবশ্যক। অবিবাহিত এবং বিধবা রমণীর শাঁখা পরা নিষেধ। হিন্দু শাস্ত্র মতে, শাঁখা হচ্ছে বিবাহিত সতী নারীর প্রতীক। সিঁদুরও বিবাহিত নারীর প্রতীক। মানিকগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহিত নারীগণ শাঁখা ও সিঁদুর পরে থাকেন। এছাড়া সকল সম্প্রদায়ের বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েরা খোঁপায় ফুল, হাতের বালা, চুড়ি, রিং, ব্রেসলেট, মালা, কানের দুল, নাকফুল, পায়েল, নূপুর প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন। অলংকার পছন্দের ক্ষেত্রে কাঠের, কাঁচের, মাটির থেকে শুরু করে রূপা, তামা, সোনা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়া তাজা ফুলের ব্যবহারও করে থাকেন। লেইস ফিতার ব্যবহারও করেন প্রায় মেয়েরা।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

ক. মানিকগঞ্জের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মানিকগঞ্জ জেলা যমুনা-পদ্মা বাহিত, বুক চেরা নদী ধলেশ্বরী, ইছামতি ও কালীগঙ্গার পলিবিধৌত অঞ্চল। সুর ও ছন্দ এ অঞ্চলের মানুষের সহজাত প্রকৃতি। মাঝির গান, বয়াতির গান, বিচার গান, কীর্তন, জারি, সারির এক অমূল্য খনি মানিকগঞ্জ। কারণ, নদী-নালা দিয়ে জেলার ভূমিগুলো বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রত্যেকটি এলাকায় রয়েছে এক একটি স্বতন্ত্র বিনোদনের সুরধারা। এ থেকেই এতো বিচিত্র সুরধ্বনি। এর থেকেই বেরিয়ে এসেছে বহু সংগীত ব্যক্তিত্ব।

জুলমত আলী সরকার

মানিকগঞ্জের জারিগানের অন্যতম স্রষ্টা ও প্রখ্যাত লোকশিল্পী জুলমত আলী সরকার ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন নালী ইউনিয়নের অন্তর্গত পূণ্যভূমি বাঠইমুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জীবন আলী সরকার এক সামান্য কৃষক ছিলেন। ছোটো বেলা থেকেই জুলমত আলী সরকার গান-বাজনা ও শিল্প-সংস্কৃতির সাথে জড়িত হন। কৈশোর বয়স থেকেই তিনি বিভিন্ন ভাববৈঠকি আসরে গান করতেন। শুধু গান গাওয়া নয়, গান সৃষ্টিতেও তাঁর ছিল অসামান্য দক্ষতা। তাঁর রচিত জারিগানের পালার মধ্যে শহিদ কারবালা, কুলসুমের মেহমানী, মাদার মুনি, জয়নাল উদ্ধার, ইসমাইল কোরবানি, আইয়ুব নবীর পালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু জারিগান নয়, ভাববৈঠকি গান, নৌকাবাইচের গান, সারিগান, মারফতি, মুর্শিদি, জহরনামা, শহিদনামা, জঙ্গনামা, শহিদ কারবালা স্মরণে মর্সিয়া ও খতনামা সহ অসংখ্য লোকগীতি তিনি রচনা করেছেন।

জুলমত আলী সরকার আধ্যাত্মিক বিদ্যায় তথা এলমে তাসাউফের একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। জানা যায়, তিনি হযরত সৈয়দ আতোয়ার রহমান (রঃ)-এর হাতে বায়েত গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি চরম আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর সৃষ্ট গানগুলো আধ্যাত্মিক শিক্ষায় ভরপুর।

জুলমত আলী সরকার মাশাইল গ্রামে বিয়ে করেন। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। দুই ছেলে হলেন—করিম সরকার ও বছির সরকার। ১০২ বৎসর বয়সে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জুলমত আলী সরকার ইন্তেকাল করেন। বাঠইমুরি নিজ বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়। প্রতি বছর ১৮ পৌষ তাঁর পবিত্র ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়।[১]

সৈয়দ কালু শাহ্ ফকির

কালু শাহ ফকির (১৮১০-১৯০৬)-এর জন্মস্থান কালীগঞ্জ। পিতার নাম নিতাই বেপারি ও মাতার নাম নূরজাহান, দাদার নাম আফছার উদ্দীন ও দাদীর নাম ফজলী বেগম।

www.pathagar.com

কালু শাহ ফকিররা ছিলেন চার ভাই। কালু শাহ ফকিরের বড়ো ছেলের নাম সৈয়দ সিদ্দিক শাহ, মেজ ছেলে সৈয়দ লেদু শাহ, সেজ ছেলে সৈয়দ মাইনুদ্দিন শাহ এবং চতুর্থ ছেলে ভুকুর উদ্দীন শাহ। তাঁর একমাত্র মেয়ের নাম জলবাসা বিবি।

মানিকগঞ্জের সাধক কবি সৈয়দ কালু শাহ ফকির এবং তাঁর গান সম্পর্কে ভালোভাবে জানা যায় না। তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধক এবং চারণ কবি ছিলেন। তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত অনেক গান হারিয়ে গেছে। কালু শাহ ফকিরের গানে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের জ্ঞান লাভ করা যায়। যেমন : মোরাকাবা- এই গানে তিনি ধ্যানযোগে নামাজ পড়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

কালু শাহ ফকিরের চতুর্থ বংশধর সৈয়দ বাদশা আলমের সাক্ষাতকার থেকে কালু শাহ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। (কালু শাহ ফকিরের প্রথম ছেলে সৈয়দ সিদ্দিক শাহ হচ্ছেন সৈয়দ বাদশা আলমের দাদা। বাদশা আলমের পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ শাহ।) সৈয়দ বাদশা আলম বলেন, সৈয়দ কালু শাহ পাবনা জেলার কালীগঞ্জে (উল্লাপাড়া থানা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জমিদার ছিলেন বলে জানা যায়। তালুকদার বলেও সৈয়দ কালু শাহ-এর উপাধি ছিল বলে জানা যায়। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার তার নানার বাড়ি। কালু শাহ ছোটোবেলায় একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর বোন শাবানি ও মাকে নিয়ে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় চলে আসেন। তিনি নিজে ইমামতি করে নামাজ পড়তেন উত্তর কাউন্নারা জামে মসজিদে। কালুশাহ ফকির সাটুরিয়ায় মনিহারি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কইট্যার জমিদার চান মিয়া সাবের বাড়ির পাশে করটিয়া হাটে ব্যবসা শুরু করেন। তখন তিনি এই হাটে দোকানদারী করতেন। একবার পির সৈয়দ আতাউর রহমান সাটুরিয়া এলে তাঁর নিকট সৈয়দ কালু শাহ বায়েত গ্রহণ করেন। পিরের নির্দেশে তিনি কঠিন সাধনা করতে থাকেন। সৈয়দ আতাউর রহমান নিজের সাধনালব্ধ সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও আশীর্বাদ সৈয়দ কালু শাহকে অর্পণ করেন।[২]

মানিজগঞ্জের ঝিটকা, দোলাপাড়া, কুসার চর প্রভৃতি জায়গায় সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের ভক্ত আছে। তাছাড়া টাঙ্গাইলের পাকুইল্লায়ও সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের অসংখ্য ভক্ত আছে। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সেখানে কাটান। টাঙ্গাইলের করটিয়ার জমিদার চান মিয়া সরকার কালু শাহ ফকিরের একজন নামকরা ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, একবার কিছু আলেম করটিয়ার জমিদার চান মিয়ার নিকট সৈয়দ কালু শাহ ফকিরের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করে যে, তিনি গান বাজনা করেন। জমিদার তাঁকে ডেকে পাঠান এবং মাওলানা মৌলবিদেরও সেখানে আসতে বলেন। নির্দিষ্ট দিনে সৈয়দ কালু শাহ ফকির তাঁর ভক্ত সবেদ সরকারকে নিয়ে জমিদার বাড়িতে যান। কালু শাহকে দেখে জমিদার নিজের চেয়ার ছেড়ে দেন এবং তাঁকে ঐ চেয়ারে বসান। সবাই এই দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, কী বিচার হবে। তিনি নিজেই চেয়ার ছেড়ে দিয়ে কালু শাহকে বসতে দিয়েছেন। তখন জমিদার চান মিয়া বলেন—আজ এমন একজন অলি আমার বাড়িতে এসেছেন তাকে দেখে আমার পাঁচ আত্মা কেঁপে উঠেছে। তোমরা কী চাও আটিয়ার (টাঙ্গাইল) শাহেন শার দোয়ায় যে জমিদারি আমি লাভ করেছি তা আর একজন অলির বদদোয়ায় নষ্ট হোক? জমিদার নিজ হাতে তাঁকে খাওয়ান। খাওয়ার পর ১০১/-টাকা নজরানা দেন এবং সসম্মানে বিদায় দেন এবং গান বাজনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।[৩]

www.pathagar.com

বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কালু শাহ ফকিরের কিছু গান সংগ্রহের ব্যাপারে সৈয়দ গফুর শাহ ফকিরের বড়ো ছেলে ডাঃ সৈয়দ জানে আলম শাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি গান সংগ্রহের জন্য প্রথমে টাঙ্গাইল যান। কালু শাহ ফকির টাঙ্গাইলের পাকুইল্লায় সুদীর্ঘ বিশ বছর অধ্যাত্মিক সাধনায় রত ছিলেন। সৈয়দ জানে আলম টাঙ্গাইল সদরে রসুলপুর গ্রামে ইয়াদ আলী ফকিরের নিকট থেকে কালু শাহ ফকির রচিত বেশ কিছু গান সংগ্রহ করেন।[৪]

কালু শাহ ফকিরের মাজারে বছরে দুইটি ওরস অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আতাউর রহমান উনার পির ছিলেন। উনার আদেশে ওরস হয় মাঘ মাসের চাঁদের পাঁচ তারিখ থেকে শুরু হয়ে দশ দিন পর্যন্ত। আর একটা ওরস হয় ভাদ্র মাসে। ২০শে ভাদ্র থেকে শুরু হয়ে ২৫শে ভাদ্র শেষ হয়। কালু শাহ ফকিরের পির দুধ পছন্দ করতেন। তাই দুধের শিরনি হয় মাঘ মাসে। কালিজিরা চাউল মিশিয়ে দুধের শিরনি পাক করা হয়। ভক্তদের ডাল ভাত খাওয়ানো হয়। সন্তান কামনা করে এখানে অনেকে আসেন। তারা চাউল, হাঁস, মুরগি, ছাগল, টাকা পয়সা ইত্যাদি দেয়।

সুফি সাধক দেওয়ান রশীদ

দেওয়ান রশীদ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে ১২৩৭ বঙ্গাব্দ/১৮৩১ইং সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জাফর উদ্দিন। পিতা একজন দরিদ্র পরিবারের মানুষ ছিলেন। দেওয়ান রশীদ দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া করতে পারেননি। ছেলেবেলায় গান বাজনা শোনার জন্য গানের আসরে ঘুরে বেড়াতেন। গায়ক বয়াতিরাও তাঁকে ভালোবাসতেন।

এক সময় ফরিদপুর জেলায় পাংসার নিকটবর্তী চাঁদপুর গ্রামের বাউল শাহ হানিফের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এখানেই তাঁর গান শেখা শুরু হয়। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে পাবনা জেলার নগরবাড়িতে তাঁর চাচার বাড়িতে চলে আসেন। কিছুদিন পর তাঁর পিতার মৃত্যু হলে দেওয়ান রশীদ মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার জাফরগঞ্জ গ্রামে আসেন, এখানে বিয়ে করেন এবং শ্বশুরবাড়িতে জীবন যাপন শুরু করেন। এখান থেকে তিনি হরিরামপুর থানার ঝিটকা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তখন তাঁর মাথায় লম্বা জটা চুল, গায়ে নামাবলি, হাতে চিমটা এবং পায়ে খড়ম। কলকাতা থেকে হজরত শাহ সাফাতুল্লা নামে একজন সুফি সাধক ঝিটকায় আসেন এবং কলাহাটায় আস্তানা গড়ে তোলেন। দেওয়ান রশীদ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ফকির সাফাতুল্লা সন্ন্যাসী বেশে দেওয়ান রশীদকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি একটি গান রচনা করেন—

যে ব্যথা আমার প্রাণে
দুঃখ বলিব কে শুনে
আমার বুক চিরা দেখাবো কারে
ব্যথার ব্যথিত নাই এইখানে
দুঃখ কারে বলি কে শুনে ॥

www.pathagar.com

তিনি অসংখ্য মরমি সংগীত রচনা করেছেন। 'জ্ঞানসিন্ধু' ও 'অন্ধের চক্ষুদান' নামক দুটি গানের বই তিনি রচনা করেছেন। তিনি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ঝিটকায় ইন্তেকাল করেন। এখানে তাঁর পবিত্র মাজার শরিফ রয়েছে। প্রতি বছর ভাদ্রমাসের ১২ ও ১৩ তারিখে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর মাজারে কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তবৃন্দ আসেন তাঁদের মনস্কামনা পূরণের জন্য। তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন হচ্ছে মানুষের মধ্যে স্রষ্টা বিরাজমান। কামেল পিরের নিকট বায়েত গ্রহণ এবং সাধনার মাধ্যমে ভক্ত নিজের মধ্যে স্রষ্টা বা পরমসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁর রচিত গান বর্তমানে বিচারগান, ভাবসংগীতের আসর, বৈঠকিগান, জারিগানের আসরে প্রাসঙ্গিকভাবে গীত হয়।

বদর উদ্দিন বয়াতি

ঐতিহ্যবাহী জারিগানের প্রখ্যাত গায়ক বদর উদ্দিন বয়াতি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার গাঙ ধুসরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক ভাবে কিছু জানা যায় না। তাঁর পিতার নাম ছিল কোতালী বয়াতি। বদর উদ্দিন বয়াতি ঝিটকা মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ছোটো বেলা থেকেই গান বাজনার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। তৎকালীন বাঠইমুরি গ্রামের জারিগানের বিখ্যাত বয়াতি জুলমত আলীর কাছে প্রথম জারিগান শেখেন। এরপর সমগ্র দেশে ঘুরে ঘুরে তিনি জারিগান করেছেন। জারিগানের পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে সমাদৃত গাজীর গানও গাইতেন বলে জানা যায়। তিনি ভালো সারিন্দা ও বেহালা বাজাতেন। তিনি একজন সৌখিন সহিসদার (ঘোড়া চালনায় পটু) ছিলেন। এক সময় পৌষ-মাঘ মাসে বিভিন্ন স্থানে ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা হতো। তিনি ঐ সব ঘৌড় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন এবং বিজয়ী হতেন। তিনি লাঠিখেলায়ও পারদর্শী ছিলেন।

বদর উদ্দিন প্রথমে বিয়ে করেছিলেন গঙ্গাসাগর গ্রামে। তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে লাল চাঁন, সদর উদ্দিন, হাকিম চাঁন ও কালা চাঁন নামে চার পুত্র ও গোলাপজান ও গেদন নামে দুই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন বাহাদুরপুর গ্রামের আশরবি নামে এক মহিলাকে। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কোনো সন্তান ছিল না।

বদর উদ্দিন বয়াতি একজন বহুমাত্রিক প্রতিভার মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্‌র নাম, রসুলের নাম, ধর্ম ভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভিত্তিক পল্লিগীতি সহ কয়েকশত গান তিনি রচনা করেছিলেন। বাংলার পল্লিকবি জসীমউদ্‌দিনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বদর উদ্দিন বয়াতি বাংলা ১৩৬৫ সালের ১৮ মাঘ (ইংরেজি ১৯৫৮) রোজ রবিবার প্রজনন তন্ত্রের প্রস্টেট গ্রন্থির রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। গাঙ ধুসরিয়া নিজ বাড়িতে তাকে সমাহিত করা হয়। সেখানে তাঁর পবিত্র মাজার শরিফে প্রতি বছর ওরস অনুষ্ঠিত হয়।[৫]

খন্দকার আজাহার আলী বয়াতি

মানিকগঞ্জ জেলার অন্যতম লোকশিল্পী ও লোককবি খন্দকার আজাহার আলী বাংলা ১২৭২ সনে এবং ইংরেজি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার

www.pathagar.com

অন্তর্গত বিনাইচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খন্দকার মাইনুদ্দিন এবং মাতা এরফান বিবি। মাত্র ৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে তাঁর মা তাকে নিয়ে ১২৭৭ বঙ্গাব্দে বাবার বাড়ি তালুকনগর চলে আসেন। তালুকনগরের স্থানীয় একটি মক্তবে তাকে ভর্তি করে দেয়া হয়। মক্তবের পাঠ শিক্ষায় তাঁর মন বসে না। সে সময় তালুকনগর সহ বিভিন্ন গ্রামে পালাগান হতো। তিনি পালাগানের নাম শুনলেই পাগলের মতো ছুটে যেতেন পালাগানের আসরে। অবশেষে তিনি পালাগানের শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। বাংলা ১২৯২ সালে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে কদবিহালী গ্রামের হযরত শাহ্ নোয়াই ফকির (রঃ)-এর নিকট থেকে নানা তত্ত্ব বিষয়ে অবগত হন। তাঁর নিকট থেকেই বিচার গান, ভজন বিচ্ছেদ গান শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া তিনি নাগরপুর উপজেলার লক্ষ্মীদিয়া গ্রামের নর্তন বৈরাগীর নিকট থেকে কবিগান ও পশ্চিমবঙ্গের আসামের ধুপটি গ্রামের মহরউদ্দিন বয়াতির কাছ থেকে জারিগান শিক্ষা লাভ করেন। জারিগান শেখার পর তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে জারিগান পরিবেশন করেছেন। জারিগানের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় আলোচনায়ও তাঁর জুড়ি ছিল না। কোরান-হাদিসে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য তিনি বাংলা ১৩১৬ সনে চট্টগ্রামে চলে যান। সেখানে ফতেহপুরের বিখ্যাত আলেম, পির-ই-কামেল হযরত অছিয়ার রহমান (রঃ)-এর নিকট বায়েত গ্রহণ করেন। এমনিভাবে জীবনের ১৪টি বৎসর পিরের সেবা যত্ন করে কোরান-হাদিসের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং পরিশেষে খেলাফত প্রাপ্ত হন। এ সময় তিনি গান গাওয়া নয়, গান লেখার কাজ শুরু করেন। তিনি চট্টগামে থেকে অনেক মাইজভাণ্ডারী গান রচনা করেছেন।

আজাহার আলী চট্টগ্রাম থেকে আবার দৌলতপুর উপজেলার নিজ গ্রাম তালুকনগর ফিরে আসেন এবং সুফিবাদ, মারিফত তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে প্রচার শুরু করেন। খন্দকার আজাহার আলী শেষ জীবনে এসে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েন। কঠোর সংযমী এই সাধক ৯৫ বৎসর বয়সে বাংলা ১৩৬৭ সনের (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে) ২৪ আষাঢ় পরলোকগমন করেন। তাকে তালুকনগর নিজ বাড়িতে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বছর মাঘ মাসের ৬ তারিখে তাঁর মাজার প্রাঙ্গনে পবিত্র ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়।[৬]

ইব্রাহিম বয়াতি

ইব্রাহিম বয়াতি আনুমানিক ১২৮৬ বঙ্গাব্দে বর্তমান সিংগাইর উপজেলার সারাবিয়া গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল শেখ ছিলু ফকির। ইব্রাহিম বয়াতি স্থানীয় পাঠশালায় অল্প কিছুদিন লেখাপড়া করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন খুব মেধাবী। কোনো কবিতা বা গান একবার শুনলে সাথে সাথে তা মুখস্থ হয়ে যেতো। ইব্রাহিম বয়াতির ছোটোবেলা থেকে গান বাজনার প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। তৎসময়ে বাংলার আনাচে কানাচে জারিগানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী জারিগানের শিল্পী হবার নেশা তাকে পেয়ে বসে। অবশেষে

www.pathagar.com

বঙ্গদেশে জারিগানের জনক জুলমত আলী সরকারের শিষ্য মালিগাছ পৌরসভার কুশের চর গ্রামের তনু পেদার কাছে জারিগানের তালিম গ্রহণ করেন। তাছাড়া তত্ত্ব তালিম, হাদিস-কোরান, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য হাশেম মুন্সি নামক এক ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করতেন।

তিনি শ্রোতাদের মনোরাজ্যে ঝড় তুলে দিতে পারতেন। তার অসাধারণ ধুয়া গান আধ্যাত্ম পিপাসু মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতো। তিনি ধুয়া গান রচনায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এক সময় ক্ষেত খামারে কাজ করার সময় কৃষক-রাখাল-শ্রমিকরাও তাঁর লেখা ধুয়া গান পরিবেশন করতো। তার রচিত সেইসব ধুয়া গান আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। তাঁর লেখা একটি ধুয়া গানের আংশিক উল্লেখ করে দেওয়া হলো :

এসো আল্লাহ দীনবন্ধু ডাকি বারে বার
তুমি অধীনেরে কর দয়া ভব সিন্ধু কর পার
তোমার লীলা তুমি বুঝ, বুঝবার আছে সাধ্য কার ॥
আল্লাহ তুমি করিম, তুমি রহিম, তুমি হও জব্বার
তুমি বাইতুল্লাহকে মোজাম রেখে পাথর রাখলে শূন্যের পর
ইউসুফ রইলো কুয়ার মাঝে, তারে বসাও আবার তক্তের উপর ॥

ইব্রাহিম বয়াতি জারিগানের একজন নামকরা শিল্পী ছিলেন। তিনি জারিগানের মধ্যে হাদিস-কোরান, আল্লাহ রসুলের প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে যে চমৎকার উপস্থাপনা করতেন তা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাছাড়া পির মুরিদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন। ইব্রাহিম বয়াতি পরিবেশিত জারিগানের মধ্যে ছিল—আইয়ুব নবীর জারি, কুলসুমের মেজবানি, শহিদ কারবালা, জয়নাল উদ্ধার ও মাদার মুনির জারি প্রভৃতি। জারিগানের পাশাপাশি তিনি আল্লাহ-রসুল ও দেহতত্ত্ব বিষয়ে ধুয়া গান গাইতেন। তিনি তার ধুয়া গানের মধ্য দিয়ে এই নশ্বর দুনিয়ায় ক্ষণিক বিচরণ নিয়ে যে কথা ও সুরে গান করতেন—তাতে শ্রোতারা যেন দুনিয়ার সমস্ত মায়া মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ভিন্ন ভাব জগতে প্রবেশ করতেন। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ২৮ কার্তিক হাজার হাজার মানুষকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ৭০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। নিজ গ্রাম সারাবিয়াতে এই মহান সাধকের মাজার শরিফ রয়েছে। প্রতি বছর তাঁর ওফাত দিবসে ওরস উদ্‌যাপিত হয়।[৭]

ওস্তাদ রমেশচন্দ্র ঘোষ

ওস্তাদ রমেশচন্দ্র ঘোষ ১৮৯২ সালে ঘিওর উপজেলার পেঁচারকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বৎসর বয়স হতেই তাঁর সংগীত চর্চা শুরু হয়। তাঁর ওস্তাদ ছিলেন মহারাজ গীরিজাশঙ্কর রায়। ওস্তাদ রমেশচন্দ্র ঘোষ সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী হলেও বাদক হিসেবেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একাধারে খোল, তবলা, বেহালা, এস্রাজ, বাঁশি ও হারমোনিয়াম সহ বহু বাদ্যযন্ত্রে ওস্তাদ বলে সকলের নিকট স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হন। তাঁর খ্যাতি শুধু এই অঞ্চলেই নয়, উত্তরবঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ে। সুদূর জলপাইগুড়ি ও মুক্তাগাছার মহারাজার দরবার হতে তিনি রৌপ্যপদক লাভ করতে সক্ষম হন। রেডিও বাংলাদেশের বেতার যন্ত্রীদলে যোগদানের আহ্বান তিনি প্রত্যাখান

www.pathagar.com

করেন। কারণ, তিনি ভালোবাসতেন গ্রামের মানুষকে, পল্লির শ্যামল ও মনোরম পরিবেশ তাকে আকর্ষণ করতো। সংগীত জগতে সুনাম ছাড়াও তিনি একজন ভালো শাস্ত্রজ্ঞানী হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ওস্তাদ রবি ঘোষ সংগীত জগতের সাথে এবং কনিষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ দিলীপ ঘোষ বহুবিদ সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন। ১৯৮৩ সালে এই মহান প্রতিভার জীবনাবসান ঘটে।[৮]

আকবর আলী বয়াতি

আকবর আলী বয়াতি মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার রৌহা গ্রামে আনুমানিক ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম আলী চৌকিদার। আকবর আলী বয়াতির বাউল গানের ওস্তাদ ছিলেন সিলেট জেলার লোকশিল্পী উকিল উদ্দিন মুন্সি। আকবর আলী বয়াতি বাউল সম্রাট খ্যাত রজ্জব আলী দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, আজহার উদ্দিন টেনু বয়াতি সহ অনেক বিখ্যাত শিল্পীদের সাথে বাউল গান করতেন। ১৯৯০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।[৯]

জলিমুদ্দিন বয়াতি

জারিগানের বিখ্যাত শিল্পী ও গড়পাড়া ইমাম বাড়ি দরবার শরিফের একনিষ্ঠ খাদেম জলিমুদ্দিন বয়াতি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া ইউনিয়নের ঘোনা গ্রামে আনুমানিক ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পরশ উল্লাহ। জলিমুদ্দিন বয়াতির জারিগানের ওস্তাদ ছিলেন ভাউটিয়া গ্রামের আমেজ উদ্দিন বয়াতি। জলিমুদ্দিন বয়াতি তৎকালীন সময়ে জারিগানের বিখ্যাত শিল্পী বদর উদ্দিন বয়াতি, ইব্রাহিম বয়াতি, আফাজ উদ্দিন বয়াতি, দারগ আলী বয়াতি, মোগর আলী বয়াতি সহ অনেকের সাথে জারিগান গেয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। তবে বিশেষ করে গড়পাড়া ইমাম বাড়িতে মহররম পর্বে জারি ও মর্সিয়া গানের জন্য তাঁর প্রচুর সুখ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন গড়পাড়া ইমাম বাড়ির প্রধান শিল্পী।

জলিমুদ্দিন বয়াতি শুধু একজন জারিগানের শিল্পীই ছিলেন না, তিনি জারিগানের লেখকও ছিলেন। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে আয়োজিত বাংলাদেশ সুফি মজলিশ সম্মেলনে স্বরচিত গান গেয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে একটি চাদর ও কিছু বই সহ অন্যান্য উপহার সামগ্রী লাভ করেছিলেন।

জলিমুদ্দিন বয়াতি বাগজান গ্রামের দাগা বেপারীর কন্যা সালমা খাতুনকে বিয়ে করেন। তিন পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান রেখে ২২ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১০]

আবদুল হালিম চৌধুরী

বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গনে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব আবদুল হালিম চৌধুরী। ১৯১৮ সালে কলকাতায় এই সংগীতজ্ঞের জন্ম হয়। তাঁর বাবা আবদুল কাদের চৌধুরী কলকাতায় এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল ঢাকার

www.pathagar.com

দোহার থানার জয়পাড়া গ্রামে। পরবর্তীকালে তাদের পরিবার মানিকগঞ্জ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হন। ছোটোবেলা থেকেই আবদুল হালিম চৌধুরীর গানের প্রতি আগ্রহ জন্মে। ঢাকা মুসলিম ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি "ও মন রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ" গানটি পরিবেশন করেছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক আর তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের দুই দিকপাল যথাক্রমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুর সম্রাট আব্বাস উদ্দিন। বালক হালিমের গানে মুগ্ধ হয়ে শেরে বাংলা তাকে একটি রৌপ্য পদক উপহার দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে সংগীত শিল্পী হিসেবে গান পরিবেশন করেন। আবদুল হালিম চৌধুরী ১৯৪০ সালে ঢাকায় এসে কয়েক বৎসর অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম করেন। ১৯৪০ সালে প্রথম দিকে কবি জসীমউদ্‌দীন-এর অনুরোধে Song Publicityতে যোগদান করেন এবং কবি জসীমউদ্‌দীন-এর বহু গানে কণ্ঠ দান করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি মানিকগঞ্জে চলে আসেন এবং ঢাকা রেডিও স্টেশনে সংগীত প্রযোজক হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি ১৯৪২ সালে খালাত বোন শামসুন নাহার বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আবদুল হালিম চৌধুরী সংগীত শিল্পীর তুলনায় সুরকার হিসেবেই অধিকতর সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সুর করা গানের সংখ্যা দু হাজারেরও অধিক। দেশ বরেণ্য বহু শিল্পী তাঁর সুর করা গান গেয়েছেন এবং সে গানগুলো অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠানের সুরকার হিসেবে কাজ করেন। এ সময়ে চট্টগ্রাম বেতার প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে তিনি প্রধান সংগীত প্রযোজক হিসেবে যোগদান করেন। পরে ১৯৭২ সালে ঢাকা বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে প্রধান সংগীত পরিচালক থাকাকালীন সময়ে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সংগীতে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য তিনি ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে একুশে পদক, ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ লেখক কল্যাণ সংস্থা পুরস্কার এবং ১৯৮৬ সালে নেধুশাহ একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। মানিকগঞ্জ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা ২০০১ সালে তাকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি ১৯৯০ সালের ২৭ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।[১১]

মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন (টেনু বয়াতি)

মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন (টেনু বয়াতি) ১৩২৬ সনের আশ্বিন মাসে মানিকগঞ্জ সদর থানায় পুটাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল গনি। পুটাইল প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এবং মানিকগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। কিশোর বয়সে টেনু বয়াতি টাঙ্গাইল জেলার মোহাম্মদপুর থানার চামারি ফতেপুর গ্রামের কাদেরিয়া তরিকার সুফি সাধক এবং বিচারগানের বিখ্যাত

www.pathagar.com

শিল্পী ওস্তাদ গোলাম মওলা-এর কাছে বাউল গান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ওস্তাদের কাছে একাগ্র নিষ্ঠার সাথে বাউল গান শিক্ষা গ্রহণ করে মাত্র পনেরো বৎসর বয়স থেকে তিনি পালাগান বা বিচারগান গাওয়া শুরু করেন। টেনু বয়াতি দোতারা বাজিয়ে গান করতেন। অল্প লেখাপড়া জানা এই শিল্পী অনর্গল কথা বলে যেতেন কোরান-হাদিস-শরিয়ত-হাকিকত-মারেফত বিষয়ে। তার উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি অনেক জটিল-কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন।

আজাহার উদ্দিন নিজে শুধু শিল্পীই ছিলেন না, তিনি অনেক বাউল শিল্পী তৈরিও করেছিলেন। তিনি অনেক বাউল গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু সে সব গান কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। টেনু বয়াতি তার সুদীর্ঘ সংগীত জীবনে দেশের অনেক বড়ো বড়ো শিল্পীর সাথে পালাগান করেছেন। তিনি একজন খেলাফত প্রাপ্ত পিরও ছিলেন।

১৯৯৬ সালে এই গ্রন্থের প্রধান সমন্বয়কারীর সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, "একবার রনদা প্রসাদ সাহার মেয়ের জামাই ব্যারিস্টার শওকত আলী বাড়িতে গানের আসরের ব্যবস্থা করেন। একফানা কলা ও একশত টাকার নোট ঝুইলা রাখছিল। যে জিতবে সে টাকা নিয়ে যাবে। যে হারবে সে কলা খাবে। গান আরম্ভ হওয়ার আগেই আমরা দুইদল কলা খাইয়া ফেলি। বৃন্দাবনের সঙ্গে গান হয়। ও বলছিল আমাকে যদি গানে হারাইয়া দিতে পারে তাহলে আমার নিকট তার নাতিন বিয়া দিবে। হিন্দুতত্ত্ব ও মুসলমানতত্ত্ব নিয়ে দুইজনের মধ্যে তর্ক হয়। আমি মুসলমানের পক্ষে এবং বৃন্দাবন-ঠাকুর হিন্দুর পক্ষে। আমি জিজ্ঞাসা করি রামায়ণে বাল্মিকি রামচন্দ্র ও সীতার জন্মের ষাট হাজার বছর পূর্বে রামায়ণ রচনা করেন। তাহাতে লিখেছিল সীতা অসতী। সেই সীতার জন্মের পরে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হয়। রামের সীতাকে রাবণ রাজা হরণ করে নিয়ে যায়। সেথা হইতে রাম, লক্ষণ, হনুমান যুদ্ধ করে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। অবশেষে সীতা অগ্নি পরীক্ষা দেয়, তাতে সতী বলে প্রমাণিত হয়। ইহার মধ্যে বাল্মিকি মুনি কি মিথ্যা, নাকি রামায়ণ মিথ্যা, নাকি সীতা মিথ্যা? তিনটার কোনটা মিথ্যা? ঠাকুর মিথ্যা হলে পূজা পার্বণে ঠাকুরকে ডাকা হবে না, রামায়ণ মিথ্যা হলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মিথ্যা, রাম মিথ্যা হলে ভগবান মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সীতা মিথ্যা হলে আদ্যাশক্তি মিথ্যা হয়। আমার প্রশ্নের উত্তর বৃন্দাবন ঠাকুর দিতে পারেন না। আসরে জোড় হাত করে তিনি দর্শক শ্রোতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বৃন্দাবন ঠাকুর আসর শেষে আমাকে বলেন যে, আমি মুখ দিয়ে যা বলেছি তা করব। আমার নাতিন তোমার নিকট বিয়ে দিব। এই আসরের মাস খানেক পর বৃন্দাবন ঠাকুর তার নাতিন ভাগ্যরাণীকে আমার নিকট বিয়ে দেন। বিয়ের পর ভাগ্যরাণীর নাম রাখা হয় ভানুবিবি। বর্তমানে তিনি আমার স্ত্রী। আমার এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।"

মানিকগঞ্জের এই প্রখ্যাত গুণী শিল্পীকে ঢাকাস্থ মানিকগঞ্জ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক পরিষদ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে সংবর্ধনা প্রদান করে এবং ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ বাউল শিল্পী কল্যাণ পরিষদ তাকে স্বর্ণ পদক প্রদান করে। আজীবন সংগীতের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দিয়ে অবশেষে কয়েক বৎসর আগে এই গুণী শিল্পী ইন্তেকাল করেন।[১২]

www.pathagar.com

মজনু মিয়া

মজনু মিয়া মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ইজদিয়া গ্রামে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পল্লির মাটি ও মানুষের গান সংগ্রহ করে অত্যন্ত দরদ দিয়ে তিনি গান করতেন। তিনি দীর্ঘ দিন পল্লিগীতির শিক্ষকতাও করেছেন। মজনু মিয়া একজন লোককবিও ছিলেন। আজীবন লোকসংগীত প্রেমিক এই গুণী শিল্পী অনেক লোকশিল্পী তৈরি করে গেছেন যারা আজ প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। পল্লিগানের এই গুণী শিল্পী আনুমানিক ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১৩]

মোমতাজ আলী খান

মোমতাজ আলী খান ১৯২০ সালের ১ আগস্ট মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার ইরতা-কাশিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফসার আলী খান এবং মাতা বেদৌরা খাতুন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি গান গাওয়া শুরু করেন। তিনি ভারতের 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত ওস্তাদ নেসার হোসেনের কাছে দীর্ঘদিন উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন। সঙ পাবলিটিস, আকাশবাণী, মেগাফোন কোং, হিজ মাস্টার ভয়েজ (H.M.V) কোং সবখানেই তিনি নিজের শিল্পী প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি ১৯৪৩ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তান রেডিওতে উচ্চ পদে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি পি.আই.এ আর্টস একাডেমিতে যোগদান করেন। তিনি সংগীত শিল্পী হিসেবে ১৯৬২ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার গৌরব বয়ে নিয়ে আসেন। এছাড়াও তিনি ইংল্যান্ড, বার্মা, মালয়েশিয়া, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে সংগীত পরিবেশন করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল মুহূর্তে তাঁর রচিত –"বাংলা মায়ের রাখাল ছেলে বাঁশি দিল টান, শোন ভাই হিন্দু মুসলমান" এবং "বাংলাদেশের মাটি ওগো তুমি আমার জন্ম স্মৃতি" প্রভৃতি গান স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করে। শিল্পী নিজে প্রায় তিরিশ বৎসর গান গেয়েছেন। এছাড়াও তিনি বহু চলচিত্রে গায়ক, সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও কাজ করেছেন। সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৮০ সালে তিনি ২১শে পদক পান। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, কালু শাহ সংগীত পুরস্কার, গীতিকবি সংসদ পুরস্কার, লেখক কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনা ও ট্রফি, পতাকা পদক, জাতীয় রবীন্দ্র পরিষদ সম্মাননা পদক ইত্যাদি লাভ করেন। মানিকগঞ্জ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ ঢাকা সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য ২০০১ সালে তাকে মরণোত্তর পুরস্কার ও সংবর্ধনা প্রদান করে। এছাড়া লালন একাডেমী এবং নজরুল একাডেমীও তাকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করে।

ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান ৬৪ সালে টিভির জন্মলগ্ন থেকে এবং রেডিওতে আমৃত্যু নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংগীত বিভাগের প্রধান হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা বিভাগের

www.pathagar.com

লোকসংগীত পরীক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি ছায়ানটের লোকসংগীতের প্রধান ছিলেন আমৃত্যু। ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।[১৪]

ওসমান খান

বাংলার সংগীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ওসমান খান ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার করিমকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। কোথাও যাত্রাগান, পালাগান বা জারিগানের আসর হলেই সেখানে ছুটে যেতেন তিনি। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা তাকে ঢাকার আহমদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। দু-এক বৎসর পরই তিনি মাদ্রাসা ত্যাগ করে কলকাতায় মামার কাছে চলে যান। এরপর স্থান বদল করে আলিপুরে ফুফুর বাসায় উঠেন। সেখানে এক চাচাতো ভগ্নীপতি তাকে কেওড়া তলায় মন্টু মাস্টারের কাছে গান শেখার সুযোগ করে দেন। তিন বৎসর সেখানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেবার পর সর্বভারতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং পল্লিগীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু সাহেব খুশি হয়ে ওসমান খানকে নিজেই অতি যত্নের সঙ্গে তালিম দিতে থাকেন। ১৯৪২ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্র থেকে ওসমান খানের কণ্ঠে "তোর লাগি পরান কান্দেরে, পরানের বন্ধু" গানটি প্রচারিত হয়। এরপর শুরু হয় তাঁর বেতারে নিয়মিত গান গাওয়া। মালদহের মহারাজার বাড়িতে বহু গুণী শিল্পীর সমাবেশে এক সংগীতানুষ্ঠানে একমাত্র ওসমান খানই স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। হিস মাস্টার্স ভয়েজ ও কলম্বিয়া রেকর্ডে নিজের কণ্ঠে এবং অন্যান্য অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর কণ্ঠে ওসমান খানের লেখা ও সুরে অনেক গান বের হয়েছে। এছাড়া চলচিত্রেও তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন। এই গুণী শিল্পী ১৯৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন।[১৫]

রাধা বল্লভ সরকার

রাধা বল্লভ সরকার মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের বাইতরা হিন্দু প্রধান গ্রামে ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কেশব চন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। রাধা বল্লভ কৈতরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণি পাস করেন। এরপর কিশোর রাধা বল্লভ বাইতরা গ্রামেই এক বড়ো ব্যবসায়ীর পাটের ব্যবসার নৌকায় হিসাব রক্ষকের চাকরি নেন। এই সময় তিনি গান বাজনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু তাঁর গানের গলা ভালো ছিল না। তিনি নৌকার হিসাব নিকাশের চাকরি ছেড়ে দিলেন। অবশেষে বাবা কেশব চন্দ্র বিশ্বাস ছেলেকে কবিগান শেখাবার জন্য ঘিওর উপজেলার মাইজখাড়া গ্রামের তৎকালীন বিখ্যাত কবিগানের সরকার কবি ভাষান সরকারের কাছে নিয়ে গেলেন। ভাষান সরকারের সাথে থেকেও তাঁর কণ্ঠের কোনো উন্নতি হলো না। অবশেষে ভাষান সরকার একদিন রাগান্বিত হয়ে রাধা বল্লভকে ঘরের বারান্দা থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিলেন। এরপর নিজের বাড়ি

www.pathagar.com

বাইতরা এসে বাবাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। কেশব বিশ্বাস ছেলেকে নিয়ে আবার ভাষান সরকারের কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করে ছেলেকে গান শেখাতে বললেন। ভাষান সরকার আবার তাকে গ্রহণ করলেন এবং যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কবিগানের টপ্পা, ধরতি টপ্পা, কাটতি টপ্পা, পাঁচালি, একতালা, মুখছড়া এবং বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্ব ও শাস্ত্রীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলেন। এভাবে শিক্ষা শেষে নিজ বাড়িতে এসে কবিগানের দল গঠন করেন। খোদার অপার মহিমায় প্রায় ৩৫ বছর বয়সে হঠাৎ তাঁর গলায় সুমধুর কণ্ঠের সৃষ্টি হয়। তাঁর শেষ জীবনে গানের গলা ও কথা এতো শ্রুতিমধুর ছিল যে, তা বলাই বাহুল্য। ধামরাইয়ের নরসিংপুরের তৎকালীন বিখ্যাত কবিয়াল উপেন্দ্র সরকারের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি সারা বাংলায় কবিগান গেয়ে বেড়িয়েছেন।

রাধা বল্লভ সরকারের প্রথম জীবনে সানবান্ধার সুরেন সাধুর নিকট ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পরে সুরেন সাধু নিজে রাধা বল্লভকে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত হিন্দু সাধক দয়াল পূর্ণ চাঁদের ভক্ত করিয়ে দেন। তিনি দয়াল পূর্ণ চাঁদের নিকট আধ্যত্মতত্ত্বের নিগূঢ় বিষয়ে অবগত হন। তাছাড়া স্বীয় গুরুর কাছ থেকে ভজন গান শিখেন এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ গান লেখার কৌশল শিক্ষা লাভ করেন। কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনায় ও গানের আসরে সর্বত্র তিনি তাঁর গুরুকে স্মরণ করতেন। সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর গুরু দয়াল পূর্ণ চাঁদ ও তার স্ত্রী ছিল তার ভরসা। গুরুর প্রতি তাঁর যে ভক্তি ও প্রেম ছিল তিনি তা তাঁর লেখা অনেক গানের মধ্যে প্রকাশ করে গেছেন। তিনি কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন—

"পূর্ণ ভরসা কেবলং"

রাধা বল্লভ সরকার কোরান-হাদিস ও পুরাণসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কবিগানের সম্রাট ছিলেন। বাংলায় কবিগানের চরম উৎকর্ষ তাঁর মাধ্যমে ঘটেছিল। তিনি আধ্যাত্মিক চেতনা সমৃদ্ধ অসংখ্য মূল্যবান গান রচনা করে গেছেন। আজো বিভিন্ন বাউল গানের আসরে রাধা বল্লভের সেইসব মূল্যবান গান পরিবেশিত হয়। তিনি তাঁর গান লেখার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ও সাধন-ভজনের সূক্ষ্ম কঠিন বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তিনি দেখতে ছিলেন কালো, গোলাকার মুখ, মায়াবী চেহারার মানুষ। তাঁকে দেখলেই সবার ভালো লেগে যেত। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁর বাড়িসহ ২০/২৫টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার নিজ পৈতৃক ভিটা বাইতরা গ্রামে তিনি আগের চেয়ে উন্নত ঘর বাড়ি নির্মাণ করেন। কিন্তু ১৯৭২ সালে তাঁর শিষ্য সাইদুর রহমান বয়াতিকে তাঁর গানের পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে হঠাৎ একদিন রাতের অন্ধকারে পুত্র শ্যামপদ, স্ত্রী সরস্বতী ও মাকে নিয়ে ভারত চলে যান। সেখানে পশ্চিম দিনাজপুরের কালকিনি গ্রামে বসতবাড়ি গড়ে তোলেন। ভারতে গিয়ে তিনি আর গান বাজনা করেননি। এই খ্যাতিনামা গীতিকার ও সাধক কবি ১৩৯০ বঙ্গাব্দের ২১ জ্যৈষ্ঠ স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে ইহধাম ত্যাগ করেন।[১৬]

www.pathagar.com

গিয়াস উদ্দিন শিকদার (গেন্দু বয়াতি)

গিয়াস উদ্দিন শিকদার (গেন্দু বয়াতি)-এর জন্ম ১৯২৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার অন্তর্গত হারুকান্দি ইউনিয়নের নারায়ণকান্দি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছমির শিকদার। তিনি পাটগ্রাম অনাথ বন্ধু পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি মহর বয়াতি ও সতীশ সরকারের কাছে গানের তালিম নিয়ে সংগীত চর্চা শুরু করেন। শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও সংগীত সাধনায় তাঁর কোনো বিরাম ছিল না। তিনি পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশনের 'এ' গ্রেডের শিল্পী ছিলেন। গেন্দু বয়াতি বেশ কয়েকবার রেডিও পাকিস্তানের পল্লিগীতির প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ও প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন। স্বাধীনতার পরও তিনি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সংগীত পরিবেশন করে পল্লি মানুষের মনে 'জারি সম্রাট' হিসেবে স্থান করে নেন। তিনি সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগীত পরিবেশন করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। সুদীর্ঘ কাল সংগীত সাধনার পর ১৯৯২ সালের ২৪ শে নভেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।[১৭]

মনিরুদ্দিন ওরফে মধু বয়াতি

মনিরুদ্দিন ওরফে মধু বয়াতি মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার জয়মন্ডপ ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাকুম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলম বেপারী। আলম বেপারীর তিন পুত্রের মধ্যে বড়ো পুত্র ছিলেন মধু বেপারী। তাঁর ভালো নাম ছিল মনিরুদ্দিন। কিন্তু বাউল গানের শিল্পী হবার পর তাঁর আসল নাম ও বংশীয় খেতাব 'বেপারী' ঢাকা পড়ে গিয়ে শুধু মধু বয়াতি হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

মধু বয়াতি ছোটোবেলা থেকেই কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে এলাকার বিভিন্ন গানের আসরে যোগদান করতেন। তাঁর গানের গলাও ছিল খুব ভালো। তাই বিভিন্ন যাত্রাপালায় বিবেকের অভিনয় করার জন্য তাঁর ডাক পড়তো। গান পাগল কিশোর মধু বয়াতি মাত্র ৮/৯ বৎসর বয়সে গানের দলে যোগদান করেন। তাছাড়া পরিণত বয়সে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন ভাব-বৈঠকি গানের একজন বিশিষ্ট গায়ক হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। বিশেষ করে আদি ভাব-বৈঠকি গান পরিবেশনে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর দরাজ কণ্ঠের সুর ব্যাঞ্জনায় ভাব-বৈঠকি গানের শ্রোতারা ভাবাবেগে আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়তেন। তাঁর ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি। একবার একটি গান শুনলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুখস্থ করতে পারতেন। নাটক বা যাত্রার সংলাপ তাকে কোনো দিন লিখে মুখস্থ করতে হয়নি। 'বই মাস্টার' রিহার্সেলের সময় যা বলে দিতেন তা সাথে সাথে তাঁর মাথায় গেঁথে যেত। মানিকগঞ্জে যত প্রকার লোকসংগীত ছিল তার সবই তিনি গাইতে পারতেন।

মধু বয়াতি সিংগাইর উপজেলার ধল্লা গ্রামের বিখ্যাত সাধক ও বাউল সংগীত শিল্পী ইউসুফ আলী দেওয়ানের কাছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও বাউল গানের শিক্ষা গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মধু বয়াতি একসময় গ্রাম-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে বাউল গান করেছেন। শেষ জীবনে এসে তিনি বাউল গানের শিল্পী সৃষ্টিতে বেশি মনোযোগ দেন। তাঁর অত্যন্ত স্নেহের কন্যা মমতাজকে তিনি ছোটোবেলা থেকেই গানের তালিম দিতে থাকেন। বর্তমানে মমতাজ বেগম একজন বিশ্ববরেণ্য লোকসংগীত শিল্পী। শুধু মেয়ে মমতাজকে নয়, তিনি তাঁর চারপাশের অনেক ছেলে মেয়েকে গান বাজনা শেখাতেন। বিশেষ করে বাউল গানকে সমৃদ্ধ করতে তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। এই গুণী শিল্পী ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর সোমবার ঈদ-উল-আযহার দিন ইন্তেকাল করেন।[১৮]

ইউছুব আলী বয়াতি

ইউছুব আলী বয়াতি মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার গাজিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তার পিতার নাম ছিল মোঃ জৈনুদ্দিন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। অভাব অনটনের জন্য লেখাপড়া করতে পারেন নি। তিনি জারিগানের বিখ্যাত গায়ক লেহাজ উদ্দিন বয়াতির (ধল্লা) বাড়িতে রাখালের কাজ করতেন। রাখালের কাজ করার সময় গানের জগতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে নয়ারহাট ছয়বারিয়া (বংশাই) গ্রামের জারিগানের বিখ্যাত গায়ক দারোগ আলী বয়াতির নিকট জারিগান শিখেন। তখন তাঁর বয়স ১৭ বৎসর হবে। বিচারগান শিখেন বামনশুরের খালেক দেওয়ানের নিকট। গানের জগতে থাকাকালীন গাজীপুর বরিয়াবর দরবার শরিফে সৈয়দ ঢলু চানের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স বয়স ২০ বৎসর হবে। খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে অগণিত ভক্তকে মুরিদ করেন। তাঁর মুরিদের সংখ্যা আনুমানিক দুই হাজার। মানিকগঞ্জ, হরিরামপুর, নবাবগঞ্জে তাঁর অসংখ্য মুরিদ রয়েছে।

৩০শে বৈশাখ তাঁর ওফাত দিবস উপলক্ষে ওরস পালন করা হয়। সেখানে মিলাদ মাহফিল ও তাঁর রচিত ভক্তিমূলক গান পরিবেশিত হয়। গরু, মহিষের মাংস দিয়ে বিরিয়ানি পাক করা হয় এবং দুধ, চিনি, চাল দিয়ে শিরনি তৈরি করা হয়। ভক্তবৃন্দ ওরসের আয়োজন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যারা গানের জগতে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের মধ্যে হায়দার আলী দেওয়ান (শাহরাইল), লাল মিয়া (গাজিন্দা), মধু বয়াতি (জয়মন্টপ) এবং বর্তমান প্রজন্মের গায়ক রাজ্জাক বয়াতি, ইব্রাহিম বয়াতি, তৈয়ব আলী বয়াতি (তাঁর ছেলে)। ইউছুব আলী বয়াতির ছোটো ভাই জন্মান্ধ সাহেব আলী বিখ্যাত ঢোল বাদক ছিলেন। হারমোনিয়াম বাজাতেন ছাবেদ আলী (ফুটনগর)। দোহারদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন নোয়াব আলী ও আশেক আলী। সাইদুর রহমান বয়াতি ও ইউছুব আলী বয়াতি জোটকে অসংখ্য গান গেয়েছেন। ইউছুব আলী বয়াতি গান গেয়ে অনেক মেডেল পেয়েছেন। স্মৃতিচারণ করে তাঁর একমাত্র ছেলে তৈয়াব আলী বলেন, "আমার আব্বা ছিলেন উদাসীন, উদার ও দানশীল মানুষ। এখানকার মানুষ তাঁকে আব্বা বলতেন। বিচার-সালিশে ডাকতেন। তিনি ছিলেন সৎ চরিত্রের অধিকারী একজন মহান মানুষ।"

www.pathagar.com

সাইদুর রহমান বয়াতি বলেন, "তাঁর চেহারা ছিল মায়াদার, মুখের গড়ন মেয়েলি। দাঁড়ি মোছ কোনোদিন গজায়নি। হরিণ হরিণ দু'টি চোখ। উনার গান শুনে দর্শক শ্রোতা কেঁদে ফেলত।"

তাঁর রচিত 'সুজন বন্ধুরে', 'ঘষে জ্বলে তুষের অনল জল ঢালিলে নিভে না', 'প্রাণে ধৈর্য মানে না' কলের গানে রেকর্ড করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই গানের ক্যাসেট পাওয়া যায় না। তিনি প্রায় আড়াইশত গান রচনা করেছেন।[১৯]

বজলু দেওয়ান

এক সময়ের জনপ্রিয় বাউল সংগীত শিল্পী বজলু দেওয়ান আনুমানিক ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের ঘোস্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম টেনুর উদ্দিন দেওয়ান ও মাতা আদুরী বিবি। তিনি ঘোস্তা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি এবং খাবাশপুর লাবণ্যপ্রভা উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে কৃষিকাজ করতেন এবং ওস্তাদ আজাহার বয়াতির কাছে বাউল গান শিখতেন। দীর্ঘদিন ওস্তাদের কাছে বাউল সংগীতে তালিম নেবার পর বাউল গান শুরু করেন। তিনি দীর্ঘদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পালা গান করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। বজলু দেওয়ান ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে পরলোক গমন করেন।[২০]

মোহাম্মদ চান মিয়া

মোহাম্মদ চান মিয়া বাংলা ১৩৪৩ সালের চৈত্র মাসে মানিকগঞ্জ পৌরসভাধীন পূর্ব দাশড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মোহাম্মদ শফিউদ্দিন বেপারি এবং মা বিবিজান। তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। লালিত পালিত হন নানা-নানির নিকট। ছোটোবেলা থেকেই গান পছন্দ করতেন। তার বয়স যখন ৯/১০ বৎসর তখন তার পিতা শখ করে একটি গ্রামোফোন কিনেন। সেখান থেকেই বিভিন্ন শিল্পীর গান শুনে তিনি গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার সবচাইতে ভালো লাগতো আব্বাস উদ্দিনের পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, ও মুর্শিদি। তবে গানের চেয়ে গানের মধ্যে যে দোতরার সুর বেজে উঠতো সেই সুর তাকে পাগল করে তুলতো। সেই থেকে দোতরা বাজিয়ে গান গাওয়ার নেশা তাকে পেয়ে বসে। হাসেম আলী নামে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি দোতরা বাজিয়ে ভালো পল্লিগীতি গাইতেন। এই হাসেম আলীর কাছেই চান মিয়া দোতরা বাজানোর হাতেখড়ি হয়। তারপর বেতার শিল্পী ফেলু শেখের নিকট দোতরা বাজানোর তালিম নেন। তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত দোতরা বাদক কানাই শীল-এর কাছেও প্রায় দশ বৎসর দোতরা বাজানো শেখেন। পরে তৎসময়ে বাংলাদেশ রেডিওতে দোতরা ও পল্লি গানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি রেডিওতে তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। তাছাড়া চান মিয়া কণ্ঠ সংগীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান, ওসমান খান ও আব্দুল হালিম চৌধুরীর নিকট। লোক শিল্পী চান মিয়া দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর বাংলাদেশ বেতারের দোতরা বাদক হিসেবে কাজ

www.pathagar.com

করেছেন। বাংলার প্রখ্যাত লোকশিল্পী আব্দুল আলীম, মোস্তফা জামান আব্বাসী সহ বহু গুণী শিল্পীদের সাথে তিনি দোতরা বাজিয়েছেন। পল্লি কবি জসীমউদ্‌দীনও তার দোতরার সুরে মুগ্ধ হয়েছেন বহুবার। চান মিয়া সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন।

চান মিয়া ছিলেন লোকসংস্কৃতি চর্চা ও অনুশীলনের একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মানিকগঞ্জে গড়ে উঠেছিল আব্বাস উদ্দিন শিল্পীগোষ্ঠী। তিনি ছিলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। চান মিয়া এক ছেলে ও সাত কন্যার জনক। তাঁর মেজো মেয়ে জেসমীন আক্তার পিতার কাছ থেকে দোতরা বাজানো শিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

চান মিয়া দোতরা বাদক হিসেবে অনেক পদক, মেডেল ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এই গুণী শিল্পী ৬ মে ২০০৪ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন।[২১]

হাসেম আলী বয়াতি

হাসেম আলী বয়াতি আনুমানিক ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ঘিওর উপজেলার নালী ইউনিয়নের কলতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাছাই ফকির। কাছাই ফকির ভালো মুর্শিদি গান করতেন। হাসেম আলী বয়াতি পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই লোকসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি সারিন্দা বাজিয়ে গান করতেন। তাঁর দরদী কণ্ঠের গান আর মিষ্টি মধুর কথায় সবার মন ভরে যেত। হাসেম আলী বয়াতির আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন কলতা গ্রামের বিখ্যাত সাধক বোরহানুল আলম আল চিশতি। হাসেম আলী বয়াতি একজন খেলাফত প্রাপ্ত পিরও ছিলেন। তাঁর অনেক ভক্ত রয়েছে। মানিকগঞ্জ সদর থানার বগজুরি গ্রামে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর কোনো পুত্র সন্তান নেই তবে কন্যা সন্তান রয়েছে। এই বিখ্যাত সাধক ও লোকশিল্পী ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন।[২২]

রশিদ সরকার

রশিদ সরকার ১৯৫৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সিংগাইরের আজিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আইনুদ্দিন পত্তনদার। মায়ের নাম রূপজান বেগম। রশিদ সরকার-এর বড়ো ছেলে শফিউল বাশার বলেন, "বাবার নানা হজরত আলী মাতবর বৈঠকি গানের নামকরা শিল্পী ছিলেন। তাঁর হাত ধরে বাবা গানের জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার যন্ত্রাইল গ্রামের বিখ্যাত মরমি গায়ক আনোয়ার দেওয়ানের নিকট লোকসংগীত, মরমি সংগীতের তালিম নেন। তখন তাঁর বয়স ১৫/১৬ বৎসর হবে। পরবর্তীতে তিনি গাজীপুরের বইরাবর দরবার শরিফের পির সৈয়দ গোলাম মওলা রেজভীর নিকট বায়েত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি ২০০৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৮ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।"[২৩]

www.pathagar.com

বর্তমানে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আজিমপুরে তাঁর ফকির মওলা দরবার শরিফে পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়। পাগলা রশিদ, ফকির রশিদ, বাউল রশিদ নামে তিনি সমধিক পরিচিত। প্রথম জীবনে তিনি রজ্জব দেওয়ানের সঙ্গে গান করেছেন। তাছাড়া মাতাল রাজ্জাক, মালেক দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মাখন দেওয়ানের সঙ্গে গান করেছেন। তাঁর রচিত ৪৫০টি গান সংগ্রহে আছে।

তাঁর দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলেরা হলেন, শফিউল বাশার (৩৩), মেহেদী হাসান (১৮) ও কন্যা তানাকা। উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ রশিদ সরকার একজন সমাজ সচেতন সাধক ও লোককবি। তিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাঁর দাদা ও বাবা কৃষিকাজ করতেন। তিনি ছিলেন একজন বৃক্ষ প্রেমিক। এছাড়াও তিনি মৎস্যচাষ করতেন। তিনি একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়িতে আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেলের বাগান রয়েছে। বাগানের মাঝখান রয়েছে একটি বড়ো পুকুর। পুকুরের পাড়ে গরু ও মহিষের খামার। বাড়ির দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ।[২৪]

চাঁন মিয়া বয়াতি

মানিকগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জারি, সারি, মুর্শিদি, গাজীর গান ও যাত্রাপালা সহ লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে কাজ করে গোটা জীবনটাই যিনি কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁর নাম চাঁন মিয়া বয়াতি। চাঁন মিয়া বয়াতি সাটুরিয়া উপজেলার চর ধানকোড়া গ্রামে আনুমানিক ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাশেম আলী সরকার ও মাতা লায়লী বেগম। ছোটোবেলা থেকেই চাঁন মিয়া গান বাজনা করতেন। মানিকগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী গাজীর গানের তিনি একজন ভালো গায়েন ছিলেন। তাছাড়া ভাববৈঠকি গান এবং যাত্রাপালার গানও তিনি করতেন। বর্তমানে বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়েছেন। এই লোকশিল্পী আজো গানের কথা নিয়ে ভাবেন এবং নতুন শিল্পীদের গান বাজনা শিখিয়ে থাকেন। তিনি দুই ছেলে এবং তিন মেয়ের জনক।[২৫]

দবির উদ্দিন বয়াতি

মানিকগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জারিগানের শিল্পী দবির উদ্দিন খান ·(দবির বয়াতি) মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার উত্তর আড়া গ্রামে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো. ইছাক খান। দবির বয়াতি মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পারিবারিক কারণে তাকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাজের সন্ধান করতে হয়। তিনি ঘিওর বাজারে একটি দর্জির দোকানে কাজ নেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি জারিগান চর্চা করতেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি জারিগান গাওয়া শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি জারিগানের শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি মানিকগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলা ও টাঙ্গাইলের নাগরপুরে জারিগানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন। নিজ জেলার বাইরে ফরিদপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, ঢাকা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি গান পরিবেশন করেছেন।

www.pathagar.com

দবির উদ্দিন বয়াতি শুধু জারিগানের শিল্পীই ছিলেন না, তিনি গান রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জারি, সারি, মুর্শিদি, মারফতি সহ অনেক মূল্যবান গান তিনি রচনা করে গেছেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জাগরণীমূলক গান রচনা ও পরিবেশন করে গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন এই লোকশিল্পী।[২৬]

আয়নাল মিয়া আল চিশতী

আয়নাল বয়াতি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বোয়ালিয়া থানার প্রেমতারা, সাতইর গ্রামে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম মিয়া চিশতী ও মাতা আবিরন্নেছা। আয়নাল বয়াতি স্থানীয় সাতইর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর কিশোর আয়নাল তৎকালীন পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। নয় বৎসর চাকরি করে তিনি পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি চলে আসেন। এরপর বাউল গান শেখার প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে নিজ গ্রামের বাউলগানের শিল্পী ইয়াছিন মিয়ার শরণাপন্ন হন। তিনি ওস্তাদ ইয়াছিন মিয়ার কাছে মাত্র দেড় বৎসর গান বাজনা শেখার পর এককভাবে বাউলগান গাইতে শুরু করেন।

দেশের প্রখ্যাত এই বাউল সংগীত শিল্পী বাউলগানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অনেক নতুন শিল্পী সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে নব্বই বৎসর বয়সেও দেহ-মন-সুর-তাল-লয় অটল রেখে তিনি গান গেয়ে চলেছেন। সকল ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয়টি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাউলগানের মঞ্চে উপস্থাপন করেন। আয়নাল বয়াতি জীবনে গান গেয়ে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি টাঙ্গাইলের বিখ্যাত রণদা প্রসাদ সাহার বাড়িতে গান করে স্বর্ণের মেডেল পেয়েছিলেন। তাছাড়া ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ মাদার ফাউন্ডেশন আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাউল সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য ক্রেস্ট ও প্রশংসাপত্র লাভ করেন। আয়নাল বয়াতি দুটি বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে এক ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। এই প্রবীণ ও গুণী শিল্পী বর্তমানে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ইন্তাজগঞ্জ ইউনিয়নের হাপানিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।[২৭]

গর্জন আলী বয়াতি

গর্জন আলী বয়াতি আনুমানিক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১৩৩২ সনে) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কাটিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ সাগের আলী এবং মাতা ছিবারণ বেগম। গর্জন আলী বয়াতি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। পরিবারে গান বাজনার চর্চা না থাকলেও গর্জন আলী ধীরে ধীরে মরমিবাদ ও বাউল গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে মানিকগঞ্জ সদরের রৌহাদহ গ্রামের বিশিষ্ট জ্ঞান তাপস ও সাধক হযরত আদালত হোসেন ওরফে এদেল মুন্সী (রঃ)-এর সংস্পর্শে এসে শরিয়ত, হকিকত, তরিকত ও মারিফত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এদেল মুন্সী গান বাজনা পছন্দ করতেন এবং নিজেও অনেক মাহফিলে গান গাইতেন।

www.pathagar.com

গর্জন আলী বয়াতি তাঁর গুরু এদেল মুন্সীর কাছ থেকেই গান বাজনা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং এক সময় তিনি বাউল গান ও বিচার গান গাইতে শুরু করেন। তিনি লেখা পড়া না জেনেও যেভাবে হাদিস-কোরান-বেদ-পুরাণ-উপনিষদ প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিতেন তা ছিল শ্রোতাদের কাছে বিস্ময়কর। তৎসময়ে দেশের সকল বিখ্যাত বাউল শিল্পীর সাথেই তিনি গান করেছেন। প্রায় তিরিশ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৯৮২ সালের দিকে তাঁর গুরুর নির্দেশে তিনি গান বাজনা ছেড়ে দেন। গর্জন আলী বয়াতি বর্তমানে পুরোপুরি একজন আধ্যাত্মিক সাধক। তিনি দুই পুত্র–বিল্লাল হোসেন ও বাবুল হোসেন এবং দুই কন্যা সন্তানের জনক।[২৮]

নূরুন্নেহার বেগম

১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানার হোগলাকান্দি গ্রামে শিল্পী নূরুন্নেহারের জন্ম। তাঁর পিতার নাম নজিবত খাঁ এবং মাতা বেগম হামিদুন নেসা। বাবা বরিশালের আদালতে পেশকারের চাকরি করতেন। তৎকালীন সময়ে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে মেয়েদের সংগীত চর্চা ছিল প্রায় অসম্ভব ঘটনা। তবে গানের গলা ভালো ছিল বলে নূরুন্নেহারকে পাড়াপড়শিদের বাড়িতে গান গাইতে হতো। সবাই তাকে উৎসাহ দিত; সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিতেন তাঁর মামা কবি জসীমউদ্দীন।

মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে নূরুন্নেহারের বিয়ে হয় পাবনার শাহজাদপুরে। স্বামী কলকাতায় এক কোম্পানিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন। বিয়ের পরপরই নূরুন্নেহার কলকাতায় স্বামীর বাড়িতে চলে যান। কিন্তু চার বৎসর পরই দুটি ছেলে সন্তান রেখে তাঁর স্বামী মারা যান। তখন নূরুন্নেহার চলে আসেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু বাপের বাড়ির বিষয় সম্পত্তি পদ্মার গ্রাসে চলে গেলে শিল্পী আবার কলকাতায় ফিরে যান। সেখানে আকাশবাণী অনুষ্ঠানের প্রযোজক সাদুকুর রহমানের পরামর্শে শিল্পী নূরুন্নেহার আকাশবাণীতে কণ্ঠ পরীক্ষা করান এবং অডিশনে পাস করেন। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি আকাশবাণীতে গান গাইবার আমন্ত্রণ পান তিনি। এরপর থেকেই আকাশবাণীতে নিয়মিত গান গাইতে থাকেন। এর মধ্যে মেগাফোন কোম্পানিতে শিল্পী নূরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে ডুয়েট গানে গান রেকর্ড করার সুযোগ আসে। সে সময় চারটি গান দিয়ে দুটি ডিস্ক রেকর্ড করা হয়। এর পরপরই কলকাতা শহর ও শহরতলীর নানা জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র-এর বাড়িতে মিসেস সরোজিনী নাইডুর উপস্থিতিতে গান গাইবার ডাক আসে কয়েকবার। শিল্পী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া মাদ্রাসা, হুগলী কলেজের মঞ্চেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পল্লি সংগীত পরিবেশন করেন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে শিল্পী নূরুন্নেহার ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকার তৎকালীন বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ম্যানেজার সাদেকুর রহমানের সঙ্গে গান গাইতে শুরু করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৬ সালে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) নিখিল পাকিস্তান সংগীত সম্মেলনে নূরুন্নেহারই প্রথমবারের মত দলীয় সংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

www.pathagar.com

নূরুন্নেহার বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্মলগ্নের শিল্পী। বর্তমানে তিনি রেডিও ও টেলিভিশনের পল্লিগীতির নিয়মিত সংগীত পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।[২৯]

কদম আলী বয়াতি

কদম আলী বয়াতি মানিকগঞ্জ সদরের চর মকিমপুর গ্রামে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত পির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মদন ফকির ও মাতা পুণ্যবিবি। কদম আলী বয়াতির পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমিক ভাবে পির ছিলেন। তাদের পূর্বপুরুষগণ সংগীতেও খুব পারদর্শী ছিলেন। শৈশবকালেই কদম আলী তাঁর বাবার হাত ধরে সংগীত জগতে প্রবেশ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি বাবার সাথে বিভিন্ন গ্রামে ভাব-বৈঠকি গানে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি লোকসংগীত করতে করতে আপন প্রচেষ্টায় ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে নিয়মিত লোকসংগীতের শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। কদম আলী বয়াতি গ্রাম বাংলার পুরনো দিনের মুর্শিদি, মারফতি, দেহতত্ত্ব, বারোমাসী সহ অন্যান্য লোকগীতি গেয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। তিনি নিজেও অনেক পল্লিগীতি রচনা করেছেন। তাছাড়া গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোক যাত্রাপালার তিনি একজন দক্ষ অভিনেতা ও যাত্রাপালা নির্দেশক হিসেবেও কাজ করেছেন। বর্তমানে (২০১৩) ৮৬ বৎসর বয়সে তিনি এখনো সুস্থ-সবল আছেন। আজো দোতারা বাজিয়ে গান করতে পারেন কদম আলী বয়াতি।[৩০]

সাইদুর রহমান বয়াতি

সাইদুর রহমান বয়াতি বাংলা ১৩৩৮ সালে জৈষ্ঠ্য মাসে তৎকালীন মানিকগঞ্জ মহকুমার পুটাইল ইউনিয়নের অন্তর্গত পশ্চিম হাসুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি এবং মায়ের নাম কুসুমী বেগম। পিতা-মাতা নাম রাখেন সাইদ আলী। প্রথমে পশ্চিম হাসুলি ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে তিনি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর লেমুবাড়ি বিনোদা সুন্দরী এম. এ. স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তিনি যখন লেমুবাড়ি বিনোদা সুন্দরী এম. এ. স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন তখন সেই স্কুলের শিক্ষক নিরোদ বরণ চক্রবর্তী সাইদ নাম কেটে সাইদুর রহমান লিখে দেন। তখন থেকেই তিনি সাইদুর রহমান নামে পরিচিত। এরপর নবগ্রাম স্কুল থেকে নবম শ্রেণি পাস করেন। দারিদ্র্যের কারণে তিনি আর লেখাপড়া করতে পারেন নি। ছোটোবেলা থেকেই তিনি গান বাজনায় ডুবে থাকতেন। প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়ার সময় তিনি তৎকালীন মানিকগঞ্জের বাইতরা গ্রামের যাত্রাদল বাসুদেব অপেরা পার্টিতে যোগ দেন। যাত্রার দলে তিনি মেয়ে সেজে নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। যাত্রাদলে তাঁর নাম ছিল ছবি 'রাণী'। তখনকার দিনে যারা মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতো তাদের নামের শেষে 'রাণী' যোগ করা হতো। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের প্রয়োজনে তিনি মাথার চুল লম্বা করে রাখতেন। নিজের কানও ফুটো করে নেন। তিনি 'সিরাজউদ্দৌলা' যাত্রায় লুৎফা, 'হরিশচন্দ্র' যাত্রায় হরিশচন্দ্রের স্ত্রী সৌভা,

www.pathagar.com

'বিশ বছর আগে' যাত্রায় তন্বী, 'রঘু ডাকাত' যাত্রায় মনিকা দেবী, এবং 'হোসেন শহীদ' যাত্রায় মায়মুনার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

গোঁড়া পর্যায়ের মুসলমানরা তখন যাত্রাকে ঘৃণা করতেন। যাত্রার দলে যোগ দেয়ার কারণে তাঁর পিতাকে সমাজের মাতব্বরেরা একঘরে করে রাখেন। এই বিষয় নিয়ে গ্রামে একটি বিরাট সালিশ হয়। সালিশে সাইদুর রহমান বলেন, "আমি যদি এক আসরে একরাত গান করি তাহলে আমার স্কুলের দুই তিন মাসের বেতন হয়। আমি মাটি কাটতে পারি না বা অন্য কাজও করতে পারি না। আমাকে তোমরা গান গাওয়ার সুযোগ দাও"। সালিশের লোকজন তাঁকে গান গাওয়ার অনুমতি দেন।

১৯৪৯ সালে তিনি দশম শ্রেণিতে উঠেন। সংসারে তখন প্রচণ্ড অভাব অনটন দেখা দেয়। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬/৭ জন। পিতার জমিজমাও ছিল সামান্য। গান গেয়ে সংসার চালানো তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৯৫০-৫১ সালে চট্টগ্রাম চলে যান এবং সেখানে পাকিস্তান নৌ বাহিনীর জাহাজ আল বদর-এ যোগ দেন। কিন্তু পিতা মাতার অনুরোধে সেখানে থাকা হয় না। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে চাকমাদের এলাকায় রামানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে তিনি দেড়মাস অবস্থান করেন। অনেক মন্ত্র-তন্ত্র তিনি এই সাধুর নিকট থেকে শেখেন। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে মানিকগঞ্জ কো-অপারেটিভ ব্যাংকে সামান্য বেতনে বৎসর কয়েক চাকরি করেন। সেখানেও তাঁর মন বসে না। শেষে বাড়ি এসে জারি, সারি, কবিগান সহ ২০/২৫ প্রকার গান শিক্ষা করেন।

রাজনীতি ও সমাজসচেতন এই লোককবি দেশের বিভিন্ন আন্দোলনের উপর গান রচনা করেছেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময়ও তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যখন মানিকগঞ্জে যান তখন তাঁর নির্বাচনী সভায় তিনি একটি গান গেয়ে শুনান। গানটি হলো—

এসো হকের দলে সবাই মিলে
হকের নৌকায় যাই
সাইদ বলে সময় গেলে
আর পাব না ভাই
এসো সবে মিলে হকের দলে যাই।

ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলনের সময়ও তিনি গান রচনা করেছেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তিনি অনেক গান রচনা করেন। যেমন—

মুক্তি সেনার নিশান তলে
আয় ছুটে বাঙালি ভাই
শক্ত হাতে দাঁড়া সবে
আরত বুঝি সময় নাই।

মুক্তিযোদ্ধারা যখন লেমুবাড়ি হাইস্কুলে ট্রেনিং নিত তখন তিনি তাদেরকে এই সব গান শুনাতেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করতেন গানের মাধ্যমে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরনের গোপনীয় খবরাখবর দিয়ে (পাকিস্তানিদের সম্পর্কে) সাহায্য করতেন।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের সময় লেমুবাড়ি হাটে তার মুদি দোকান ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা রাতে তাঁর দোকানে আসতেন এবং তিনি তাদেরকে খাওয়াতেন এবং তথ্য সরবরাহ করতেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাইদুর রহমান বয়াতি জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, কবি, ধুয়া, মালসি, তর্জা, মাদার বাঁশের গান, গাজীর গান, সখি-সম্পাত গান, কীর্তন গান, ত্রিনাথ ঠাকুরের গান, মর্সিয়া গান জানেন। তাছাড়াও তিনি ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, গঙ্গাদেবীর গান, কৃষ্ণলীলার গান, রামলীলা গান, ভাবসংগীত, বাইলান্তি গান (এক জায়গায় একসঙ্গে বসে যে গান পরিবেশিত হয়), নৌকাবাইচের গান, মানিক পিরের গান জানেন। তাঁর স্বরচিত গানগুলোর মধ্যে রয়েছে নবীতত্ত্ব, মুর্শিদি, ভাবগান, ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, জারি, নৌকাবাইচের গান, ধুয়া, বাউল গান ইত্যাদি। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর আমন্ত্রণে তিনি ১৯৯২ সালে কলকাতায় যান এবং লোকসংগীত উৎসবে যোগ দেন। সেখানে নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির, হাওড়া ভবানীমন্দির, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে তিনি লোকসংগীত পরিবেশন করেন। তিনি গান গেয়ে জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখ্য লোকসংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি ২০১৩ সালে তাকে সম্মানসূচক 'ফেলোশিপ' প্রদান করে।

সংগীত ছাড়াও লোকচিকিৎসক হিসেবেও তার খ্যাতি রয়েছে। বর্তমানে তিনি আদি ওয়াছিয়া তরিকার একজন মুরীদ। তাঁর পিরের নাম এস. এ. এন. জলিল (আঙ্গুর পাড়া, মানিকগঞ্জ)। তিনি নিজেও একজন পির। তাঁর দর্শন হলো—আল্লা, রাসুল ও পাক পাঞ্জাতনকে চেনা ও জানা। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই– এই মতে বিশ্বাসী তিনি। সাইদুর রহমান বয়াতি বলেন, "হিন্দু-মুসলমান হচ্ছে ক্ষেতের আইলের ভাগ বাটোয়ারার মত, অন্য কিছু নয়। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ভাইয়ের মত বসবাস করবে। সকল ধর্মের মানুষ নানা ভাষায় একজন স্রষ্টার প্রার্থনা করবে। এটি প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র পৃথিবীতে শান্তি আসবে।"[৩১]

ওস্তাদ রফিকুল ইসলাম

ওস্তাদ রফিকুল ইসলাম ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে মুলজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম লেবু। তাঁর পিতার নাম সুধন আলী। তিনি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত গুলুটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল (বর্তমানে মানিকগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়) থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর সুরের নেশা ছিল। নবম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় একবার কবি জসীমউদ্‌দীন তাদের স্কুল পরিদর্শনে আসেন। রফিকুল ইসলাম সেদিন গান পরিবেশন করেন। কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর গান শুনে খুশি হয়ে তাকে কবির *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, *নকশি কাঁথার মাঠ* সহ আরও একটি কাব্যগ্রন্থ উপহার দেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর রফিকুল ইসলাম ঢাকায় চলে যান এবং শিল্পী কানাইলাল শীলের (১৮৯৫-১৯৭৭) কাছে পাঁচ বৎসর দোতরা বাজানো শিখেন। এরপর বেতারে তাঁর ওস্তাদ কানাইলাল শীল, আব্দুল আলীম সহ বিভিন্ন শিল্পীর গানে

www.pathagar.com

দোতরা বাজান। ১৯৬২ সাল থেকে তিনি বেতারে পল্লিগীতি গাওয়া শুরু করেন। ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদের (১৯২৮-২০০০) কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীত তালিম নেন। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রামের সংগীত বিষয়ক পণ্ডিত জগদানন্দ বড়ুয়া আয়োজিত 'নিখিল পাকিস্তান সংগীত প্রতিযোগিতায়' উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে রফিকুল ইসলাম প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর 'ছায়ানট' ও 'নজরুর একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হলে সেখান থেকেও তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি বেতারে সংগীত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।

ওস্তাদ রফিকুল ইসলাম জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও একজন সংগীত পিপাসু শিক্ষার্থীর মতো যে কোনো ভালো জিনিস শেখার প্রতি আগ্রহী। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন বিশেষ শ্রেণির শিল্পী হয়েও তাঁর জ্ঞান আহরণে তারুণ্যই পরিলক্ষিত হয়। তিনি ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিয়ে করেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রিজিয়া ইসলাম। তাদের চার কন্যা ও দুই পুত্র সন্তান রয়েছে। ওস্তাদ রফিকুল ইসলাম বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর ধানমণ্ডি শাখার একজন শিক্ষক।[৩২]

খৈমুদ্দিন বয়াতি

খৈমুদ্দিন বয়াতি ১৯৪২ সালে গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলায় কিছুদিন ফরিদপুরের চরমহিদাপুর গ্রামে বসবাস করেন। পদ্মানদীর ভাঙনের ফলে তিনি তাঁর বাবা জিঞ্জির খান-এর সঙ্গে ফরিদপুর থেকে কাঞ্চনপুর বাগুটিয়া গ্রামে চলে আসেন। খৈমুদ্দিন বয়াতি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। পড়াশুনা বাদ দিয়ে তিনি নৌকাবাইচ এবং যাত্রাগানে আগ্রহী হয়ে পড়েন। মালুচি গ্রামের ওফাজউদ্দিনের নিকট জারিগান শিখেন। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, "গ্রামের মধ্যে গানের জলসা, বিচারগান ও জারিগান হতো। দু'একটি গান গাইতাম। মালুচির জমিদার হেরেনবাবু আমাকে খুব ভালোবাসতেন। হেরেনবাবু বলতেন, তুমি একজন কবি হবে, গায়ক হবে। তিনি আমাকে দোয়া করেন।"

নিজের সংগীত জীবন সম্পর্কে তিনি বলেন, "ঝিটকা নতুন বাজারে প্রথমে আমি লাল চানের মেলায় নয়েজউদ্দিনের সঙ্গে চাচা-ভাতিজার জারি গাই। চারজন দোহার এবং আমিসহ মোট পাঁচজন। বয়স তখন ২২/২৩ বছর হবে। ২৮ বছর বয়সে আমি পুরা গায়ক। গেন্দু বয়াতি, মনিরুদ্দি বয়াতি, দারোগ আলী বয়াতি (ছয়বাড়িয়া), মোগর আলী (ইশাননগর) ও আফাজউদ্দিন বয়াতির ছেলে সোনামিয়ার সঙ্গে গেয়েছি। আকালি সরকার (মাচাইন গ্রাম) ও ওয়াহেদ আলী বয়াতির (বাল্লা) সঙ্গেও গেয়েছি। হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারী পালট করতাম। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বর্গে আরোহণ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্ম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ইত্যাদি প্রসঙ্গে জারিগান করতাম।"

তিনি আরো বলেন, "জারিগানে আমি অসম্ভব ঘটনা বা অলৌকিক ঘটনাকে মানুষের নিকট বাস্তব ঘটনারূপে পরিবেশন করি। মীর মশাররফ হোসেন-এর বিষাদ সিন্ধুর ঘটনাকে আমি নিজে অলংকার ভরে আমার মতো করে সমাজে মানুষের নিকট উপস্থাপন করি। হাজেরার বনবাস যা বলতাম মানুষ নীরব হয়ে শুনত। কান্নাকাটি শুরু

www.pathagar.com

করে দিত। দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে আমিও কাঁদতাম। আমি নিজে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলাম কয়েকবার। শহিদে কারবালা আমার বিখ্যাত জারি। স্টেজে কোনো অলৌকিক বা অসম্ভব ভাষা ব্যবহার করি না। কোরান ও হাদিসের আলোকে যা পাই তাই করি। আমরা গায়করা হজরত আলীর তরিকায় আছি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আমার গান শুনে। বর্তমানে জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ নেই।"

খৈমুদ্দিন বয়াতি একজন সুফি সাধক। ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা তাঁকে স্পর্শ করে না। মানুষের মধ্যেই স্রষ্টাকে তিনি খুঁজে বেড়ান তাঁর গানে। তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবীর মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। একজন জ্ঞানী মানুষ হচ্ছেন পূর্ণ মানুষ। নিজেকে চেনা এবং জানাই হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এখানে ধর্ম নেই, জাতি নেই। বিশ্বের মানুষ এক। সব মানুষই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তাঁর গানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি পুরনো লেখাগুলোকে নিজের মতো করে অলংকার, সুর ও ভাষা দিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট সহজভাবে উপস্থান করেন। জারিগানে তিনি একটি স্বতন্ত্র ধারা চালু করেছেন। তা হলো ভাটিয়ালি সুরের ধারা। তাঁর ওস্তাদ ফয়েজউদ্দিন এই সুরটি তাঁকে শিখিয়েছেন। তাঁর মতে জারিগান হচ্ছে পুরনো, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন "জারি হচ্ছে কাহিনি, পুরাতন কালের ইতিহাস। জারির অপর নাম হলো রোনা জারি—কান্নাকাটি। অতএব চারণ কবি দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যা বলতে পারেন তাই জারি।"[৩৩]

বৈদ্যনাথ সরকার

বৈদ্যনাথ সরকার ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বরুন্ডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নিতাই সরকার ও মাতা কাদম্বিনী সরকার। বৈদ্যনাথ সরকার বরুন্ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কালিয়াকৈর নবগ্রাম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি গান-বাজনা-নাটক-যাত্রাপালা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি বিভিন্ন যাত্রাপালায় 'বিবেকের' চরিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়াও তিনি ত্রিনাথের মেলা এবং বিভিন্ন ওরস মাহফিলে মুর্শিদি, মারফতি ও ভক্তিমূলক গান করেন। তিনি কীর্তনের সুর-সংগীত ও এর ভাববৈচিত্র উপস্থাপনে একজন দক্ষ কারিগর। তাঁর কীর্তন গান পরিবেশন খুবই চমৎকার। তাঁর গানের গুরু হচ্ছেন কেওয়ারজানী গ্রামের কেশব চন্দ্র মণ্ডল আর আধ্যাত্মিক গুরু হচ্ছেন হরিরামপুরের প্রখ্যাত সাধক ললিত গোস্বামী। বৈদ্যনাথ সরকার কোনো একটি বিশেষ ধর্ম বা জাতির ধারক ও বাহক নন। তিনি বিশ্বাস করেন সবার আগে মানুষ এবং তারপর ধর্ম। মানুষের সেবার চেয়ে ধর্ম বড়ো নয়। তিনি এই ধর্মীয় আদর্শই মূলত তাঁর গান আর কথা দিয়ে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। বর্তমানে তিনি স্ত্রী পদ্মারাণী সরকার, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে বেশ ভালো আছেন।[৩৪]

লোকসংগীতের অনন্যসাধারণ শিল্পী মমতাজ

একাধারে লোকসংগীত শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, সমাজ সেবক মমতাজ সিংগাইর উপজেলার জয়মন্টব ইউনিয়নের ভাকুম গ্রামে ১৯৭৪ সনের ৫ই মে

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মধু বয়াতি ও মাতার নাম উজালা বেগম। মমতাজের সংগীতের হাতেখড়ি তাঁর বাবা মধু বয়াতির কাছেই। অতি অল্প বয়সেই বাবার সান্নিধ্যে থেকে সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের তালিম গ্রহণ করেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে পিতার সাথে মঞ্চে গান গাওয়া শুরু করেন। তিনি তাঁর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা কালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়ে পুরস্কারে ভূষিত হন এবং একজন সম্ভাবনাময় শিল্পী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত বাউল সংগীত শিল্পী, গীতিকার, মাতাল রাজ্জাকের কাছেও গান শিখেছেন। মমতাজ দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর একটানা মঞ্চে বাউল গান পরিবেশন করে গোটাদেশে প্রচুর সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি দেশের বরেণ্য বাউল শিল্পীদের সঙ্গে পালাগান গেয়ে কোকিলকণ্ঠী গায়িকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

শিল্পী মমতাজ নায়ের মাঝি, ক্ষেতের চাষী, দিনমজুর, তাঁতি, কামার, কুমার, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের গান সংগ্রহ করে নিজের কণ্ঠে ধারণ করেছেন এবং তা নতুন প্রজন্মের কাছে স্বার্থকভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। লোকসংগীতকে তিনি নগর সংস্কৃতিতে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার গভর্নর তাঁর সংগীত প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন—Your voice reflects millions of Bangladeshi people that are echoed through out the world। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের গভর্নরের এই মন্তব্যের মধ্যদিয়ে বাংলার লোকসংগীত জাতীয় সংস্কৃতির গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে। মমতাজের প্রথম অডিও ক্যাসেট 'বিরহের বিচ্ছেদ' প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। এরপর তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। শুধু দেশের মিউজিক কোম্পানিগুলো নয়, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যসমূহ থেকেও তাঁর গানের অডিও এ্যালবাম বের হয়েছে। তাঁর এ পর্যন্ত সাতশ-এর বেশি সংখ্যক এ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে সর্বাধিক সংখ্যক এ্যালবাম বের হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'গিনিজ বুক অফ দা রেকর্ডে' তাঁর নামটি স্বর্ণাক্ষরে যুক্ত হয়েছে।

শুধু দেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোকসংগীত পরিবেশন করে বিশ্বের দরবারে তিনি বাঙালি জাতিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এ পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, ইটালি, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সুইডেন, স্পেন, গ্রিস, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, ভারত সহ আরও অনেক দেশ ও শহরে কনসার্ট করেছেন। মমতাজ দেশে বিদেশে তার সংগীত প্রতিভার অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। সেগুলো হলো—টেলিভিশন রিপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টিআরএবি) ২০০০, বিসিআর এ্যাওয়ার্ড ২০০১, টিআরএবি এ্যাওয়ার্ড ২০০১, বিসিআরএ এ্যাওয়ার্ড ২০০২, বিজিএ এ্যাওয়ার্ড ২০০৩, বিসিআরএ এ্যাওয়ার্ড ২০০৩, মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার ২০০২, ঢালিউড এ্যাওয়ার্ড ২০০৩, দেশ, মাটি ও মানুষ পুরস্কার ২০০৩, টিআরএবি এ্যাওয়ার্ড ২০০৪, বিসিএ হায়েস্ট এ্যাওয়ার্ড ২০০৪, সাঁকো টেলিফিল্ম পুরস্কার ২০০৪, লাক্স চ্যানেল আই পারফরমেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০০৪, বিএফজেএ

www.pathagar.com

পুরস্কার ২০০৫, ঢাকা ক্লাব পুরস্কার ২০০৬, সিটিসেল মিউজিক এ্যাওয়ার্ড ২০০৬, বিসিআরএ পুরস্কার ২০০৬, লাক্স চ্যানেল আই পারফরমেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০০৭-২০০৮, বাচসাস পুরস্কার ২০০৯। তাছাড়া অনন্য নারী পদক এফসিসিআই পদক, ফোবানা পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার সহ আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। শিল্পী মমতাজ নিজ নামে একটি আত্মজীবনীমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যে ছবিতে নিজ নাম ভূমিকায় নিজেই স্বার্থকভাবে অভিনয় করেছেন। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী মমতাজ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়সহ বিভিন্ন কোম্পানির পণ্য প্রচারে মডেল হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ছায়াছবিতে কণ্ঠ দিয়ে মমতাজ তাঁর সুর ও সংগীতের ধারাকে চলচ্চিত্রের জগতে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছেন। 'মোল্লা বাড়ির বউ', 'দৌড়', 'মাটির ময়না', 'হৃদয়ের বাঁধন', 'খায়রুন সুন্দরী' ও সর্বশেষ 'মনপুরা' ছবিতে গান গেয়ে চলচ্চিত্র জগতে স্বার্থক শিল্পী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিল্পী মমতাজ শুধু গানই করেন না, তিনি দেশ, মাটি ও মানুষ নিয়েও ভাবেন। মানুষের সেবার চেয়ে বড়ো ধর্ম নেই সেই বিশ্বাস থেকেই ২০০৪ সালে নিজের কষ্টার্জিত অর্থে মানিকগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র বাসস্ট্যান্ডে নিজ নামে 'মমতাজ চক্ষু হাসপাতাল' স্থাপন করেন।

মমতাজ বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী একজন মানুষ। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে মূল্যায়ন করার সময় এখনও আসেনি। নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সংগীত জীবন থেকে মহান জাতীয় সংসদের সাংসদ নির্বাচিত হবার ঘটনা তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর কণ্ঠের সুর-মাধুরী আমাদের লোকসংগীতকে আরো সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।[৩৫]

উপরোল্লিখিত শিল্পীগণ ছাড়াও মানিকগঞ্জে আরো অনেক লোকসংগীত শিল্পী রয়েছেন যারা তাদের সংগীতের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ তথা সমগ্র বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতের আবহমান ধারাটিকে সচল রেখেছেন এবং তাকে আরো সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

খ. মানিকগঞ্জের লোকসংগীত

ভৌগোলিক পরিবেশ, নদ-নদীর অবস্থা, মরমি কবি, সাধক ও গায়কদের আবির্ভাবের ফলে মানিকগঞ্জ এলাকা যাত্রা, জারি, সারি, কবিগানসহ অন্যান্য লোকসংগীতের একটি উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আগের দিনে গ্রাম বাংলায় সন্ধ্যা হলেই পাড়ায় পাড়ায় পুথি পাঠের আসর, বৈঠকি গান, কেচ্ছা কাহিনি, রামমঙ্গল, ত্রিনাথ ঠাকুরের গান, গাজীর গান ও ধুয়া গানের আসর বসতো। মেয়েরা মেয়েলী গীতের আসর বসাতো। মুরুব্বী শ্রেণির লোকজন, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে, নারী পুরুষ তন্ময় হয়ে গান শুনতো। আগের দিনের দর্শক-শ্রোতা মনোযোগ সহকারে গান শুনতেন। মূল গায়ককে তারা পিরের মত সম্মান করতেন, ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন।

www.pathagar.com

আগের দিনে গান পরিবেশনের একটা ধারাবাহিকতা ছিল। দিনের সময় বুঝে গান গাওয়া হতো। ভোরে গাওয়া হতো ভোরগান। বেহাগ সুর অর্থাৎ আজানের সুরে গান। যেমন—

আজ নিশি ভোর হলো বন্ধুর বিরহে
ফুলের শয্যা হলোরে বাসি
প্রাণ বন্ধু বিনেরে
আজ নিশি ভোর হলো বন্ধুর বিরহে।

ভোরের গানের পর গাওয়া হতো গোষ্ঠ গান—অর্থাৎ রাখালিয়া গান, যেমন- 'সাজাইয়া দেমা তোর গোপালে গোষ্ঠে লইয়া যাই'। এরপর গাওয়া হতো মালসি গান। মাকে নিয়ে যে গান তাকে মালসি গান বলা হয়। যেমন—

মা তোর খাস তালুকে বসত করি পরম সুখে
আগে জানে কে বা এই বিপাকে পাকে পাকে
ঘোরাবে সং করি
মা তুই মারবি ধরবি, ধরবি কি ছাড়বি আমায় করিও মা ক্ষমা।

এরপর সখি সম্পাত গান গাওয়া হতো। সখিকে দিয়ে সংবাদ আদান প্রদান করা হচ্ছে সখি সম্পাত গান। এরপর গাওয়া হতো ধুয়া গান, যেমন—হাসান হোসেনের ধুয়া গান। বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দৈন্য গান গাওয়া হতো, যেমন—

দুনিয়া স্বপনের খেলা
কখন কার ভাঙিবে বেলা
আমি কার লাগি বাঁধিব সুখের ঘর
পুত্র কন্যা সব মায়ার বন্ধনরে
চোখ বুঁজিলে সকল পর
আমি কার লাগি...

সন্ধ্যার পর যখন গানে দর্শক-শ্রোতা মত্ত হয়ে যেত তখন শেষ গান গাওয়া হতো যেমন—
আমি শেষের কথা যাই বলিয়া
যেদিন যাব শেষ বিদায় নিয়া।
তোমরা মিছিল করে এসো সবাই রে
আমার মুর্শিদ চাঁদের ধ্বনি গাইয়া ॥
আহা রে না করিও রোনা জারি
তৈয়ার করবে নতুন বাড়ি
তাড়াতাড়ি দিও আমায় সাজাইয়া

www.pathagar.com

মুখে বলবে তৈয়ব কলেমা
সকল ভক্ত মিলিয়া ॥ .

বর্তমানে গান পরিবেশনের এই ধারাবাহিকতা আর রক্ষা করা হয় না।[৩৬]

১. সারিগান

নৌকাবাইচের সঙ্গে সারিগান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সারিগান প্রসারের ক্ষেত্রে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নৌকাবাইচের ক্ষেত্রে মানিকগঞ্জ একটি শীর্ষস্থানীয় জেলা। নৌকাবাইচের সময় সারিগান হয় এই এলাকায়। সারিগানে গানগুলো পরপর বা ধাপে ধাপে গাওয়া হয় বলে একে সারিগান বলা হয়। যেমন— নৌকাবাইচে যাওয়ার সময় যে গান গাওয়া হয় প্রতিযোগিতা শেষে ফেরার পথে ঐ গান গাওয়া হয় না। আবার বাজারে বা উৎসবস্থলে পৌছে যে গান গাওয়া হয় ঘাটে নৌকা ভিড়ানোর পর সেই গান গাওয়া হয় না। হিন্দু মহল্লায় যে গান গাওয়া হয় মুসলমান মহল্লায় সেই গান গাওয়া হয় না। এই জন্যই সারিগান। হিসাব করে গাওয়া হয় বলে এই গানকে সারিগান বলা হয়। সারিগানে ধর্মতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, বিরহ, রাধাকৃষ্ণ, সমসাময়িক ঘটনা ইত্যাদি থাকে। মানিকগঞ্জের বিখ্যাত সারিগান রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছেন–ময়ূর আলী বয়াতি (কাপাটিয়া), মানিক বয়াতি (পুটাইল), কছিমউদ্দিন বয়াতি (কাপাটিয়া), উমেদ আলী বয়াতি (বালিয়াবিল), কালাচান বয়াতি (লেমুবাড়ি), সামুদ্দি বয়াতি (নিমবাড়ি), জৈনুদ্দি বয়াতি (হাসুলি) ও সাইদুর রহমান বয়াতি (হাসুলি) প্রমুখ।

সারিগানের উৎস সম্পর্কে ধারণা

দ্বার যুগে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন রাখাল হিসেবে তিনি রাধার সঙ্গে প্রেমে মত্ত হন। রাধা সম্পর্কে কৃষ্ণের মামি। রাধার সঙ্গে তার যেসব সখি ছিল তারাও কৃষ্ণকে ভালোবেসে ফেলে। ফলে সমস্ত সখিকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপঙ্খী নৌকায় উঠে গান এবং জলে ভেসে ভেসে জলকেলি করতেন। রাধা ও সখিগণ কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে জলকেলির সময় গাইত—

তোমার নৌকায় নিবেনি আমায়
দয়াল মাঝিরে
আমার গলার হার খুলিয়া দিব
মাঝি তোমার পায় ॥
কে কে যাবি তোরা
ময়ূরপঙ্খী নায়রে সজনী
আয়গো তোরা সময় বয়ে যায়
ঐ দেখা যায় শ্যাম কালা চান
সোনার তরী বাইয়া যায় ॥

www.pathagar.com

এই ধরনের গান থেকে পরবর্তীতে সারিগানের জন্ম হয় বলে অনেকের ধারণা। বর্তমানেও অষ্টসখি নৌকা সাজিয়ে হিন্দু ছেলে মেয়েরা মেলায় আসে এবং এসব গান গায়।

১.

কৃষ্ণ বাজায় মোহন বাঁশি
নায়ের পাছা নায়
সখি তোরা গাঁইথা মালা
পরা বন্ধুর গলায় ॥
বাঁশির সুরে প্রেম জোয়ারে
উথাল পাথাল ঢেউ
বন্ধু রইল কই ॥
ঐ দেখা যায় বন্ধু আমার
ময়ূরপঙ্খী নায়
বিনে সুতের মালা গেঁথে
পরা বন্ধুর গলায় ॥
উজানে ভাই টানে নৌকা
চলছে তালে তালে
অষ্টসখি যাবি তোরা
বন্ধুর সনে মিলে ॥

২.

গোপাল সাজায়ে দাও মা
গোপাল যদি না যায় গোষ্ঠে
আমরা যাব না ॥
গোপালকে নিয়া মাগো
সাজাবো রাখাল রাজা
বনফুলের মালা গেঁথে সবাই করব মজা ॥
বনফল আনিয়া মাগো গোপালকে খাওয়াবো
গোপালের মুখের প্রসাদ
সব রাখালে পাবো ॥
আমরা যত রাখালগণে
আছি গোপালকে নিতে
গোপালকে ডাকিয়া দাও মা
নিব আমাদের সাথে ॥

(গোপাল = শ্রীকৃষ্ণ, রাখাল = শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু বান্ধব, গোষ্ঠ = গরু চরানোর চারণভূমি)

www.pathagar.com

গানের ব্যাখ্যা করে সাইদুর রহমান বয়াতি বলেন, নৌকাটা হচ্ছে গোপালের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। মাঝি-মাল্লা, সারিগানের বয়াতি সবাই শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু-বান্ধব রাখালের প্রতীক। গোষ্ঠের প্রতীক হচ্ছে মেলা বা আড়ং।

৩.
আইলা বুঝি বরণ করিতে মা যশোদে
আইলা বুঝি বরণ করিতে ॥
আগে যায় শাশুড়ি
পিছে যায় আহ্লাদি
তার পিছে যায় ননদি কোকিলা ॥
বাম হাতে বরণের কুলা
ডান হাতে দেয় ধান দুবলা
কোন বানিয়ার সিঁদুর কপালে ॥
বরণ করিতে
ধান দুবলা হাতে নিয়া গো
ঠমকে ঠমকে তারা চলে লো ললিতে ॥

৪.
আজব লীলা তার
দেইখা চমৎকার
ঝগড়া লাগে ঢাকা জেলায়
কি প্রাণ সইরে
১৩৪৭ সনে হিন্দু আর মুসলমানে
ঝগড়া লাগল ঢাকা জেলায়
শুনি এক হিন্দুর মেয়ে
আবির ছিটিয়ে দিলে
দিলে আবির মুসলমানের গায়ে
কি প্রাণ সইরে
ঢাকা ছিল সোনারপুরী
দুই দলে লাগল আড়ি
প্রথম শাঁখারিপট্টি হয়
কত মারামারি হুড়াহুড়ি
আর কত দৌড়াদৌড়ি
ছোরাতে বহুলোক মারা যায় ॥
ঢাকায় কাইজা লাগল ভারি
হিন্দুরা ভয় পাইল ভারি

www.pathagar.com

কত হিন্দু টুপি দেয় মাথায়
আবার মুসলমানে মালা পরে
মালা টুপি একসাথ করে
দৌড়াইয়া যার যার জান বাঁচায় ॥
কথা শুনে লাগে ধন্দ
মসজিদ মন্দির করল খণ্ড
দোকানদারের হইল বিষম দায়
স্পিরিট ছিটাইয়া ঘরে
আগুন জ্বালায়ে পোড়ে
কত লোকে বলছে হায়রে হায় ॥
শুনি একজন বাইজ্যে বসে
পিছন দিকে লোক আসে·
পানি খরচ না করেই দৌড়ায়
হইলরে ভাই আজব কাণ্ড
লঞ্চ স্টিমার হইল বন্ধ
সাইদ বলে ঢাকা যাওয়া দায় ॥

৫.

নৌকা খোল খোলরে
আলা রাসুলের নাম লইয়া
নৌকা খোল খোলরে
আলার নাম লইরে ॥
এই নৌকার মাঝি
আপনি দয়াল গাজী
গলুইতে নবরত্ন জ্বলে ॥
এই নৌকার পরে
পাক পাঞ্জাতন চড়ে
দোমের মাদার আপনি কাণ্ডার ॥
এই নৌকার পরে
কালুগাজী চড়ে
বড়ো পির আপনি কাণ্ডার ॥

ব্যাখ্যা : গুরু প্রদত্ত নয় প্রকার ভক্তি হচ্ছে নবরত্ন। শাক্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর, সরল, গরল, বান ও চন্দ্র। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার জন্য

www.pathagar.com

নবরত্ন ভক্তির অবশ্যই প্রয়োজন। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে পরমসত্তা মানবদেহে আসা যাওয়া করে। আধ্যাত্মিকভাবে একে দোমের মাদার বলা হয়।

৬.

সুজন জাইনা নৌকা খুইলা
দিও পরানের মাঝি
দেহের মাঝির খবর রাইখো ভালো ॥
আলার নাম কইরা সার
নৌকা ধরি ভব পার হে
মুরশিদের চরণ হৃদে রাইখো ॥
গাজীর নাম কইরা সার
নৌকা ধরি ভব পার হে
মুরশিদের চরণ হৃদে রাইখো ॥
আলীর নাম কইরা সার
নৌকা ধরি ভব পার হে
মা ফাতেমার চরণ হৃদে রাইখো ॥

৭.

যাও তোমরা কানাইর ডিঙ্গা বাইয়া (২)
ঐ দেখা যায় বন্ধুর বাড়ি
মধ্যে নলের বেড়া
হাত বাড়াইয়া দিতে পান
দেখল ছোটো দেওরা ॥
ওপার যে কদম্বের গাছরে
লম্বা ছাড়ে রশি
খাইলাম না ছুঁইলাম না
শুধু হইলাম দোষের দোষী ॥

ব্যাখ্যা : বাহ্যিক জগতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কানাই। আধ্যাত্মিক জগতে মানবদেহে পরমসত্তাকে কানাই বুঝনো হয়েছে। যিনি এই দেহ পরিচালনা করেন।

৮.

উড়াল ছাড়িল ছাড়িলরে
খোপের কবুতর উড়াল ছাড়িলরে
বড়ো সুখে পাললাম তোরে

www.pathagar.com

পিঞ্জরায় ভরিয়া
যাবার কালে যাইবা তুমি
নিষ্ঠুর কথা কইয়া ॥
শিশুকালে পালছি তোরে
মুখের অন্ন দিয়া
এখন কেন যাইবা তুমি
আমায় নারে কইয়া ॥
তুই তোরে যাইবে পাখি
অবলা ভুলাইয়া
মাটির খাঁচা ভাইঙ্গা যাবে
তোরে না পাইয়া ॥

৯.
শ্রীরাম কান্দিয়া বনে যায়রে
শূন্য করে সোনার ঘরবাড়ি
আগে চলে রামচন্দ্র
পিছে যায় জানকি লক্ষ্মণ
ধীরে ধীরে যায় মেলা দিয়ারে
ঘরে রইতে পারি না রে ॥
কই কি রমণীর দোষে
রামচন্দ্র যায়রে বনে
দেখ সবে ঘরে বাহির হইয়ারে
ঘরে রইতে পারি না রে ॥
পঞ্চবটি বনে গেল
সীতাকে হারাইল
দুষ্ট রাবণ নিল যে হরিয়ারে
ঘরে রইতে পারি না রে ॥

১০.
কোথায় রইলা কালাচান
তারে আন
দারুণ কোকিলের রবে
বিঁদরে পরান ॥
এক কালা দোয়াতের কালি

www.pathagar.com

যাতে কোরান লেখে
আরো কালা চক্ষের মণি
যাতে দুনিয়া দেখে ॥
হাতে চান কপালে চানরে
চান্দের গাঁথুনি
কোনখানে লুকাইয়া রইলা
শ্যাম গুণমণি ॥
সবে বলে কালা কালা
আমি বলি শ্যাম
আমার অঞ্চলে ছাপিয়া রাখি
কালার নিজ নাম ॥

ব্যাখ্যা : কালাচান হচ্ছে মানবদেহে পরমাত্মার প্রতীক। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, যেহেতু কালো বর্ণের কালি দিয়ে কোরান লেখা হয় তাই এই কালি অনেক মূল্যবান। কিন্তু এই কালির চেয়েও চোখের মণি অনেক মূল্যবান। চোখের মণি না থাকলে কোরান পড়া যায় না। চোখের মণির চেয়েও কালাচান বা পরমাত্মা মূল্যবান। আকাশে চাঁদ না উঠলে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তেমনি দেহে পরমাত্মা না থাকলে সবকিছুই অসার। এই গানে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার তীব্র আকুতি পরিলক্ষিত হয়।

১১.
শ্যামচান আইসাছে কদমতলে লো ললিতে (২)
কিসের আমার রান্ধা বাড়া
কিসের হলুদ বাটা
দুই নয়নের জলে আমার
ফাইসা যায় পাটা ॥
পান দিলে সুপারি লাগে
আরো লাগে চুন
ঘষিয়া ঘষিয়া জ্বলে
মনেরই আগুন ॥
শুইলে স্বপনে দেখি
বন্ধুর ঝিকিমিকি
মনে বলে তোমায় পাইলে
হৃদয়েতে রাখি ॥

১২.
শ্রীরাম কাঁদিয়া বলেরে
ভাই লক্ষ্মণ
উঠরে ভাই চল যাই ঘরে

www.pathagar.com

কাইল আইসাছি খেলতে মাঠে
আছেনি তোর মনে
মা দুখিনী কাঁইন্দা মরবে
তুমি আমি বিনে ॥
মা যে আমার কাঙালিনী
আরতো কেহ নাই
একবার মা বলিয়া ডাকব যাইয়া
আমরা দুটি ভাইরে ॥

১৩.
সারাদিন কোথায় ছিলি গোপালরে
একবার মা বোল বলিয়া কোলে আয়রে (২)
ভাতে হইল কড়কড়
দুধে পইল মাছি
সামনে বইসা খারে একবার
তোকে দেখলে বাঁচি ॥
অঞ্চলের ধন নীলমণি
কই রইলা লুকাইয়া
সামনে আইসা ডাক দে একবার
মুখে মা মা কইয়ারে ॥

১৪.
আইজ কেনে তোর বদন দেখি কালা মা জননী
কে দিয়াছে রঙ্গফুলের মালা
অসুর কাটিয়া মাগো দাঁড়ায়েছ পথে
নিঘাও কইরা চাইয়া দেখ
তোর স্বামী পদতলে ॥
ডানহাতে খড়গ তোমার
বামে মুণ্ডু ধর
মুণ্ডুমালা গাঁইথা মাগো
কেন গলায় পর ॥

১৫.
পুত্র শোক জ্বালা
মায়ের বুকেরে
ওরে নিমাই মা বলিয়া ডাকদে

www.pathagar.com

যখনে জন্মিলা নিমাই
নিম তরুতলে
হইয়া যদি মইরা যাইতা
না লইতাম কোলেরে ॥
দেখরে জগতের লোক
দেখরে চাহিয়া
নিমাইচান সন্ন্যাসে যায়
জননী ছাড়িয়ারে ॥
নিমাইরে করাইলাম বিয়া
কোলের কামিনী
সেই নারী ঘরে রইল
জ্বলন্ত অগ্নিরে ॥

ব্যাখ্যা : নিমাই হচ্ছেন হিন্দুদের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। বাড়ি নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রামে। তিনি সবসময় উদাসীন থাকতেন। কথাবার্তা কম বলতেন। তাঁর মা সচীরাণী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ে দেন। বিয়ের পর স্ত্রীকে ঘরে রেখে নিমাই সন্ন্যাসে চলে চান। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর তিনি ঘরে ফেরেন নি। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নামে তিনি এখনো ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান।

সারিগানের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

মানবদেহ একটি নৌকা সমতুল্য। যেমন— মানবদেহের গঠন প্রক্রিয়া মায়ের গর্ভে শুরু হয়। সাধারণ ভাষায় একে ভ্রূণ বলা হয়। কিন্তু এর আধ্যাত্মিক একটি নাম রয়েছে। সেটি হলো বিন্দু জালাল। তেমনি একটি নৌকাকে যখন গঠন বা পত্তন দেওয়া হয় তখন ঐ নৌকাটারও একটা নাম থাকে। নৌকার মিস্ত্রি যখন দাড়াতক্কা তৈরি করে তখন একটি নাম দেয়। মনে যেটি উদয় হয় সেটিই ঐ নৌকার আদি নাম। এটি যদি বাইচের নৌকা হয় তাহলে এই নৌকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অন্য নৌকা পারবে না। এই গোপনীয় নাম তারা প্রকাশ করে না।

মানবদেহ ও নৌকার সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। মানবদেহের শুরু ও শেষ আছে। নৌকারও শুরু ও শেষ আছে। মানবদেহে যেমন রগ, হাড়, কব্জি আছে তেমনি নৌকারও এসব আছে। মানবদেহে প্রতিনিয়ত জারি-সারি গান হচ্ছে, তেমনি নৌকারও গান আছে। বাইচের নৌকায় যেমন বর্ষাকালে সারিগান গাওয়া হয় বা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, তেমনি মানবদেহেরও একটি কাল আছে। সেটি হলো যৌবনকাল বা বয়ঃসন্ধিক্ষণ। নৌকার মধ্যে যেমন মাঝিমাল্লা আছে তেমনি মানবদেহেও মাঝিমাল্লা আছে। মানবদেহ একজন মাঝি পরিচালনা করে তেমনি নৌকা চালায় একজন মাঝি। মানবদেহে একজন (নফছে আম্মারা) সারিগান গায় এবং পাঁচজন যোগান দেয়। কাম,

www.pathagar.com

ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়রিপু সম্মিলিতভাবে মানবদেহকে নাচায়। তেমনি বাইচের নৌকার সারিগানে একজন মূল গায়ক থাকেন ও চার পাঁচজন দোহার থাকে। মানবদেহ যেমন এককালে জরাজীর্ণ হয়ে সৌন্দর্য, যৌবন সবকিছু হারিয়ে ফেলে তেমনি নৌকাও জীর্ণ হয়। তখন নৌকা ডাঙায় পড়ে থাকে এবং উলুপোকার খোরাক হয়। নৌকার কিছু অংশ জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হয়। তেমনি মৃত্যুর পর মানবদেহ মাটিতে কবর দেয়া হয়। কেউ কেউ অগ্নিতে দাহ করে। নৌকার পরিত্যক্ত অংশ থেকে কিছু কাঠ মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়। তেমনি কিছু মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর মহামানবের আত্মা পরিবর্তিত হয়ে মহাশক্তি বা মহাসত্তার সঙ্গে মিশে সমগ্র জীবের কল্যাণ সাধন করে।

সারিগানে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক ব্যাখ্যা

শাস্ত্রমতে রাধা হচ্ছে বৃকবানুর মেয়ে এবং কৃষ্ণ হচ্ছে শ্রী নন্দরাজার ছেলে। বাহ্যিক জগতে তাদের মধ্যে লোকাচার প্রেম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক বা নিত্যের জগতে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে কাম এবং রাধারানী হচ্ছে কামিনীর প্রতীক। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলতেই পুরুষের কামশক্তি এবং রাধারানী বলতেই নারীর কামশক্তিকে বুঝায়। এই দুই শক্তির ফলেই নতুন শক্তির সৃষ্টি। তাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নৌকাবাইচকে মানুষের জীবনতরী, সৃষ্টি, মৃত্যু ও প্রলয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেমন— মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে মানুষের শিশুকাল যায় একভাবে। বাল্যকাল বা বালক-বালিকা কাল যায় আরেকভাবে, আবার যুবক-যুবতীর সময়টা অতিবাহিত হয় অন্যভাবে। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাবস্থা যায় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে। মানবদেহতরী দুনিয়ার আড়ং-এ বা মেলায় প্রতিনিয়ত বাইচ খেলছে। মানুষ যদি মানবধর্মকে রক্ষা করে মৃত্যুবরণ করতে পারে তাহলে সে যেন বাইচের জয়ী নৌকার মতো তার জীবন নৌকা বা দুনিয়ার মেলায় জয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

সারিগানের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে মানিকগঞ্জ এলাকায় সারিগানের প্রচলন কমে গেছে। যে সমস্ত নৌকায় গান গাওয়া হতো এবং যে সব নৌকাবাইচে অংশগ্রহণ করতো সেই ধরনের নৌকা বর্তমানে নেই বললেই চলে। নৌকা তৈরি ও নৌকার রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ায় নৌকাবাইচও আর আগের মত অনুষ্ঠিত হয় না। তাছাড়া দেশে বর্ষাকালে পানি হয় না। পানি না হওয়াতে নৌকাবাইচ ও সারিগানের পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

২. মেয়েলি গীত

বিয়ের গান

১. ছেলের বাড়িতে ছেলের হাতে মেন্দি লাগানোর সময় মেয়েরা গান গাইতে থাকেন–

www.pathagar.com

দামানদের নানি লো
সে বড়ো রসিক লো
আইস আমরা মেন্দি দেবো
দামানদের হাতে না লো।
ইনা মেন্দির রূপে লো
অরে ঝিলিক মারে লো
তাইনা দেখে কন্যার পরান
দোলে না লো।

২. মেয়ের কপালে সিঁদুর দেওয়ার সময় নিম্নবর্ণিত গান গাওয়া হয়–
সিঁদুরের বাণিজ্যে গেল হারে দামান
সিঁদুর বেসাও হিরামনে
সিঁদুর বেসাও হারে রাজামনে
আমার সিঁদুর মইলাম পরছে
জ্বাইলা দেও না দেও হে।

শব্দার্থ : দামান = নওসা বা বর, হিরামনে = উৎফুল্ল মনে, রাজামনে = গর্বিত মনে, মইলাম = মলিন হওয়া, জ্বাইলা দেও = পরিষ্কার করা

৩. কনেকে সাজানোর সময় বা গোসল করানোর সময় এই গানটি গাওয়া হয়–
ঢাকা গণে আসিলাম
পথে পাইলাম চিকন মেন্দির চারা না লো
এইনা মেন্দি বুনিবে কে
এই না মেন্দি বুনিবে কয়নার বড়ো ভাই না লো
বাবলা গাছের তলে লো
সুন্দর দেওলা কান্দে লো
কান্দে দেওলা মায়ের কোলে বইয়া না লো
কয়নার বাবা বলে না লো
হায় আল্লাহ এমন বেটি হয় না যেন ঘরে না লো
এমন বেটির জ্বালা লো
ঘষি তুষের আগুন লো
জ্বলে আগুন নিভানো না যায় লো ॥

শব্দার্থ : মেন্দি = মেহেদি, বুনিবে = বপন করা, কয়না = কনে, দেওলা = বিবি, বেটি = মেয়ে

www.pathagar.com

৩. ধুয়া গান

মহররমের হৃদয়বিদারক কাহিনিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিশেষ সুরে যখন গাওয়া হয় তখন এইগুলি মর্সিয়া, আবার বয়াতি যখন এই ঘটনাকে বিস্তৃতভাবে আলাদা সুরে পরিবেশন করেন তখন তাকে ধুয়া গান বলা হয়। এইভাবে মর্সিয়ার অংশকে ধুয়া সুরে গাওয়া যায়। ধুয়া গান, মর্সিয়া গান এবং জারিগানে মহররমের ঘটনা বা বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয় ভিন্ন ভিন্ন সুরে। মর্সিয়া সংগীতে বিভিন্ন তাল যেমন দাদরা, কাহারবা, ঝুমুর, ত্রিতাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধুয়া গানেও একই তাল ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র সুরের পার্থক্য থাকে। লোকজ করুণ সুর হচ্ছে মর্সিয়া, ধুয়া ও জারিগানের মূল বৈশিষ্ট্য। ধুয়া গানগুলো (যা মর্সিয়ার অংশ) ধুয়া সুরে গীত হয়। যেমন—

১.

হোসেন কয় সীমাররে তোরে বলি
আমার গলায় দিস না রে ছুরি
ফাতিমার বেটা বলে ভয় না করিলি
কোন সাহসে নবীর নাতির বক্ষে বসিলি ॥
ওকি আহারে পাপিষ্ঠরে সীমার
প্রাণে ভয় কিনা আর
পানি বিনে নবীর বংশ মইল
একি তোর বিচার
হলকুম (কণ্ঠ) ছেড়ে দে রে সীমার
মা বলে ডাকি একবার ॥
নূরে নবী বেহেস্তের জামিন
বাপজান হয় হজরত আলী
পানি বিনে নবীর বংশ মইল, এই কি করিলি,
আমি যাবার বেলায় চাবো রে পানাহ, দু' হস্ত তুলি ॥

২.

এগো আলা দীনবন্ধু সাঁই
তোমার দয়াল নামটি শুনতে পাই
তুমি ছাড়া জীবের গতি নাই
শুইনাছি রাম অবতারে
দয়া করলে অহলারে
দয়াল চান গোঁসাই,
জগা মাধা পাপী ছিল
তরাই গেল তারা দুই ভাই।
তুমি সেই বৃন্দাবনে

www.pathagar.com

তরাইলা গোপীগণে
গোলকে নাম শুনেছি
গোলকের গোঁসাই ॥
হলো বাঞ্ছা কল্পতরু নাম তোমার
ঐ চরণে দিছি ভার
ভবসিন্ধু আমায় কর পার
তুমি দীন তারিণী দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু
নাম শুনি তোমার
পাগল সাইদ ডাকে পইড়া পাকে
আমাকে কর উদ্ধার
তোমার নাম ধইরা ডাকি
দিওনা আমায় ফাঁকি
আজ এই সভা মাঝে
হওনা অবতার ॥

৩.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বাংলার দুঃখের সর
যারে বিনে বাঁচেনারে প্রাণ বাংলার।
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দেগো
মুজিব বলে জারে জার ॥
কোলের সন্তান ঘুমে থাকে বিছানায় শুইয়া
জেগে উঠে মুজিব মুজিব কইয়া মরি হায়রে
এ যেন কারবালাতে ইমাম শহিদগো
এ বাংলার মাটি কান্দে খাইয়া আছাড় ॥
মা জানে সন্তানের দরদ গর্ভে দিছে ঠাঁই
ভায়ে জানে ভায়ের দরদ মরলে জোড়ের ভাই মরি হায়রে
বাঙালি জানে মুজিবের দরদগো
বাংলার বুকে মুজিব নাইরে আর ॥

ধুয়া গানে প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর ধুয়া গান দিয়ে দিতে হয়। যেমন—

প্রশ্ন :

কঠিন হাদিস তত্ত্ব জিজ্ঞাস করি—
বয়াতির কাছে তত্ত্ব খুলে কও সবার মাঝে,
কয়দিনে এই দুনিয়াটা মৌলায় (মওলা) গড়েছে
কয় ভাগে বিভক্ত করা, কি দিয়া বা সাজাইছে

www.pathagar.com

সারে জাহানের মধ্য জায়গা কোথায় রাইখাছে।
দুনিয়ার মূল দরজা কোথায় আছে গো
সাইদ কয় শুনতে বাসনা আছে ॥ (সাইদ হলেন প্রশ্নকর্তা)
আবার—

প্রশ্ন :
উকিলউদ্দিন কয় সভায় এসে শুনেন বর্তমান
শুনবেন আরো যত মালেকান
একটা জীব পাখি পয়দা করেছে মালেক ছোবাহান
তারে কি জন্যতে পাঠাইয়াছে কোথায় তাহার বাসস্থান
স্বর্গে কিংবা মর্ত্যে থাকে পাই না তার সন্ধান
হাদিস তত্ত্ব খুলে বল আমাকে গো।
শুনাইয়া রাজসভাতে শান্ত কর মন।

বিপক্ষ গায়ক ধুয়া দিয়ে উত্তর দেন। যেমন—
উত্তর :
কঠিন হাদিস তত্ত্ব জিজ্ঞাস করে এসে সভাস্থান
শুনবেন আরো যত মালেকান হাদিস মতে দীনের নবী কইরাছে বয়ান
মক্কার ঘর রক্ষা করিতে আবাবিল পাখি পাঠান
সেদিন আলাম তারা সুরা নাজিল করলেন ছোবাহান
পাঞ্জেগানা নামাজেতে গো ঐ দোয়া পড়ে যত মুমিন মোছলমান।

৪. জারিগান

জারি শব্দের অর্থ প্রচার এবং কোনো ঘটনা বা কাহিনির বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ। যেমন— শহিদনামা জারি বলতে বুঝাবে দীর্ঘ সময় ধরে সুর, তাল ও লয়ের মাধ্যমে শহিদে কারবালার বিস্তারিত বিবরণ, ইমাম হাসানের বিষপানে শাহাদত বরণের বর্ণনা, ইসমাইলকে তাঁর পিতা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর কোরবানি দেওয়ার প্রস্তুতির বিবরণ, মনসুর হালাজের খোদা দাবি বা আনাল হক প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইত্যাদি। জারিগানে কোনো কাহিনি বা ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুর-তাল-লয়ের মাধ্যমে গাওয়া হয়। কোনো কাহিনির মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে জারিগান রচিত হয়। কিন্তু গায়ক গান পরিবেশনের সময় দর্শক-শ্রোতার নিকট আকর্ষণীয় করার জন্য রসাত্মক ছন্দ উপস্থাপন করেন। মূল বিষয়কে ঠিক রেখে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক তত্ত্ব, শাস্ত্র এবং ধর্মীয় বাণী প্রসঙ্গক্রমে প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন— ছলের (মিথ্যা) ভরা জলে ডুবে জ্ঞানের বাতির জ্যোতি কমে না অর্থাৎ সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সুফি, সাধক, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক ও লোককবিগণ ইরাকে প্রচলিত মর্সিয়া সংগীতকে পরিবর্তন করে জারিগানে রূপান্তরিত করেন। জারিগানের সুর হৃদয়বিদারক, যা গ্রাম বাংলার মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারে। হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির ভাব সৃষ্টি করে। এই সুর লোকমুখে বংশ পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে।

জারিগান মানিকগঞ্জ এলাকায় বেশি কারণ এখানে সুফি সাধকদের বিপুলভাবে আগমন ঘটে। মানিকগঞ্জের বিখ্যাত জারি গায়কগণ হচ্ছেন—ধুচুড়িয়ার (শিবালয় থানা) বদু গায়েন, সারারিয়ার (মানিকগঞ্জ) ইব্রাহীম বয়াতি, বাঙ্গালার ইয়াছিন সরকার, ইসানীনগরের আফাজুদ্দি বয়াতি, মোগর আলী বয়াতি, ধলার লেহাজুদ্দি বয়াতি, জাগিরের কাজেমুদ্দি বয়াতি, বায়রার নেদু বয়াতি, চরঘোসতার নৈমুদ্দি বয়াতি, কাপাটিয়ার ময়ুর বয়াতি, গড়পাড়ার জসিমুদ্দি বয়াতি, চকবস্তার ছলিম বয়াতি, দরিকান্দির চান্দা বয়াতি, কলতার কাঙালী গায়েন, বাঠইমুরির আলফু গায়েন, খাবাসপুরের জনাব আলী বয়াতি, শিমুলিয়ার জুলহাজ বয়াতি প্রমুখ।

এসব বয়াতি ও গায়েনের পরবর্তী প্রজন্মের বয়াতিগণ হচ্ছেন কালিয়াকৈরের জাহের আলী বয়াতি, বংশাই গ্রামের দারোগ আলী বয়াতি, সুনামুদ্দি বয়াতি, সারারিয়ার নজুমুদ্দি বয়াতি, কদমতলির মনিরুদ্দি বয়াতি, বায়রার গেন্দু বয়াতি, চানপুরের গোলাম আলী বয়াতি, বইন্যার ঝড়ু বয়াতি, বাঙ্গালার বদরুদ্দি বয়াতি, মাটিকাটার সোনামুদ্দি বয়াতি, কালিয়াকৈরের আলাউদ্দিন বয়াতি, রাজানগরের পানু বয়াতি, হাসুলির ছেলামত আলী বয়াতি, লেমুবাড়ির কালাচান বয়াতি, হাসুলির জৈনুদ্দিন বয়াতি, পুটাইলের মানিক বয়াতি, জাগির বাড়ির হাতেম বয়াতি, নয়ারহাটের বাছের আলি বয়াতি, ঢোলভিটার আবুল বয়াতি, হাসুলির সাইদুর রহমান বয়াতি।

তৃতীয় প্রজন্মের জারিগানের শিল্পীগণ হচ্ছেন পুটাইলের ছন্টু বয়াতি, লেমুবাড়ির মোজাম বয়াতি, ব্রাহ্মণ কান্দার আয়নাল বয়াতি, হাতকোড়ার মনছুর বয়াতি, আজহার বয়াতি, ঝিটকার নাজিমুদ্দি বয়াতি, রসিংপুরের রহিম বয়াতি, সামাদ বয়াতি, সারারিয়ার সুনামউদ্দি বয়াতি, হাসুলির আবুল বাশার আব্বাসী, ধুচুরিয়ার হাছেন আলি বয়াতি, বারইলের মৈজুদ্দি বয়াতি প্রমুখ।

জারিগানের বিষয়বস্তু

জারিগান করুণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ও কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত। যেমন—হোসেন শহিদ, হাসান শহিদ, জয়নাল উদ্ধার, চাচা-ভাতিজা, ইসমাইল কোরবানি, মক্কানামা, মাদার মুনি, কুলছুমের মেজবানি, নবীভক্ত জাবেরা, মনছুর হালাজ, জহর নামা, মোছলেমের পুত্রদ্বয় শহিদ, গঙ্গানামা, দাতাকর্ণ, হরিশচন্দ্র রাজা, দ্রোন ও দরাদেবী, পদ্মাবতীর স্বামীভক্তি, রাম সীতার বনবাস, মেঘনাধ বধ, শ্রীকৃষ্ণের ননী চুরি, নিমাই সন্ন্যাস, পঞ্চাশের আকালের জারি, ভাষা আন্দোলনের জারি, সাম্প্রতিক কালে রচিত বঙ্গবন্ধু শহিদনামা, জিয়া শহিদনামা, জয়বাংলার জারি, পরিবার পরিকল্পনার জারি, দেশ গঠনের জারি, পরিবেশ দূষণ জারি, ধুমপানমুক্ত জারি, বৃক্ষরোপণের জারি, বৈশাখীর জারি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

জারিগানে দুইটি দল থাকে। প্রত্যেক পক্ষে মূল গায়ক থাকেন একজন। দোহার থাকেন দুইজন বা চারজন, বায়ান (যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন) কমপক্ষে চারজন। জারিগানে হারমোনিয়াম, দোতারা, কাঁসা, ঢোল ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া কোনো কোনো সময় বাঁশি, বেহালাও কেউ কেউ ব্যবহার করেন। মঞ্চে প্রথমপক্ষের দোহারগণ দুইদিকে দাঁড়িয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। দর্শক-শ্রোতার দিকে মুখ করে গান ধরেন। মূল গায়ক আসরি ধুয়া গান Prompt করেন। দোহারগণ সুরে সুরে Prompt করা কথাগুলো গেয়ে থাকেন। এটি ডাক ধুয়া বা বন্দনা নামেও পরিচিত। ডাক ধুয়া বা বন্দনা পরিবেশনের পর মূল গায়ক গোষ্ঠগান (গোষ্ঠ রাখাল বালকের খেলার মাঠ) prompt করেন।

এরপর মূল গায়ক জারিগান শুরু করেন। দোহাররা সবাই মঞ্চে গোলাকার হয়ে বসেন। মূল গায়ক দাঁড়িয়ে মঞ্চে দোহারদের চতুর্দিকে আস্তে আস্তে হাঁটেন এবং বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে জারিগান পরিবেশন করেন। জারিগানে বিভিন্ন সুর তাল থাকে—ত্রিপদী, চৌপদী ও পয়ার। যেমন—

বন্দনা বলিতে আমার হবে অনেক দেরি
মন দিয়া শোনেন সবাই জয় বাংলার জারি।
১৯৭০ সালে সাতই ডিসেম্বর
আওয়ামী লীগের নেতা হলেন শেখ মুজিবুর।
দেখে উপযুক্ত স্বদেশ প্রিয় সবাই করলাম জোট
শতকরা দিলাম তারে আটানব্বই ভোট।
ছয় দফা কায়েম করিবে আমার বঙ্গবন্ধুর দাবি
তাই দেখিয়া ইয়াহিয়া দিল গো উল্টা চাবি।
যত মারাত্মক সামরিক অস্ত্র গোপনে আনিয়া
বাংলার বুকে রাখল একলক্ষ মিলিটারি দিয়া।
গর্জে উঠল বন্দুক কামান মেশিনগানের গুলি
প্রথমে আরম্ভ করে ঢাকার বুকে বলি।
বৃহস্পতিবার রাতের কথা করিলে স্মরণ
বুক ভেসে যায় যেভাবে হলো বাঙালির মরণ।
পঁচিশে মার্চ রাতে বাংলার বক্ষ হতে
বঙ্গবন্ধুকে নিয়া গেল করাচীতে
সারা বাংলায় ছুটে গেল রক্তনদীর ঢেউ
কে কোথায় হারাইয়া গেল টের পেল না কেউ।
স্কুল কলেজের মেয়ে ধরল হাজারে হাজার
গেরস্তের কন্যা ধরে করল অত্যাচার।

জারিগানে মেয়ে-পুরুষ, জীব-পরম, রাম-হনুমান, গুরু-শিষ্য, রূপগোঁসাই-মিরাবাঈ, কৃষ্ণ ও গান্ধারী, কৃষ্ণ ও শ্রীদাম, নিমাই-নিতাই বা শ্রীদাম, শরিয়ত-মারফত,

www.pathagar.com

আদম-শয়তান, গণতন্ত্র-রাজতন্ত্র, শহর-পল্লি, অসি-মসি, বৈষ্ণব-শাক্ত, সুফি-মোল্লা ইত্যাদি পালা গাওয়া হয়। একজন গায়ক যদি চাচা-ভাতিজার জারি গায় প্রতিপক্ষ খদগিরি গাইবে। একপক্ষ ইসমাইল কোরবানি গাইলে আর এক পক্ষ আইয়ুব নবী গাইবে। একজন মাদার মুনি গাইলে অন্য পক্ষ মক্কানামা গাইবে। তেমনি একজন যদি মুজিব-শহিদ গায় অন্যজন জিয়া-শহিদ গাইবে। একজন মেয়ের পক্ষে গাইলে অন্যজন পুরুষের পক্ষে গাইবে। জারিগান শেষ করে মূল গায়ক প্রশ্নের অবতারণা করেন। জারিগানে একটা রীতি অনুসরণ করা হয়। কেবলমাত্র খ্যাতনামা ও অভিজ্ঞ বয়াতিগণ এই রীতি মেনে চলেন। বর্তমানে এসব রীতি খুব একটা মানা হয় না।

একটি জারিগানের আসরে সাধারণত এক এক বয়াতির তিনটি করে আসর থাকে। এই তিন আসরে নির্ধারিত একই পাল্লায় সমাপ্তি ঘটবে। আসরের ফাঁকে ফাঁকে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গান পরিবেশন করা হয়। প্রতিপক্ষের বয়াতিও একই রীতি অনুসরণ করেন।

জারি শেষ করে মূল গায়ক প্রতিপক্ষ গায়কের নিকট প্রশ্নবোধক ধুয়া গাইবে। তারপর মুখছড়া দিয়ে তিনি বসে পড়বেন। মুখছড়ার প্রশ্নের নমুনা। যেমন—

শ্রীদাম হয়ে গৌরাঙ্গকে প্রশ্ন করা হলো–

আমি শ্রীদাম, তুমি গৌরাঙ্গ নিমাই,
আমি তোমার বাল্যবন্ধু ও ভাই
প্রশ্ন করি, উত্তর শুনতে চাই
তুমি বিষ্ণুপিয়াকে একা গৃহে রেখে
পিতাকে মাতাকে কাঁদায়ে দেশ ছেড়ে
বিরাগী হলে কেন নিমাই।
বৈরাগীর মাথায় টিকি রাখে কেন,
কতগুলি চুল দিয়ে এই টিকি বাঁধে
এর কেমন মন্ত্র আছে সে কেমন ॥

আবার একতালা পাঁচালির প্রশ্নের নমুনা, যেমন—

যাক চলে বেশি বলে কোনো কার্য নাই
প্রশ্নভাবে দুইচার কথা জিজ্ঞেস করে যাই ॥
বিপক্ষের সরকার আরও দর্শক-শ্রোতাদেরে
শ্রেণিমত আদাব সালাম জানাই সবাইকারে ॥
মাতৃ ভগ্নি ছাত্রছাত্রী আমি দেখতে পাই
ভালোবাসা সালাম আদাব সবাইকে জানাই ॥
কথার দিকে চলে গেলে কথা কি আর কম
অল্প অল্প প্রশ্নভাবে করি সমাপন ॥

www.pathagar.com

একতালা পাঁচালির গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। শেষ মুহূর্তে মূল গায়ক দ্রুতগতিতে এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলেন। দর্শক-শ্রোতা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে করতালি দিয়ে স্বাগত জানান।

ইসলামীভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি তারে
নূহ নবীর কিস্তির কথা বল পষ্ট করে ॥
কয়টা তক্তা দিয়া নবীর কিস্তি গড়েছিল
দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা কত হাত তার ছিল ॥
হিন্দুমতে একটি কথা তারে প্রশ্ন করি
গীতা শাস্ত্র মহাভারতে পুরাণে আছে জারি ॥
পাষণ্ড এক মুনি ছিল শুনতো না ধর্মবাণী
তবু তাহার বৈকুণ্ঠ লাভ, সে হয় কোন জনী ॥

প্রথম গায়ক প্রশ্ন শেষ করে বসে পড়েন। প্রতিপক্ষের গায়ক মঞ্চে দাঁড়িয়ে দোহারদের মাধ্যমে ডাক-ধুয়া বা মালসি গাইবে। তারপরে জারি ধরবে। জারি শেষ করার পর একে একে প্রথম পক্ষের গায়কের ধুয়া প্রশ্ন, মুখ ছড়া প্রশ্ন ও পাঁচালি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বসে পড়বেন। প্রথম গায়কের প্রশ্নের উত্তর যদি সঠিক হয় তাহলে প্রথম পক্ষের গায়ক এবার অন্য প্রশ্ন করবেন এবং প্রশ্নের উত্তরকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রশংসা করবেন। উত্তর সঠিক না হলে পুনর্বার আগের প্রশ্নটি করবেন—নতুন প্রশ্নও করতে পারেন। সারাদিন দুইপক্ষের গায়কদের প্রত্যেকের দুটি করে চারটি আসর হবে এবং সবশেষে দুইদল একত্র হয়ে মঞ্চে মুখোমুখি দাঁড়াবেন এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্ন-উত্তর কাটাকাটি করবেন। একে 'জোটক' বলা হয়। এর তাৎপর্য হলো সারাদিন পাল্লা প্রসঙ্গে দুই বয়াতির মধ্যে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে যদি কোনো বয়াতি মনে আঘাত পায় বা তিক্ততা সৃষ্টি হয় তা নিরসনের জন্য এই জোটক পাল্লা। প্রশ্ন-উত্তরের আলাদা একটি তাল আছে। এটি জোটকের ধুয়া নামে পরিচিত। কোনো কোনো সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই প্রশ্ন উত্তরের পাল্লা চলে, উভয়েই যদি তত্ত্ব জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ হন। সাধারণত আধ ঘন্টায় শেষ হয়ে যায় এই পর্ব।

গান শেষে আনন্দিত চিত্তে উভয় পক্ষের গায়ক একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বয়াতি হলে তিনি কনিষ্ঠ গায়কের কদমবুসি গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ গায়ক তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেন। সাধারণত সকাল দশটা থেকে জারির পালা শুরু হয়ে রাত আটটা পর্যন্ত চলে। জারিগানে বয়াতির বুদ্ধিমত্তা, বাচনভঙ্গি, শাস্ত্রজ্ঞান, ভদ্রতা, যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের কৌশল প্রকাশ পায়। দর্শক-শ্রোতা এসব বিষয় বিচার করে থাকেন।

জারিগানের আসরে সুফি, সাধক ছাড়াও শরিয়তের আলেমগণও উপস্থিত থাকেন এবং গানের বিচার করেন। কোরান, হাদিস, গীতা, মহাভারত, বাইবেল, ত্রিপিটকসহ সব ধর্মের বাণী ও তত্ত্ব জারিগানে উপস্থাপিত হয়। সমসাময়িক ঘটনা বা কাহিনি ধুয়ার মাধ্যমে বা জারির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, যেমন–মুজিব শহিদ, জিয়া শহিদ, জয়বাংলার

www.pathagar.com

জারি, সত্তরের নির্বাচন, পঞ্চাশের আকাল, আটানব্বইয়ের বন্যা, ছিয়ানব্বই-এর নির্বাচন, পরিবেশ দূষণ, পরিবার পরিকল্পনা এবং সর্বশেষে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চাঞ্চল্যকর রায় নিয়ে জারিগান রচনা ও পরিবেশন করছেন সাইদুর রহমান বয়াতি। নিম্নে কয়েকটি জারিগান উল্লেখ করা হলো :

দাতা কর্ণের জারি

প্রথমে মুর্শিদ নাম স্মরণও করিয়া
গুরু ভক্ত বৈষ্ণব কথা দিলাম তাই লিখিয়া
কোনো কোনো ভক্তগণ সর্ব হয়ে এক মন
শ্রী কৃষ্ণের অপূর্ব লীলা করি কিছু বর্ণন ॥
ভক্ত বাঞ্ছা সিদ্ধকারী ভক্ত বৎসল
ভক্তের পরীক্ষায় প্রভু করে কত ছল।
পরীক্ষা করিতে একদিন দাতা কর্ণের মন
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে করিল গমন।
চলিতে শক্তি নাহি কাপে থরে থর
কর্ণের আঙিনায় গেল প্রভু গদাধর ॥
দ্বারকে ডাকিয়া বলে প্রভু চক্রপাণি
আমার সংবাদ কর্ণকে জানাবে এখনি।
ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দ্বারীর ভয় এলো চিতে
কর্ণের নিকটে যেয়ে বলে জোড় হস্তে।
প্রণাম করিয়া দ্বারী কর্ণের কাছে কয়
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক আপনার দ্বারেতে উদয়।
ব্রাহ্মণেরও নাম শুনে কর্ণেরও নন্দন
শীঘ্র গতি চলে এলো ব্রাহ্মণের সদন।
(রাজা) কর্ণ বলে আজ আমার সার্থক এ জীবন
পদার্ঘ দিয়ে দেব বসিতে আসন।
গলেতে বসন নিয়া জোড় হস্তে কয়
কিবা আজ্ঞা কর প্রভু শুনি সে বিষয়
ব্রাহ্মণ বলে রাজা শুন অবধান
লোক মুখে শুনিয়াছি তুমি বড়োই পুণ্যবান
শুন তুমি বলি আমি কর্ণ মহামতি
ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণ আমি তোমার দ্বারেতে অতিথি
গতকাল করেছি আমি ব্রত একাদশী
পারণ (সেবা দেওয়া) করাও হে রাজন আমি উপবাসী
পারণেরও নিয়ম রাজা করহে শ্রবণ

www.pathagar.com

মাংস বিনে আমার নাহি হইবে ভোজন ॥
যে মাংস চাব আমি সেই মাংস দেবে
তবে তোমার বাড়ি আমার ভোজন হবে।
কর্ণ বলে শুন প্রভু করুণা করিয়া
যে মাংস চাবে তুমি সেই মাংস দেব আনিয়া।
পক্ষী মাংস, মৃগ মাংস, যে মাংস রুচি হয়
আদেশ করুন কোনো মাংস আনব মহাশয়।
ব্রাহ্মণ বলে আগে রাজা কর অঙ্গীকার
তবে বলিতে পারি বাসনা আমার।
কর্ণ বলে শুন ওগো প্রভু নারায়ণ
প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি ধরিয়া চরণ।
যাহা চাবে তাহা আমি করে দেব দান
অনায়াসে দিয়ে দেব পুত্র মম প্রাণ।
ব্রাহ্মণ বলে ধন্য ধন্য দানবীর গুসাই
তোমার সমান দাতা ভবে আরতো কেহ নাই।
ভোজন যদি তুমি রাজন করাবে আমারে
তোমার কোলের ছেলে বিষকেতু কেটে দেবে মোরে।
স্বামী আর স্ত্রী করাতে ধরিয়া নিজ হাতে
কাটিয়া তাহার মাংস খেতে দেবে সাক্ষাতে।
হাসিয়া হাসিয়া পুত্র কাটিবে করাতে
তোমার স্ত্রী পুত্রের মাংস পাকাবে নিজ হাতে।
মমতা আসিলে প্রাণে মাংস নাহি খাব
নরক হইবে তোমার আমি ফিরে যাব।
শুনে দ্বিজের কথা কর্ণ হেট করিল মাথা
সর্বনাশ হইল বুঝি ভাবে মনে ব্যথা ॥
কি করিব কোথায় যাব দুঃখে মরে যাই
কি ছিল মোর কর্মে লিখা দুঃখে মরে যাই।
প্রাণের অধিক পুত্র আমার ভালোবাসি যারে
পিতা হয়ে কোন পরানে কেটে দেব তারে।
একথা ভাবিয়া পইল ব্রাহ্মণেরও পায়
দুনয়নের জলে কর্ণের বক্ষ ভিজে যায়।
কেঁদে কেঁদে বলে কর্ণ শুনগো নারায়ণ
আমার নিজের মাংস কেটে দেব তাই কর ভোজন।
বয়স্ক বলে তোমার মাংস আমি নাহি নেব
বয়সে প্রাচীন তুমি আমি শিশুর মাংস খাব।

www.pathagar.com

প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি নাহি দেবে মোরে
বিদায় কর রাজন আমি ফিরে যাব ঘরে।
প্রতিজ্ঞার কথা এখন মনে করে কর্ণ
করিব ঘাতকের কর্ম ধর্ম রক্ষার জন্য।
ধৈর্য ধরে বস প্রভু নারায়ণ হে তুমি
পদ্যার নিকটে একটু জেনে নেব আমি।
পদ্যাবতি নামে ছিল রাজারও রমণী
উঠিয়া পদ্যার কাছে চলিল তখনি।
দেখে পদ্যা জিগায় কেন বিষণ্ন বদন
কি করিলে হেরিব তোমার আনন্দিত মন
রাজা বলে কহিবারও কথা নহে মুখে
বলিতে দারুণ ব্যথা বুক ফেটে যায় দুঃখে।
কোথা হইতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এলো
এমন যে নিদারুণ কথা সেজন জবানে কহিল।
বলে বিষকেতু নামে আছে তোমাদের নন্দন
তাহাকে কাটিয়া দাও হে করিয়া পারণ।
স্ত্রী পুরুষে করাতে ধরিয়া নিজ হাতে
পুত্রকে কাটিয়া মাংস আমাকে দাও খেতে।
মমতা আসিলে প্রাণে মাংস নাহি খাব
নরক হইবে তোমাদের আমি ফিরে যাব।
পদ্যা বলে অমন কথা না বলিও আর
ঐ কথা শুনিলে পরান বিধরে আমার।
পঞ্চম বৎসরের পুত্র মোর কিছু নাহি জানে
মা হইয়া পুত্রধন কাটিবে কেমনে।
মণি মুক্তা ধন যাহা অমূল্য রতন
ভান্ডার খুলিয়া দাও আছে যত ধন ॥
না হয় আমি প্রাণ তেজিব ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে
বিষকেতু পুত্র আমার নাহি দেব কাটিতে ॥
দশ মাস দশ দিন গর্ভেতে ধরিয়া
পুশিয়াছি পুত্র আমার বুকের রক্ত দিয়া।
মা বিনে জানে না কেহ পুত্রের কত দুঃখ
সকল দুঃখ ভুল হয়ে যায় দেখে পুত্র মুখ।
দুঃখীর বুকের মানিক বিষকেতু ছেলে
আর কেবা ডাকবে আমায় মুখে মা মা বলে।

www.pathagar.com

হরি বলে মম কোলে কে করিবে গান
মা হয়ে কেমনে বধি পুত্রের পরান।
খাঁচা ফেলে যেদিন চলে যাবে প্রাণ পাখি
কে শুনাবে হরিনাম শিয়রেতে থাকি।
হরি বলে দেবে মুখে তুলে জল
জীবনে ভরসা পুত্র অন্তিমের সম্বল।
কান্দিতে কান্দিতে পদ্যা পড়িল ধরায়
নয়নের জলেতে পদ্যার বক্ষ ভেসে যায়।
রাজা বলে ওগো রানি আমার বাক্য রাখ
পুত্র দিয়ে প্রাণ খুলিয়া কৃষ্ণ বলে ডাক।
কেবা আপন কেবা পর বন্ধু বলব কারে
অন্তিমে যে করিবে দয়া বন্ধু বলি তারে।
পুত্র দিয়ে যদি আমরা অতিথি সেবা করি
অন্তিমেতে ধর্ম হবে পারেরও কান্ডারি।
হেন কালে ব্রাহ্মণ এসে ডাক দিয়ে কয়
শীঘ্রগতি বিদায় কর বিলম্ব না সয়।
প্রতিজ্ঞা করিয়া পুত্র যদি না দাও মোরে
বিদায় করহে রাজন ফিরে যাব ঘরে।
তুমার পুত্র তুমি নিয়ে সুখে থাক রাজা
সত্য ভঙ্গের কারণে তুমার পেতে হবে সাজা।
যথা ধর্ম, তথা জয় শাস্ত্রে জানা আছে
তবে কেন পুত্রের মায়া তুমি করছ মিছে।
একথা শুনিয়া পদ্যা করিল স্বীকার
কাটিয়া পুত্রের মুণ্ডু পুরাই অঙ্গিকার।
পদ্যার মুখেতে রাজা অনুমতি পেয়ে
কহিতে লাগিল রাজা ব্রাহ্মণের সদনে
ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ বসুন আপনি
খেলিতে গিয়েছে পুত্র তাকে ডেকে আনি
বিষকেতু বলে রাজা যখনে ডাকিল
খেলার স্থলে বিষকেতু শুনিতে পাইল।
শুনিয়া পিতার ডাক বিষকেতু বলে
যাইতে হইল ঘরে বিদায় দাও সকলে।
গগনে হয়েছে বেলা কিছুই নাহি খাই
খাবার জন্য ডাকছে বাবায় যেতে হলো তাই

www.pathagar.com

বিদায় হয়ে বিষকেতু করিল গমন
যার যার ঘরে চলে গেল সকল রাখালগণ
ডেকে বিষকেতুকে বলে যত রাখালগণ
যেতে ছিলি ফিরে এলি কেন কি কারণ।
একথা শুনিয়া তখন বিষকেতু কয়
ভবে খেলার আসা-যাওয়া বুঝি এবার শেষ হয়।
বিদায় হয়ে যাই এবার সবারও সাক্ষাতে
বেঁচে যদি থাকি তবে আসিব খেলিতে।
একথা বলে বিষকেতু করিল গমন
পিতার নিকটে যেয়ে বন্দিল চরণ।
পুত্র কোলে নিয়ে কর্ণ চুম্বন দিল মাথে
নিয়ে গেল প্রাণের পুত্র পদ্যার সাক্ষাতে।
বিষকেতুর বদন দেখে পদ্যাবতি বলে
জন্মের মত ওরে পুত্র এসো লই কোলে
আহারে অভাগীর পুত্র মোর বাক্য রাখ
চন্দ্র মুখে দুঃখিনীরে মা বলিয়া ডাক।
কোথা হইতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এলো
এমন যে নিদারুণ কথা সে জবানে কহিল।
তোমাকে কাটিয়া মোরা দুজনে নিজ হাতে
রান্ধিয়া খাইতে দেব ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে।
একথা শুনিয়া তখন বিষকেতু কয়
কেঁদনা-কেঁদনা মাগো ধরি দুটি পায়
অনিত্য এই দেহ মাগো কি ফল হবে
মরিলে মাটির দেহ মাটিতেই মিশিবে।
বিদায় দিয়ে দাও মাগো ধরি শ্রীচরণে
মুক্তি পেয়ে যাব আমি মাংস দেয়ার গুণে।
একা আসা, একা যাওয়া কেবা ভবে কার
মুদিলে দুই আঁখি মাগো সবই অন্ধকার।
করাতে কাটিবে মাথা তাতে দুঃখ নাই
যাবার কালে তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাই।
যখনে কাটিবে মাথা না সরিবে বুলি
সর্বাঙ্গে লিখে দিও কৃষ্ণ নামের বুলি।
নাম স্মরণে যদি মাগো চলে যাবে প্রাণ
দিনও বন্ধু শ্রীপাদ পদ্যে তবেই পাব স্থান

www.pathagar.com

এতো দিনে হবে মাগো সার্থক জীবন
আমার মাংস নেয় যদি অতিথি নারায়ণ।
পিতা, মাতা, দুজনে আমার কথা লও
ব্রাহ্মণের সামনে আমার শীঘ্র নিয়ে যাও।
পুত্রের এই কথা শুনে মায় কাঁদিতে লাগিল
লক্ষ লক্ষ চুমা দিয়ে মা পুত্র কোলে নিল
বলে হরি বলা পাখি আমার কোথা চলে যাবি
আর কি আমায় কোলে বসে কৃষ্ণ নাম শুনাবি।
কর্ণ বলে ধৈর্য ধর শুন পদ্যাবতি
ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণ আছে দ্বারেতে অতিথি।
মিছা কেন ভাবছ পদ্যা পুত্রের মায়া ছাড়
যাহাতে পাইবা মুক্তি তাহার চিন্তা কর।
বলে কয়ে বুঝায়ে কর্ণ পুত্র চেয়ে আনে
উপস্থিত হইল নিয়ে ব্রাহ্মণও যেখানে।
ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ছেলে পরে গেল পায়
ফুকারি ফুকারি তখন কৃষ্ণ গুণও গায়।
ধরিয়া বলে বিষকেতু ব্রাহ্মণের চরণ
এই অভাগার মাংস কি প্রভু করিবে গ্রহণ
দেখিয়া কেতুর মুখ ভাবে ভগবান
কেমনে বধিব আমি এমন ভক্তের প্রাণ।
দেখি নাই এমন ভক্ত নামেতে পাগল
গোপনে গোপনে প্রভুর চক্ষে বহে জল।
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া বলে ভগবান
বিলম্ব আর সয়না কর্ণ, পুত্র কর দান।
ব্রাহ্মণের পদধূলি কর্ণ নিয়ে মাথে
হরি বলে ধ্বনি দিল বিষকেতুর মাথে।
হরি নামের ছাপা দিয়া দিল ছেলের গায়
ব্রাহ্মণের চরণের পাশে ছেলেকে বসায়।
তার পরে দুজনে করাত ধরে নিল
আনন্দে পুত্রের মাথা করাত ধরে নিল
স্বামী স্ত্রীতে টান যখন দিল করাত ধরি
উচ্চস্বরে বিষকেতু বলে হরি হরি।
কাটিয়া পুত্রের মুণ্ডু ফেলে ভূমি তলে
মাটিতে গড়ায় মুণ্ডু হরি হরি বলে।

www.pathagar.com

মাটিতে গড়ায় যখন বিষকেতুর মাথা
উচ্চস্বরে বলে আমার গোবিন্দ রইল কোথা।
শুনিয়া মুণ্ডের বাণী বলে ভগবান
বিষকেতুর মাথা আমার হাতে কর দান।
ধরিয়া ভক্ত মুণ্ড বলে ভগবান
তাড়াতাড়ি রান্না করে আমায় কর দান।
নিয়ে গেল দেহ মুণ্ড পদ্যাবতি সতী
রান্না করে ভোজের জোগাড় করবে শীঘ্র গতি।
পদ্যা নিয়ে রাখে পুত্রের কাটা মাথা খান
কোলে থেকেও মরা ছেলে বলে কৃষ্ণ গান।
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া পদ্যাবতি নারী
দেহের মাংস শত খণ্ড করে তাড়াতাড়ি।
ভাণ্ডিতে ছেলের মাথা মুখের দিগে চাইল
আহা পুত্র বলে অমনি প্রাণে মায়া এলো।
মুণ্ড কোলে নিয়ে কাঁন্দে পদ্যাবতি নারী
ভাণ্ডিতে ছেলের মাথায় কেমনে দেব বাড়ি।
আহারে দারুণ বিধি কি করি উপায়
পুত্রের শোকেতে অমনি মূর্ছা খেয়ে যায়।
ক্ষণেক পরে চেতন পেয়ে ভাবে মনে মনে
বিষকেতুর মাথা আমি রাখিব গোপনে।
যখনে পরিবে মনে প্রাণের পুত্রের কথা
বাহির করিয়া আমি তখন দেখিব এই মাথা।
এই ভাবিয়া কাটা মুণ্ডু গোপনে রাখল
অন্তর্যামী ভগবান সব অন্তরে জানিল।
ডাকিয়া ব্রাহ্মণ বলে শোনো আমার কথা
ডাক দিয়া আমি তোমার পদ্যাবতি কোথা।
একথা ব্রাহ্মণ মুখে শুনে কর্ণ যদি
ভাবে সেবাতে বুঝি আমি হইলাম অপরাধী।
তাড়াতাড়ি গিয়ে কর্ণ পদ্যাকে ডাকিল
ছেলের মাংস চৌকায় রেখে তখন চলে এলো।
করজোড়ে বলে দুজন ব্রাহ্মণের ঠাঁই
কিবা বাক্য দয়া করে বলহে গোঁসাই।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলে এবা কেমন কথা
গোপনে রাখিলা কেন বিষকেতুর মাথা।

www.pathagar.com

অর্ধ মাংস আহার করে আমি নাহি যাব
তোমার ছেলের মাথায় আমি মুড়িঘন্ট খাব।
তাই শুনিয়া পদ্যার প্রাণ কাপে থর থর
কর্ণ বলে ওগো প্রিয়া প্রাণে ধৈর্য ধর।
মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট কর তাড়াতাড়ি
বুঝি এই পরীক্ষা করতে এলো বংশীধারী
রান্না শেষ করিয়া পদ্যা আসন করে দিল
ধূপ দীপ জ্বালাইয়া অতিথিকে বসাইল
ব্রাহ্মণ বলে একা আমি না করিব আহার
আমাকে খাওয়াতে যদি বাসনা তোমার।
বিষকেতুর মতো একজন ছেলে আন ডেকে
পরেতো খাইব আমি খাওয়াইয়া তাহাকে।
একথা শুনিয়া কর্ণের উড়িল পরান
পুত্র হত্যাকারীকে কেবা ছেলে করবে দান।
কান্তে কান্তে রাজা তখন চলিল পাড়ায়
কর্ণকে দেখিয়া সকল দৌড়িয়ে পালায়।
সবে বলে নর রাক্ষস কর্ণ বুঝি এলো
পুত্রকে কাটিয়া সেজে অতিথি সেবা দিল।
পুত্র না পাইয়া কর্ণ ঘরে ফিরে যায়
ব্রাহ্মণের চরণে পরে কেঁদে মূর্ছা যায়।
ব্রাহ্মণ বলে রাজা চিন্তা করছ কেন
করিয়া দেব ছেলের জোগাড় প্রাণে ধৈর্য মান।
বিষকেতু নামে তুমি ডাক উচ্চস্বরে
দেখত প্রাণের পুত্র তোমার আসতে আবার পারে।
একথা শুনিয়া তারা হইল অবাক
প্রাণ খুলে বিষকেতু বলে ছাড়ল হাঁক।
দূর থেকে বিষকেতু দোড়ায়ে আসিল
বাবা বলে ঝম্প দিয়ে পিতার কোলে গেল
পুত্র বলে কেন বাবা ডাকছ আমারে
খেলা ছেড়ে আসিতে মন চায়না ঘরে।
কর্ণ দেখিয়া অমনি পুত্রের বদন
মুখে চুমা দিয়ে অমনি দিল আলিঙ্গন।
আয়রে বাছা বক্ষে ধরে জুড়াই প্রাণের ব্যথা
দৌড়ায়ে এলো পদ্যা শুনে পুত্রের কথা।

www.pathagar.com

পুত্র কোলে নিয়ে দুজন আনন্দ পাইল
প্রভুর আনন্দ লীলা বুঝিতে পারিল।
পুত্র নিয়া দিল দুজন ব্রাহ্মণেরো কাছে
ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পুত্র হরি বলে নাচে।
একা একা এলে কৃষ্ণ মোরে রেখে বনে
নিষ্ঠুর পাষাণ তুমি মায়া নাই পরানে।
বিষকেতুর কথা শুনে বলে মনচোরা
আমি কি থাকিতে পারি প্রাণের ভক্ত ছাড়া।
এতেক শুনিয়া কর্ণ পরে গেল পায়
বলে চক্ষু দাও হে দয়াল চিনিতে তোমায়।
পতিত পবন তুমি অগতির গতি
তব দয়া বিনে কভু চিনিতে নাই শক্তি।
অপরাধ করিয়া যদি থাকি তব পায়
ক্ষমা কর দীন বন্ধু চেনা দাও আমায়।
একথা শুনিয়া প্রভুর দয়া উপজিল
ত্রিভঙ্গ মুরতি ধরে সামনে দাঁড়াইল।
তিন জনে দেখে যদি ঐ রূপো মাধুরী
প্রাণ খুলিয়া তখন তারা বলে হরি হরি।
প্রভু বলে ধন্য ধন্য দাতা কর্ণ তুমি
পরীক্ষা করিতে তব পুত্র নিলাম আমি।
প্রাণের অধিক পুত্র তুমি আমায় করলে দান
ধন্য ধন্য দাতা কর্ণ তুমি পুণ্যবান।
আমার পরীক্ষাতে যে জন করবে পাস
ইহলোকে সুখে থাকে অন্তে গোলক বাস।
পুত্র দিয়ে বলিদান ধন্য হলে তুমি
তোমার মুক্তির জন্য বাঁধা রইলাম আমি
এতেক বলে গোলক নাথ গোলকেতে গেল
বদন ভরিয়া সবাই হরি হরি বলো।
বিষকেতুর বলিদান যে শুনে যে গায়
ইহলোকে সুখে থাকে অন্তে গোলক পায়।
যেবা জনা হেন কথা লিখে রাখে ঘরে
সঙ্কটেতে মুক্তি পায় হরি নামের জোরে।
আমি অতি মূঢ়মতি ভজনও বিহীন
কৃপা করে মুর্শিদ তুমি জানাইও মৃত্যুর দিন।

www.pathagar.com

বিষকেতু দাতা কর্ণের জারি সাঙ্গ হলো
মুসলমানে আল্লা রসুল, হিন্দু ভাই হরি বলো
সাইদুর রহমান বয়াতির রচনা শাস্ত্রে যাহা পাই
ভুলত্রুটির তরে সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

মাদার মুনির জারি

মাদার মুনির জারি একটি লোককাহিনি। এটি লোকমুখে প্রচারিত। এই জারিটি মানিকগঞ্জের জারিগানের বিখ্যাত বয়াতি ইব্রাহিম বয়াতি আসরে গাইতেন। মাদার মুনির জারি বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বর্তমান প্রজন্মের গায়করাও এই জারি গেয়ে থাকেন।

আজগবি হইল যেমন মাদার এর জনম
ফাতিমা পালিল তারে করিয়া যতন।
এক মাস দুমাস করে যখন পাঁচ বছরের হলো
একদিন হঠাৎ করে শের-ই আলী দেখিতে পাইলো।
আলী বলে ও জহুরা একি সমাচার,
বাড়ির ভেতর ছোটো ছেলে ঐ ছেলেটি কার ?
ফাতিমা বলে স্বামী শোন তার খবর
যে ছেলেটি দেখতে পেলে ও ছেলে আমার।
যে দিনে শিকারেতে গিয়াছিলা তুমি
সেই দিনেইতো মাদার মুনি পেয়েছি যে আমি।
হযরত আলী বলে জহুরা বুঝে নেব তারে
কেমন তোমার মাদার মুনি পরখ দেখাও মোরে।
মায়ে বলে পরখ দেখাবে শোন সে খবর
এলিজাহিদের বিয়ে হবে দামেস্ক শহর।
এলিজাহিদের বিয়ে হবে দামেস্ক শহরে
সেই দিনে পরখ মাদার দেখাবে সংসারে।
এমনি হালে কয়েক দিন গুজারিয়া যায়
মাদার মুনি মায়ের কাছে ডাক দিয়া কয়।
মাদার মুনি বলে মাগো নিবেদন জানাই
বিদায় কর মা জননী সুমারেতে যাই।
মায়ে বলে ওরে মাদার সেতো বড়ো কঠিন
সুমারেতে যাইবা কেমনি না হলে মোমিন।
সেই যে সুমারের রাস্তা বহু কঠিন আছে
সেখানেতে গেলে বাবা প্রাণে মরবা শেষে।
ঘরে থাকো মুর্শিদ ভজ ওরে আমার বাবা

www.pathagar.com

বারো তীর্থের ছোয়াব তুমি ঘরে বসে পাবা।
মাদার বলে মা জননী কি বলো আমারে
বরকতের বেটা হয়ে মুর্শিদ ভজব কারে।
তোমার বুকের দুগ্ধ খাইয়া শরীর করছি মোটা
তোমার দুগ্ধের বল থাকিতে কেবা দেবে খোঁটা।
আরশ মাদার হয়ে আল্লার দরবারেতে থাকি
মন করিলে আখের ফানা লুকাইতে পারি।
সাত দিনের মধ্যে আমি নাহি খাব দানা
সাত দিনের পর আল্লার আরশ হবে ফানা ফানা।
শোন শোন মা জননী বলি যে তোমায়
ঐ দেখ নানা আমার চলেছে কোথায় ?
ঐ দেখ নানা আমার চলছে ধীরে ধীরে
সঙ্গে আছে কেতাব কোরান আরো বড়ো পির।
মায়ে বলে শোন মাদার বলি প্রকাশ করে
নামাজ পড়তে চলছে বাপজান বায়তুল্লার ঘরে।
কেমন করে পড়ে নামাজ শোন সেই বারতা
এক ঠাঁইতে ধর রবে আর আরেক ঠাঁইতে মাথা।
দুই ঠাঁইয়ে দুই হাত রবে, আরো দু ঠাঁইয়ে দুই পাও
মন পবন ছাড়িয়া যাবে ধরে রবে না কেউ।
ধর হইতে জুদা হয়ে যাবে যদি কল্লা
পশমে পশমে নানার বলবে আল্লা আল্লা।
মাদার বলে এ কথা মনে না মোর ধরে
না যেন কোন ডাকাতে নানার উম্মত ফেলবে মেরে।
নানার যত উম্মত আছে কঠিন রোজ হাশরে
উদ্ধার করিব বলে কান্দে জারে জারে।
যে মারিবে নানার উম্মত বেঁধে আনব তারে
কয়েদ করিয়া রাখব দোযখের মাঝারে।
যত দিন থাকে দুনিয়া তত দিন রাখিব
রোজ হাশরের দিনে তাকে খালাস করে দেব।
মায়ে বলে ওরে পাগলা তুই যে আমার বেটা
কারবা সাথে করবে লড়াই কেবা দেবে খোঁটা।
খোঁটা দিলে লাগবে কালি ছেড়ে যাবে দূরে
আপছোছের তীর লগিবে আমার কলিজার মাঝারে।
মাদার বলে তোমার স্তনের দুগ্ধ খাইয়া দেহ করছি মোটা

www.pathagar.com

তোমার দুগ্ধের বল থাকিতে কেবা দেবে খোঁটা।
একথা শুনিয়া মায়ের চোখের আড়াল হলো
মাদার মুনি সেখান থেকে রওনা দিয়া গেল।
হেন কালেতে মাদার মুনি করিয়া গমন
নীল দরিয়ার পাড়ে যাইয়া দিছে দরশন।
নীল দরিয়ার পাড়ে যখন মাদার খাড়া হইল
হেন কালেতে বড়ো পিরকে দেখিতে পাইল।
বড়ো পিরে বলছে পাগলা জিজ্ঞাসি তোমায়
কোনবা মায়ের পুত্র তুমি চলিছ কোথায়?
মাদার বলে হযরত আলীর বেটা আমি মাদার মুনি নাম
সুমারেতে যাব আমি আছে আমার কাম।
বড়ো পিরে বলে ভাইরে আমার কথা লও
মায়ের বাক্য লঙ্ঘন করছ ঘরে ফিরে যাও।
না শুনিয়া কারো কথা রওনা দিয়া গেল
সামজাম পর্বতে যাইয়া উপনীত হইল।
সামজাম পর্বতে যাইয়া মাদার খাড়া হইল
কতগুলি রাখাল বালক খেলার ছলে এলো।
রাখালগণকে বলে মাদার তোমা সবাকারে
সামজামে যাব আমি কোনবা রাস্তা ধরে।
রাখালগণে বলে ফকির বলি যে তোমারে
সামজাম এসে কেন জিগাও বারে বারে?
কাবু চাবের ফকিরের দল করে সর্বনাশ
নিগুইনা ফকিরের নাম দিলে হয় নাশ।
যাদের দেখতে ভালো কথায় মিষ্টি আরো ভালো জ্ঞান
মুরিদ না হলে তারা এসব পাবে কেন।
একথা শুনিয়া মাদার গোস্যা হয়ে গেল
অবুঝ বালকের সাথে কি ব্যবহার করলো।
মাদার মুনি বলে রাখালগণ কর একটা কাম
মুখে সবাই বল দেখি মিরমুদি নাম।
মিরমুদি নাম যদি বালকেরা কইল
ধর হইতে ছের (শির) সবার জুদা হয়ে গেল।
তাই দেখিয়া মাদার মুনি মনেতে ভাবিয়া
ধর ছের (শির) জুদা ছিল নিল মিলাইয়া।
মরা সবার ধর ছের (শির) একত্র মিলাইয়া

www.pathagar.com

মরে ছিল যত বালক দিলা বাঁচাইয়া।
বালকগণের মাথার চুলে দিলা একটা গিরা
বলে বেড়াও তোমরা সবাই ভকায় বাড়ি দিয়া।
সেখান হইতে মাদার মুনি করিয়া গমন
বড়ো পিরের বাড়ি যাইয়া দিল দরশন।
বড়ো পিরের বাড়ি যদি হইল হাজির
দোম দোম বলিয়া মাদার ছাড়িল জিকির।
তাই দেখিয়া বড়ো পিরে অন্দর বাড়ি গেল
বিবিগণের কাছে যাইয়া বলিতে লাগিল।
শোন শোন বিবিগণে বলি সবাকারে
এসেছে বরকতের বেটা চাউল নি আছে ঘরে।
বিবিগণে বলে হজরত তোমাকে জানাই
শুধু ভাত খেয়ে যাবে, অন্য কিছু নাই।
মাদার মুনি বলে নানা তোমার জানা নাই
অতিথি হইয়া আমি যার বাড়িতে যাই
মোরগা মুরগি জবাই করে উদর ভরে খাই।
বড়ো বড়ো মোরগ নানা দেখি তোমার ঘরে
তবে কেন শুধু অন্ন খেতে দেবে মোরে?
একটি মোরগ কর জবাই খুশি মনে খাই
তা নাহলে নানা আমি বেজার হয়ে যাই।
বড়ো পিরে বলে মাদার বলি প্রকাশ করি
কুদরতি মোরগা মুরগি দেখছ আমার বাড়ি।
জবাই করে খাইলে আমি আবার তাজা করি।
মাদার মুনির মনের দুঃখ বুঝিতে পারিয়া
বড়ো একটি মোরগ ধরে দেয় জবাই করিয়া।
জবাই করা মোরগ তখন গোস্ত বানাইল
গিলা মাইটা দিল কলিজা আলাদা রাখিয়া।
বিবিগণে পাকায় খানা ভিতর বাড়ি বইয়া
রান্ধিয়া বাড়িয়া খানা মাদারকে খাইতে দিল,
তাই দেখিয়া মাদার মুনি জ্বলিয়া উঠিল।
মাদার বলে ওগো নানা বলি প্রকাশ করে
মুল্লুকের চোরা গিন্নি আছে তোমার ঘরে।
অতিথি না দিয়া খানা চুরি করে খায়
এসব দেখে আমি এখন বাঁচি না লজ্জায়।

www.pathagar.com

একথা শুনিয়া বিবিগণ শরমেন্দা হইল,
দিল কলিজা গিলা মাইটা পাকাইয়া আনিল।
খোশ দিলে মাদার মুনি সেই খানা খায়
তার পরে থোরা ঘড়ি গুজারিয়া যায়।
বড়ো পিরে বলে মোরগ কার বা পানে চাও
মাদার মুনির পেটে একবার তাজা হইয়া যাও।
একেতো কুদরতি মোরগ আরো হুকুম পাইল
মাদার মুনির পেটে অমনি তাজা হয়ে গেল।
মাদার মুনির পেটে মোরগ উক্কুর উক্কুর করে
মাদার বলে আমি বুঝি গেলাম যমের ঘরে।
পেটে থেকে মোরগ যদি পাক ঝাড়া দিল,
মাদার মুনি কুল মোখলুকাত অন্ধকার দেখিল।
বড়ো পিরে বলে মোরগ আমার কথা লও
মাদার মুনির পেটে এখন হজম হইয়া যাও।
একেত কুদরতি মোরগ যদি হুকুম পাইল
খাইয়া ছিল যে মোরগ মিছমার হয়ে গেল।
বড়ো পিরে বলে মাদার তুমি জান না
মায়ের কথা যে না শুনে তার ভালোতো হয় না।
মায়ের বাক্য না মানিয়া চলে আইছ তুমি
তার জন্য কিছু সিজ্জত দিয়া দিলাম আমি।
সেখান হইতে মাদার মুনি বিদায় হয়ে গেল
সুমার পর্বতে গিয়া উপনীত হইল।
যখনেতে মাদার মুনি সুমারেতে গেল
হেন কালেতে সুলতান বাদশার মানিক চোরে নিয়ে গেল।
মানিক রতন বলে যারে মানিক কেমন ধন
সের কুটা ভাজন বেটা মানিক সেইজন।
সেই মানিক নিয়া আজরাইল চলছে শূন্য ভরে
কে যাও কে যাও বলে মাদার ডাকছে আজরাইলেরে।
মাদার মুনির ডাক শুনিয়া ভাবছে আজরাইল
কেউ বুঝি ডাকে না স্বর্গে, গর্জে বুঝি শিল।
কেমন হালে চলছে সক্স শোন তারি কথা
গগন মণ্ডলে তাহার ঠেইকা চলছে মাথা।
দুখানি হস্ত দিছে মগরেবে ছাড়িয়া
দুইখানি পদ দিচ্ছে মৃত্তিকায় নামাইয়া।

www.pathagar.com

অগ্নির জুতা অগ্নির মুজা অগ্নির পুশাক গায়
অগ্নি বেশে চলছে আজরাইল অগ্নি ছাড়া নয়।
অগ্নির মধ্যেই চলছে ভেসে অগ্নির তাহার ঘোড়া
অগ্নির জ্বলছে দুটি চক্ষু অগ্নির হাতে কুড়া।
মাদার মুনি বলে সক্‌স ডাকি বারে বারে
মঞ্চ থেকে ডাকি আমি দাড়াও বা একবারে।
আজরাইল বলে বায়ু আমি চলছি শূন্য ঘরে
মঞ্চ থেকে ডাকে আমায় সেবা কোনজনারে?
বলে বায়ু চলছি আমি মৃত্তিকাতে নয়
মঞ্চ থেকে কে ডাকিল একটু শুনে যেতেই হয়।
এতেক ভাবিয়া মঞ্চে বাড়াইল পাও
মাদার বলে ওরে বেটা কোথায় তুমি যাও।
ছেলামালিক সরকারি চিজ সবাই দিয়ে থাকে
সেও ছেলামালিক বেটা কিছুই নাই তোর মুখে।
আপনি আল্লা ছালাম জানায় আলম তনের সাথে
সেই আদব বলতে দেখি কিছুই নাই তোমাতে।
আদম জাতির সাথে আদব কিছুই নারে কও
নিশ্চই জানিলাম তুমি আদমের সমান নও।
পাগলা মাদার বলে বেটা জিগাই তোমার কাছে
বলেতো সরকারে তোমায় কি চাকুরি আছে ?
রোজ মজুরি কত মিলে বৎসরে কি হয়
আজরাইল বলে আমায় মায়না চুক্তি নয়।
আল্লার হুকুমে চলি আমি তার হুকুমে নড়ি
সার কেবল আল্লাজির নাম মায়না তুচ্ছ করি।
কি করিব মায়না দিয়া কাকে দেব খেতে
কোনো কিছুর নাই প্রয়োজন আল্লা আছে সাথে।
মাদার মুনি বলছে বেটা একটি কথা বলি
তুমি যার ঘরেতে করছ চুরি সেই দেয় তোমায় গালি।
কেমন করে করছ চুরি বল না আমারে
জীবের জানের সাথে তুমি আছ জগত ভবে।
সারা জীবন করছ চুরি দয়া মায়া নাই
সময় কি অসময় বলতে তোমার কাছে নাই।
জান কবজ কর তুমি আমি তাহা জানি
এজীবনে একদিনে জানের ছুরত দেখছনি।

www.pathagar.com

যখনেতে আল্লা প্রথম মিলাইল কাচারি
আমি তখন দিন চারি পাঁচ করিতাম চাকুরি।
জান কবজ করে আমি এসে রাহা পরে
উল্টায়ে পুল্টায়ে ছুরত দেখতাম নয়ন ভরে।
আজরাইলে বলে পাগলা কি বলছ আমায়
কভুতো শুনি নাই জানের ছুরত দেখা যায়।
মাদার মুনির কথায় আজরাইল রাজি হয়ে গেল
ধর ধর বইলা জান মাদারের হাতে দিল।
ফাঁকি জুকি দিয়া মাদার জানটা নিল হাতে
মনে মনে বলছে আমার কার্য হলো ফতে।
এই জানটা দিয়া আমি খেলবরে বাইল বাইল
নিতান্ত যদি না ছাড়ো জান নিয়া যাইও কাইল।
আজরাইলে বলে ফকির তোমাকে জানাই
ছুরত দেখে জানটা দাও দরবারেতে যাই।
মাদার মুনি বলছে আজরাইল আর বুঝিবা কত
নিশ্চই জানিলাম তুমি পাগলা কানাইর মত।
রাজি হয়ে গেছ তুমি আমারি কথায়
কেমন করে বুঝলে জানের ছুরত দেখা যায়?
আজরাইলে বলে বেটা করছ তালিবালি
জানটা যদি না দেবে জুলমতের কুরা খুলি।
মাদার মুনি বলে সক্স তুমাকে জানাই
কুরা দেখায়ে জান নেবে তোর এমন সাধ্য নাই।
শোন শোন ওরে দুষ্ট সাবধান
ইচ্ছা জান দেব না কগা তোর আল্লারে।
অপারগ হইয়া আজরাইল রওনা দিয়া গেল
আল্লা বলে ওগো আজরাইল বলি তব স্থানে
জান আনতে গিয়ে এতো বিলম্ব হয় কেন?
আজরাইলে বলে ওগো শোন মেহেরবান
রাস্তায় এসে ডাকাতের হাতে হারিয়েছি জান।
এমন ডাকাত সেজন পরান বিদরে
জান চাইলে গালি দিয়ে কয় কগা তোর আল্লারে।
আল্লায় ভাবছে আমার কাজে লাগল লেঠা
নিশ্চই জানলাম সে যে বরকতেরই বেটা।
শোন শোন ওহে আজরাইল আমার বাক্য শোন

www.pathagar.com

জান শহিদে ঐ বেটারে দরবারে আন।
এতেক শুনিয়া আজরাইল রওনা দিয়ে গেল
মাদারের নিকটে গিয়ে হাজির হইল।
আজরাইলের সাথে মাদার রওনা দিয়ে গেল,
আল্লার দরবারে যাইয়া মাদার খাড়া হলো।
আল্লায় বলে ফেরেস্তাগণ আমার কথা লও
জান শহিদে এ বেটারে দোযখেতে দাও।
দোযখেতে যায়রে মাদার ডানে বামে চায়
হাজার হাজার গুনাগার দেখিবারে পায়।
তখন মাদার কান্দন করে বলে বরকত মা
তোর পাগলা মাদার বলে কি দয়া হলো না।
একথা শুনিয়া মায়ে দরবারেতে গেল
বেহেস্তের চান্দা মায়ে দোযখে টানাইল।
আসমান দোয়া পরে ফুঁকে দোযখেতে
ঠান্ডা হলো দোযখের তাপ দোয়ার বরকতে।
মায়ের দয়ায় মাদার মুনি বড়ো সুখে রইল–
আল্লা নিজে ফেরেস্তাদের কহিতে লাগিল।
তখনেতে মাদার মুনি দরবারেতে গেল।
আল্লা বলে ওরে মাদার আমার কথা লও
সুলতান বাদশার ছেলের জানটা দরবারেতে দাও।
মাদার মুনি বলে আল্লা বলি করজোড়ে
তেরো দণ্ডের পরে জানটা আনিব দরবারে।
সেখান থেকে মাদার মুনি করিল গমন,
রাসুলাল্লাহর নিকটে যেয়ে দিল দরশন।
জানটা দিয়ে গোলার বস্তু গোলায় দিল ঢেলে
বাঁচিয়া উঠিল ছেলে আল্লা রাসুল বলে।
সালাম করিল যাইয়া রাসুলাল্লার পায়
রাসুল করিল দোয়া হস্ত দিয়া গায়।
বিশাল বছর বাছা বেঁচে থাক তুমি
আল্লার কাছে এই দোয়া দিয়া দিলাম আমি।
মাদার বলে রসুল বল প্রকাশ করে
এতো দিনের আয়ু তুমি দিলা কেমন করে?
তেরো দণ্ডের করাল করে আল্লা জান দিছে আমারে
কি জবাব দিব আমি আল্লার দরবারে?

www.pathagar.com

রাসুলাল্লাহ বলে মাদার না ভাবিও আর
আমার দোয়া হবে কবুল হক আল্লার দরবার।

জয় বাংলার জারি

প্রথমে বিসমিল্লার নামটি করিয়া স্মরণ
পিতা, মাতার চরণ যুগল করিলাম বন্ধন।
অলি আল্লা পির আওলিয়ায় সালাম জানাইয়া
বাংলাদেশের হালচাল কিছু রাখিলাম লিখিয়া।
আড়াইশো বৎসর লুটে খাইল বিদেশি চাটুকারে
তাই দেখিয়া শেখ মুজিবের দুঃখে অন্তর পুড়ে।
মনশিক্ষা বলতে আমার হবে অনেক দেরি
সত্য কথায় লিখিয়া দিলাম জয় বাংলার জারি।
উনিশশো সত্তর সালের সাতই ডিসেম্বর
আওয়ামী লীগের নায়ক হলো শেখ মুজিবুর।
দেখে উপযুক্ত স্বদেশ প্রিয় সবাই করলাম জোট
শতকরা দিলাম তারে আটানব্বই ভোট।
ছয় দফা কায়েম করিবে শেখ মুজিবের দাবি
তাই দেখিয়া ইয়াহিয়া দিল উল্টা চাবি।
যত মারাত্মক সামরিক অস্ত্র গোপনে আনিয়া
বাংলার বুকে রাখল এক লক্ষ মিলেটারি দিয়া।
পঁচিশ মার্চ রাত্রের কথা করলে স্মরণ,
বুক ভেসে যায় যেভাবে হলো বাঙালির মরণ।
বৃহস্পতিবার রাতে বাংলার বক্ষ হইতে
শেখ মুজিবকে নিয়ে বেটা গেল করাচীতে।
টিক্কা খানকে পাঠাইল বাংলার গভর্নর
যত নরহত্যা ছুটতে লাগল এদেশের উপর।
গর্জে উঠল বন্দুক কামান মেশিনগানের গুলি,
প্রথমেই আরম্ভ হলো ঢাকার বুকে বলি।
সুজলা সুফলা বাংলার সোনার বক্ষ খান
লক্ষ লক্ষ সন্তানের রক্তে বয়ে চলে বান।
যত লেলিহান কুকুরের বাচ্চা বাংলায় এসেছিল
তাদের জন্য বাংলাদেশের এমন দশা হইল।
সারা বাংলায় পড়ে গেল দারুণ হাহাকার
কত মন্দির কত মসজিদ করিল ছারখার।

www.pathagar.com

হল শহর কি বন্দরে আরো টাউনও বাজারে
নিরস্ত্র বাঙালি হত্যা করল অবিচারে।
সারা বাংলায় বয়ে চলে রক্ত নদীর ঢেউ
কে কোথায় হারায়ে গেল টের পেল না কেউ।
কোথায় গেল পুত্র কন্যা কোথায় গেল ভাই
কোথায় গেল স্বামী ও স্ত্রী দেখা শোনা নাই।
বাবা মায়ের বুকের রক্ত অন্তরের রতন
চক্ষের সামনে এনে দিল বিসর্জন।
স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে ছিনাইয়া নিল
পাশবিক অত্যাচার করে পরানে বধিল।
স্কুল কলেজের মেয়ে ধরল হাজারে হাজার
গেরস্তেরও কন্যা ধরে করল অত্যাচার।
পুত্র শোকে কন্যা শোকে কান্দে কত জন
গাছের ডালে ফাঁসি নিয়ে তেজিল জীবন।
স্ত্রীর শোকে কত জনায় পাগল হয়ে গেল
আল্লা বিনে সেসব দুঃখ কে বুঝিবে বলো।
কত সুখের সংসার পুড়া দিয়ে করে দিল ছাই
কত সোনার মানুষ সর্বহারা বসবার জায়গা নাই।
মানুষ যারা পাখির বাসা পুড়তে ব্যথা পায়,
এ কেমন মানুষ পয়দা করছে আপনি খোদায়।
মা বোনেদের পুলার গরম নিলরে ছিনাইয়া
ধন রত্ন সব লুটে নিল ডাকাতি করিয়া।
রাজনীতি ধর্মনীতি সমাজনীতি আছে
ইয়াহিয়ার জল্লাদনীতি কোথায় নি আছে।
যখন আগুন দিল বন্দুক ধরল আরো মেশিনগান
বাড়ি ছেড়ে দৌড়ায়ে কত রক্ষা করে প্রাণ।
কেও মরল কেও অর্ধমরা বন্দুকের গুলিতে
কেও যেয়ে জঙ্গলে মরল কেহ মরল পথে।
কোন দোষেতে দোষী হইল বাংলা মার সন্তান
তুমি হাসরের দিন হিসাব দিও ইয়াহিয়া খান।
যত জল্লাদের দল মেলিটারি বাংলাদেশে ঢোকে,
লোভ দেখিয়ে দালাল গুণ্ডা নিল তাদের পক্ষে।
নিমক হারাম বিশ্বাসঘাতক নিমকহারাম যারা
বাংলার সন্তান হয়ে এদেশ ধ্বংস করল তারা।

www.pathagar.com

বাংলার হলো দালাল গুণ্ডা কেউ রাজাকার
তাদের জন্য বাংলার বুকে এতো অত্যাচার।
কত সোনার মানুষ সর্বহারা বনে আশ্রয় নিল
অত্যাচার অনাহারে কত পথে ঘাটে মরল।
নিরপরাধ বাংলার মানুষ পেল কত দুখ
সেসব কথা মনে হলে দুঃখে কাটবে বুক।
প্রাণের ভয়ে কতজন ভারতে চলে গেল
পুত্র-কন্যা ভাই বেরাদর নিরুদ্দেশ রহিল।
কত সর্বহারা অর্ধ মরা হিন্দু মুসলমান
বেথিত হয়ে ভারত মাতা তাদের দেয় স্থান।
ঔষধপত্র নিরাশ্রয়কে আশ্রয় করল দান
ভারত মা বাঁচাল বাংলার এক কোটি সন্তান।
বাংলার সন্তানের ভাগ্যে দেখে অফুরন্ত ব্যথা
বিশ্বের দরবারে ভারত জানায় বাংলার কথা।
কত ভাবে জানাল সেই ইয়াহিয়ার কাছে
যেভাবে বাঙালি জাতি স্বাধীন মতো বাঁচে।
রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি আর
কোনো নীতি খানের বংশ করল না স্বীকার।
এ সমস্ত কাণ্ড হলো, হলো যত বার
সমস্ত বলিতে আমার লাগবে এক বৎসর।
এদিগেতে শত কোটি বাঙালির পরান মুজিবুর
তারে কত কষ্ট দিল—কে নেবে খবর।
আবার ভারত মা ইন্দিরার কোলে কোটি লোকের বোঝা
কিভাবে দূর করবে এই বাঙালিদের সাজা।
এমনি মতো চলে যদি সবুজ বাংলাদেশ
তবে দুনিয়া হইতে বাঙালি জাতি হয়ে যাবে শেষ।
এগিয়ে দেয় লক্ষ বাংলার ছেলে দেশের জন্যেতে
তারা গেরিলা পদ্ধতি চালায় মিলিটারির সাথে।
তাদের বল, বিক্রম, সাহস আর একতা দেখিয়া
একটু ভরসা এলো আল্লা বুঝি রাখিবে বাঁচাইয়া।
যে তারিখে হইছিল গণতন্ত্র নির্বাচন
ঠিক সেই তারিখ সাতই ডিসেম্বর আনিল জখম।
দেখে ধর্মনীতি রাজনীতি একতা শক্তি
বাংলাদেশ স্বাধীন বলিয়া ভারত দেয় স্বীকৃতি।

www.pathagar.com

আমাদের আঁধার গেল ফর্সা এলো উদয় পূর্বাকাশ
ভাবি এতো দিনে স্বাধীন দেশে করতে পারব বাস।
আমাদের মুক্তিপক্ষের সাথে মিশে মিত্রপক্ষ দল
দেখাইলো খান বাহিনীর কর্মের প্রতিফল।
ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে, ধর্ম চির তাজা
বুঝে দেখ ইয়াহিয়া কোন কাজের কি মজা।
যত দালাল গুণ্ডা ষণ্ডা পাণ্ডা শত্রু যত দল
বাংলার বুকে তাদের বংশ হলো রসাতল।
মিলিত জোয়ানের হাতে খানের বংশগুলি
বাংলার বুকে হয়ে চলে ছাগল পাঁঠা বলি।
পাক সেনা চালক নিয়াজি সাহেব যিনি,
চতুর্দিকে খুব অন্ধকার দেখতে লাগল তিনি।
বিপদ দেখে সংবাদ দিল ইয়াহিয়ার কাছে
এমন সময় ভুট্টো সাহেব জাতিসংঘে গেছে।
এমন সুখের সংবাদ যদি ভুট্টো সাহেব পেল
রাগের চোটে পেট ফুলিয়ে দুম্বার মতো হলো।
রাগের সাথে দাঁড়াইয়া দেয় পুঁতি ধরে টান
তার ব্যবহারে সবে বলে বাপরে কি জোয়ান।
ভাঙা ছাতির মতো গেল সভাকক্ষ ফেলে
এ সমস্ত বলতে অনেক সময় যাবে চলে।
এ দিকে ঢাকার খবর শোনেন বন্ধুগণ
নিয়াজি জানাল করবে আত্মসমর্পণ।
আমাদের মিত্র পক্ষ চালাক সামরিক নেতা যিনি
একটি দলিল নিয়ে সদর ঢাকায় চলে এলেন তিনি।
বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন কবুল
সাক্ষী রইল বিশ্ববাসী, আল্লা আর রসুল।
যদি প্রাণের ভয়ে দুশমনের দল করে আত্মদান
চব্বিশ বৎসরের যত দুঃখ হলো অবসান।
উঠল জয়ধ্বনি, জয় মুজিব ধ্বনি, বাংলা জয়গান
ইন্দিরা গান্ধী জয় ধ্বনি আর ভারতের জয়গান।
বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গণতন্ত্র
স্বার্থত্যাগ আর আত্মত্যাগ হইল মূলমন্ত্র।
আমরা বাঙালি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান
কেউ নয় আমরা ছোটো বড়ো এক মায়ের সন্তান।
যার যার ধর্ম বজায় রেখে ভুল কোরো না পথ

www.pathagar.com

তবে থাকবে ভালো, রাখবে ভালো আল্লা ও মুহম্মদ।
যারা দেশের তরে রক্ত দিয়ে শহিদ হয়ে গেছে
তাদের জন্য দোয়া করবে হক আল্লার কাছে।
যদি দেখ কোনো মানুষ আছে অনাহারে
নিজের খাদ্যের অংশ দিয়ে বাঁচাইও তারে।
যদি দেখ মরে গেছে কারো প্রাণের ভাই
তারে ভাই বলিয়ে আদর করে কাছে নেয়া চাই।
আরো দেখ পুত্র শোকে কোনো মা কান্তেছে
তারে পুত্র সম মা বলিয়া নিবে বুকের কাছে।
কত জনের বাসাবাড়ি পুড়ে হইছে ছাই
এমনি যদি দেখ কারো বাসা বাড়ি নাই।
সাধ্য মতো খাদ্য দিয়ে তারে বাঁচাইও
ব্যথার ব্যথি হয়ে তাদের দুঃখ মুছে দিও।
দুঃখী জনার হাতে দিও ধনীরা জাকাত
আখেরাতে দিনের নবী করবে সাফায়ত।
সাইদুর রহমান বলে আমি যে অশিক্ষিত
ভুলত্রুটি ক্ষমা করিও আমি যে দুঃখিত।
এই পর্যন্ত ব্যথার গাঁথা দিয়ে দিলাম ইতি
দেখি এবার বাংলাদেশের কেমন হবে গতি।

মুজিব শহিদের জারি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সমাজ সচেতন লোককবি সাইদুর রহমান বয়াতিকে দারুণভাবে ব্যথিত করে। সহজ সরল ভাষায় তিনি ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনা গানে উপস্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধু শহিদ হওয়ার পরপরই তিনি এই জারি রচনা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি 'মুজিব শহিদ' জারি পরিবেশন করেছেন। বর্তমানেও তিনি বিভিন্ন আসরে এই জারিগানটি গেয়ে থাকেন।

ওগো আল্লা বারেতালা কুদরত ও কামাল
খুঁটি বিহীন আসমান জমি রেখেছ বহাল।
সত্য ত্রেতা দাপর গেছে বর্তমান ঘোর কলি
কলি যুগের হাল দেখিয়া কর্ণে লাগে তালি।
কল্পনা ভাবনায় যাহা ধরা নাহি পরে
সেই সব কাণ্ড ঘটতেছে সারা জগৎ ভরে।
চন্দ্র, সূর্য পূজা করত দেব দেবতা বলে
এখন তাহা আবাদ করছে বৈজ্ঞানিক কৌশলে।
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ জাতি ব্রহ্মাণ্ডেরও ফুল

www.pathagar.com

বিধাতারই আপন ইচ্ছায় খেলারও পুতুল।
যাকে ইচ্ছা তাকে তুমি করছ মহাসুখী
আবার কারে বানায়েছ দিন দুনিয়ার দুঃখী।
তোমার প্রিয় মানব জাতি বলেছ নিজ মুখে
মানুষ দিয়া মানুষ মার তুমি থাক সুখে।
দুষ্টের দমন শ্রেষ্ঠের পালন তোমারি বিধান
পুরুষ ও প্রকৃতি দিয়া সাজাইলা বাগান।
অনাচার, অত্যাচার যখন যে দেশে যায় বেড়ে
নানান রকম গজব দিয়া নিপাত কর তারে।
এদেশ যখন বিদেশিদের হলো আবাদ ভূমি
তোমারি কুদরতে আবার আবাদ কর জমি।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান বানাইয়া
দেশের উপর করল জুলুম বিদেশি বেনিয়া।
মায়ের ভাষা আর বুকের আশা সব করিল শেষ
পরাধীনের অশান্তিতে ভরে গেল এই দেশ।
পশুপাখি খাঁচায় রাখলে যেমন হালে থাকে
বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে তেমন করে রাখে।
আপন ঘরে চুরা ঢুকে যেমন চুরি করে
তাহার চাইতে বেশি দুঃখ দিল বাঙালিরে।
বলতে গেলে উচিত কথা অবিচারে মারে
তাই ভাবিয়া সরল মানুষ কান্দে জারে জারে।
যত রকম অত্যাচার চলিল বাংলার পরে
সকল কথা বলতে গেলে সহে না অন্তরে।
এমনি হালে চব্বিশ বছর গত হয়ে গেল
দুঃখের সাগরে যেমন সুখের সঞ্চার হলো।
আওয়ামী লীগের নায়ক হলো শেখ মুজিবুর
দেখে বাংলার দুঃখের দশা কাঁদিল অন্তর।
রেসকোর্স ময়দানে মুজিব বক্তৃতার উপরে
কথায় যেন আকাশ থেকে অগ্নি বৃষ্টি ঝরে।
এমন কথা এ জীবনে শুনে নাই বাঙালি
সবার বুকে লাগে যেন পরাধীনের গুলি।
জাতি ধর্ম ভুলে গিয়ে হলো একাকার
একই নৌকায় যাত্রী সবাই শেখ মুজিব কাণ্ডার।
তাই দেখিয়া আইয়ুব শাহী জমাইল পাড়ি

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া খান বাংলার বুকে চালায় মাতব্বরি।
বানর যেমন অগ্নি দেখলে অস্থির হয়ে পরে
ইয়াহিয়ার তেমনি দশা শেখ মুজিবের ডরে।
যত বড়ো যুদ্ধা সৈনিক পাকিস্তানে ছিল
গোপনে গোপনে সেই সকল বাংলায় নিয়ে এলো।
পঁচিশা মার্চ রাত্রিবেলা গুণ্ডার দল সাজাইয়া
করাচিতে পাড়ি জমায় শেখ মুজিবকে নিয়া।
সাত কোটি বাঙালি তখন হইল আত্মহারা
মুজিব মুজিব বলে সবার বহে নয়ন ধারা।
প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে কান্দে মুজিব বলে
আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে ভাসে নয়ন জলে।
চক্ষের পানি আপনি খোদায় সইতে নাহি পারে
কবুল হলো সবার মোনাজাত হক আল্লার দরবারে।
ছাগলের বুকে পাইল বারো হস্তীর বল
অসুর বংশ বাংলার বুকে গেল রসাতল।
সত্যের ভরা ডোবেনারে প্রমাণ পাওয়া গেল
প্রথমবারে বাঙালিদের জয় ভাগ্য হলো।
এদিগেতে শেখ সাহেবের নাই কোনো খবর
মুজিব আশায় বাঙালিদের বুকে বইছে ঝড়।
চারিদিকে জয় বাংলার ধ্বনি জারি হলো
মুক্তি পাইয়া মুজিব তখন দেশে ফিরে এলো।
সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তখন প্রাণের মানুষ পাইয়া
মরা বৃক্ষ পত্র ফুলে যেন উঠিল ভরিয়া।
দেশে ফিরে মুজিব তখন দেশের দিগে চায়
হাজার হাজার ধ্বংসাবশেষ দেখিবারে পায়।
কারো মরছে কোলের সন্তান, কারো মরছে ভাই,
কারো মরছে প্রাণের স্বামী, কারো পিতা-মাতা নাই।
গ্রাম, গঞ্জ, শহর, বন্দর চুরমার হয়ে গেছে
পাকবাহিনী যা করেছে তারি চিহ্ন আছে।
এসব দেখে শেখ মুজিবের দুঃখের সীমা নাই
ভাবছে শুধু কত দিনে এ সকল পূরাই।
বঙ্গবন্ধু নামটি তখন জারি হয়ে গেল
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হইল।
দেশ বিদেশে বঙ্গবন্ধু হাত পাতিয়া দিল
সাহায্য পেয়ে রিলিফ দিয়ে জনগণ বাঁচাইল।

www.pathagar.com

আরামকে হারাম করিল নাই তার রাত্র দিন
ভাবছে শুধু কবে হবে বাঙালির সুদিন।
সময় অসময় শুধু দেশের চিন্তা করে
বাংলাদেশের হাল দেখিয়া সদায় নয়ন ঝরে।
যে ক্ষতি করেছে এদেশ পাকবাহিনী দলে
সে সকল পূরণ করতে অনেক বছর যাবে চলে।
রাস্তা-ঘাট, সেতু-সড়ক, মন্দির-মসজিদ যত
ধ্বংস হয়ে গেছে দেশের এসব শত শত।
সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, খাদ্য-বস্ত্র নাই
কলকারখানা, দোকান-পাট, দালান-কোঠা নাই।
বঙ্গবন্ধু সদায় ভাবছে কি উপায় করিব
কত দিনে কেমন করে পরিপূর্ণ করব।
এমনি মতো তিন চার বছর গুজারিয়া যায়
সুখের ঘরে দুঃখের অনল জ্বলিল বাংলায়।
সাপুড়িয়া সর্প পুষে দুধ কলা খাওয়াইয়া
সুযুগ পাইলে সেই সর্পে দেয় বিষের দাঁত বসাইয়া।
নুন খাইয়া নুন হারাম করে যারা এ সংসারে
তাদের জন্য ধর্ম-কর্ম গেল ছারেখারে।
অল্প স্বার্থের মোহে যারা বৃহৎ ক্ষতি করে
কঠিন বিচার করবে তাদের ঐ পরওয়ারে।
দেশের মানুষ হয়ে যারা দেশের মাথা খায়
তাদের সাথে পারা কঠিন মুনাফেক তারা হয়।
রাসুলুল্লার মুখের বাণী মুনাফেক হইও না
কাফের হলেও নাই ক্ষতি তাদের যাবে চেনা।
মুনাফেকের মত পাপী জগতে নাই
আল্লার বিচারের দিনে তাদের নাই রেহাই।
আনছার, বিডিআর, সেনা বাহিনী, পুলিশ, নৌবাহিনী
দেশ রক্ষার্থে আছে আরও বিমান বাহিনী।
সকলকে ভালোবাসিত যেমন আপন সন্তান
যখন যাহা লাগে দিত হাসি মুখে যুগান।
শেখ মুজিবুর বিশ্বাস করত নিজ পুত্র মত
শত্রু মিত্র চিনিত না সবার কাছে যাইত।
একদিন বঙ্গবন্ধু ঘুমে ছিল আপনার বাসায়
সুযুগ পেয়ে আজরাইল এসে হাজির হয়ে যায়।
বিবি, বাচ্চা, ছেলে-মেয়ে সকল কাছে নিয়া

www.pathagar.com

একই ঘরে ঘুমায় মুজিব বিছানাতে শুইয়া।
লখিন্দরের হলো মরণ লোহার বাসর ঘরে
জহর দানে জয়নব যেমন আপন পতি মারে।
অন্ধমনির পুত্র মইল রামের বান লাগিয়া
(ইমাম) হুসেনকে মারিল যেমন কারবালা ঘিরিয়া।
মাবিয়ার বেটা এজিদ যেমন তক্তে দিল ভার
কি সন্ধানে ইমাম বংশ করিল ছারখার।
উনিশশো পঁচাত্তুর সালে পনেরো আগস্ট মাসে
নিশি রাত্রে বঙ্গবন্ধুর ধ্বংস বিনাশে।
অসুরের দল যেমন করে দেবতা নাশিল
গোলাবারুদ সহ তেমনি সামরিক দল এলো।
প্রথম দরজাতে এসে গুলি ছেড়ে দিল
তাই শুনিয়া বঙ্গবন্ধুর ঘুম ভাঙিয়া গেল।
দরজা খুলিয়া অমনি সামনে চলে গেল
এই সুযুগে দুশমনের দল ঘরে ঢুকে ছিল।
এয়ছা গুলি ছাড়ে তখন সকলকে তাকাইয়া
যে যেখানে ঘুমে ছিল সবাই গেল যে মরিয়া।
বঙ্গবন্ধু বলে বাবারা কি চাও তোমরা বল
পরের কথা বলবে এমন সুযুগ নাহি পেল।
দুশমনেরা গুলি ছাড়ে বক্ষ তাকাইয়া
শেখ মুজিবুর কান্দে তখন আপসোস করিয়া।
হায়রে আল্লা তোমার কি এই বিচার
আশা না মিটিতে গো আল্লা
কি হলো আমার।
মনে বড়ো সাধ আছিল আমার
সোনার বাংলা গড়বো।
বাংলাদেশের প্রতি ঘরে আমি
সুখ শান্তিতে ভরবো।
সেই আশা আমার নৈরাশ হলো আল্লা
সময় দিলা না।
জীবন দিয়া ভালোবাসলাম যাদের
তারাই আমায় বাঁচতে দিল না।
মরণ কালে এই প্রার্থনা আল্লা
তোমার দরবারে করি আমি
সবুজ শ্যামল বাংলাদেশকে আল্লা

www.pathagar.com

রক্ষা করিও তুমি।
আল্লাহ্ নাম মুখে নিয়া মুজিব
ছাড়িল চক্ষের পানি
জবানে আর সরে না কথা উড়ে গেল পরানি।
কোথায় আছে পুত্র কন্যা কিছুই না ভাবিয়া
মরণ কালে কান্দে মুজিব বাংলাদেশ বলিয়া।
বড়ো সাধের বাংলা আমার রক্ষা করিও তুমি
যাবার বেলা এই মোনাজাত করে গেলাম আমি।
জয় বাংলা বলিয়া মুজিব অমনি টইলা পইল
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে সর্বগায় লাগিল
খাঁচার পাখি উড়ে গেল মাটির খাঁচা ছেড়ে
পুরী সহ ধ্বংস হলো যারা ছিল ঘরে।
পাকা ভিটি মুহূর্তে সেদিন রক্তের ঢল নামিল
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমন ময়দানে হইছিল।
রাত পোহালে সারা বাংলায় পরে গেল সাড়া
খবর শুনে কত জনে হলো অর্ধমরা।
মুজিব শোকে কত জনায় দম আটকাইয়া মইল
কত জনে পাগল হয়ে দেশ ছাড়িয়া গেল।
পশু কান্দে, পাখি কান্দে, কান্দে তরুলতা
নদী চলে আপন বেগে বুকে মুজিব ব্যথা।
কলসি কাঁখে মুজিব শোকে গায়ের বধূ কান্দে
ঘরের গিন্নি ফুকারে আর ভাত তরকারি রান্ধে।
আতালেতে গরু কাঁদে-গায়ক কাঁদে গানে
সারা বাংলায় শুধু কাঁদে যে ছিল যেখানে।
কৃষাণ কৃষাণী কাঁদে মুজিব মুজিব বলে
শহিদানের আত্মা কাঁদে স্বাধীন মায়ের কোলে।
কবি ও সাহিত্যিক কাঁদে লেখায় কবিতায়
সাইদুর রহমান বয়াতি কাঁদে আসরে ধুয়ায়।
দেশের জন্য যারা দেশে শহিদ হয়ে গেছে
তাদের তরে দোয়া করিও আল্লাতালার কাছে।
ফরিদপুর জেলায় জন্ম টুংগীপাড়া বাড়ি
১৯২০ সাল ১৭ই মার্চ হিসেবে তাই ধরি।
হাসিনা, রেহানা নামে দুইটি কন্যা আছে
জার্মানিতে আছিল তারা তাইতো বেঁচে রইছে।
দোয়া করবেন সবাই মিলে তাদের তরে

www.pathagar.com

বংশের বাতি জ্বলে উঠবে অতি ধীরে ধীরে।
বঙ্গবন্ধু মুজিব নামা জারি ইতি দিয়া যাই
সাইদ বলে ভুলের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাই।
বাঁচিয়াও বাঁচেনা ভাই লোকে যারে দোষে
মরিয়াও মরে না মানুষ লোকে যদি ভালোবাসে।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত রাখি শেখ মুজিবের কথা
ইতিহাসে লিখা থাকবে এ সমস্ত বার্তা।

জারিগান বোদ্ধা দর্শক-শ্রোতাই কেবলমাত্র বুঝতে পারে। ব্যাখ্যা শুনে অজানাকে জেনে নেয়। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে জানতে পারে। নারী-পুরুষের মিলনতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে জারিগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানিকগঞ্জের বায়রা ইউনিয়নের নয়াবাড়ি গ্রামে জারিগানের আসর

১৪.০৫.২০০৯ তারিখে মানিকগঞ্জের বায়রা ইউনিয়নের নয়াবাড়ি গ্রামে জারিগানের আয়োজন করা হয়। আশিকুর রহমান আশেক, মুজিবুর রহমান সহ কয়েকজন গ্রামবাসী এই জারিগানের আয়োজন করেন। জারিগানের প্রবীণ ও খ্যাতনামা শিল্পী সাইদুর রহমান বয়াতির গান শোনা ও দেখার জন্য তারা আগ্রহ প্রকাশ করে। তাঁর সঙ্গে গান করার জন্য ধামরাই থানার আবুল হোসেন বয়াতিকে উদ্যোক্তাগণ আমন্ত্রণ জানান। উল্লেখ্য, গ্রামবাসীরা এই গান আয়োজনে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। তারা চাঁদা দেয় এবং যাদের বাড়িতে বাঁশঝাড় আছে তারা চাঁদা হিসেবে বাঁশ বিক্রি করে টাকা দেয়। সকাল নয়টায় জারিগানের আসর বসে।

জারিগানে, যেমন– শহিদনামা, খদগিরি, ইসমাইল কোরবানি, আইয়ুব নবী–গায়ক তার ইচ্ছানুযায়ী কথার ছন্দে ধর্ম ও শাস্ত্র মোতাবেক উত্তর দিয়ে থাকেন। সেদিনের বিষয় ছিল রাম বনাম হনুমান–অর্থাৎ গুরু-শিষ্য। সেদিন প্রশ্ন বা শিষ্যের ভূমিকায় হনুমান রূপে অবতীর্ণ হন আবুল বয়াতি। সাইদুর রহমান বয়াতি রামরূপে গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রথমে মঞ্চে উঠেন আবুল বয়াতি এবং প্রশ্নের পক্ষে অবতীর্ণ হন। তিনি যথারীতি বন্দনা সংগীত, ধুয়া ও জারি পরিবেশন করেন। তারপর প্রতিপক্ষের বয়াতি সাইদুর রহমান বয়াতির নিকট হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মীয় শাস্ত্র অনুযায়ী আলিফ, লাম, মিম এই তিন হরফের ব্যাখ্যা এবং আল্লার নিরানব্বই নামের ব্যাখ্যাও চান। তিনি মানবদেহে আলিফ, লাম, মিম কোথায় আছে এবং আলিফের নোকতা কোথায় আছে তাও জানতে চান। হিন্দু শাস্ত্র মতে তিনি প্রশ্ন করেন—হনুমান রামকে বলছে তোমার স্ত্রী আমার গুরু মা। তাকে অগ্নি পরীক্ষা দিলে কেন? তার কী দোষ ছিল? অকালে যজ্ঞ করলে কেন?

আবুল বয়াতির আসর শেষ হওয়ার পর সাইদুর রহমান বয়াতি মঞ্চে উঠেন। প্রথমে তিনি নিম্নলিখিত বন্দনা সংগীত পরিবেশন করেন।

www.pathagar.com

১.
বিপদ ভঞ্জন দয়াল
এসো মম মন্দিরে
হৃদয় দুয়ার খুলে এবার ডাকি তোমারে
তোমার নাম স্মরণে বিপদ হরেরে
ঢেউ কেটে যায় ওপারে ॥

২.
তুমি মক্কা নগরে উদয় হইলা
উম্মতের লাগিয়া
দস্যু ডাকাত তোমার নামে
হয়ে যায় আওলিয়া
এবার ডাকে পাগল সাইদুর মিয়া
তরাও ঘোর পাথারে ॥

৩.
তপ্ত তৈলে প্রহ্লাদেরে
কোলে তুলে নিলে
ইব্রাহিম খলিলকে অগ্নিকুণ্ডে
ফুল বিছানা দিলে
জগা মাধার নয়ন খোলেরে
হরি নামের সুর ধরে।

৪.
বৃন্দাবনে গোপীগণে
তোমায় ভালোবাসে
ভক্তের ভক্তির টানে শুনি
নয়ন জলে ভাসে
তাই সারা জগত তোমার আশেরে
খুঁজিছে জীবন ভরে।
এম এ জলিল মুর্শিদ আমার
আঙ্গুরপাড়া ধাম
ঘোর নিদানে পাবার আশায়
জীবন সপিলাম
ওয়াছিয়া তরিকা আমার
রুহানি খান্দান ধরে ॥

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, বন্দনা সংগীতে সব ধর্মের সমন্বয় সাধন করা হয়। এখানে কৃষ্ণের কথা থাকে, নবী-রাসুলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় আবার বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বর্তমানেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

এরপর সাইদুর রহমান বয়াতি নিম্নবর্ণিত ধুয়া গান পরিবেশন করেন—

পড়ো মন বিসমিল্লাহে আলহামদুলিল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহু লা শারিকালাহু
সেজদা সজুদ তুমি মাবুদ
করিম কালামুল্লাহ।
তোমারি নামের জোরে সেই ঈসা পয়গম্বরে
মুরদা বাঁচায় কবরে বলে কুম বেইজনিল্লাহ।

এরপর তিনি জারিগানের নিয়ম অনুযায়ী ইসমাইল কোরবানির জারি শুরু করেন। জারি গাওয়ার পূর্বে সাইদুর রহমান বয়াতি দর্শক শ্রোতা কোন জারি শুনতে চান তা জেনে নেন। সেদিন দর্শক শ্রোতা তাঁর নিকট ইসমাইল কোরবানির জারি শুনতে চান।

জারি শেষ করে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুরু করেন। আলিফ-লাম-মিমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "এই তিনটি হরফ বা অক্ষর পৃথিবী সৃষ্টির মূল। যেমন–আলিফ বলতে এক আল্লাকে বুঝায়। অর্থাৎ এক আল্লার প্রতীক হচ্ছে আলিফ। লাম অক্ষর হচ্ছে হজরত আদম-এর প্রতীক। মিম হরফের প্রতীক হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)। আল্লা, আদম এবং মোহাম্মদ এই তিনজনই সৃষ্টিকে সৌন্দর্যময় করেছেন এবং কোরানের মূল হচ্ছে এই তিনটি অক্ষর।"

হকিকতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন— বিসমিল্লার সমস্ত তত্ত্ব হচ্ছে 'বে' অক্ষর। 'বে' অক্ষরের নিচে নোকতা বা ফোঁটা দেওয়ার জন্য কোরান শরিফের সমস্ত তত্ত্ব একটি ফোঁটার মধ্যে নিহিত। মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন আলাদা একটি রূপ ধারণ করে, যাকে বলা যায় আহাম্মদি কদ। আহাম্মাদি কদ চার হরফে আলিফ, হে, দাল এবং মিম। যেমন- নামাজে দাঁড়িয়ে যখন কোনো ব্যক্তি হাত বা তাহারিমা বাঁধে তখন সে ব্যক্তি আলিফের আকার ধারণ করে। যখন রুকুতে যায় তখন হে অক্ষরের রূপ ধারণ করে। যখন সেজদাতে যায় তখন মিম-অক্ষরের রূপ ধারণ করে। যখন আত্তাহিয়াতু পড়ে হাটুতে হাত রেখে বসে তখন দাল অক্ষরের রূপ ধারণ করে। নামাজে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে নামাজিকে চিন্তা করতে হবে যে তিনি ফুলছেরাত এর উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তার পিছনে মৃত্যুরূপী ফেরেশতা আজরাইল দাঁড়িয়ে আছে এবং সামনে স্বয়ং স্রষ্টার নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করছেন।

মানবদেহে নাসিকা হচ্ছে আলিফ অক্ষরের প্রতীক, বে হচ্ছে ওষ্ঠের প্রতীক, তে হচ্ছে মুখ গহ্বর ও তালুর প্রতীক, ছে হচ্ছে চোখের প্রতীক, জিম হচ্ছে জিহ্বা, হে হাতের, খে অসমতল জায়গা, জাল সমগ্র মুখমণ্ডলের, ছিন এবং সিন ছিনা, জে ফেপসা, আইন এবং গাইন চক্ষুদ্বয়, ছোটো কাফ কলিজা এবং বড়ো কাফ নাভী, ইয়া লিঙ্গের প্রতীক। এমনি করে ত্রিশটি অক্ষর মানবদেহের ত্রিশটি জায়গার প্রতীকরূপে সেট করা।

www.pathagar.com

এইজন্য কোরানকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কাগজে লিখিত কোরান হচ্ছে আল কোরান আর মানবদেহের প্রতীক কোরান হচ্ছে দিল কোরান। এই ব্যাখ্যা এবং গুরু রহস্য একমাত্র সুফি-সাধকরাই উপলব্ধি করেন। মাওলানা মৌলবিরা কমই বুঝেন। হনুমানের অভিনয় করে আবুল বয়াতির প্রশ্নের উত্তরে সাইদুর রহমান বয়াতি রামচন্দ্রের অভিনয়ে বলেন, হিন্দু শাস্ত্র মতে– রাম ও লক্ষণ সহোদর ভাই। রাম যখন পিতা দশরথের আদেশ পালন করার জন্য পঞ্চবটি বনে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন তখন লঙ্কার অধিপতি রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সীতাকে উদ্ধার করার জন্য চৈত্র সংক্রান্তিতে রাম-লক্ষণ দুর্গাপূজার মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা জানান। এটি হচ্ছে বর্ধিত যজ্ঞ বা অকালপূজা। কলিযুগে বা বর্তমান যুগে সেই পূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। রামচন্দ্র থেকেই এই পূজার উৎপত্তি।

নয়াবাড়ি গ্রামে অনুষ্ঠিত জারিগানের আসর বেশ জমজমাট ছিল। উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিলেন বয়স্ক। তারা এই গানকে ভালোবাসেন। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে তারা মনোযোগ সহকারে জারিগান উপভোগ করেন। জারিগানের ভাবে তারা তন্ময় হয়ে যান। কারবালার হৃদয়বিদারক কাহিনি এবং ইসমাইল কোরবানির কাহিনি দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। দেশের জারিগানের প্রবীণ ও খ্যাতনামা শিল্পী সাইদুর রহমান বয়াতি ইসমাইল কোরবানির কাহিনি উপস্থাপন করেন। আবুল বয়াতি কারবালার কাহিনি পরিবেশন করেন। জারিগানে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব ছাড়াও কারবালার কাহিনি, ইসমাইল কোরবানি, আইয়ুব নবী, চাচা-ভাতিজা, মাদারের জারি ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। বিকেল চারটার দিকে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। এতে গান বন্ধ হয়ে যায়। দর্শক শ্রোতা গান শুনতে না পেরে হতাশ হয়ে বাড়ি চলে যান। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জারিগানের আসরটি উপভোগ্য ছিল। উল্লেখ্য, গ্রামবাসীদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ এবং বাঁশ সংগ্রহ ও বিক্রি করে বয়াতিদের সম্মানী সহ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া উপস্থিত দর্শক শ্রোতাগণ খুশি হয়ে যার যার সামর্থ অনুযায়ী নগদ অর্থ প্রদান করেন।

৫. গোষ্ঠ গান

গোষ্ঠ গান অর্থ রাখালিয়া গান। গোষ্ঠ হলো রাখাল বালকের খেলার মাঠ।

এলাম সব রাখালগণ তোরে নিতে
ওরে কানাই ভাই
নেচে নেচে আয়রে এবার
তোরে নিয়া আমরা গোষ্ঠে যাই।
গোষ্ঠে গিয়ে করব খেলা
দূর হবে মনের জ্বালা
তুই যাবি কিনা যাবি গোষ্ঠে
ও ভাই কানাই ॥

www.pathagar.com

তুই বিনে এই গোচারণে যাবার সাধ্য নাই
তুই মাকে বলে আয়রে কানাই
অধিক বেলা দেখতে পাই
তোরে সব রাখালগণে
রাখাল রাজা সাজাব বনে
গোষ্ঠের বেলা অধিক হলো ভাই তোমায় বিনে ॥
কাল গিয়েছিলাম গোচারণে আছেনি তোর মনে
সব রাখালগণ মরেছিলাম প্রায় বেঁচেছি কেবল
তোর গুণে
তুই কানাই দিলি রে জীবন
না হলে হইতো মরণ
জীবনদান পেয়েছি কেবল তোমার গুণে ॥

(কানাই হলো দলপতি ও খেলার নায়ক। গানের ভাবার্থে এখানে কানাই হচ্ছে স্রষ্টা বা গুরুদেব।)

প্রশ্ন-উত্তরের মতো করেও গোষ্ঠ গান গাওয়া হয়। যেমন—
প্রথম গায়ক বলেন–

এলাম সব রাখালগণ তোমায় নিতে ওরে কানাই ভাই
গগনেতে অধিক বেলা–গোষ্ঠের কথা কী তোর মনে নাই
তুই রলি ঘুমের ঘরে গোষ্ঠে যাই কেমন করে
গোষ্ঠের বেলা অধিক হলো ভাই তোমায় বিনে।

অপর গায়ক উত্তর দেন–
একদিন আঙ্গিনায় আসিয়া সদায় ডাকতেছে বলাই
গোষ্ঠের বেলা অধিক হইল শুইয়া রলিরে কানাই
শ্রীদাম সুবল রাখালগণে যাইয়া মার সদনে
বল যাব না মোরা কানাই বিনে কর নিবেদন।

৬. মর্সিয়া সংগীত

মহররমের হৃদয়বিদারক কাহিনিকে অবলম্বন করে যে সংগীত রচিত তাকে মর্সিয়া বলা হয়। এখানে মূল ঘটনা হচ্ছে মহররমের হৃদয়বিদারক কাহিনি। যারা মহররম পর্ব পালন করে তারা কয়েকশ লোক একত্রিত হয়ে মহররম মাসে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বুক চাপড়িয়ে মর্সিয়া সংগীত গেয়ে থাকে এবং কান্নাকাটি করে। মর্সিয়া সংগীতে বিভিন্ন তাল যেমন দাদরা, কাহারবা, ঝুমুর, ত্রিতাল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—

www.pathagar.com

এগো আলা মালেক সাঁই
সীমারে মাইরাছে দোনো (দুই) ভাই ॥
বিয়ার রাতে কাসেম মইল
ছকিনা হয় রাড়ি (বিধবা)
পানি বিনে আসগর মইল
এজিদ পায় বাহাদুরী
আলা মালেক সাঁই
খঞ্জরে মাইরাছে দোনো ভাই ॥
দুই হাতের মেন্দি না শুকাইতে
খুইলা পড়ে গলার হার
নিইভা গেল বংশের বাতি
মদিনা করে অন্ধকার
হায় হায় রবে কান্দে কারবালার বালি
বেহেস্ত থেকে মায় কান্দে,
জোড়ের ভাই কোথায় গেলি ॥

৭. অন্নিগান

অন্ন শব্দ থেকে অন্নি শব্দ এসেছে। মানিকগঞ্জ হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এখানে বারোমাসে তেরো পূজা অর্থাৎ পূজা-পার্বণ, উৎসব, সংগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়। অন্নিগান একটি বাৎসরিক গান। প্রতি বছর পৌষ মাস থেকে মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত গ্রামের যুবক ছেলেরা অন্নিগান গেয়ে থাকে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে অন্ন বা চাউল সংগ্রহ করে। তাই এই গানের নাম অন্নিগান। দু'মাস অন্নিগান গেয়ে যে চাউল সংগ্রহ করা হয় তা দিয়ে বড়ো ধরনের শিরনি করা হয়। শুধুমাত্র চাউল সংগ্রহ করে না, তারা বিত্তশালীদের নিকট থেকে টাকা পয়সাও সংগ্রহ করে। অন্নিগান গবাদি পশুকে নিয়ে গাওয়া হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস, কালু গাজী, মানিক পির, মাদার মুনি, কালী দেবীর ঘটনা, উভয় ধর্মের দেব-দেবীদের বর্ণনা অন্নিগানে থাকে। তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন গায়কদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন। বাড়ির মহিলারা চার/পাঁচ কেজি চাউল, দু'শ-তিনশ টাকাও দিয়ে থাকে।

অন্নিগানে দু'জন মূল গায়ক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানের কথা Prompt করে এবং দোহাররা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে নাচে এবং গাইতে থাকে। বড়ো একটি ধামা বা একটি সিলভারের গামলা বা পাতিল রাখা হয় এবং এর চারদিকে ঘুরে ঘুরে গায়করা গান গায়। এদের সংখ্যা ১০/১৫ জন হতে পারে। প্রত্যেক বাড়িতে আধা ঘণ্টা করে গান গায়। গানের শেষে চাউল বা টাকা দিয়ে গায়কদলকে বিদায় করা হয়। বর্তমানে গ্রামের অনেক সৌখিন যুবক অন্নিগানের দল করে গান গেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

২৬.১২.২০১১ তারিখে আয়নাপুরের জামাল উদ্দিনের বাড়িতে অন্নিগান হয়। মূল গায়ক ছিলেন আজিজ ও রহিম। দোহাররা হচ্ছেন বাদশা মিয়া, মাহাম আলী, জামাল, দুলাল, ডাক্তার শহীদ আলী, ফজল, ফরহাদ, জুলহাস ও আবদুল মালেক। মোট সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। ঐ বাড়ি থেকে ৫ কেজি চাউল এবং ১০০/- টাকা গায়কদের দেয়া হয় শিরনি করার জন্য।

আয়নাপুরের জামাল উদ্দিনের বাড়িতে অন্নিগান পরিবেশন করছেন গায়কেরা

অন্নিগানের মধ্যে কিছু প্রসিদ্ধ গান আছে, যেমন— কানুঘোষের অন্নি, নন্দঘোষের অন্নি, সোনারার বিরহ অন্নি, কোকিল ঘোষের অন্নি, শ্রী কৃষ্ণের জন্মখণ্ড, টেংরি মাছের অন্নি, কৃষ্ণের বসন হরণ, কালু-গাজী, সাহা পির, মানিক পির ইত্যাদি।

১.

মূল গায়ক : আয়রে রাখালগণ ছোল্লাড়ি খেলাই। সবাই বল ঐ কথাটি।
মূল গায়ক : ছোল্লাড়ি খেলিবা তুমি, বাবার বাড়ি যাবো আমি।
সকলে : শ্যামের চিকন কালার বাঁশিরে...
মূল গায়ক : বাবার বাড়ি যাবে তুমি, কোলে করে আনবো আমি।
সকলে : শ্যামের...
মূল গায়ক : কোলে করে আনবা তুমি, কোলে বসে হাসবো আমি।
সকলে : শ্যামের...
মূল গায়ক : কোলে বসে হাসবা তুমি, গাঙ্গে নিয়ে ধুইবো আমি।
সকলে : শ্যামের...

www.pathagar.com

মূল গায়ক : গাঙ্গে নিয়ে ধুইবা তুমি, স্বর্গের তারা হবো আমি।
সকলে : শ্যামের ...
মূল গায়ক : স্বর্গের তারা হবা তুমি, তীর চালাইয়া ধরবো আমি।
সকলে : শ্যামের ...
মূল গায়ক : তীর চালাইয়া ধরবা তুমি, শর্শা হয়ে পরবো আমি।
সকলে : শ্যামের ...
মূল গায়ক : শর্শা হয়ে পরবা তুমি, কবুতর হয়ে খাবো আমি।

২.
এই অন্নিগানটিতে প্রথম ব্যক্তি যা বলে, দোহারগণও তাই সুরে সুরে বলে যায়।
মূল গায়ক : এই বাড়ির গেরস্তে বড়ো ভাগ্যবান।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : বাইর বাড়ি দাঁড়ায় দেখি দুমালাই দালান।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : দুমালাইয়া দালানের উপর সাত কুইলা ধান।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : সাত কুলা ধান নয়রে সাত কুলা চাইল।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : সাত কুইলা চাইল পাইয়া সকল রাখাল বলে।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : গিরস্তের চাইয়া দেখি সোনার চাঁন কোলে।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : ধীরে ধীরে সোনার চাঁন বিয়ার যুগ্য হলো।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : দেশে বিদেশে তখন ঘটক পাঠাল।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : কুঁচ বরণ কন্যা চাই মেঘ বরণ চুল।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : সেই কন্যার বিয়ায় নাগবে নানান জাতের ফুল।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : আনরে গোলাপ ফুল সাজি ভরিয়া।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : সে ফুলেতে হলো না সোনারার বিয়া।
সকলে : ঐ

www.pathagar.com

মূল গায়ক : আনরে জবা ফুল সাজি ভরিয়া।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : সে ফুলেতে হলো নারে সোনারার বিয়া।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : স্বর্গ হইতে আইল ফুল হাওয়ায় চড়িয়া।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : সেই ফুলে হলো রে সোনারার বিয়া।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : ঢোল বাজে সানাই বাজে আরো বাজে কারা।
সকলে : ঐ
মূল গায়ক : আজ হতে হলো রে সোনারার বিয়া সারা ॥

৩.

লক্ষ্মীর পাঁচালি নামে একটা অন্নিগান আছে। এই গান মহিলারা বেশি শুনতে চায়। এ ধরনের একটি গান নিম্নে দেওয়া হলো। প্রথমে প্রধান বয়াতি ও দোহারগণ দ্বৈতকণ্ঠে লক্ষ্মীর পাঁচালি গেয়ে থাকেন।

কি ভাইরে সাতালি পর্বতে হইল লক্ষ্মীর জনম–
লক্ষ্মীরে যে বিয়ে করে দেব নারায়ণ।
একদিন লক্ষ্মী বলে নারায়ণ হে বলি যে তোমারে
চার চন্দ্র ভেদের কথা বলে দাও আমারে।
নারায়ণে বলে লক্ষ্মী বসে শোন তুমি
চার চন্দ্র ভেদের কথা বলে দেব আমি।
কি ভাইরে চার চন্দ্র ভেদের কথা যেবা জনে জানে
থাক তার মনুষ্য জনম দেবগণেও মানে।
হস্তিনী, পদ্মিনী নারী, শঙ্খ, চিন্তামনি
এই চার নারীর মধ্যে কোন-নারীর বাখানি।
কি ভাইরে হস্তী নারী যেমন হস্তীর মত খায়
কলস ভরা পানি সে যে নিয়াসে উবায়।
কি ভাইরে পদ্মিনী নারী তাহার পদ্মেরো বসতি-
সেই নারী থাকে যেমন চিরদিনই সতী।
চিন্তামনি নারী থাকে সদায় চিন্তা মন
তার সোয়ামি কামাই করে অঞ্চল ভরা ধন।
কি ভাইরে চার রকমের নারী আছে এই দুনিয়ার পরে
জেনে শুনে সবাই যেন নারী সঙ্গ ধরে।

www.pathagar.com

৮. মুর্শিদি গান

মুর্শিদি গানের সুর আলাদা। গুরু-শিষ্য বিষয়ক গান হচ্ছে মুর্শিদি গান যেমন—

সাইদুর রহমান বয়াতি রচিত

আমার মন হলিরে পাষাণ
গুরুর চরণ অমুল্য ধন
করলা না সন্ধান
সময় নাইরে কখন যেন
আজরাইলে কবজ করে জান ॥
আজরাইলে আসিয়া যেদিন
মারবে কোড়ার (চাবুক) বাড়ি
শুকাইবে বক্ষ সেদিন
কাঁদন হবে জারি
সাত দরিয়ার পানি ঢাললে
জুড়াবেনা প্রাণ ॥
পুত্র কন্যা কাঁদবে বসে
বলে আব্বাজান
মা দুঃখিনী পাগলিনী
হারায় তার সোনার চান
খোদ অঙ্গিনী (স্ত্রী) থাকবে বসে
যে জন ছিল জানের জান ॥
কি করিবে দরদের ভাইরে
বন্ধু সহচরী
চক্ষের সামনে নিজের ঘরে
হয়ে যাবে চুরি
পাগল সাইদ বলে
সময় থাকতে
গুরকে সপে দেই নাই প্রাণ ॥

৯. ডাক বা সায়ের/কর্মসংগীত

মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বড়ো বড়ো গাছ কাটা, গৃহনির্মাণ কাজে ভারি পাথর স্থানান্তর ও নৌকা তৈরির পর পানিতে নামানোর সময় শ্রমিকরা ডাক বা সায়ের বলে থাকেন। দেহে শক্তি সঞ্চার, শ্রমসাধ্য কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টির জন্য এসব ডাক

www.pathagar.com

বা সায়ের তারা উচ্চারণ করেন। যেমন, একজন শ্রমিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক বলতে থাকেন আর অন্য শ্রমিকরা গাছ, পাথর বা নৌকা ধরে সুর ও তালে তালে এসব ডাক উচ্চারণ করেন। 'হেইও' বা 'হেইলেচোঁ' বলার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে উদ্যম ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। আস্তে আস্তে তারা ভারি বস্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়।

০৩.১১.২০১২ তারিখে পুটাইল ইউনিয়নের হাসুলির মোড়ে নাদিয়া সাদিয়া স মিলে এধরনের ভারি কাঠ সরানো কাজ পর্যবেক্ষণ করেন সাইদুর রহমান বয়াতি। স মিলের মালিক জাহাঙ্গীর নিজে 'হারে জোয়ান হেলা' ডাক উচ্চারণ করেন। এরপর সকলে বলে, 'সব জোয়ানে মারো একটা ঠেলারে'–এই ডাক ছড়া বলে কাঠ একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে নেয়। একজন বলে 'আহইরে আহই' অন্য সবাই বলতে থাকে 'আহই'। তারপর একজন বলে আহই ভাইয়া অন্য শ্রমিকরা সমস্বরে 'হেইও' ধ্বনি দিতে থাকে। একজন বলে 'ঘাট বান্ধিব' অন্যরা বলে 'হেইও'। একজন বলে 'হুগলি যাইয়া'। অন্যরা সমস্বরে বলে 'হেইও'। একজন বলে 'হুগলি আছে' অন্যরা সমস্বরে বলে 'হেইও'। প্রথমজন বলে 'রসের নাইয়া' অন্যরা সমস্বরে বলে 'হেইও'। সেদিন নিম্নবর্ণিত ডাক বোল উচ্চারণ করে সুর ও ছন্দের তালে তালে ট্রাক থেকে বিশাল কাঠের টুকরা নামানো হয়।

এভাবে কাঠের গুড়ি নামানোর সময় ডাক উচ্চারণ করেন শ্রমিকরা

১.

১ম জন : সোনার নাতিন

সকলে : হেইও

১ম জন : কাঠের টিয়া

সকলে : হেইও

www.pathagar.com

১ম জন : কাস্তে লোহায়
সকলে : হেইও
১ম জন : জড়াজড়ি
সকলে : হেইও
১ম জন : কুলায় নারে
সকলে : হেইও
১ম জন : পাটের দড়ি
সকলে : হেইও
১ম জন : টাইনা ছিড়
সকলে : হেইও
১ম জন : মোটা দড়ি
সকলে : হেইও
১ম জন : নৌকা নড়ে
সকলে : হেইও
১ম জন : ঘোড়ায় চড়ে
সকলে : হেইও
১ম জন : ঘোড়ায় চড়ল
সকলে : হেইও
১ম জন : কদম মারল
সকলে : হেইও
১ম জন : বন পুড়ে যায়
সকলে : হেইও
১ম জন : আগুন লেগে
সকলে : হেইও

২.
প্রথম জন বলে— জোর কী আছে
অন্য সকলে বলে— আছেত না আছে
প্রথমজন আবার বলে— জোর থাকতে যে জোর না করে তার জোর খায় মরা কাষ্ঠেরে
হায়রে হায় হেইও
কেউ মারে হেইও
কেউ তামাক খায়
সাইজা দিলে সবাই খায়

তামাক খাইয়া পান চাবায়
পান চাবায় আর মুখ নাড়ায়
মুখ নাড়াইয়া গান গায়
গান গাইয়া ঢাকায় যায়
ঢাকায় যায় না রমনাতে
বাসনা তেল দেও চান্দিতে।

এভাবে বিভিন্ন ধরনের ছড়া বলতে বলতে শ্রমিকরা ভারী মালামাল স্থানান্তর করে থাকে।

১০. গাজীর গান

গাজীর গান হচ্ছে এক ধরনের লোকজ কেচ্ছা কাহিনি। এসব কেচ্ছা-কাহিনি বিভিন্ন গায়ক বিভিন্নভাবে পরিবেশন করে থাকেন। গাজীর গানের মধ্যে কালু গাজীর কথা উল্লেখ থাকে বলে একে গাজীর গান বলা হয়। কালু গাজী হচ্ছেন জিন্দা পির। মাঝে মাঝে কিংবদন্তি হিসাবে এই গানে গাজীর কথা উল্লেখ থাকবে বা গাজীর ভূমিকা থাকবে

যেমন—গোলে বাকাওয়ালি পালা—
বাকাওয়ালির বাগানে বাকাওয়ালির ফুল
পাহারায় রক্ষিত আছে ষাট হাজার দেও মূষিক ইঁদুর (এরা মাটির নিচে পাহারারত)
বাগানের উপরে পাহারা রত আছে ষাট হাজার পরী
এবং মৃত্তিকার উপরে আছে বিশ হাজার দেও
দারোয়ান হিসাবে।

জামাল যখন বাকাওলির ফুল চুরি করে নিয়ে আসে তখন যে একটা বিবাদের সৃষ্টি হয় সেই বিবাদ মিটাবার জন্য ভক্তের ডাকে জিন্দা পির গাজী আবির্ভূত হন এবং ভক্তের বিবাদ মিটিয়ে মনস্কামনা পূর্ণ করেন। এ জন্য এটিকে গাজীর গান বলা হয়। গাজীর জন্ম খণ্ড বিষয়ক পালায় গাজী-কালুর উপর বেশি আলোচনা হয়। তাই এটাকে গাজী-কালুর পালা বলা হয়।

গাজীর গান হচ্ছে এক প্রকার মানতের গান। অর্থাৎ কেউ পুত্র সন্তান কামনা করে, কেউ ধনসম্পদ কামনা করে, কেউ রোগব্যাধি থেকে মুক্তি কামনা করে, কেউ বা গবাদি পশুর মঙ্গল কামনা করে গাজীর গানের মানত করে থাকেন। বর্তমানে মানিকগঞ্জে গাজীর গানের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। মানিকগঞ্জে গাজীর গান যারা পরিবেশন করেন তাদেরকে 'গায়ান' বলা হয়। প্রয়াত বিখ্যাত গায়ানদের মধ্যে ধুচুরিয়া গ্রামের বদু গায়ান, কলতা গ্রামের বাঙালি গায়ান, বাঠইমুরির তমিজ গায়ান, উভাজনী গ্রামের আলফু গায়ান, মান্নান গায়ান, লেমুবাড়ির নজু গায়ান, মাটি কাটার হাকিম আলী গায়ান প্রমুখ। বর্তমানে আব্দুর রহমান গায়ান, রাজ্জাক গায়ান, বারইলের হাকিম আলী গায়ান, জামসার চান মিয়া গায়ান উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

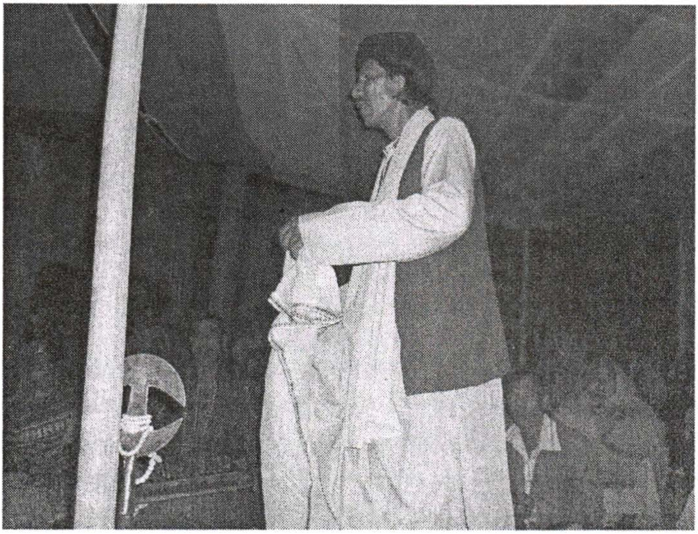

গাজীর গান পরিবেশন করছেন উভাজানী গ্রামের শিল্পী আব্দুর রহমান গায়ান

১৯.০৯.২০১১ তারিখ হাসুলি গ্রামের সেহের আলীর ছেলে বাচ্চু মিয়ার বাড়িতে গাজীর গানের আয়োজন করা হয়। সেহের আলীর পুত্র রুবেলের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। নাম রাখে রাজা মিয়া। বয়স দেড় বছর। রুবেলের দাদি খোদেজা বেগম ঐ শিশুর সুখ-সমৃদ্ধি ও রোগমুক্তি কামনা করে গাজীর গানের আয়োজন করেন। বাড়ির উঠানে খেজুর পাতার পাটি এবং চট বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়। ঘরের দুয়ারে মঞ্চ স্থাপন করা হয় এবং গাজীর আসন সাজানো হয়। একটি ছোটো বসার চৌকির ওপর সোয়া সের আতপ চাল একটা কাঁসার থালার মধ্যে রাখা হয়। তার ওপর একটি নতুন গামছা দিয়ে বিশটি সবরি কলা, আগরবাতি, মোমবাতি, একটা গাদা ফুলের মালা, এক গ্লাস পানি সেখানে রাখা হয়। শিশুকে নিয়ে তার মা, দাদি ও নানি গাজীর আসনের নিকট দাঁড়ায়। গায়ান তার হাতের চামর দিয়ে শিশুটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুছে দিতে থাকে। এরপর শুরু হয় গাজীর গান। বন্দনা সংগীত দিয়ে গান শুরু হয়।

এসো এসো দয়াল গাজী
তোমার গুণ গাই
চরণে ধরিয়া তোমায়
মসজিদে (হৃদয়) বসাই, হে দয়াল গাজী।

ঐদিন গাজীর গানের পালা ছিল 'হেম্মেজ কেম্মেছ'। দর্শক-শ্রোতার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল বেশি। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল হারমোনিয়াম, জুরি, ঝাজ, চটকা। মোট সাতজনের দল। গায়ানের নাম গাওয়ালী গ্রামের (ধামরাই) বারেক গায়ান (বারুন)।

www.pathagar.com

কেচ্ছা পরিবেশন কালে এমন একটি পর্যায় আসে যখন কেচ্ছা-কাহিনির পাত্র-পাত্রী/গায়ক বিপদের সম্মুখীন হন। তখন কালু গাজী ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং তাদেরকে উদ্ধার করেন। এভাবেই কেচ্ছা-কাহিনি বা পালায় কালু গাজীর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়।

১১. মাদার পিরের গান

মাদার পিরকে নিয়ে বাংলাদেশে অনেক লোকসংগীত সৃষ্টি হয়েছে—

১.

মুখে মাদার মাদার বল সবে
মাদার মস্ত পির
দিল কোরান খুলিয়া দেখ
মাদার সে ফকির ॥
মাদার বলে মা জননী রইয়া কার্য নাই
বিদায় কর মা জননী আমি সুমারেতে (যুদ্ধ) যাই ॥
বিদায় নিয়া মাদার মুনি করিল গমন
কালিদহের কোলে যাইয়া দিচ্ছে দরশন ॥
কালী কালী বইলা মাদার ডাকিতে লাগিল
পাতালেতে ছিল কালী ভাসিয়া উঠিল ॥
কালী বলে ওগো মাদার শুনো সমাচার
কালী কালী বইলা কেন ডাক বারবার ॥
মাদার বলে ওগো কালী তোমাকে জানাই
নীল বরণ কমল পুষ্প তোমার কাছে চাই ॥
এই কথা পাতাল কালী যখনে শুনিল
নীল বরণ কমল এনে মাদারকে সপিল ॥
কমল পুষ্প পাইয়া মাদার বড়ো খুশি হইল
ধুম ধুম বইলা মাদার জিকের ছাড়িল ॥
আগে আগে যায়রে মাদার কমল পুষ্প নিয়া
পিছে পিছে যায়রে কালী নাগের চাও (পতাকা) উড়াইয়া ॥
একেক কাইকে যায়রে মাদার
একেক যুগের পথ
তিন কাইকে গেল মাদার সুমার পর্বত ॥
বয়স কাইলা তিনটি শিষ্য স্মরণ করিল ॥
এক শিষ্য আছে তাহার বীর হনুমান
সাতালী পর্বতে যাহার কুলায়নারে টান ॥
আর এক শিষ্য আছে তাহার নামে গদাসূর
রাত্রিকে করিতে পারে নিশিকাইটা ভোর ॥

www.pathagar.com

আর এক শিষ্য আছে তাহার ব্রহ্মাবলি যারে
চোখের পলকে দুনিয়া পাঠায় ছারেখারে ॥
তিন শিষ্য নিয়া মাদার হেলেদুলে যায়রে
আকাশের চন্দ্রসূর্য টলমল করে ॥
মাদার মুনির কথা শুনে কাঁদে যার পরান
কোলেতে পাইবে বেটা পূর্ণিমারই চান ॥

২.
মাদার মুনি ডাকে উচ্চস্বরে
নামাজ পড়িতে যাব বায়তুল্লার ঘরে ॥
কি ভাইবে নীল দরিয়ার পাড়ে যাইয়া মাদার খাড়া হইল
পার কইরা দাও নাইয়া ভাইরে ডাকিতে লাগিল ॥
কি ভাইরে নানা গেছে নামাজ পড়তে বাইতুল্লার ঘরে
আমি যাব নামাজ পড়তে নানাজীর সনে ॥
কি ভাইরে কেমন কইরা পড়ব নামাজ শুন তার কথা
এক ঠাঁইতে (জায়গায়) ধর (দেহ) রবে নানার
আর এক ঠাঁইতে মাথা ॥
কি ভাইরে দুই ঠাঁইয়ে দুই হাত রবে তার দুই ঠাঁইয়ে দুই পাও
মন পবন ছাড়িয়া যাবে ধরে রবে না কেউ ॥
কি ভাইরে দুই ঠাঁইয়ে দুই মানিক জ্বলবে আগুনের গোলা
পশমে পশমে নানার বলবে আল্লা আল্লা ॥

১২. মরমি গান

রশিদ সরকার রচিত

১.
আহলে বায়াতের উপর যে বান্দার নাই মুহাব্বত
হবে কাট্টা কাফের দোযকের কীট
পাবে না নবীর সাফায়াত।
সারা জনম নামাজ পড়ে যদি দেহ করে ফানা
যে জন আহলে বায়াতের উপর মুহাব্বত রাখে না
হজ্জ, যাকাত সে যতই করুক
সকলই হবে গড়বাত।
মানকুনতুম মাওলাহু বলে হাদিসে দেখ না
ফাহাজা আলীউন মাওলাহু রয়েছে বর্ণনা
নবী যার মাওলা, আলী তার মাওলা
দুই জনে আছে একসাথে।
আল্লাহুম্মা ওয়ালেমান ওয়ালাহু বলছে দীন দেওয়ানা
বন্ধু বলে গ্রহণ কর ওহে পাক রাব্বানা

www.pathagar.com

আলীকে যে ভালোবাসে সরকার রশিদ
কয় হইয়া উম্মাত।

২.

যে চিনেছে দয়াল নবী
তার আল্লাহ্ চেনার কোনো বাকি নাই
কে বা আল্লাহ কে বা নবী
আমি বা কোন পথে যাই।
লক্ষাধিক ফেরেস্তা নিয়া
নূর নবীজির শান মান গাইয়া
আল্লাহ্ গেছে বেহাল হইয়া
এতো প্রমাণ হাদিসে পাই।
মিরাজে যায় পয়গাম্বরে
সেজরাতুল মোনতাহার পরে
সব মঞ্জিলে নবী হেরে
দেখে সব জায়গায় নিজের বাদশাই।
মাত্র একটা পর্দা বাকী
নবী আল্লাহ্‌কে করে ডাকাডাকি
আল্লায় কয় দোস্ত এ করকি
আমি সেজদাতে মোহিত সদাই।
নবী কয় সেজদা পয়দা তোমার তরে
আল্লাহ তুমি সেজদা কর কারে
আল্লাহ্ কয় দোস্ত তোর কদমের পরে
বিলীন করে দিলাম খোদাই।
রশিদ কয় পুরুষ প্রকৃতি
দুইজন জুইটাছে আজব পিরিতি
কে পুরুষ আর কে প্রকৃতি
আমি হক কথা কইতে ডরাই।

৩.

বি.জে.পি. আর জামাতীরা
জাল ফেলেছে বিশ্ব জোড়া
চেতন মানুষ যারা শোন
চেতন মানুষ যারা।
কেউ মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির গড়বে
কেউ মসজিদ-ই কায়েম রাখিবে

www.pathagar.com

বিবাদ শুরু হয় এভাবে ভারত দিল নাড়া
দুই দলের বিবাদে গেল কত মানুষ মারা
মন্দির গড়বি মনের মতন
মানুষ গড়তে পারবি কি তোরা।
মসজিদ মন্দির মানুষের জন্য
মানুষ নয় মসজিদের জন্য
জন্ম পাইয়া হইলি ধন্য সৃষ্টির হইলি সেরা
কেউ করিবে রামের রাজ্য কেউ ইসলাম করবে খাড়া
যারা করে মানুষ মাইরা ধর্ম খাড়া
মানুষ নামের কলঙ্ক তারা।
বাংলাদেশের ধর্ম নিরপেক্ষ রুখতে
ঐক্য হয় বিসমিল্লাহর সাথে
গোলাম আজম দেশের পথে
রাজাকারের সেরা।
আদবানী আর গোলাম আজম
যদি গদিতে দেয় পাড়া
দেশে ঠিক থাকিবে মসজিদ মন্দির
মানুষ মাইরা করবে সারা।
আগে নবীজির আদর্শ মান
আছ যত মুসলমান
মানব প্রেমিক হইয়া যাওগা
কৃষ্ণ ভক্ত যারা
রশিদ সরকার নাই তার ধর্ম
হইছে ধর্ম ছাড়া
বুঝলে পরে মানব ধর্ম
কিছুই নাই এই মানুষ ছাড়া।

৪.

ভাসা ভাসা মুখস্থ জ্ঞানে
সাধন ভজন হবে কেনে
বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবের দরকার, পাগল মন আমার
সাধন ভজন কঠিন এক ব্যাপার।
সত্যসাধন করবি যদি
মুর্শিদ ভজো নিরবধি
পইড়া থাক চরণে তাহার

www.pathagar.com

রহমতের দ্বার খুলিবে
তিন সাগরের পাড়ে নিবে
শুদ্ধ একটা গোসল করাইবার।
শুদ্ধ গোসল যখন হবে
পাঞ্জাতনের করণ দিবে
মধু খাবি বইসা বেসুমার।
সেই মধু করিলে ভক্ষণ
দেহ হবে কাঞ্চা বরণ
থাকবে না আর জরা মৃত্যুর ডর।
পিরের কাছে মন্ত্র নিও
আল্লাহকে ধন কর্জ দিও
কোরানেতে বলছে কয়েকবার
উত্তম ঋণ ঘুরাইয়া দিলে
জ্ঞানের বাতি উঠবে জ্বলে
রইছে ভুলে রশিদ সরকার।

জুলমত আলী সরকার রচিত
সাড়ে তিন খাদা জমি খানি
না করলিরে আবাদ
জঙ্গলে ঘিরাছে জমি
না দিলে চাষ
চাষ বিনে জমি হইলরে সর্বনাশ ॥
পাপরূপী ঘাস কর বিনাশ
ভক্তি কোদাল কররে সার
নিকাশের সময় হলে তুমি
কি দিবে নিকাশ ॥
বাহাত্তর হাজার আমিন এসে
যে দিন করবে মাল গুজারী,
কম্পাসেতে জরিপ দিয়া যাবে তাড়াতাড়ি
ও মনভোলা থাইকোরে হুশিয়ারী
ঐ একদিন জমা বাদ পড়িলে
অমনি করবে রিপোর্ট জারী
সরকারের হুকুম ভারী
খাজনা দাও তাড়াতাড়ি ॥
দশ আইনে কইরা জারী

www.pathagar.com

যে দিন হাতে দিবে দড়ি,
তাই জুলমত সরকার ভেবে বলে
মনরে জমি ঠিক রাখিও
ভেঙ্গে গেলে চর পড়িবে
সেও জমিনেরও কামেল মুর্শিদ ধরে ॥
নকশা পরচা ঠিক রাখিও
জমি ওঠিত হলে দাগে দাগ মিশায়ে
জমিনে যাওগা চলে ভয় না রাখো কারো ॥

রাধা বল্লভ রচিত

১.

হৃদয় কপাট দেখ না খুলে ঘরের মানুষ ঘরে খাড়া ॥
চাম চক্ষু বন্ধ না হলে খুলবে না কারো জ্ঞানের তারা ॥
তরিক ধরে জানো হকিকত অন্তরে জাগবে মারফত
দেখবে আল্লা আদম আর মোহাম্মদ
তিন জনা এক জায়গায় খাড়া ॥
আত্মা যাহার সহংএ স্থিতি
গভীর জলে তার বসতি (২)
দেখতে পারে ব্রহ্ম জ্যোতি ষোল কলা চন্দ্রে ঘেরা ॥
আপন মানুষ নিজ ছুরতে
খেলছে খেলা চুপে চাপে (২)
ডুব দিয়ে দেখ রসের কোপে, এই মানুষে মানুষ ভরা ॥
ভেবে রাধা বল্লভ বলে
সাইদ মানুষ চিন উল্টা কলে (২)
লাম, আলিপে মিলন হলে (২)
খুলে যাবে মিমের বেড়া ॥

২.

নায়র হতে নায়র নিতে নাও পাঠাইয়া দিল
সে নাও ঘাটেতে ভিড়িল ওলো নায়রি–
তাড়াতাড়ি আপন বাড়ি চল ॥
তোমার ভাবতে ভাবতে পূবের বেলা পশ্চিমে ডুবিল
ওলো নায়রি ॥
গলার মালা কানের সোনা সঙ্গে নিতে ভুল কোরো না
যাবার বেলায় মনে করে নিও ॥
গাজী পাঁচ পির বদর দিয়া যখন দেবে নাও ছাড়িয়া

www.pathagar.com

তখন তুমি ডগরাতে জল ফেলো ওলো নায়রি।
থাকবে এ বাড়িতে যারা যারা, কেই যেন কাঁদে না তারা
ফেলে না যেন মায়ায় চোখের জলো
আমি যাবার বেলায় বলে যাই আমি আমার দেশে যাইরে
আমার কাছে বসে মুরশিদের নাম বলো
যদি ভালোবাসা কারো সাথে করে থাক এ জগতে
তার কাছে মনের কথা কইও
তার গলা ধরে বলো ভাই আমি আমার দেশে যাইরে
আমার কথা কেউ কোরো না ভুল।
প্রাণ বন্ধুর ছবিখানা বাক্সে নিতে ভুল কোরো না
যাবার বেলায় বাক্সে ভরে নিয়ো
রাধা বল্লভ কর্ম দোষে খালি হাতে চলছে দেশেরে
আমার ছবি তোলার বাক্স জ্বইলা গেল ॥
৩. বাতাসতত্ত্বের গান
জানো নারে ওরে বান্দা বাতাসের খবর
কিভাবেতে আসে বাতাস পিঞ্জিরার (দেহ) ভিতর
একুশ হাজার ছয়শত বার বাঁচো আর মরো
দশ আঙ্গুল ঘরে রাখিয়া বারো আঙ্গুল ছাড়ো
ঘুমাইতে যায়রে বাতাস আঠারো আঙ্গুল দূরে
দৌড়াইতে চব্বিশ আঙ্গুল বাড়ে
আহারেতে ছত্রিশ আঙ্গুল চলে
সে বাহিরে
স্ত্রী সঙ্গম মৈথুনে বাতাস একশ আঙ্গুল যায়রে।

ব্যাখা : মানব দেহে নাসিকা পথে যে বাতাস আসা যাওয়া করে তার পরিধি হচ্ছে দশ আঙ্গুল এবং ব্যাস হচ্ছে বারো আঙ্গুল। প্রতিদিন বারো ঘণ্টায় মানুষ একুশ হাজার ছয়শত বছর বার বাঁচে এবং মরে যায়, যেমন—নিশ্বাস ত্যাগ করা হলো মৃত্যুবরণ করা এবং নিশ্বাস গ্রহণ করা হলো পুনরায় জীবিত হওয়া।

৪.
আমার দয়াল গুরুর লীলা
বিশ্ব মাঝে বোঝা ভালা
গুরু থাকলে কাছে মরা বাঁচেরে
দূরে গেলে সব অন্ধকার ॥
গুরু কখন করে বাদশাই গিরি
কখনো সাজে ভিখারি

www.pathagar.com

আবার কখন পুরুষ কখন নারী
কখনো হয় নিরাকার ॥
গুরু কখন পরে সোনার গহনা
কখন পরে ছেঁড়া তেনা
আবার কখন শাকে লবণ পায় না
কখন করে ক্ষীর আহার ॥
গুরু কখন জলে কখন স্থলে-
হাওয়ায় ভেসে কখন চলে
বল্লভ বলে তারে মিলে
দুই দেহ এক হলো যার ॥

৫.

আমি কত দিনে পাব জায়গা গুরু তোর রাঙ্গা চরণে ॥
কেন দেখা দিয়ে দাওনা ধরা গো-
গুরু তুমি লুকায়ে থাক ... বলো।
আমি না হয় অপরাধী তুমি গুরু কৃপা সিধি
দয়ার সাগর কয় ভক্তগণে যদি নিজগুণে না দাও ধরা গো
গুরু তোমায় দয়াল বলিব কোন গুণে ॥
না বুঝিয়া ভালো-মন্দ, নয়ন থাকতে হলেম অন্ধ
বঞ্চিত হই রূপ দরশনে
সদায় মন প্রাণে করে দ্বন্দ্ব গো গুরুহে
আমারে কুপথে টানে ॥
আমায় জানায়ে দাও জানের বাড়ি, দেহ রথের হও সারথি
নিত্য মূর্তি দেখি নয়নে
অধম বল্লভ বলে তোমায় পেলে গো-
আমি খালাস পেতাম এ জীবনে ॥

৬.

যদি কেউ ধরবি অধর চান, তবে আয়নার পৃষ্ঠে
দিয়ে পায়রা নিজকে নিজে জান ॥
যখন খোদার ইচ্ছায় এক কোটি নূর সৃষ্টি হয়েছিল
তার নয় ভাগে নয় জিনিস দিয়া দুনিয়া গড়াইল
হায়ানি ইনছানি আদি রুহু পঞ্চখান (২)
কাজেই পঞ্চ রুহের পঞ্চ স্বভাব, আদম জাতি পান ॥
যখনে খোদার আশেকে আদম ছিনা চাক করিল

www.pathagar.com

সেই বস্তু হতে বেহেস্তে গন্ধমের গাছ হইল
তার তেরো দানার মধ্যে হাওয়া ... দানা খায়
তিনটা দানা দিয়া দুনিয়ায় বিছন বানায়
একটি দানা খায় আদম দেইখা যান ॥
অধর মানুষ ধরতে যদি পাবে আশা করো
আদম হয়ে আত্মা দিয়ে হাওয়ার আত্মা ধরো
গন্ধম গাছের কাছে তারা থাকিও সাবধান
পাঞ্জাতনে মিশলে রুহু পাইবা নির্বাণ ॥
হায়ানি রুহুর আছে ... গুনার পথে যাও-
চেতন গুরুর সঙ্গ ধরে ইনছানী জাগাও
আদম হয়ে আদম চেন, চাও যদি আছান-
বল্লভের ধ্যানের মধ্যে দয়াল পূর্ণচান ॥

৭.

প্রাণ পাখি পিঞ্জিরায় বসে লওরে হরি নাম
অন্তর দুয়ার খুলে বল, হরে কৃষ্ণ নাম ॥
হরি নাম হয়ে বিশ্বরস ঘুচল না মোর জন্ম মরণ
কিসে হবে ত্রিতাপ বিবশ জুড়াবে পরান
হরি নাম মহৌষধি ভক্তিতে পান করবে যদি
তার দূরে যাবে ভবব্যাধি, হবে প্রাণ আরাম ॥
যাগ যজ্ঞ আর ব্রত আদি, কলিতে নাই অন্য বিধি
প্রাণ খুলে নাম করবি যদি হবে মন আরাম ॥
হরি নাম হয়েছে পারের তরী, জপরে নাম শিক্ষা করি
যথা নাম তথা হরি তথা ব্রজধাম ॥
যার মুখে নাই কৃষ্ণ কথা সে মানবের জনম বৃথা
হরি নাম যার হৃদয়ে গাঁথা–সে তার প্রাণের প্রাণ
বল্লভের স্বভাব মন্দ হরি নামের সাথে নাই সম্বন্ধ
এবার দেখা দিয়ে প্রাণ গোবিন্দ হে
পুরাও মনস্কাম ॥

৮.

সন্ধ্যা বাজির ধুঁকায় পরে আন্দাজি করছ সাধন ॥
কোন রূপেতে পাওয়া যাবে নিরাকারে নিরঞ্জন ॥
যদি মক্কায় গেলে খোদা মিলত, শিব মিলিলে কাশিতে

www.pathagar.com

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ মিললে, কেও চাইত না আর আসিতে।
সে কোন মোকামে আছে বাজ, কি বস্তু তার প্রিয় খাদ্য
কি দিলে হবে বাধ্য কে করতেছে আয়োজন ॥
যদি ভুগ দিলে ভগবান মিলতো খোদা মিলতো শিরনিতে
বড়ো করে ভুগ সাজায়ে বাদশায় পারত কিনিতে।
জাহেরে বাতনে মৌলা ভক্ত রূপে করছে খেলা
কোন দেশে তার নিগুম লীলা, কে করছে তার দরশন ॥
মণ্ডপেতে মূর্তি গড়ে ধ্যান করে মনে মনে,
আবার আকাশেতে হাত তুলিয়া সেজদা করে জমিনে
দেখলাম না যার মুরতি, তার সাথে কি হয় পিরিতি
রাধা বল্লভের এই পাগলামী বুঝবে সে পাগল যেজন ॥

৯.
কাঁচা বাঁশের ঘর বানাইয়া বনবাসে দিন কাটাই
দয়াল গুরু তুমি বিনে দরদি কেউ নাই ॥
আমার কাঁদন দেখে বেদন বুঝে, এমন বান্ধব পাইনা খুঁজেরে...
দয়াল তুমি বিনে ভব মাঝে, ব্যথায় ব্যথিত কোথায় পাই ॥
ছিল জীবন মর্তের রঙ্গমঞ্চে সাথী যারা যারা
আমার সকল কেড়ে নিয়ে একদিন বিদায় দেবে তারা
নীল গগনে মেঘ সাজিল, বিদায় লগন সুর বাজিলরে...
সাথীরা আমায় তেজিল, আমি কার বা সঙ্গে দেশে যাই ॥
ভেবেছিলাম অনেক কিছু রুজি করেছি
এমন দেখি সব হারাইয়া কাংগাল সেজেছি
দয়াল তুমি আমার বল ভরসা তুমি আমার আশার বাস গো
আমার যখন হবে জীবন দশা (নিদান দশা) তখন যেন তোমায় পাই ॥
জানিনা যে কোথায় ছিলাম আবার কোথায় যাব
কার মায়েরে মা বলিয়া বুকের দুগ্ধ খাব
গুরু তুমি আমায় কোলে নিলে যেত আসা যাওয়ার বন্ধন খুলেরে...
বল্লভ বলে নিদান কালে চরণ তলে দিও ঠাঁই ॥

ইউছুব আলী বয়াতি রচিত

জবাব

মা আমেনার কোলে দেখি নূরেরই পুতুল
শাহাদতের বাণী নিয়া আসিলেন রাছুল।

www.pathagar.com

মা আমেনার কোলে দেখি নূরেরই পুতুল
হায়াতুল সে বেলায়াতে, উফাতুন নবুয়াতে
নবুয়াত হইলে খতম, আসিল নায়েবে রাছুল
মা আমেনার কোলে দেখি নূরেরই পুতুল
হযরত আলী মা ফাতেমা, ইমাম হোসেন এই পাঁচজনা
খুবিতে সে আছে মিশে অজুদ ভাণ্ড করে কবুল।
মা আমেনার কোলে দেখি নূরেরই পুতুল
শিরেতে সে হযরত আলী, রুহুতে ফাতেমা বলি,
কালবে হাসান জলিতে হোসেন, এই পাঁচ অঙ্গে একটি পুতুল
মা আমেনার কোলে দেখি নূরেরই পুতুল
হইলে পরে রসিক সুজন, পাকেতে দেখবি পাঞ্জাতন
ইউছুব বলে চিনতে হলে গুরুর চরণ কর কবুল
মা আমেনার কোলে দেখি নূরেরই পুতুল।

আদমতত্ত্ব বিষয়ক

১.

আদমকে চিনবি যদি মনরে আমার
ইয়াদম ইহতে আদম আল্লার নিজ
ছুরতে হইল তৈয়ার ... ঐ
আলমে মুলকুত বিছে, কুদিমি হইতে আসে;
সালাতে মুকছুদ আদম, মাখলোকাতে হইল প্রচার
আদমকে চিনবি যদি মনরে আমার
দায়মু সালাত পরে যখন, ফেরদাউস বিচেতে তখন
মানব জান্নাত হযরত আদম, সালাতে মেরাজ হইল তার।
আদমকে চিনবি যদি মনরে আমার
কোন ফায়া কোন সালাত পরে, নাছদ বিছে আদম ঘুরে,
সালাতে ওস্তা নেগাভর কদম, করে দেখ সুবিচার
আদমকে চিনবি যদি মনরে আমার।
ইউছুব বসে সাঁই রব্বানা, হইল না মোর আদম চেনা
আমার ঢুলু চান্দের পাক দরবারে দরখাস্ত রইল আমার।

২.

আওয়াল আখের জাহের বাতনে,
হইয়া সুজন আদম লও চিনে। ... ঐ
গঞ্জজাত পুষিদাতে ছিল আদম, নিজ দমেতে

www.pathagar.com

টেনে লয় দম, হাইয়ান সেই হযরত আদমে
জিন্নতল ছুরি বিছে মুস্তিতে যখন আসে
হাওয়া আদম গন্ধম খায় তখনে। ... ঐ
চক্ষু থাকতে হইলি কানা, হইল না কেন আদম চেনা
আল্লার ছুরত দিয়াছে আদমে, আন্‌স ফাকতু
ফিহিমের রুহি, আল্লা বলে করে অহি,
আমার নিজদম ফুকাইলাম আদমতনে। ... ঐ
স্বরূপে রূপ করে মিলন, মিশে আছে আল্লা আদম
দেখা যায় না বেল গায়েব একিনে,
... একিয়নান সামনে নিয়া, জ্ঞান নয়নে দেখনা চাইয়া,
আহাদ গুপন আদমতন যেখানে। ... ঐ

৩.
তুমি হও আদি তুমি হও অন্ত, তুমি ফুল তুমি গন্ধ,
তুমি ভালো তুমি মন্দ, আমার হয় দণ্ড কি বিষয়।
আসা-যাওয়া কি ... দয়াময়।
বেহেস্ত দোযখ স্বর্গ নরক, সকলি তোমার ইচ্ছায়
তোমার সবই ভালোবাসি, নাই দুষাদুষি
যথায় খুশি তুমি রাখিও আমায়।
আসা-যাওয়া কি ... দয়াময়।
হুকুমে তুমার, সৃজন হয় আমার, তুমি আমি রই
এক জায়গায়, তবে কেন দূরে রেখেছ আমারে
ইছবের প্রাণে তোমায় দেখতে চায়
আসা যাওয়া কি ... দয়াময়।

ভক্তিমূলক গান

আমি আসলে হইলাম নকল, সারিল না জন্মের ভুল,
কি করিব কোথায় যাব, ভাবিয়া না পাইলাম কূল
আমি আসলে হইলাম নকল, সারিল না জন্মের ভুল।
আমি আদর করে পুষলাম যারে রমণী,
সে আমাকে ভালোবেসে, বসিল আমারি পাশে
খুনি হইয়া হরণ করে নেয় মণি।
আপন হইয়া সাজিলো কাম কামিনী
মায়াজালে বন্দি হইয়া, এই জীবন বিসর্জন দিয়া,

www.pathagar.com

আমার কাঁদিতে হয় রাস্তায় বইয়া, আমায় কে দিবে ভুলের মাসুল।
আমি আসলে হইলাম নকল, সারিল না জন্মের ভুল।
মায়ের কাছে হইলাম এসে মাতৃঋণ, মায়ের কোলে স্থান নিয়া
ঋণী হইলাম মায়ের দুগ্ধ খাইয়া সেই ঋণেতে ভাবিতেছি রাত্র দিন
পিতৃবস্তু দিনের দিনে হইল ক্ষীণ, ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন,
করিয়াছে লালন পালন, আমি সবার ঋণে হইয়া বন্দি
আসলে হইলাম নকল সারিল না জন্মের ভুল।
ভাবিয়া পাইলাম না কোনো কূল কিনার, কেবা কে কেবা গুসাই,
কেমন করে কার ঋণ সুধাই, গুরু বাক্য হইল না অক্ক আমার
বল গুরু সাধন হবে কি প্রকার, ইউছুব তাই পড়ে গোলমালে
কেবা দিবে ভরসা ও কূল।
আমি আসলে হইলাম নকল, সারিল না জন্মের ভুল।

পরমতত্ত্ব বিষয়ক

১.

তুমি সুর করে ডেকেছ যারে, সে দেখো মন কাছেতে রয়,
তুমি যথা সেও তথা ডাকিলে সে সাড়া দেয়।
তুমি সুর করে ডেকেছ যারে, সে দেখো মন কাছেতে রয়।
ঝলক দেয় সে রূপ মহলে, তুমাতে খুঁজিলে মিলে,
সে যে হাতের কাছে লড়ে চড়ে, ডাকিলে সে কথা কয়।
তুমি সুর করে ডেকেছ যারে, সে দেখো মন কাছেতে রয়।
ঢাকার বস্তু আছে ঢাকা, খুঁজলে তারে পাবি দেখা
প্রেম থাকিলে মধু মাখা, দেখবি প্রেমের বিনিময়।
তুমি সুর করে ডেকেছ যারে, সে দেখো মন কাছেতে রয়।
ইউছুব কয় সাঁইর নিলা অপার, কে বুঝে মহিমা তাহার
সূক্ষ্ম হইয়া লক্ষ্য ধরে, ধ্যান দরশনে পাওয়া যায়।
তুমি সুর করে ডেকেছ যারে, সে দেখ মন কাছেতে রয়।

২.

কুন্তুকান জান মাক ফিয়ান, কালামে করে প্রচার,
প্রেম সাধিতে এই জগতে, একে হইল দুই আকার,
জাত হইতে হইল সেফাত, আমরা সব সেফাতের সেফাত,
গুপনে রইয়াছে আহাদ, সিন্ধু হইতে বিন্দুমণি

www.pathagar.com

যে চিনে সেই মহাজ্ঞানী ... ঐ
আলেপেতে অটল মণি, নুক্তা হইতে সেফাত তার
বের নিচে এক মুক্তা পরে, এই জগত হইল প্রচার,
আলেপের নুক্তা বে-তে গেল, মিমের নুক্তায় আদম হইল,
ইউছুব বলে স্রষ্টা হইতে, সৃষ্টি হইল আকাশ জমি।

৩.
ওরে মন খুঁজরে যারে, মিম আলেপে
করছে খেলা আলেক শহরে ঐ
মনরে আলেপে আল্লা হাদি, পুশিদাতে নিরবধি
আসা-যাওয়া মিমের শহরে,
লাম হরফের ফাঁদ পাত সেই রাস্তার মাঝারে
ওরে মন খুঁজরে ... ঐ
মনরে লাম আলেপে দিয়া কাউরা
সেই হইতে সৃষ্টির গোড়া
লজ্জায় মিম ঘোমটা দিয়াছে
সেই কারণে তেইশ হরফের বামেতে পরে
ওরে মন খুঁজরে যারে ...ঐ
আসেক জুড়ে আপে খোদা
এস্কে মাসুক করে পয়দা
বে-হরফে ফুল ফুটায় তারে, আপনি সাঁই
অলি হইয়া ফুলেতে পরে,
ওরে মন খুঁজরে যারে ...ঐ
ইউছুব কয় সাঁইর লীলা অপার, সাত পাঁচে বারো আকার
লক্ষ কোটি আলেপ ফুটেছে, নাম বাক্‌তার নিরাকারে
অখণ্ড ধরে।
ওরে মন খুঁজরে যারে ...ঐ
কেবা খোদা কেবা আদম, কেবা হাওয়া কেবা গন্ধম
বিচার কর রসিক সুজনে ভেবে কয় ইউছুব দেওয়ানে
থাক গুরুর রূপ ধিয়ানে, তারে পাবি কি আর মুর্শেদ রূপ বিহনে ...ঐ

জীবতত্ত্ব প্রশ্নবোধক

অখণ্ড মণ্ডল আকার, গুপ্ত ছিলে কেন ব্যক্ত হলে
আহাদ গুপন কিসের কারণ, কোথায় সে ধন লুকাইলে।
অখণ্ড মণ্ডল আকার, গুপ্ত ছিলে কেন ব্যক্ত হলে।
আলেপের এক নুক্তা ছিল, সেই নুক্তা কেন বে-তে গেল,
এখন কেন খালি আলেপ, কোরানেতে প্রমাণ দিলে

www.pathagar.com

অখণ্ড মণ্ডল আকার, গুপ্ত ছিলে কেন ব্যক্ত হলে।
গুপনের ধন রাখবে গুপন, তবে কেন করলে এমন,
কে তোমায় দেখাইল স্বপন, কার স্বপনে ঘুম ভাঙ্গিলে
অখণ্ড মণ্ডল আকার, গুপ্ত ছিলে কেন ব্যক্ত হলে।
ইউছুব কয় বুঝেছি আমি, আমার ধনে তুমি ধনী,
তবে কেন জগত স্বামী আমায় হইতে গুপন রইলে।
অখণ্ড মণ্ডল আকার, গুপ্ত ছিলে কেন ব্যক্ত হলে।

দেওয়ান রশীদ রচিত

১.

থেকো মন সচেতনে জ্ঞান নয়নে ঘুমাইও না ॥
ঘুমাইলে পড়বে ধরা হারাইবে ষোল আনা ॥
চৈতন্য মানুষ যারা বেহুঁশে রয়না তারা
সদায় দেয় রূপের পাহারা সাধু যারা
তারা দিব্য ঘরে বসত করে, ভাংগা ঘরের ধার ধারে না ॥
দেওয়ান রশীদ বলে বারে বারে
ঘর খানি লও পাকা করে
ভাংগা গড়া বারে বারে আর হবে না
ভাংগা বাড়ি পলাইনা ঘর
সেই ঘরে কেউ বাস করে না।

২.

আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে রে ॥
আল্লা, মোহাম্মদ, আদম, তিন জনা এক নূরেতে ॥ (২)
সেই সাগর অকূল আদি অন্ত নাই নিরবধি
নিঃশব্দে আছিল সিন্ধু আদিতে
আচানক দিয়ে নাড়া শব্দ হইল খাড়া
সেইতো সৃষ্টির গোড়া আদিতে আদিতে ॥
শব্দ আছিল কুন শুনো তার বিবরণ
হুয়াল আসমা কারিগরি
আহাদিয়াত জাত নূর এলেমে হয় জহুর
শহুদ অজুদ ফায়াকুনেতে কুনেতে ॥
দীন হীন রশীদ বলে শাহ্ ছাফার চরণ তলে
জেনেছি তব কৃপা বলেতে

www.pathagar.com

সাত পাঁচ বারো কারে সাঁইজি মোরে সৃষ্টি করে
তালিমে পাইনু বস্তু ভেদ বুঝিতে ॥

৩.
চিন চিন আমার মন চিন পাঞ্জাতন
জাতে রুহু পঞ্চজন বিরাজ করে ॥
চিন আদম অজুদ পাবে অজুদে মজুদ
তবে রুহুল, আজম, দেখবি নজরে ॥
রুহু কুরসি আর রুহু যে ইনছানি
দেখ নজর করে রুহু যে হায়ানি
রুহু নাবাদি জামাদি দেখবি মন যদি
তবে ভজ নিরবধি কামেলিন পিরে ॥
কামেলিন পির হইবেন যিনি
রুহের ছুরত দেখাবেন তিনি
তৌহিদ সাগরে ডুবায়ে তোমারে
রশীদ কয় অপরূপ দেখবি নজরে ॥

৪.
তুমি বিশ্বরূপী বিশ্বময়
রূপ দেখালে আপনার
ত্রিভুবনে নাই তোমার তুলনা
তোমাকে তুমি দেখিতে
করেছিলে বাসনা
তাই এলে বিশ্বরূপে
এমকান লও ঠিকানা
ওয়াহেদু আছানি সাঁই
তুলনা তোমার নাই
তোমার দুই নাই
তাই তোমার নাই তুলনা।
তোমার থাকিলে দুই
দেখাইতে তাহারে
একা তুমি ত্রিভুবনে
তুমি দেখ তোমারে
হাইয়ুল কাইয়ুম জাত

www.pathagar.com

তুমি জাত তুমি ছিফাত
অহদুত কাহরাতে তুমি কর খেলনা ॥
নিস্তব্ধ অবস্থা মাতৃগর্ভে
জমা জহুরের কারণে
আহাদ জাত মুখফি ছিল
নূর এলেম শহুদ অজুদ
নিয়া আসলে এমকানে
ওয়াজেবুল অজুদ ধর
এমকানেতে ঘুর ফের
নওবতন ঘুরে রূপ
দেখলে আপনা ॥
আদি অন্ত গুপ্ত ব্যক্ত
তুমি চারি আকছানে
আউয়াল আখের জাহের বাতেন
তুমি প্রকাশিলে কোরানে।
সব চিজেতে তুমি ঘেরা
কিছু নাই তুমি ছাড়া
সাইন মুহিত নাম
করলে বর্ণনা ॥
হাইয়ুন আলিমুন মুরিদন
আর কাদিরুন
ছামিউন বাছিরুন
তুমি হইলা কলিমন
তুমি বল তুমি শুন
তোমায় দেইখা তুমি চিন
দেওয়ান রশীদ বলে
অচিনার চিন
চিন আপনা ॥
ত্রিভুবনে নাই তোমার তুলনা।
হরদমে কর জপনা
জাতে সুমন হয় দমন
লাইলাহা ইল্লাল্লাহু
জপ ওরে আমার মন ॥

www.pathagar.com

আলমে হুকুত যথায়
হরকত হইল তথায়
আলমে মিছালে এসে
শব্দ হইল কুন
খায়েস করিয়া বাড়ি
করে বন্ধু তাড়াতাড়ি
আলমে আচ্ছামে এসে
জহুর হলো ফাইয়াকুন ॥
দুই নদী একযোগে চলে
বরজখ তার মাঝখানে
কে হয় লা কে হয় ইলাহা
ইল্লাল্লা হয় কোন জন
দুই নদীর দ্বার সমবেগে
জেয়াদতি নাহি করে
মতি মঙ্গা দুটি রত্ন
ঐ খানেতে হয় সৃজন
দেখনা সুরা আর রহমান
মারজুল বাহরাইন
ইয়ালতাক বায়নুহুমা
বরজখ লইবগা
দেওয়ান রশীদ বলে
কামেলিন মুরশিদ ধরে
দেখাইবে দুই নয়নে
মতি ও মঙ্গার কিরণ ॥

৫.

দীন দুনিয়ায় চাঁদরে দীনের নবী আখেরের কাণ্ডারিরে
কিসে পাব দীনের নবীরে
তুমি দিবা তুমি রবি দোজাহানে তুমি হবিরে (হাবিব)
আশকেরই হিল্লায় ডুবে আমার দীনের নবী
যেমন পতঙ্গ খেলেরে দীনের নবী হৃদয় মাঝারে রে ॥
তোমার আশকি যারা শাফায়াত পাইবে তারা
আশকেরি মাসেকে তুমি তোমরা সেই মাশেক ধরবে

www.pathagar.com

এমন আশেক খেলা খেলে সেই মাশেকের
ও দিন রশীদ বলেরে নামের ধ্বনি
দীনের নবী এই লহর দরিয়ারে।

সাইদুর রহমান বয়াতি রচিত বাতাস তত্ত্বের গান
এই দেহে বাতাসে কী কথা কয়
তত্ত্ব জেনে মত্ত হতে হয়
আড়ে দিকে (লম্বায়) কতখানি
কী বা তাহার পরিচয়
সেই বাতাস তিনটি শব্দ কয়
তাহাতে তিন মহাজন রয় (আল্লা-আদম-মোহাম্মদ)
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিয়ে
খেলছে সব সময়
স্বর্গ মর্ত ত্রিভুবনে এক পলকে খবর হয় ॥
বাতাস যাহার অধীন হয়েছে,
জগতের খবর লইতেছে
বিনা তারের টেলিফোনে রাস্তা খুলেছে
মূল দরজায় কপাট দিয়া
জাতে জাত (আল্লাহ নিজে) মিলাইতে চায় ॥
আসা যাওয়া করে দুই পথে
মিলে না কভু এক সাথে।
মাঝখানে এক সরু পর্দা রয়েছে তাতে
কখন বাড়ে কখন কমে
এই আলম (পৃথিবী) করিয়া লয় ॥
সেই বাতাস ছুটলে একবারে
তখন রোজ কেয়ামত করে
আগুন পানি হাওয়া মাটি
যায় যারে যারে
তাইত সাইদ চিন্তা করে
কখন যেন হয় প্রলয় ॥

১৩. মারফতি গান

সৈয়দ কালু শাহ রচিত
১.
ধইরা তোলরে মোর আল্লা নবী
একই কালে ডুবেনা যেন সাধের তরী

www.pathagar.com

যে নৌকায় মুরশিদ কাণ্ডারি
সেই নৌকায় কেন ডুইবা মরি
ধইরা তোল অধীনেরে ॥
ভাব সাগরে যেন যায়না মারা ॥
(ওরে) আপনে মাঝি সাগর দাড়ি
এই যে মস্তুল লাইগাছে আড়ে
এই যে কমজোর তোর
কানির দড়ি বেউরি বাগে
যাইস না মারা
আমি নৌকা দিলাম গহীন জলে
মুরশিদ তোর নামের মহিমা বলে
ধইরা তোল অধীনেরে
ভাব সাগরে যায়রে মারা
কালু শাহ্ ফকির বলে
এই যে দম থাকিতে নৌকায় চড়বেন
দমের নিকাশ দমে দিলে
তার ভরা কি যায়রে মারা ॥
২.
ও সখি গো তোরা কেগো প্রেম করবি
তোরা যে প্রেম করবি আমারে পাবি
আমি নিদয়া না কারুরে
আমি প্রেমের মালা নিয়া
প্রেমের মালা সদায় গাঁথি
প্রেমের বাজারে থাকি
প্রেমের মালা সদায় গাঁথি হে
এই মালা যে নিবি
কালারে সে পাবি
মালা গলায় দেখবি কালা নয়নে রে ॥
কালু শাহ্ ফকিরে বলে
সৈয়দ চান্দের চরণ তলেরে
অমূল্য ধন দোকানে
খরিদদার তার না মিলে
শুধু দোকান লইয়া বইসা থাকিরে ॥

মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন রচিত
১.
আগে শরিয়ত জানিয়া করিও ফকিরি

www.pathagar.com

ছোবে না যমে
না জানলে শরিয়তের বিধান
ঘোরায় তারে শয়তান ॥
শরিয়তে গাছের গোড়া
তরিকতে ডাল
হকিকতে ফুলের কলি
মারফতে ফল
ফকির কোথায় পাইবা
মারফতের ফল
শরিয়তের গাছ বিনে ॥
শরিয়তের মাতা গুরু
তরিকতে পিতা গুরু
হকিকতে জন্মে ভাই বোনে
মারফতে ঘরের স্ত্রী
জন্মে কি শরিয়তের
মা বাপ বিনে ॥
আজহার কয় শরিয়ত কর
মারফত বাতিলে ধর
শরিয়ত করে মারফতে গেলে
কামেলিন হয় সেই জনে ॥
২.
আছে মানুষ আনন্দের বাজারে
নির্জন নিগুম ঘরে
মানুষ আছে গো ॥
যদি মানুষ চিনতে চাও
চিনা লোকের সঙ্গ লও
চইলে যাও সেই চিনার বাজারে
সেই মানুষের সঙ্গ নিয়া
হিয়াতে মিলাও হিয়া
রাখ তারে অতি যতন করে
দেইখ তারে দীর্ঘ জীবন ভরে।
ফুলের মধ্যে মধু থাকে
ভ্রমর ঘুরে পাকে পাকে
ঘুরে ভ্রমর মধুর আশা করে
দুনিয়ায় শিমুল ফুলে

www.pathagar.com

ভ্রমন যায় না
প্রেমিক বিনে ভাব বুঝে না
ভ্রমন মধু পায় না
তুলা পায় ভিতরে ॥
যেই গাছের গোড়ায় রস
সেই গাছের ডালায় রস
পাতায় রস ফুলে রসে ভরে
শুকাইলে পাতায় রস
শুকনা পাতা করে খসখস
ফুলের রস শুকায় গেলে
ভ্রমর যাবে উড়ে ॥
দুগ্ধেতে হয় মাখন ছানা
গোয়াল বিনে কেউ জানে না
সূক্ষ্ম গোয়াল হইতে যেজন পারে
সে অনুরাগের চরকা দিয়া
ভক্তি রশি লয় বাঁধিয়া
এশক জোরে মাখন বাহির করে ॥
মাকলের ফল দেখতে জল
উপরে লাল ভিতরে কাল
গুরুর সেবায় লাগল না সংসারে
তার উপরে লাল পাই
ভিতরে ভরা ছাই
তোমার দেহের কেদা উঠল না সংসারে
মানুষের সাক্ষাৎ পাইবা কেমন করে ॥
গাছের আগাতে নারকেলের ফল
পাত্র বিশেষ থাকে জল
টলমল করে তার ভিতরে
সেই জলে আশেক যারা
এশকের চুমুক মারে তারা
মন তুই ছোবা চুইষা গেলি
এই সংসারে ॥
দীনহীনের এই বাসনা
আমার মত কেউ হইও না
আমি আছি ডাকাতের দুয়ারে

www.pathagar.com

আমার পথের সম্বল ছিল যাহা
ভবে হারাইলাম তাহা
আমার গুরুর করণ ছিল যাহা
এই ভবে হারাইলাম তাহা
বিপাকে কানছে আজহারে ॥

আসমানের পক্ষে গান

আলার নাম শুনি দেখি না তারে
খোদা বলে মানি কারে
আখলাকুল মাখলুকাত করল সৃষ্টি
সে রহিল কেন গোপন ধরে
সে আমাগ সকলকে দেখে
আমরা কেন দেখি না তারে ॥
তুমি আমি জন্ম নিলাম
এই ভব সংসারের পরে
আমার নাম রাখল বাপ মায়
হাদিছ দেখে শুদ্ধ করে ॥
আল্লার নিরানব্বই নাম
দুনিয়ায় প্রচার করে
খোদার নাম রাখছিল কেবা
জানলে কথা কও আমারে ॥
আজহার কয় আমরা কেনে
পরে রইলাম অন্ধকারে
মুরশিদ গোলাম মওলা যদি দয়া করে
সেই ছবি দেখায় আমারে ॥

জমিনের পক্ষে গান

আপন ঘরে খুঁজে দেখ
তোমার মধ্যেই বসত করে
নিজকে নিজে চিনতে পারলে
তবে চিনবে সেই খোদারে ॥
শাহারগ হইতে নিকটে
তবু কেন দেখ না তারে
তারে নিজ ছুরতে দেখতে পাবা
জ্ঞানের নয়ন ফুটলে পরে ॥

www.pathagar.com

উন্নালাকা খালাকা মিন
আদামা আলা ছুরাতেহি প্রচার করে
আলায় নিজ ছুরতে গড়ে আদম
পাঠাইল এই সংসারে ॥
আজহার কয় ছুরাতের আদব কর
এই সংসারে
দুই হাতে কেন মুখ মুছ
আলার ছুরাতের আদব করে ॥

১৪. পল্লিগীতি

চান মিয়া রচিত

১.
বড়ো সুখে নিদ্রায় শুইয়াছিলাম
গলে দিয়ে বন্ধুর মালা
ডাক দিয়া কেন বনের কোকিল
বাড়াইলি জ্বালা
বন্ধুরে ... বন্ধু গেছে পরদেশে
তুই বুঝবি কি মোর কথা
কেন প্রাণে দিলি ব্যথা
আগুন জ্বলে বুকে কইনারে দুঃখ
অন্তর হইছে কালা ॥
দিন কাটল তার আশায় আশায়
সন্ধ্যা গেল বইয়া
সহিতে পারি না জ্বালা
নিশি যায় পোহাইয়া
কোকিলরে আমার আশার বাতি নিভু নিভু
আইলনা তো আর
কেন ডাকিস বারে বারে
তারে কইও পাখি ঝরে আঁখি
মন হইছে উতালা ॥
২.
নীল বাদাম উড়াইয়ারে মাঝি কোন বা দেশে যাও
একবার এসে দেখে যাইও আমার ছোট্ট গাঁও
রে মাঝি আমার ছোট্ট গাঁও।

www.pathagar.com

ছায়া ঢাকা ছবি আঁকা দেখিতে সুন্দর
নয়ন যদি ভরেরে মাঝি ভরে নাও অন্তর
কলাপাতায় দোলায় মাথায়
ছাড়লে পূবাল বাও রে মাঝি
সেথায় হিজল বনের ফাঁকে ফাঁকে
রং বেরং এর পাখি
বউ কথা কও চক্ষু গেল করে ডাকাডাকি
সেথায় তুমি নাও ভিড়াইয়া
শুইনো তাদের গান
বকুল ফুলের হাসি দেখে
জুড়াইও পরান
তোমায় হিজল ফুলের মালা দিব
যদি নিতে চাওরে মাঝি
আমার ছোট্ট গাঁও।

সাইদুর রহমান বয়াতি রচিত
মানিকগঞ্জের চারণ কবি আমি বাংলা মার সন্তান
যেইখানে মানিক মিলে মানব দলে রে
আরো পির আওলিয়ার বাসস্থান ॥
এখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ হয়
জিকির আর কীর্তন শুনলে ভাবের হয় উদয়
নদী কালীগঙ্গায় পলি ছড়ায় রে
এটা যে সারা বাংলার মধ্যস্থান ॥
এখানে ফসল দেখলে ভরবে সবার প্রাণ
কবিয়ালের কণ্ঠে বাজে নিত্য নতুন গান
বাস করে দুইটি জাতিরে হিন্দু মুসলমান
মানুষের ব্যবহারে দেয় প্রমাণ ॥
সাইদুর রহমান আমার হলো নাম
ডাকঘর হলো লেমুবাড়ি হাসুলি আমার গ্রাম
আমি সবার কাছে হাত পাতিলামরে
আমাকে দোয়া আশিস করবেন দান ॥

১৫. গজল

খৈমুদ্দিন বয়াতি রচিত

১.

আল্লা বলে ডাকলাম সারাজীবন

www.pathagar.com

উদ্দেশ না পাইলাম তার
দূর নয় অতি কাছে
নিকটেতে আছে আমার
পরিচয় দিলে আল্লা কাদের গনি
নফসেতে পাবি দিদার
সাধু ডুব দিয়ে পেয়েছে মওলার
আসল বাড়িঘর।
২.
সাধু ঘরে করেছে খোঁজাখুঁজি
কেউ না বলে ঘরে আমি আছি
সাধু তখন হইছে শুচি
ঐ ঘরে সাধু একা একেশ্বর
সাধু ছিল পরম আশে
এলো পরম সাধুর বেশে
ডুবে তার প্রেম রসে
পেয়েছে একটা নূরের ঘর।
গুরু রূপ ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতি
তথায় সাধকের গতি
সাধক সাধে প্রেম রতি
মরণ চিন্তা নাই তার।
খৈমুদ্দি পাগল বেশে
ঘুরে বেড়ায় দেশ বিদেশে
এলেম কালাম নাই তার কাছে
ভুলের দেশে বেঁধেছে ঘর।
৩.
চিনেছ কী তোমায় তুমি
কে তুমি
ছিল না আকাশ বাতাস
বায়ু পবন পানি
তখনো ছিলে তুমি।
ছিলে তুমি গঞ্জ জাতে
জাতে জাতে আপনি প্রকাশিলে তাতে
তোমাকে জানতে তুমি
তাই এসেছ ধরাতে তুমি।

www.pathagar.com

জাতে ছিফাত ছিল তাতে
ছিল ছিফাত জাতে জাতে
আপনি প্রকাশিল তাতে
আপন রূপ দেখাইতে ভুবনে।
ছিফাতের রূপ জাতে প্রকাশ
ধরে লামের বেশ
জাতেই প্রকাশ হলেন তিনি।
জাতের স্বভাব ভাঙ্গা গড়া
তাইতো গাই নবরূপের ধ্বনি।
তাই লা মাকান লামের আকার
আহাজ জাত হলো ছিফাতের আকার
তাই খৈমুদ্দি কয় আশরাফ নাম ধরে
খুঁজে বেড়ায় আপনারে
তাই হয় নাই চিনাচিনি ॥
আমি চির চেতন
চির পুরাতন
আমি মূলাধার
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে আমি
তুলনা নাই আমার
আমি চতুরঙ্গে করি ভর
বানাইয়া এক এমকানি ঘর
আমি আমাকে চিনিতে
হয়েছি প্রচার ॥
আমি জাত আমি ছিফাত
আমি আহাদ আমি আহম্মদ
মোহাম্মদ নাম তারিফ আমার।
আমি হাইয়ুল কাইয়ুম জাত
ছিফাতে আসিয়া পাইলাম জাতের স্বাদ
তাই ভাঙ্গা গড়া আমার স্বাদ
মউতু ইনতা কাবলিল মউত
এটিই জাতের স্বাদ।
খৈমুদ্দি তাই পাগল পারা
নাছুতের তরঙ্গে চুবানি খাইয়া দফা সারা
তাই মুরশিদ তুমি হইয়া সখা

www.pathagar.com

অন্তিমে দিও দেখা
ঐ রূপ দেখিতে দেখিতে যেন
আমি হইয়া যাই পার।
আহাদে ছিল আহম্মদ
আহাম্মদকে চিনিতে মোহাম্মদ প্রকাশিল
মিছালি রূপ নিয়া
বে মিছালকে চিনিতে।

শব্দার্থ : জাত = মাটি হচ্ছে জাত, ছিফাত = মাটির গুণ হচ্ছে ছিফাত, গঞ্জ = পুশিদা (উর্দু শব্দ) = গোপন

১৬. আসরি গান

আজহার বয়াতি রচিত

ওগো আলা পাক পরোয়ার
তুমি বিনে কেউ নাই আমার
আমি বান্দা হইলাম গুনাগার ॥
আলা তোমার নূরেতে নবী
যায় নুয়ে দুনিয়ার খুবি
করলে তারে দীন দুনিয়ার সরদার
তার বেটি জগত জননী
আলা, মা বলিয়া ডাইকাছ তুমি
তাহার স্বামী আলী জড়োয়ার
ফাতেমার হাসান হোসেন দুইটি ছেলে
হোসেন কারবালাতে শহিদ হলে
দিল কোরবানি নামেতে সিমার
আলা, ফাতেমার যে পুত্র মারে
এমন শক্তি কার সংসারে
কি দিয়া প্রাণ গড়েছ তার ॥
আলা রহমানের রাহিম তুমি
কোরানে শুনেছি আমি
করবে রহম বান্দার উপর
আলা আমি যদি পাপ না করি
তারে দিবা তুমি মাফ করি
রহমান নাম ডাকবে কে তোমায় ॥
আলা আমার মধ্যে আছ তুমি

www.pathagar.com

তোমার মধ্যে নাইকো আমি
আমায় দিয়া গৌরব তোমার
আলাম প্রজা থাকলে আছ রাজা
নইলে তুমি কিসের রাজা
ভাবিয়া তাই বলছে আজহার ॥

সাইদুর রহমান বয়াতি রচিত
কেউ বলে গান শুনা
হাদিসে রয়েছে মানা,
গান যে জন গায়
সে নাকি দোযখে পৌছায়
আমি বলি
যে গানে নাই আল্লা রসুলের নাম
যে গানে নাই মানুষের কোনো সুনাম
সেই গান গাওয়া নিষেধ রয়।
গান হয় জ্ঞানীর জন্য
গানে হয় জ্ঞানের চৈতন্য
গান হতে প্রেম ভক্তি বাড়ে
ফকির আর দরবেশ যারা
উদাসিনী বাউলেরা
গান শুনে ভজন করে পরোয়ারে।
সাইদ মিয়ার এই চাওয়া
পূরণ করিও রব্বানা
আমি যতদিন বেঁচে থাকি সংসারে
জাগ্রত জ্ঞান দিও আমার অন্তরে
হিংসা নিন্দা ভুলে যেয়ে
মানুষকে ভালোবাসব
গান শুনে গান গেয়ে
শেষদিনে এই বাংলার
বুকে ঘুমাব ॥

১৭. দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান

আজহার বয়াতি রচিত
আর কতকাল করবে বসত
শালুক পাতার ন্যায়

www.pathagar.com

কি নায়রে তরী
ডুবলে ভাসানো বিষম দায় ॥
সাড়ে তিনহাত নৌকা খানি
দিয়াছে খোদায়
চইর, বৈঠা লাগে না তরীর
শুকনা দিয়া যায়
কি যায়রে তরী
ডুবলে ভাসানো বিষম দায় ॥
আলায় চল্লিশ গঞ্জ মাল দিছে
তরীতে বোঝাই করি
মালের খবর না জানিয়া
সাইজাছ বেপারি (২)
নদী শীতলক্ষা পাড়ি দিতে
তরী ডুইবা যায়
মদনগঞ্জের মদনা চোরা
ধইরাছে তোমায় তরী
ডুবলে ভাসানো বিষম দায় ॥
তোমার মুরশিদকে কর নাই তুমি
পাড়ের কাণ্ডারি
তুমিও নিজে সাজিলা না
পাড়ের ভিখারী
দিতে পাড়ি ডুবল তরী
নদীর কিনারায়
তোমার বিপদ দেখে
মাঝি মালা সকলেই পালায় পালায়রে
তরী ভাসানো বিষম দায় ॥
নারায়ণগঞ্জের পাড়ে
নবীগঞ্জ যাও
তোমার পাড়ের তরী
সাজাইয়া রাখছে
নিজে চিনা লও
মুরশিদকে বসাইয়া রাইখো
তরীর হাইল মাচায়
তোমায় নিতে হাত বাড়াইয়া

www.pathagar.com

আছে ফাতেমায় ফাতেমারে
তরী ডুবলে ভাসানো বিষম দায় ॥
মুরশিদকে করিও সেদিন
পাড়ের কাণ্ডারি
অনুয়াসে পার হইবে
থাকলে ভক্তির কড়ি
হেলেগুলে দুলে পাবে তরী
ঢেউয়েরই মাথায়
তাই আজহার মুরশিদের গুণ গায়
লাহুর দারিয়াই ॥

সাইদুর রহমান বয়াতি রচিত

১.
আগে সাজাও দেহতরী
তরী না সাজাইলে তোমার খুশি থাকবে না কাণ্ডারি ॥
দাড়া কর ধৈর্য দিয়া, ছাইনি চল্লিশ তালিম নিয়া
নবগুণের কারা আনিয়া গুঁইড়া লাগাও তারি
খুঁটি নাটি বুদ্ধি হবে গুছা বাঁকার আরি
বিবেক আর বিশ্বাসের গলুই আগা-পাছায় দিবে জুড়ি ॥
দশইন্দ্রিয় পেরাক নিয়া জ্ঞান হাতুড়ি লও মারিয়া
ষড়রিপু পাতাম দিলে বাইনে করবে আরি
এবার ভাবনা কামনার গাবে করনা সুন্দরী
টুটা ফাটা বন্ধ করে সবলের গ্যাস তৈয়ার করি ॥
মান অহংকার চাটাই নিয়া
মালখোপে লও বিছাইয়া
নামের মাস্তুল প্রেমের বাদাম
নিরিখের দাও ডুরি
অমূল্য নাম মুরশিদ বাণী হরদমে গাও সারি
তরিকতের বৈঠা ধর
সাইদ কয় তার জমবে পাড়ি ॥

২.
তৌহিদ সাগরে প্রেমের মাছ ধরা পড়ে
আগে উঠ যাইয়া
তরিকার তরী এশক সুতার জাল বুনাইয়া
প্রেমসুতার ডুরি

www.pathagar.com

অনুরাগের কাঠি জালে
দাও সারি সারি।
ভাবের গাব লাগাইয়া জালে
ফেলে দাও গভীর জলে
তোমার ছয় রিপুকে রাখ আপন করেরে
বকের স্বভাব মাছ দেখিলে
পলক দেয় না চোখে
বিড়াল থাকে ছুকনি ধরে
ইঁদুর যদি দেখে
যদি সেই মাছ ধরিতে চাও
নয়নে পলক নাহি দাও।
ছয় রিপুকে রাখ আপন করে।
ভাইগ্য গুণে পাইলে ঐ মাছ আশা থাকে না
ওয়াছ করনি পাগল হইয়ে পায় নবীর জামা
সে বড়ো সাধনার মিন যে দিল করছে একিন
পাগল সাইদ শিখেনাই মাছ ধরিতে।

৩.
পাড়ি দিতে ভয় করো না
ও দরিয়ার মাঝিরে
নাও চালাইও মাঝি
ভাবের বাদাম দিয়া ॥
ও মাঝিরে
চৌদ্দ পোয়া তরীখানি
বঙ্কে বঙ্কে জোড়া
ঝাপটা বাতাস লাইগা যেন
ছুটে না বাইনের জোড়ারে ॥

১৮. নাম সংকীর্তন

১.
প্রেম কি সামান্য বটে সজনী
সে যে হেম কষা পাথরের মত
পাথর নয় পরশমণি
রাধে বলে আমি যোগ্য নই
আমার কৃষ্ণকে যে ভালোবাসে
আমি তারই দাসী হই
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ নাম তার মুখে শুনি ॥

www.pathagar.com

প্রেম করেছে বনের হনুমান
রামে দিল কণ্ঠের মালা
না করল ধেয়ান
সে যে বুক চিরে রাম রূপ দেখাইল
এইতো প্রেমের নিশানি ॥
সেই কথা কালু শাহ ফকির কয়
কৃষ্ণ ভক্ত যে জন হয়
সেই তো কৃষ্ণ পায়
প্রেম না জাইনা ধরতে গেলে
মিলবে না গৌর ধ্বনি ॥

২.
চিহ্ন মাত্র আছে দুটি
নয়ন দেখলে চেনা যায়
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক যে জন হয়
মুখে বল কৃষ্ণ কথা
জুড়াক আমার মনের ব্যথা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ গুণ গায়
জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ
ভুবন মোহিত কৃষ্ণ
দেহেতে কর উদয় ॥
গাভী মইল বৎস বিনে
চাতক মইল জল বিহনে
কৃষ্ণ ভক্ত যে জন হয়
সেইত কৃষ্ণ পায়
কালু শাহ ফকিরে বলে
সেই প্রেম জানে গোপীগণে
তুই না জাইনা বুঝবি কেনে
সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয়।

১৯. দেশাত্মবোধক ও স্বদেশচেতনামূলক গান

সাইদুর রহমান বয়াতি রচিত ভাষা আন্দোলন বিষয়ক গান

১.
জন্মভূমি মায়ের ভাষা বলতে কেন দাও বাধা

www.pathagar.com

তোমাদের কি হয় মাথা ব্যথা?
হায়রে বনের পাখি বনে থাকে
যার যার ভাষায় সেই ডাকে
তাতেই খুশি আল্লাপাকে
বুলিতে তার নাম গাথা
যে দেশে আমাদের জন্ম
সেই ভাষাতে হব ধন্য
রাইছ, ভাত আর বলে অন্ন
এক অর্থ ভিন্ন কথা।

২.
হায়রে বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষা
এর মত আর নাইরে খাসা
এই ভাষায় মিটাই পিপাসা
এই ভাষাতে সুর সাধা
এই ভাষা বাঁচাতে গিয়া
যদি সবে যাই মরিয়া
তাইতো বলে সাইদ মিয়া
কবে হবে সমাধা।

৩.
হায় জল পানে পিপাসা মেটে
পানিতে তৃষ্ণা থাকে না মোটে
নানা ভাষার আমদানি জোটে
আব ওয়াটার নয় জুদা
বাংলা মায়ের সন্তান যারা
বাংলাতে গান গাইবে তারা
তোমাদের কেন মেজাজ চড়া
উরা বাওই পাইক পেয়াদা।

৪.
এই দেশ একদিন ছাড়বি তোরা
দৌড়াবি পালাইয়া
সেদিন বুঝবি ছোটো সাপের বিষের কি হুলিয়া
কান ধরে যাবি প্রাণ নিয়ে পালাবি
মুখে তোদের পড়বে চুনকালি।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত সাইদুর রহমান বয়াতির গান

ছয় দফা কায়েম করিবে
শেখ মুজিবের দাবি
তাই দেখিয়া ইয়াহিয়ায়
চালায় উল্টা চাবি
বাঙালিদের বাঁচাইতে কান্দে মুজিবের প্রাণ
বাংলাদেশ ছাড়িয়া পাকিস্তানিরা পাকিস্তানে যাও
নইলে বাঁচিবে না তোমাদের প্রাণ।

১৯৭০-এর নির্বাচনের সময়ও তিনি গান রচনা করেন।

আওয়ামী লীগের নেতা হলো শেখ মুজিবুর
দেখে উপযুক্ত স্বদেশ প্রিয় সবাই করলাম জোট
শতকরা দিলাম তারে আটানব্বই ভোট।

তথ্যনির্দেশ

১. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪ পৃ. ১৭-২০

২. সৈয়দ বাদশা আলম, পিতা : সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ শাহ, মাতা : তারাজান বিবি, তারিখঃ ২৫.০৫.৯৮ স্থানঃ কালু শাহ ফকিরের মাজার, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

৩. সৈয়দ আব্দুল গফুর শাহ, পিতা : সৈয়দ টুকুর উদ্দীন শাহ (কালু শাহ ফকিরের চতুর্থ পুত্র), বয়স : ৮০ বৎসর, তারিখ : ২২.০৫.৯৮, স্থানঃ কালু শাহ ফকিরের মাজার, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

৪. সৈয়দ জানে আলম শাহ, পিতাঃ সৈয়দ গফুর শাহ, তারিখঃ ২২.০৫.৯৮, স্থানঃ কালু শাহ ফকিরের মাজার, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

৫. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৩-২৫

৬. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৬-২৯

৭. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২১-২২

৮. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩০

৯. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৮

১০. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৯

১১. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৪-৪৭

১২. মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন (টেনু বয়াতি), পিতা : আবদুল গনি, বয়স : ৭২ বৎসর, শিক্ষাঃ সপ্তম শ্রেণি, পেশা : সংগীত শিল্পী, গ্রাম : পুটাইল, থানা : মানিকগঞ্জ সদর থানা, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৪.০১.৯৬, সময় : সকাল ১০টা, স্থান : নিজ বাড়ি; মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৩

১৩. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৮

www.pathagar.com

১৪. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৯-৫১
১৫. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫২-৫৩
১৬. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫৪-৫৯
১৭. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৮
১৮. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯৬-৯৮
১৯. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮১ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৪.০৯.২০১২
২০. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭৫-৭৬
২১. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৮১-৮২
২২. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১০৫-১০৬
২৩. শফিউল বাশার, পিতা : রশিদ সরকার, বয়স : ৩৩ বৎসর, গ্রাম : আজিমপুর, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ
২৪. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১২১-১২৭
২৫. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৭
২৬. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪০
২৭. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬০-৬২
২৮. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৩-৬৫
২৯. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭২-৭৪
৩০. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৬-৬৭
৩১. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮১ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৪.০৯.২০১২; মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৮৩-৮৪
৩২. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭৭-৮০
৩৩. খৈমুদ্দিন বয়াতি, পিতা : জিঞ্জির খান, বয়স : ৬৯ বৎসর, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, পেশা : লোকসংগীত শিল্পী, গ্রাম : গোপালপুর, ইউনিয়ন : গালা, উপজেলা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ
৩৪. মো. মোশারফ হোসেন, *মানিকগঞ্জের লোকশিল্পী*, তরঙ্গ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯০
৩৫. উজালা বেগম, জয়মন্টব, সিংগাইর; মোকছেদ আলী, জয়মন্টব, সিংগাইর; ওবায়দুর রহমান, জয়মন্টব, সিংগাইর
৩৬. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮১ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৪.০৯.২০১২

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

মানিকগঞ্জ যাত্রা, জারি, সারি, কবিগান ও ধুয়া গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। যাত্রাগানে আগের দিনে ব্যবহার করা হতো হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, ডুগি, জুরি, ক্ল্যানুয়েট, কর্নেট ইত্যাদি। কবিগানে ঢোল, কাসা, হারমোনিয়াম-এর ব্যবহার ছিলো। ধুয়া ও জারিগানেও এসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। বৈঠকি গানে ব্যবহৃত হতো একতারা, দোতারা, খমক, সারিন্দা, বাওয়া, চটক ইত্যাদি। কালের বিবর্তনে বর্তমানে এসব বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁশের বাঁশি, বেহালা, সারিন্দা, ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র, যেমন—কি বোর্ড, বেনজুর, গিটার ইত্যাদি।

লোকসংগীত পরিবেশনের সময় বর্তমানে কোনো কোনো গায়ক বেহালা, কর্নেট, বাঁশি, গিটার ব্যবহার করছেন। কিন্তু পুরনো কবিয়াল-বয়াতিগণ ঐতিহ্যবাহী লোক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের সুফি সাধকদের মাজারে ভাবসংগীত পরিবেশনের সময় ঢোলক, হারমোনিয়াম, চটক, একতারা, দোতারা, জুরি ও সারিন্দা ব্যবহৃত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে কীর্তন পরিবেশনের সময় খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁশের বাঁশি, বেহালা, দোতারা, সারিন্দা ইত্যাদি।

১. একতারা

লোকসংগীতে বহুল ব্যবহৃত একটি বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে একতারা। একতারা এক তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। মানিকগঞ্জেও লোকসংগীত বিশেষ করে বাউল বা মরমি সংগীত পরিবেশনকারীরা একতারা বাজিয়ে গান করে থাকেন। একতারার গঠন প্রণালী যেমন সহজ, তেমনি এর উপকরণও সাধারণ এবং সহজলভ্য।

উপকরণ

লাউয়ের খোল, নারকেলের মালা বা কাঠের খোল, বাঁশের বাতা বা ডাঁটি, তার ও চামড়া একতারা তৈরির প্রধান উপকরণ।

প্রস্তুত প্রণালী

একতারা বেল, লাউ বা নারকেলের মালা দিয়ে বানানো হয়। চামড়া দিয়ে মালার অর্ধেকের চেয়ে অধিক অংশ ছেয়ে দিতে হয়। দুটি বাঁশের বাতা বা ডাঁটি মালার বৃত্তের দুপাশে সংযুক্ত করা হয় এবং বাতা দুটির মাথা একত্রে সংযুক্ত থাকে। এরপর একটি তারের একমাথা বাঁশের বাতার ডাঁটি দুটির সংযুক্ত প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হয় ও অপর মাথা মালার তলভাগের চামড়ার সাথে সংযুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

একতারা

২. দোতারা

নাম দোতারা হলেও এটিতে চার বা ততোধিক তার থাকে। একতারার মতই জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র দোতারা। বাউল গানের পেশাদার গায়কেরা প্রায় সবাই দোতারা বাজিয়ে গান পরিবেশন করে থাকেন। মানিকগঞ্জে বাউলগান, পালাগানে দোতারার ব্যবহার দেখা যায়। কাঠের কাঠামোর উপর তার লাগিয়ে দোতারা প্রস্তুত করা হয়।

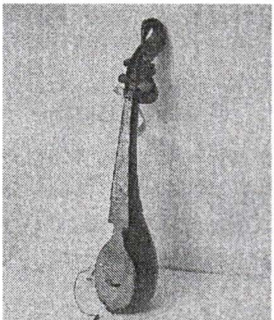

দোতারা

৩. বাঁশি

লোকসংগীত পরিবেশনায় বাঁশি একটি অতি পরিচিত বাদ্যযন্ত্র। বাঁশির উপকরণ খুবই সহজলভ্য–তরলা বাঁশ। বাঁশি তৈরির সময় একদিকে গিঁট রেখে কাটতে হয় যাতে তা বন্ধ থাকে। অপর প্রান্ত উন্মুক্ত রাখতে হয়। বাঁশিতে ছয়টি ছিদ্র থাকে। বাম ও ডান হাতের তিনটি করে আঙুল ছিদ্রের উপর রেখে বাঁশি বাজানো হয়। বাজানোর সময় আঙুলের ওঠা নামা বাঁশির সুর নিয়ন্ত্রণ করে। আড়াআড়িভাবে ঠোঁট রেখে বাঁশিতে ফুঁ দিতে হয়।

www.pathagar.com

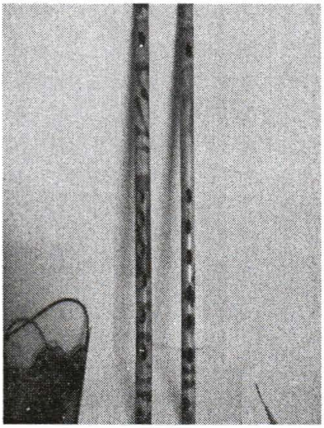

বাঁশি

৪. ডুগডুগি

লোকসংগীত পরিবেশনের সময় শিল্পীরা হাত নেড়ে নেড়ে ডুগডুগি বাজিয়ে থাকেন। কাঠের খোলের দু পাশে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ডুগডুগি বানানো হয়। এর মাঝে সুতা বাঁধা হয় এবং সুতার মাথায় লোহার গুলি জড়ানো হয়। খোলের মাঝখানে ধরে নাড়ালে গুলি দুটি উভয় পাশের চামড়ার সাথে আঘাত খেয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করে।

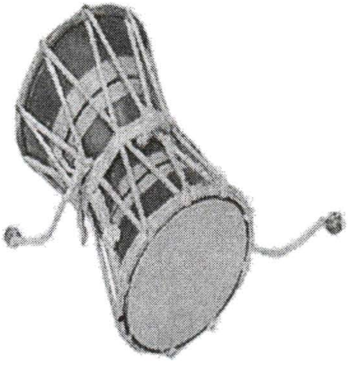

ডুগডুগি

৫. ঢোল

লোকসংগীত ছাড়াও নাচের মঞ্চে, বিবাহ-উৎসব, শোভাযাত্রায়, পূজাপার্বণ এমনকি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়। ঢোল গানের তাল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কাঠ।

www.pathagar.com

প্রস্তুত প্রণালী

সাধারণত পোক্ত আম গাছের ৩/৪ হাত মোটা এবং ২/৩ হাত লম্বা কাঠের টুকরা শুকিয়ে টুকরাটির ভেতর ভাগে সুন্দর করে চেঁছে নিতে হয়। ঢোল তৈরির কাঠ চাঁছা-ছিলার সময় ঢোলের মধ্যভাগ দুই প্রান্ত অপেক্ষা মোটা থাকে। দুদিকের শেষ প্রান্তগুলো উন্মুক্ত থাকে যা উদের বা গুঁই সাপের চামড়া দিয়ে ছানি দেয়া হয় এবং সুন্দর করে রশি, তামা বা পিতলের রিং যুক্ত করে টানা দেয়া হয়।

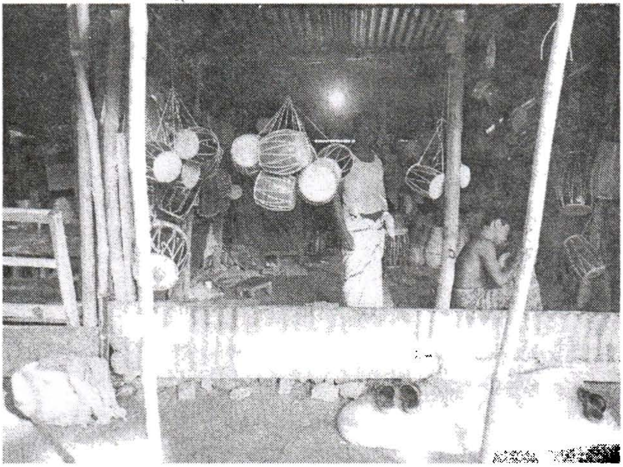

ঢোলের দোকান

৬. তবলা

লোকংগীতের সুর নিয়ন্ত্রণে তবলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবলা কাঠ ও চামড়া দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। চামড়ার সাহায্যে কাঠের উপর দিয়ে ছানি দেয়া হয়। টানা চামড়ার মাঝে কালো রঙের প্লেট করা হয়।

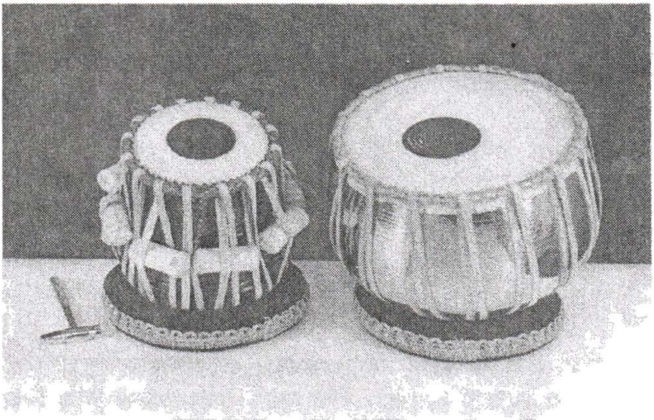

তবলা

www.pathagar.com

৭. মন্দিরা

লোকসংগীতের পরিবেশনায় মন্দিরার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কাঁসার তৈরি দুটি বাটি দু হাতে ধরে মৃদু টোকা বা আঘাত দিয়ে সুর সৃষ্টি করা হয়।[১]

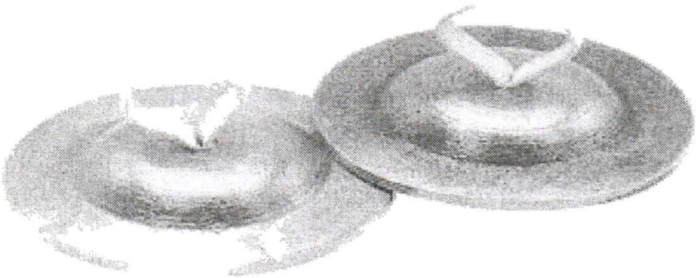

মন্দিরা

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮১ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৪.০৯.২০১২; মজনু মিয়া, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : কারুশিল্পী, গ্রাম : গড়পাড়া, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০.১২.২০১৩, স্থান : বিজয় মেলা, মানিকগঞ্জ সদর; আবুল সরকার, বয়স : ৩৮ বৎসর, পেশা : বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

www.pathagar.com

লোকউৎসব

উৎসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। উৎসব মানে মিলিত হৃদয়ের উদ্বেলিত আনন্দের প্রকাশ এবং সামাজিক ও মানবিক মিলনের এক ভিত্তিভূমি। মানিকগঞ্জের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে মানুষের হাজার বছরের যাপিত জীবনের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর মানুষের জীবনধারায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। আমরা ঐতিহ্যকে ধারণ করি নানা আয়োজন ও উৎসবের মধ্য দিয়ে। মানিকগঞ্জ উৎসব আয়োজনের এক সমৃদ্ধ জনপদ। সামাজিক উৎসবের প্রায় সবগুলোই মানিকগঞ্জ জেলায় উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

১. নববর্ষ

পহেলা বৈশাখ বাঙালির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক উৎসব। বাংলা বর্ষবরণ উৎসব বাঙালির আবহমান কালের ঐতিহ্য। বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখ নববর্ষের প্রথম দিন। নববর্ষ মূলত একটি সর্বজনীন উৎসব হিসেবে বাঙালি সমাজে মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে। প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের আগমনে যেন মানুষ নতুন স্বপ্নে জেগে ওঠে। সেই সাথে আমাদের জীবনেও জেগে ওঠে নতুন আশা-ভরসা, স্বপ্ন-কল্পনা, প্রাপ্তি ও আনন্দ উল্লাসের দীপ শিখা।

কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে নতুন ফসলকে কেন্দ্র করে যে উৎসবের শুরু হয় তাই কালক্রমে পরিণত হয়েছে বাংলা নববর্ষ উৎসবে। বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে বর্ষবরণের উৎসব। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই সম্মিলিতভাবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উৎসব পালন করছে। মানিকগঞ্জ বহুকাল আগে থেকেই একটি অসাম্প্রদায়িক জনপদ হিসেবে পরিচিত। এখানকার মানুষের মধ্যে নেই কোনো হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটি। সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে রয়েছে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। এখানকার মানুষ ধর্মীয় অনুভূতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় এক ও অভিন্ন। মানিকগঞ্জে নববর্ষকে ঘিরে এক সময় বহুমাত্রিক সংস্কার ও সংস্কৃতি চালু ছিল। এখন সেসব তেমন চোখে পড়ে না। আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলেই নববর্ষের অনেক ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটেছে। হালখাতা অনুষ্ঠান কোনো রকমে চালু আছে। তবে তা আনুষ্ঠানিক আনন্দ উৎসবের পরিবর্তে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মুখ্যত চালু আছে।

১৪১৯ বঙ্গাব্দের নববর্ষ উপলক্ষে মানিকগঞ্জ জেলায় মূল আয়োজন করেন জেলা প্রশাসন। ১৪ এপ্রিল জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ভোরে পান্তা-ইলিশ ভোজন, তারপর র‍্যালি এবং র‍্যালি শেষে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। র‍্যালিতে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন উপাদান তুলে ধরা

www.pathagar.com

হয়। কলসি কাঁখে মেয়ের দল, একতারা হাতে বাউল, সাধু-দরবেশ, নাগরদোলা, সাপ খেলা, মুড়ি বোঝাই ঝাম, বাউল গান, ঢেঁকি, মুড়ি ভাজার সাজ-সরঞ্জাম, হিন্দু সাধক, মুখা কাজ, মুন্সী বিয়ের বরযাত্রী, পালকি, মিষ্টির পাতিল, রাজা-বাদশা, কামার-কুমার, কাঠুরে, ছাগল, ধান ক্ষেত, নৌকা, পলো বাইচ, বেদের দল, হাডুডু খেলা, গাজী-কালু, হাঁড়ি-পাতিল, কৃষক সবশেষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ফাঁসির মঞ্চ উক্ত র‍্যালিতে প্রদর্শিত হয়। এই র‍্যালির মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যকে যেমন তুলে ধরা হয় তেমনি বর্তমান সরকারের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ক একটি প্রদর্শনী অত্যন্ত সময়োপযোগী প্রদর্শন বলে মনে হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে নববর্ষের মিছিল একত্রিত হয়ে মানিকগঞ্জ শহর প্রদক্ষিণ করে। এর পরে আলোচনা সভা হয়।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের সাথে কথা বলে তাদের আগমনের কারণ জানতে চাওয়া হয়। মানিকগঞ্জ সদরের চর হিজুলি গ্রাম থেকে আফছার আলী (৭০) এসেছেন কৃষক সেজে। তার কাঁধে একটি লাঙ্গল, মাথায় একটি অতি পুরনো মাথাল। র‍্যালিতে কেন এসেছেন জানতে চাইলে বললেন, "পয়লা বৈশাখ আইছে তাই মনে আনন্দ লাগছে। মিছিলে আইছি, একটু আনন্দ কইরা গেলাম। অনেক বয়স অইছে। যে কয়ডা দিন বাঁচুম আনন্দ কইরা যামু।" চর হিজুলি থেকে আরেকজন বৃদ্ধ আদরআলী (৬৫) এসেছেন মাথাল মাথায় ও কাচি হাতে। র‍্যালিতে যোগ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'আনন্দ করতাছি– বৈশাখ আইছে ঘরে। শুনলাম মিছিল ভিডিও করবো তাই আইছি। নিজের ভিডিও অইবো তাই আইছি। মইরা গেলে তো সব ফুরাইয়া যাইবো। তাই শেষ বয়সে শখ কইরা গেলাম।"

দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১লা বৈশাখ পালিত হয়। অনুষ্ঠানে মানিকগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমী, কালু শাহ্ শিল্পী গোষ্ঠী ও মানিকগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ সংগীত পরিবেশন করে। তাছাড়া কুশের চর গ্রামের সালাম পাগলা ও দাশড়া গ্রামের হাসান পাগলা বাউল গান পরিবেশন করে এবং বর্মণ আবৃত্তিচক্র আবৃত্তি পরিবেশন করে।

মানিকগঞ্জে সর্বজনীন উৎসবের মধ্যে বৈশাখী মেলা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মেলাগুলো এখানকার মানুষকে সম্মিলিত হতে ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। এবছর (১৪১৯ বঙ্গাব্দ) মানিকগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে (বিজয় মেলা মাঠ) এক দিনের বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এখানে এটাই প্রথম মেলা। এ মেলায় বিভিন্ন লোকজ খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। লোকজ-খেলাধুলার মধ্যে মানিকগঞ্জ পৌরসভার বান্দুটিয়া ও ঘিওর উপজেলার চর মাস্তুল গ্রামের দুটি দল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী দাড়িয়াবান্ধা খেলা প্রদর্শন করে। দলের নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে আব্দুল হালিম (৬০) ও মুসলেম উদ্দিন বাবুল (৪৫)। তাছাড়া কাবাডি, চারা খেলা, হাঁড়িভাঙ্গা, পুকুরে হাঁস ধরা, তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওপরে ওঠা, চোখ বেঁধে কপালে টিপ পরানো, বেলুন ফুটানো প্রভৃতি লৌকিক-খেলার আয়োজন করা হয়। শহরাঞ্চলের চাইতে গ্রামে বৈশাখী মেলা বসে বেশি। মানিকগঞ্জে পুরো বৈশাখ মাসব্যাপী মেলা বসে। তবে সবচেয়ে বড়ো বৈশাখী মেলা বসে মানিকগঞ্জ সদরের বাড়ারিয়া ইউনিয়নের খাবাশপুর-কৃষ্ণপুর গ্রামে।

www.pathagar.com

বাংলা নববর্ষের সঙ্গে যে ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা ও লোকজ সংস্কৃতি মানিকগঞ্জে নির্মিত হয়েছে তা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিরাট ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে আছে। মানিকগঞ্জের বৈশাখী মেলাগুলোতে সবাই একত্রিত হয়ে একে অপরের সাথে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করে। এতে করে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। সেই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকাও সচল হয়।

২. চৈত্র সংক্রান্তি

নববর্ষের আগের দিন হচ্ছে চৈত্র সংক্রান্তি। এই চৈত্র সংক্রান্তিকে ঘিরে আমাদের সমাজে বহুমাত্রিক সংস্কার ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেই সব চৈত্র সংক্রান্তির আয়োজন বর্তমানে তেমন একটা চোখে পড়ে না। আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চৈত্র সংক্রান্তির মূল ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। আগের দিনে চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে একটি মাটির হাঁড়িতে পানি ভরে তাতে আম গাছের পাতাসহ খণ্ডিত ডাল ডুবিয়ে রাখা হতো এবং ঐ হাঁড়ি দুয়ারে সারারাত রেখে দিতেন। আর আউলা চাল ভিজিয়ে রাখতেন। সকালে উঠে ঐ হাঁড়ির পানি ও ভেজানো আউলা চাল খেতেন। এতে মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করতেন। এমনি অনেক সংস্কার এক সময় গ্রামগঞ্জে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল।

চৈত্র সংক্রান্তি মানিকগঞ্জ জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি পূজা ও অনুষ্ঠান। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজা, বাসন্তী পূজা ও কালীপূজা হয়। দুর্গাপূজার মতো বাসন্তী পূজার উৎসব হয়। নহবত বাজানো হয় এবং ঢাক ঢোলের শব্দে চতুর্দিক মুখরিত হয়।

৩. শারদীয় দুর্গোৎসব

দুর্গাপূজার তিনটি স্তর রয়েছে : রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক। রাজা ও ধনী ব্যক্তিগণ রাজসিক পূজা করার ক্ষমতা রাখেন। সাত্ত্বিক পূজা হচ্ছে গোপনীয় ও আধ্যাত্মিক পূজা। এখানে ভক্ত নিজের মধ্যে দশভুজা মা দুর্গাকে খোঁজে এবং মহিষাসুরকেও চিহ্নিত করতে পারে। সাত্ত্বিক পূজা খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। তামসিক পূজা হচ্ছে দুর্গাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করে জনসাধারণের নিকট প্রদর্শন করা। বর্তমানে বাংলাদেশে রাজসিক ও তামসিক পূজা বেশি হয়। প্রতিটি মণ্ডপে প্রতিযোগিতামূলক পূজার আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। দুর্গা প্রতিমার অলংকরণ ও সাজসজ্জায় এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। জাঁকজমকপূর্ণ পূজার আয়োজন হয় শহরে বেশি। এখানে দুর্গাপূজা একটি উৎসবে পরিণত হয়। নারী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে নতুন কাপড়, গয়না পরে পূজা দেখতে যান। বিভিন্ন মণ্ডপে তারা ঘুরে ফিরে দেখেন।

বহু বছর আগে মানিকগঞ্জের বগজুরি সেন বাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা হতো। মত্ত গ্রামে গোকুল মুন্সির বাড়ি, বেতিলা জমিদার বাড়ি, তেওতা জমিদার বাড়ি, বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, বেলেশ্বর জমিদার বাড়ি, পালরা বসাক বাড়ি ও হিজলাইন শিকদার বাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা হতো। জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণ এ

www.pathagar.com

পূজার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পূজা উপলক্ষে কবিগান, যাত্রাগান, কৃষ্ণলীলা গান, এমনকি জারিগানও হতো। বর্তমানে মানিকগঞ্জের গ্রামীণ এলাকায় যেমন লেমুবাড়ি মিস্ত্রি বাড়িতে, কৈতরা ঠাকুর বাড়িতে, বাইতরা যুধিষ্ঠির পণ্ডিতের বাড়িতে, কৈতরা হাটে পূজা হয়। এছাড়া বুরুণ্ডি পোদ্দার বাড়িতে, কাসতা শাহা বাড়িতে, তিল্লি বাজারে, তিল্লি মালিপাড়ায়, ডাওটিয়া শাহা বাড়িতে, ডাওটিয়া বাজারে এবং বেতিলায় বারোয়ারী পূজা হয়।

মানিকগঞ্জ শহরে লক্ষ্মীমণ্ডপে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শহরে শিববাড়ি, কালীবাড়ি, কালিখোলা, গঙ্গাধরপট্টিতেও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। চিরাচরিত নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী দুর্গপূজা পাঁচদিন ব্যাপী হয়। প্রথম দিন মা দুর্গাকে আহ্বান করা হয় বেলতলা পূজার মাধ্যমে। এটিকে ষষ্ঠী বলা হয়। প্রথম দিন নবদুর্গার পূজা হয়। দ্বিতীয় দিন মা দুর্গাকে বরণ করে নেওয়া হয় অর্থাৎ ঘরে তোলা হয়। মন্ত্রের মাধ্যমে মাটির ঘটে বসানো হয়। একে বলা হয় সপ্তমী। এদিন ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ হচ্ছে পঞ্চফলের ভোগ। এতে মিষ্টান্ন, লুচি, বাতাসা, সন্দেশ প্রভৃতি থাকে। কাঁচা দুধ, আতপ চাল, তিল, নারকেল কোরানো এবং কলা দিয়ে একটি ভোগ দেওয়া হয় মা দুর্গার স্মরণে। মা দুর্গার ডানে থাকেন কার্তিক ও গণেশ, বামে থাকেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং দুর্গার পেছনে থাকেন তাঁর স্বামী ভোলানাথ বা মহাদেব। তাঁর পায়ের নিচে থাকেন মহিষাসুর। এসব ভোগ দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। পূজা শেষে এসব ভোগ আগত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় প্রসাদ হিসেবে।

অষ্টমীকে মহাঅষ্টমী বলা হয়। অষ্টমীর দিন রাবণ রাজার মৃত্যু হয় রামের সঙ্গে যুদ্ধে। এদিনে সারাদিন পূজা হয়। পুরোহিত মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পূজা পরিচালনা করেন। পুরোহিত সেদিন পূজায় বসে মন্ত্রের সাহায্যে নিজেকে পবিত্র করেন। অপবিত্রং পবিত্রবাঃ সর্বাং পবিত্রমঃ– এই মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজেকে পবিত্র করেন। এরপর তিনি যা দেবী সর্বভূতে নম সত্যে যা দেবী সর্বভূতেষু, মাতৃরূপেনু দশভূজায়ে নমস্তিতে নমঃ নমঃ নমস্তুতে নমঃ নমঃ– এই মন্ত্র পাঠ করে দেবীকে প্রণাম করেন। তারপর তিনি শঙ্খধ্বনি করেন। সকল দেব-দেবীকে আহ্বান করা হয় শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে। দেবীর পূজার মন্ত্র হলো—

নমস্তে সর্বানী ঈশ্বর ইশ্বরী
কালী করালিনী ভীমা শঙ্করী
ঈশ্বরী ঈশ্বরী জায়া।

সমস্ত পূজা শেষ করে পুরোহিত মন্দির থেকে বিশ্রামে চলে যান। ভোগের প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এরপর আরতিপর্ব। আরতি হচ্ছে মাটির তৈরি ধূপের সরা হাতে নিয়ে অর্থাৎ (ধুপ্তি) নারকেলের ছোবড়ার মধ্য আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে ধূপ দেওয়া হয়। এতে সুঘ্রাণ বের হয় এবং ধোঁয়া বের হয়। ঢাকের বাজনার তালে তালে যুবকরা নাচে। মন্দিরের সামনের সব পূজা শেষে সন্ধ্যায় আরতি দেওয়া হয়। নবমীর দিন পূজা সংক্ষিপ্তভাবে সম্পন্ন করা হয়। দশমির দিন তর্পণের মাধ্যমে জল ভর্তি মাটির পাতিল দুর্গাদেবীর পায়ের কাছে রাখা হয়। সেখানে মন্ত্রের সাহায্যে তর্পণ করা হয়। তাকে তর্পণ বা তর্পণে প্রতিমা বিসর্জন বলা হয়, পূজারি এবং ভক্তবৃন্দ মায়ের জন্য

www.pathagar.com

শোক করতে থাকেন এবং একে অপরের গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অনেকে বেহুঁশ হয়ে যান। বিকেলে মন্দির থেকে প্রতিমা বের করা হয়। রাত বারোটার পর প্রতিমা নদীতে/জলাশয়ে/পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতিমা চিত হয়ে না পড়ে যেন উপুড় হয়ে পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। প্রতিমা ভাসমান থাকে না। পানিতে নিমজ্জিত করা হয়। জয় মা দুর্গা, জয় মা লক্ষ্মী, জয় মা সরস্বতী, সিংহ বাহিনী কি জয়-ধ্বনি দিতে থাকে ভক্তবৃন্দ। উল্লেখ্য, পূজার পাঁচদিন পূজারি নিরামিষ খায়। মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ। দশমীর পরের দিন মাছ-ভাত খাওয়া হয়। একে মৎস্যমুখী বলা হয়।

মানিকগঞ্জ শহরের আনন্দময়ী কালীমন্দিরসহ অন্যান্য পূজামণ্ডপে নারীপুরুষ, ছেলেমেয়ে সহ হাজার হাজার মানুষ পূজা উপলক্ষে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসেন। অনেকের হাতে মিষ্টির প্যাকেট দেখা যায়। তারা মন্দিরে গিয়ে দুর্গার নামে নিবেদন করেন। অনেকে নগদ টাকা পয়সাও দেন। কপালে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা, স্বর্ণের অলংকার পরে অনেকে আসেন। ভাবগম্ভীরভাবে মা দুর্গাকে প্রণাম জানিয়ে অন্য মন্দিরে চলে যান। সর্বত্র উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে।

দুর্গাপূজা একটি বাৎসরিক উৎসব। হিন্দু-মুসলমান সবাই এই উৎসবে যোগ দেন। বর্তমানে রাতে গানের অনুষ্ঠান হয় না বললেই চলে। মাইকে গান বাজানো হয়। দশমীর দিন পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। লেমুবাড়ির হাইস্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে মেলা বসে। রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত চলে এই মেলা।

মানিকগঞ্জে শারদীয় দুর্গাপূজা ২০১১

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখ দিবাগত রাতে ২৭ শে সেপ্টেম্বর ভোরে মহালয়ার মধ্য দিয়ে পূজার অনুষ্ঠান শুরু হয়। দেবীর ষষ্ঠীতে হলো বিহিত পূজা। এতে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। এই দিনে চণ্ডিপাঠ, কাঁসা-ঘন্ট, উলুধ্বনির মাধ্যমে দেবীর বোধন ও আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই সাথে জনভোগের আয়োজন হয়। তাতে খিচুরি, মিষ্টান্ন, লাবড়া, লুচি, মালপোয়া, বেগুনভাজি, আলুভাজি প্রভৃতি যোগে দেবীর ভোগ দেওয়া হয়।

প্রতিদিন পূজামণ্ডপে চলে মন্ত্রপাঠ, আর সন্ধ্যার পর থেকে ঢাকা-ঢোল, কাঁসা বাজিয়ে চলে আরতি নৃত্য। দুর্গাপূজার মূল আয়োজন হয় অষ্টমীতে। এই দিনের পূজাকে মহাঅষ্টমীর পূজা বলে। এই দিনের সকালে দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে অঞ্জলি প্রদান শুরু হয়। এই সময় ভক্তরা হাত জোড় করে অর্থাৎ করজোড়ে দাঁড়িয়ে পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং পরে বেলফুল পাতা উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। মানিকগঞ্জ লক্ষ্মী মণ্ডপে সকাল ১১টার সময় অঞ্জলি পাঠ সম্পন্ন হয়। অঞ্জলি পর্বে যারা অংশগ্রহণ করে তারা সাধারণত উপবাস থাকে। এই দিন আগত ভক্তরা পাক-পবিত্র অবস্থায় থাকে। তারা যার যার সাধ্যমত নতুন কাপড়-চোপড় পরিধান করে। মেয়েরা অনেক সেজেগুজে মণ্ডপে আসে। সকাল ১০টার দিকে দেখা যায় মানিকগঞ্জ প্রধান সড়কে দুর্গা দেবীর ভক্ত রমণীদের হাতে ছোটো ছোটো মিষ্টি ও লাড়ুর প্যাকেট। গোটা রাস্তা দেবী ভক্ততে ভরে গেছে। মন্দিরের

www.pathagar.com

দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। যার যার মনোবাসনা নিয়ে হাজির হচ্ছে তারা। মহাঅষ্টমীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ খুব বেশি দেখা যায়।

দুর্গাপূজার অষ্টমীতে কুমারী পূজা হয়। কিন্তু মানিকগঞ্জে হয় না। লক্ষ্মী মণ্ডপ এলাকার কালী প্রসাদ কুণ্ডু (৭২) বলেন, কুমারী পূজার জন্য তান্ত্রিক পুরোহিত দরকার। আমাদের নেই— কে কুমারী হবে তা নির্ধারণ করেন তান্ত্রিক পুরোহিত। কন্যা হতে হবে ব্রাহ্মণের মেয়ে আর তার বয়স হতে হবে ১২ বছরের নিচে। তাই সব মণ্ডপে কুমারী পূজা হয় না। কুমারী পূজার কারণ জানতে চাইলে বয়োবৃদ্ধ কালী প্রসাদ কুণ্ড বলেন, 'প্রত্যেক নারীই একজন ভগবতী। একটি নারী একজন সরস্বতী।'[১]

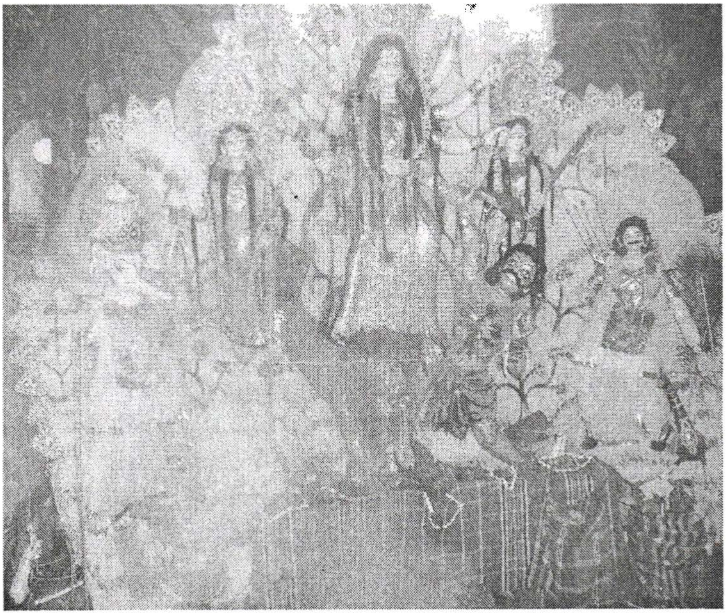

মানিকগঞ্জ সদরের লক্ষ্মী মণ্ডপে দুর্গাপূজা

০৬.১০.২০১১ ইং/১৯ আশ্বিন ১৪১৮ বিভিন্ন মণ্ডপে বিসর্জন হয়। হিন্দু ভাই বোনদের মধ্যে অনেক আবেগ-অনুভূতি-ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ছিল। দুর্গাপূজার সমাপ্তি হয় দশমীতে। এই দিন মধ্যাহ্নে তর্পণ বিসর্জন পূজা হয়। পূজার ষষ্ঠীতে যে ঘট স্থাপন করা হয় আর ঘটের সাথে সুতা দিয়ে দেব-দেবীর সাথে সংযুক্ত থাকে, একে মঙ্গল ঘট বলা হয়। ঐ সংযুক্ত সুতা কেটে দিলেই তর্পণ বিসর্জন পূজা সম্পন্ন হয়ে যায়। তর্পণ বিসর্জন দেওয়ার পরে বিবাহিত মহিলাদের মা দুর্গার কপালে সিঁদুর পরাতে দেখা যায়। এ সময় তাদের প্রার্থনা হচ্ছে তারা যেন বিধবা না হয়। অনেকে এই সময় দুর্গাকে মিষ্টি মুখ করায়। মহিলারা কৌটা বোঝাই করে সিঁদুর আনে। দুর্গার কপালে সিঁদুর দেওয়ার

www.pathagar.com

পর বাকিটা বাসায় নিয়ে যায় এবং তারা সারা বছর ঐ কৌটার সিঁদুর নিজেরা কপালে পরে। তরা গ্রামের বাবুল (৪০) এসব তথ্য জানান। তিনি আরো বলেন, দশমীতে বিবাহিত মহিলারা সাধারণত বেশি অংশগ্রহণ করে।[২]

পূর্ব দাশড়া থেকে কবিতা বণিক (৪০) এসেছেন তার ৯ বছরের মেয়ে পুষ্পিতাকে সাথে নিয়ে। তিনি দুর্গাপূজার অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে বললেন, 'বছর ভর এই দিনটার জন্য অপেক্ষায় থাকি। মহাঅষ্টমীর যে আনন্দ এই আনন্দ পাবার অপেক্ষায় থাকি। বছর পরে মা দুর্গাকে দেখে গেলাম। আগামী বছর যেন আবার মা দুর্গাকে দেখতে পারি। এখানে আসি সবার সাথে দেখা হয়, কত ভালো লাগে। গত বছর অষ্টমীতে লাড্ডু, শাঁখা, সিঁদুর, শাড়ি দিছি। এ বছর শুধু সন্দেশ দিলাম।'[৩]

২০১১ সালে মানিকগঞ্জে সবচেয়ে বড়ো দুর্গোৎসব হয় ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী গ্রামে ভেনাস জুয়েলার্স লিঃ-এর মালিক গঙ্গাচরণ মালাকারের বাড়িতে। ভেনাস জুয়েলার্স-এর মালিক গঙ্গাচরণ বাড়িতে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে খিচুরির প্যাকেট বিতরণ করেন। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা হয়। বিভিন্ন মেলা থেকেও এখানে দর্শনার্থীরা আসে।

৪. শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হয়। মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে শ্রী কৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। মানিকগঞ্জ শহরে কালীবাড়িতে বৃহস্পতিবার ০৯.০৮.২০১২ তারিখ বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি মানিকগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে মানিকগঞ্জ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে মহাবতার শ্রী কৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমীর মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

০৯.০৮.২০১২ তারিখ বৃহস্পতিবার মানিকগঞ্জ শহরের কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হয় সকাল ১১.৩০ মিনিটে। অল্পসময়ের মধ্যে ফরিদপুর, কুমারখালি, আমডালা, কামরা, হরিরামপুর, ধামরাই, দৌলতপুর, খাবাসপুর বালিরটেকসহ অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য মিছিল এসে কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। হাজার হাজার মানুষকে খিচুরির প্যাকেট বিতরণ করা হয়। মিছিলটি খোল, খঞ্জনি, হারমোনিয়াম, বাঁশি বাজিয়ে কীর্তন করে শহর প্রদক্ষিণ করে। কোনো কোনো দলে ইংরেজি বাজনা ক্ল্যানুয়েট, কর্নেট বাঁশি, সানাই, সাইড ড্রাম, বিগ ড্রাম, করতাল বাদ্যযন্ত্র বাজতে থাকে। মিছিলটি 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' গান করে শহর প্রদক্ষিণ করে। হলুদ রঙের পোশাক ও গেরুয়া পোশাক পরিধান করে পুরুষরা মিছিলে যোগ দেয়। মহিলারা সাদা রঙের শাড়ি পরিধান করে। তাদের কপালে তিলক। কেউ রাধা, কেউ কৃষ্ণ আবার কেউ বসুদেব সাজে। কেউবা সন্ন্যাসী, কেউ মহাদেব সেজে মিছিলে যোগ দেয়। মানিকগঞ্জ শহর যেন আনন্দ উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জন্মাষ্টমীর মিছিল

ভগবান শ্রী কৃষ্ণের আবির্ভাবের দিনটি পালনের মাধ্যমে তার ভক্তরা শ্রী কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মিছিলে আসা একজন মহিলা ভক্ত, নাম নিরুপমা রায়, অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, "আজকে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মতিথি, সেই উপলক্ষে গোবিন্দের মিছিলে শামিল হয়েছি এবং তাঁর নামের ওপর কিছু প্রসাদ বাড়িতে নিয়ে যাব। প্রসাদ পেলে নিজের জীবন ধন্য হবে।" সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত দুলু নামে একজন ভক্ত যার হাতে ত্রিশূল, মাথায় লাল কাপড়ের পাগড়ি, পরনে লাল সালু, বয়স আনুমানিক ৪৫ হবে। তিনি বলেন, "শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে এতো বড়ো মিছিলে যোগ দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।" বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মিছিল চলে। এভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান পালিত হয়। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বর্তমানেও অটুট রয়েছে। রোজার দিন থাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনের উপস্থিতি খুবই কম দেখা যায়। মানিকগঞ্জ স্টেডিয়াম ভর্তি দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দ ও দর্শনার্থীদের গাড়ি।

মানিকগঞ্জ শহর ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। মানিকগঞ্জ শ্রীশ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে দেখা যায় বেতিলা-মিতরা ইউনিয়ন, হাটিপাড়া, ভাড়ারিয়া, ধানকোড়া, কৃষ্ণপুর, ঘিওর, দিঘী, জয়রা, পশ্চিম দাশড়াসহ বহু জায়গা থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালিসহ উপস্থিত হয় হাজার হাজার মানুষ। মাঝে মাঝে শ্লোগান হচ্ছিল, "শুভ শুভ দিন, শ্রী কৃষ্ণের জন্ম দিন"। শ্লোগানের ফাঁকে ফাঁকে মুহুর্মুহু উলু ধ্বনি গোটা পরিবেশকে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যে পূর্ণ করে তোলে। কৃষ্ণ ভক্ত

www.pathagar.com

নরনারীরা কুশল বিনিময় ও পরস্পর পরস্পরকে প্রেম বিতরণের যেন মহামিলন মেলায় বসেছিল সেদিন। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে দেখা যায় সমাবেশ স্থলে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম পালন ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়তে এ উৎসব যেন এক ঐতিহাসিক মিলন মেলায় সবার ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

৫. রথযাত্রা

হিন্দুধর্মের প্রধান প্রবর্তক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর প্রধান ভক্ত মুকুন্দবিহার রায় রামানন্দ এবং কবিদের রাজা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বলেছিলেন এবার আমরা ভ্রমণ করবো রথে চড়ে। সব ভক্ত খুশি হয়ে মহাপ্রভুকে রথে চড়িয়ে রথের কাছি ধরে টানতে শুরু করেন। কিন্তু রথ চলে না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেন, "রথ কেন চলে না?" অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে রথের কাছি যারা টানছে তারা সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। অন্য কোনো জাতির লোক নেই। তখন মহাপ্রভু ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা হিংসায় মত্ত হয়ে শুধু নিজেদের জাতের লোকদেরকে কাছি টানার সুযোগ দিয়েছ। অন্য কোনো জাতি নেই। তাই রথের চাকা চলছে না। সব জাতের মানুষ তখন একত্রিত হয়ে রথের কাছি টানতে শুরু করে এবং রথ চলতে থাকে। সেই থেকে সব ধর্ম, বর্ণ ও জাতের লোক অদ্যাবধি রথ টানায় অংশগ্রহণ করে থাকে। রথযাত্রার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এখানে প্রতিফলিত হয়। বাঙালি আবহমানকাল ধরে যে উদার ও মানবিক সংস্কৃতি লালন করে আসছে তার বৈশিষ্ট্য এখানে সমুজ্জ্বল।

হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাধাকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলা, কীর্তন ও নৃত্যে রত ছিলেন তখন গোপ এবং গোপী রথ তৈরি করেন এবং এই রথে রাধাকৃষ্ণকে বসিয়ে রশি ধরে টানতো এবং উলুধ্বনি দিত। ভক্তবৃন্দ রথের উপর ফুল ও ফল ছিটাত। তখন থেকেই রথের পূজা শুরু হয়। এটাকে বলা হয় মাধবের রথ। মূলত এটি শ্রীমতি রাধারানি ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন মেলা। তাই লোককবি বলেন—

রথমেলা লোকারণ্য
মহাধুমধাম
যাত্রীরা পথে লুটাইয়ে
করতেছে প্রণাম।
রথ বলে আমি দেব
পথ বলে আমি
মূর্তি বলে আমি দেব
হাসে অন্তর্যামী।

বর্তমানে উড়িষ্যার পুরিতে রথপূজার আচার-অনুষ্ঠান অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে পূজা-উৎসব পালন করে থাকেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে রথপূজা এবং রথমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

মানিকগঞ্জ শহর কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে রথের পূজা হয়। এছাড়াও মানিকগঞ্জ জেলার বানিয়াজুরি, হেলাচিয়া, কৈতরাসহ মানিকগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে রথপূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাতদিন যাবত রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনটিকে বলা হয় পহেলা রথ ও শেষের দিনটিকে বলা হয় শেষের রথ।[৪]

মানিকগঞ্জ সদরে প্রথম রথ অনুষ্ঠান

একটি উঁচু টিনের ঘরে রথ রক্ষিত থাকে। প্রথম রথের দিন ঐ ঘর থেকে রথ টেনে বের করা হয়। এটিকে বলা হয় প্রথম রথ। রথ বের করার আগে মানিকগঞ্জ সদরের কালীবাড়ি সড়কে মিস্ত্রিরা রথের সংস্কার করে থাকেন। রথের সামনে দুটি কাঠের তৈরি ঘোড়া স্থাপন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, রাম, রাবণ, বীর হনুমান, তারকা রাক্ষসী, বগাসুর, মহিষাসুর, সীতার বনবাস, দ্রুপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি রঙিন ছবি রথের চতুর্দিকে অঙ্কিত থাকে। সংস্কার কাজ শেষ হওয়ার পর ভক্তবৃন্দ এবং রাধা গোবিন্দ মন্দিরের পুরোহিত রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি লাল কাপড়ে জড়িয়ে মাথায় করে বহন করে রথের উপর স্থাপন করেন। এসময় ইংরেজি বাজনা, ড্রাম, সাইড ড্রাম, বিগ ড্রাম, ক্ল্যানুয়েট, কর্নেট, ঝাঁজ এবং করতাল বাজানো হয়। অসংখ্য নারী-পুরুষ রথের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে হরি ধ্বনি ও উলুধ্বনি দিতে থাকে। বেলা দু'টার সময় মাইকে ঘোষণা করা হয় যে, রথের টান হবে। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নারী পুরুষ, ছেলেমেয়ে রথের মোটা দুটি কাছি বা রশি ধরে হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি করে বাজনার তালে তালে টানতে থাকে। এসময় মানিকগঞ্জ শহরের প্রধান সড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় চতুর্দিক থেকে রথের উপর চিনি, কলা, ফুল, ফল, আপেল, আঙ্গুর, বাতাসা বৃষ্টির মতো পড়তে থাকে। এটি হলো প্রথম রথ-এর অনুষ্ঠান। এক সপ্তাহ পর ঐ রথকে আবার যথাস্থানে রাখা হয়। তাকে বলা হয় উল্টো রথ বা শেষ রথ।

রথের মূল ভোগ হচ্ছে চিনি-কলা। তাই ভক্তবৃন্দ চিনি-কলা সহ অন্যান্য মানত দ্রব্য নিয়ে রথ দেখতে আসেন। ২১.০৬.২০১২ তারিখে (৬ই আষাঢ় ১৪১৯) মানিকগঞ্জ সদরের কালীবাড়িতে প্রথম রথের অনুষ্ঠান হয়। এদিন হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী রথ দেখতে মেলায় আসেন। ভক্তবৃন্দ নানা রকম মানত সামগ্রী সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। গুরুসতা গ্রামের উষা রাণি সরকার (৫২) মাটির তৈরি একটি ঘোড়া ও চিনি কলা নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, "রথের মেলায় আসার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো গোবিন্দ মাধব দরশন করা। আর ঘোড়া হলো রথ টানার জন্তু। তাই আমি ঘোড়াটি কিনেছি। পথে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাব।" বায়রা গ্রামের তুলসী রাণী সরকার মাটির তৈরি একটি ঘোড়া, একটি পাকা কলা, পাতায় মোড়ানো সামান্য চিনি নিয়ে মেলায় আসেন। তিনি বলেন, "আমি এগুলো রাধা গোবিন্দের সেবায় দেব। রথে আসলে চিনি-কলা দিতে হয়। আমার পায়ে ব্যথা হয়েছিল। ব্যথা সারলে রথে ঘোড়া দেব মানত করি। এখন ব্যথা সেরে গেছে। তাই মানত দিতে এসেছি।"

www.pathagar.com

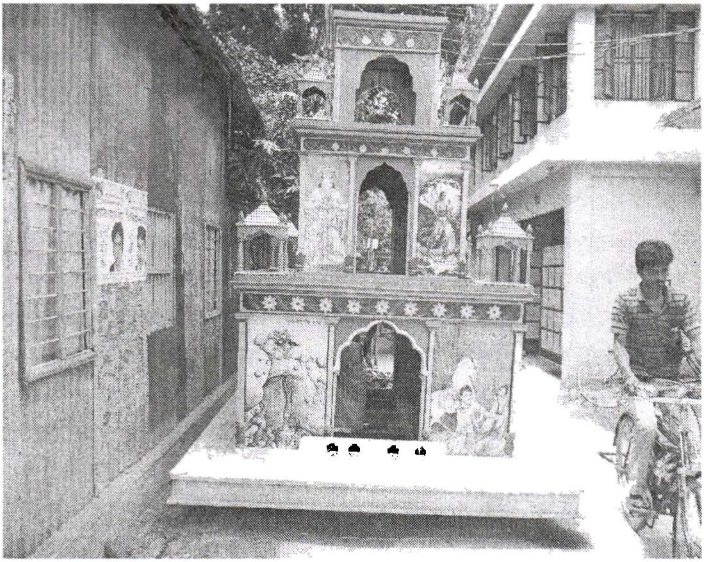

মানিকগঞ্জ সদরের কালীবাড়িতে সুসজ্জিত রথ

রথ টানার প্রস্তুতি

www.pathagar.com

রথে স্থাপনের জন্য ভক্তদ্বয় মাথায় করে রাধা কৃষ্ণের মূর্তি আনছেন

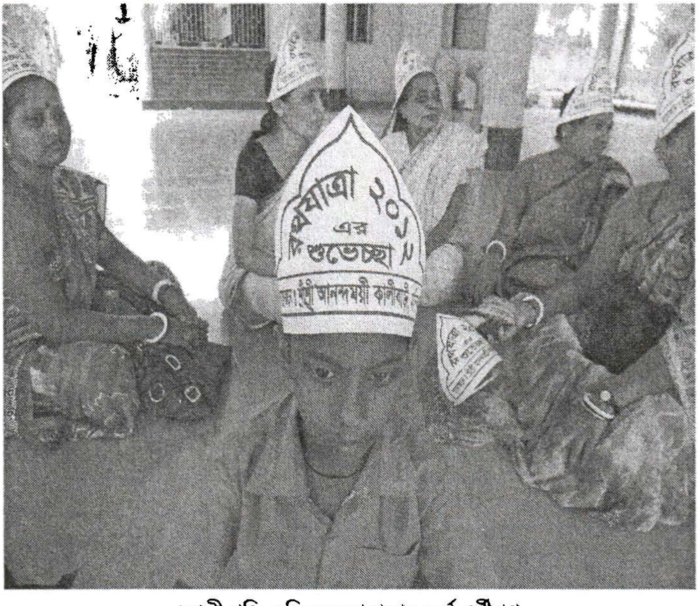

কালীবাড়ি মন্দিরে রথযাত্রার দর্শনার্থীগণ

www.pathagar.com

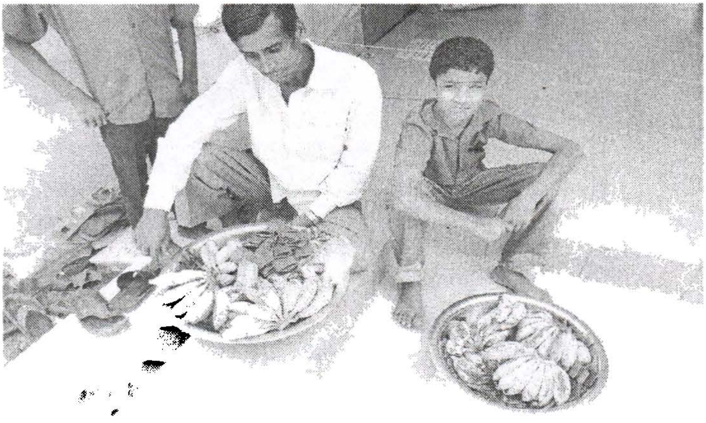

রথের দিন কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গনে কলা বিক্রি করছেন কলা বিক্রেতা

কৈতরা হাটে শেষ রথ অনুষ্ঠান

১৫ই আষাঢ় ১৪১৯/ ২৯শে জুন ২০১১ তারিখ শুক্রবার পুটাইল ইউনিয়নের পূর্বদিকে সিংগাইর উপজেলার অন্তর্গত কৈতরা গ্রামের কৈতরা হাটে শেষ রথ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে রয়েছে একটি বড়ো লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দির। বাবু পূর্ণচন্দ্র সরকার নিজের অর্থায়নে তৈরি করেছিলেন ৮০ হাত উঁচু শালকাঠের একটি রথ। এই রথকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর রথপূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অযত্নে অবহেলায় পুরনো রথটি নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে স্থানীয় লোকজন ছোটো একটি রথ বানিয়ে পূজা করে থাকেন।

কৈতরা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দির

www.pathagar.com

শেষ রথের দিন কৈতরা হাটে ভক্তবৃন্দ রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ বা মূর্তি ছোটো একটি কাঠের চৌকির উপর বসিয়ে মাথায় বহন করে মেলা প্রদক্ষিণ করেন। তারা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দিরের সামনে চৌকিটি নামান এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করতে থাকেন। এ সময় পঞ্চফলের ভোগ–আম, আপেল, জাম্বুরা, আনারস, গোণ্ডারি বা কুশইল, শসা প্রভৃতি উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রসাদ হিসেবে মিষ্টিও বিতরণ করা হয়। এরপর চৌকি মাথায় বহন করে ছোটো রথের ভেতর রাখে এবং ওখানে ভক্তরা মাটির ঘোড়া, চিনি, কলা ইত্যাদি রাখেন।

কৈতরা হাটে শেষ রথের দিন রাধা গোবিন্দের মূর্তি নিয়ে মিছিল

রাধা গোবিন্দের মূর্তিতে ভক্তদের দেয়া উপহার সামগ্রী (কৈতরা হাট)

www.pathagar.com

৬. ঘুড়ি উৎসব

গ্রাম বাংলায় ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি উড়ানোর উৎসবের এক সময় ব্যাপক প্রচলন ছিল। বাড়িতে, মাঠে, ঘাটে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চোখে পড়তো আকাশ জুড়ে যেন ছেয়ে আছে বাহারী রঙের বিচিত্র নামের ঘুড়ি। শিশু, কিশোর, যুবক সবাই খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়াতে দারুণ পছন্দ করতেন। কৃষক বৈশাখ মাসে ধান ক্ষেত নিড়ানি দেওয়ার সময় তার পছন্দের ঘুড়িটি মাঠে নিতে ভুল করতেন না। বৈশাখ মাসের দক্ষিণা বাতাসে অসীম আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ে ঘুড়ির লাটাই ক্ষেতের আইলের পাশে মাটিতে বিশেষ খুঁটির মাধ্যমে আটকিয়ে রাখতেন। নানা রঙের ঘুড়ি নিয়ে উন্মুক্ত মাঠে ছোটো শিশুর ছুটে বেড়ানোর দৃশ্য যে কত মনোমুগ্ধকর ছিল তা বলাই বাহুল্য। সেই অতীত ঐতিহ্যের ঘুড়ি উড়ানো এখন আর নেই। তবে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় অল্প বিস্তর ঘুড়ি উড়াতে এখনো দেখা যায়। মানিকগঞ্জ সদর থানার চান্দইর বুড়ির বৈশাখী মেলায় ঘুড়ি কিনতে পাওয়া যায়। সেই সুবাদে আকাশে দুই একটি ঘুড়ি চোখে পড়ে।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী মনোমুগ্ধকর সেই ঘুড়ি উড়ানোর পরিবর্তে এখন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনেকে ঘুড়ি উড়ানোর আনুষ্ঠানিক উৎসব করে থাকে। এমন একটি ঘুড়ি উড়ানোর উৎসব করে আসছে শিবালয় থানার 'শতদল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন'। এই সংগঠনের সদস্য সৈকত বলেন তারা ৪ বছর যাবৎ প্রতি বছর ১লা বৈশাখ যমুনা নদীর বিস্তীর্ণ তীরে আরিচা ঘাটে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘুড়ি উড়ানোর উৎসব আয়োজন করে থাকেন। এতে মেলা বসে, পান্তা ইলিশ খাওয়া হয় আর ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়। এই ঘুড়ি উৎসবে প্রায় তিন থেকে চারশ ঘুড়িয়াল অংশগ্রহণ করে। এই ঘুড়ি উৎসবে প্রায় তিন/চার হাজার দর্শকের সমাগম ঘটে। বিচিত্র রকমের ঘুড়ি নিয়ে আসে ঘুড়িয়ালরা। বিচিত্র রকমের ঘুড়ির মধ্যে বিভিন্ন নামের ঘুড়ি রয়েছে যেমন—পতিঙ্গা, কয়রা, চিলা, সপো, দোল, বিমান, মানুষ ঘুড়ি, ময়ূর ঘুড়ি, ফেইচা ঘুড়ি প্রভৃতি। ছোটো ছেলেদের পছন্দের ঘুড়ি হচ্ছে পতিঙ্গা আর বড়োদের পছন্দের ঘুড়ি হচ্ছে কয়রা। আরিচা ঘাটের এই ঘুড়ি উৎসব এখন মানিকগঞ্জের অন্যতম ঘুড়ি উৎসব। এই উৎসবে প্রধান আকর্ষণ হলো প্রতিযোগিতায় যারা ঘুড়ি উড়ানোর ভালো নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন এমন ২০ জনকে টেলিভিশন, মোবাইল সেট ও ডিভিডি ইত্যাদি পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়। এতে ঘুড়িয়ালরা দারুণ উৎসাহ বোধ করেন। আরিচা ঘাটের আবদুল হাই (৪০) বলেন, সৌখিনদার মানুষ দিন দিন কমে যাচ্ছে। নানা টিভি চ্যানেল হওয়ায় দেশীয় জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আরিচা ঘাটের এই ঘুড়ি উৎসব মানে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো আর কি। ঘুড়ি উড়ানোর স্বতঃস্ফূর্ত সেই মানসিকতা এখন আর নাই। তবু নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যবাহী ঘুড়ি পরিচয় করিয়ে দিতে এই আনুষ্ঠানিক ঘুড়ি উৎসবের আয়োজনের মূল্য কম কি। আরিচা ঘাটে যমুনা নদীর তীরে ঘুড়ি উৎসব ছাড়াও হরিরামপুর উপজেলায় ঝিটকা গ্রামের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি কর্মী রঞ্জন বাবুও ঘুড়ি উড়ানোর উৎসব আয়োজন করেন।[৫]

www.pathagar.com

৭. মহররম অনুষ্ঠান

কারবালা প্রান্তরে মা ফাতেমার সন্তান ইমাম হোসেন-এর শহিদ হওয়া বা আত্মত্যাগের মাধ্যমেই মহররম অনুষ্ঠানের উৎপত্তি। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি দুটি সম্প্রদায় রয়েছে। মহররম-এর অনুষ্ঠান শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করে। মানিকগঞ্জের অধিকাংশ এলাকায় মহররম পালিত হয়। এর মধ্যে মানিকগঞ্জ সদরের গড়পাড়া ইমাম বাড়ির মহররম অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিজরি ৬১ সনের ১০ই মহররম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করে বিশ্ব মানবের মুক্তির দিশারী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসেন (আঃ) কারবালা প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে শহিদ হয়েছিলেন। তাঁর স্মরণে হযরত শাহ্ খলিলুর রহমান বাংলা ১৩২৮ ও ইংরেজি ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে নিজ বাড়িতে 'গড়পাড়া ইমাম বাড়ি' প্রতিষ্ঠা করেন। পির সাহেব কারবালা যুদ্ধের স্মৃতি স্মরণ করে ঢাকা হোসনী দালান, হুগলী ইমাম বাড়ির ন্যায় পবিত্র মহররম শরিফ উদ্‌যাপন শুরু করেন বলে জানা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ইমাম বাড়ি থেকে পাটখড়ির মাথায় খণ্ড খণ্ড লাল রঙের কাপড়ের নিশান বানিয়ে ছোটো আকারে মহররমের মিছিল বের করা হয় এবং তৎকালীন গড়পাড়া খুরাম হাটে গিয়ে সমবেত হয়। তারপর ধীরে ধীরে মহররম পর্বের প্রসার ঘটতে থাকে। হযরত খলিল (রঃ) মানিকগঞ্জের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা জাগরণের নতুন মাত্রা সংযোজনের জন্য এই মহররম পর্বের আয়োজনে গুরুত্ব দিতেন। তিনি ১লা মহররম থেকে ১০ মহররম পর্যন্ত আশুরার যাবতীয় কার্যাদি যেমন—মিলাদ, ফাতেহা, জেয়ারত, নেওয়াজ, জারি, মর্সিয়া, মাতম, তাজিয়া দুলদুল ও অগণিত ভক্ত সমন্বয়ে শোক-মিছিল বের করেন। ১৯৩৩ সালে ১০ মহররমের শোক মিছিল প্রথমবারের মতো মানিকগঞ্জ শহর প্রদক্ষিণ করে। সুফি দর্শন ও তরিকা প্রচারসহ বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের ভরসা স্থল হচ্ছে এই গড়পাড়া ইমাম বাড়ি।

গড়পাড়া ইমাম বাড়িতে ১লা মহররম থেকে মহররম পর্ব শুরু হয়। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে ঢাক-ঢোল ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। এটি ঐতিহ্যগতভাবেই চলে আসছে। বড়ো একটি বাদ্যযন্ত্র ইমাম বাড়িতে সংরক্ষিত আছে যার নাম ডংকা। সকাল-বিকেল অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দরবার শরিফে রক্ষিত 'ডংকায়' বাড়ি দিয়ে বিশাল শব্দ তৈরি করা হয়। প্রতিদিন সকালে-বিকেলে এইরূপ বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে দরবারের বর্তমান খাদেম শাহ্ মোখলেছুর রহমান পান্নু মিয়া বলেন, "আগের দিনে মাইক ছিল না। কখন মহররম মাস এলো তাও মানুষ স্মরণ রাখতো না। তাই তৎসময়ে এই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মূলত এলাকাবাসীদের জানান দেওয়া হতো যে মহররম মাস এসে গেছে। গড়পাড়া ইমাম বাড়ির বাদ্যযন্ত্র শুনেই মানুষ বুঝে নিত মহররম মাস তাদের দুয়ারে হাজির। এখন মাইক দিয়ে অনায়াসে সব কিছু জানানো গেলেও ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিদিন সকাল-বিকেল দরবার শরিফের সদর গেটের সামনে এই ডংকা বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়।"

www.pathagar.com

মহররম পর্ব সম্পন্ন করার জন্য দরবারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। সব কিছুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "কাশেদ দল" গঠন। এই কাশেদ দল জেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে বেরিয়ে পড়েন এবং নির্ধারিত বাড়িতে এই কাশেদ দল গিয়ে কারবালা প্রান্তরে শহিদদের করুণ গাঁথা, মর্সিয়া ও জারিগান পরিবেশন করে। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে কাশেদ দল বুক চাপড়িয়ে সেই করুণ কাহিনি সুরে-গানে-ছন্দে-বর্ণনা করেন। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করে এবং কারবালার প্রান্তরে ঘটে যাওয়া নির্মম কাহিনি মানুষের স্মরণে আসে। ইসলামের ইতিহাসে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন (রঃ)-এর যে মর্মান্তিক খুনের বর্ণনা আছে—তা এই কাশেদ দলই যেন তাদের গান মর্সিয়া, জারি ও দেহের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলে ধরেন। মহররমের মূল ঘটনা প্রচার করতে এই কাশেদ দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিদিন সকালে কাশেদ দল ইমাম বাড়ি থেকে বের হয় আবার রাত ৮/৯টার দিকে ইমাম বাড়িতে এসে জড়ো হয়। এমনিভাবে দশ মহররম পর্যন্ত চলে।

২০১১ সালের মহররমের ৯ তারিখ (৬ ডিসেম্বর, ২০১১) দিবাগত রাতে বর্তমান গ্রন্থের প্রধান সমন্বয়কারী ও তথ্য সংগ্রাহকগণ গড়পাড়া ইমাম বাড়িতে অনুষ্ঠিত মহররম দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সে দিন রাত ১১টায় কাশেদ দল চিৎকার করে 'হায় হোসেন! হায় হোসেন!' বলতে বলতে দ্রুত বেগে দরবার শরিফের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে দরবার প্রাঙ্গণ কাশেদ দলের লোকে পূর্ণ হয়ে যায়। কারবালার স্মৃতি স্মরণ করে সবাই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। কয়েকজন কাশেদকে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে দেখা যায়। ঐদিন সকাল ৯ টায় সমস্ত কাশেদ দল, ভক্ত অনুসারী ও সমস্ত শ্রেণি পেশার মানুষের ঢল নামে ইমাম বাড়িতে। মানিকগঞ্জ সদরের মালুটিয়া গ্রাম থেকে আগত দর্শনার্থী মোঃ সাহাজুদ্দিন বলেন— "মহররম দেখাতো ভালো, অথচ আমরা আইয়া দেহি না। ইমাম বাড়ির মহররম তো দেহার মতো জিনিস।" খুলনার বাগেরহাট থেকে আগত আমিনুর রহমান জানান তিনি তিন বছর যাবত গড়পাড়া ইমাম বাড়িতে আসছেন। তিনি আরো জানান, গড়পাড়া ইমাম বাড়ি থেকে ইসলামের মৌলিক যে শিক্ষা তা জানা যায়। এখনকার ধর্মাচার, কথাবার্তা হাদিস-কোরানের সাথে মিল আছে। মানিকগঞ্জ সদর এবং চান্দইর গ্রামের কিশোর রুবেল বলেন, "ইমাম হোসেন শহিদ হইছে সেই দৃশ্য ইমাম বাড়ি তুলে ধরে তাই ভালো লাগে।"

মহররমের দশম দিনে বিকেল ২টার সময় ইমাম বাড়ি থেকে হাজার হাজার যুবক-বৃদ্ধ, কাশেদ দলের সদস্য, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সবাই বিশাল মহররমের মিছিল নিয়ে মানিকগঞ্জের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণের উদ্দেশ্যে মানিকগঞ্জ অভিমুখে রওনা হয়। অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও শোক-বিহ্বল অবস্থায় সবাই মিছিল নিয়ে মানিকগঞ্জ যায়। মিছিলের অগ্রভাগে থাকে কয়েক ডজন হোন্ডারোহী, বাদ্যযন্ত্রীদল, অতিথিদের সারি। তারপর থাকে লাঠি, তরবারী, বর্শা, নিশান হাতে অগণিত মানুষ। সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে উপকরণ থাকে তা হচ্ছে তাজিয়া ও দুলদুল ঘোড়া। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বিল্ডিংয়ের ছাদে ও ঘরের বারান্দায় অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে মিছিল দেখার জন্য। মিছিলে থাকে কাঁধে বহন করা ইমাম হোসেনের

www.pathagar.com

মাজারের প্রতিকৃতি, সুসজ্জিত দুলদুল ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে ঢাল তরবারি। ইমাম হোসেনের গদি ঘোড়ার পিঠে স্থাপন করা হয়। তরবারি, রামদা, বটি, ছেন, তীর, ধনুক, সুরকি, কুড়াল, বল্লম ও লাঠি হাতে যুবকরা নেচে গেয়ে 'হায় হোসেন, হায় হোসেন' মাতম জারি করতে করতে রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে। কেউ কেউ আগুনের মশাল জ্বালিয়ে শোক প্রকাশ করে। কেউ কেউ লাঠি ঘুরায়। তাদের পরনে লাল, কালো কাপড় থাকে। কেউ কেউ ভ্যান গাড়ির উপরে মহররমের তাজিয়া স্থাপন করে বহন করেন। বাজনার দল ভ্রমি, সাউন্ড ড্রাম, বিগ ড্রাম, কর্নেট, ক্ল্যানুয়েট, সানাই, কাস, ঝুনঝুমি, করতাল এবং বিরাট সবেস বাঁশি বাজায়। বাদ মাগরিব এই বিশাল মিছিল সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ মাঠে গিয়ে শেষ হয়। মানিকগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সেখানে কাশেদদের ইফতারি করানোর জন্য খেজুর ও চিনির শরবতের ব্যবস্থা করে। দেবেন্দ্র কলেজ মাঠে ইফতারি শেষে এক মনোমুগ্ধকর কাশেদ দলের লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে লাঠি খেলার বিভিন্ন নৈপুণ্য প্রদর্শন করা হয়। তারপর কলেজ মাঠে নির্মিত মঞ্চে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। এতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিদেশি মেহমানগণ মহররমের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন।

মানিকগঞ্জের গড়পাড়া ইমাম বাড়ির আয়োজিত মহররম পর্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা এখন মানিকগঞ্জবাসীর কাছে সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান হিসেবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই গড়পাড়া ইমাম বাড়ির মহররমের মিছিল এক নজর দেখতে মানিকগঞ্জ শহরে এসে ভিড় করে। গ্রামগঞ্জ থেকে পঙ্গপালের মতো মানুষ ছুটে আসে ১০ মহররম মানিকগঞ্জ শহরে। এই সময় শহরের সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গড়পাড়া ইমাম বাড়ির মহররমের সব আয়োজন এখন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণি পেশার মানুষের কাছে এক কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, গড়পাড়া ইমাম বাড়ি ছাড়াও দাশড়ার পরান মেম্বারের বাড়ি, সেওতা, বাঠইমুরি শোভা মিয়ার বাড়ি ও মান্তা থেকেও মহররম পর্বের বিভিন্ন আয়োজন ও মহররমের মিছিল বের হয়ে থাকে।[৬]

গড়পাড়া ইমাম বাড়ি মহররম অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

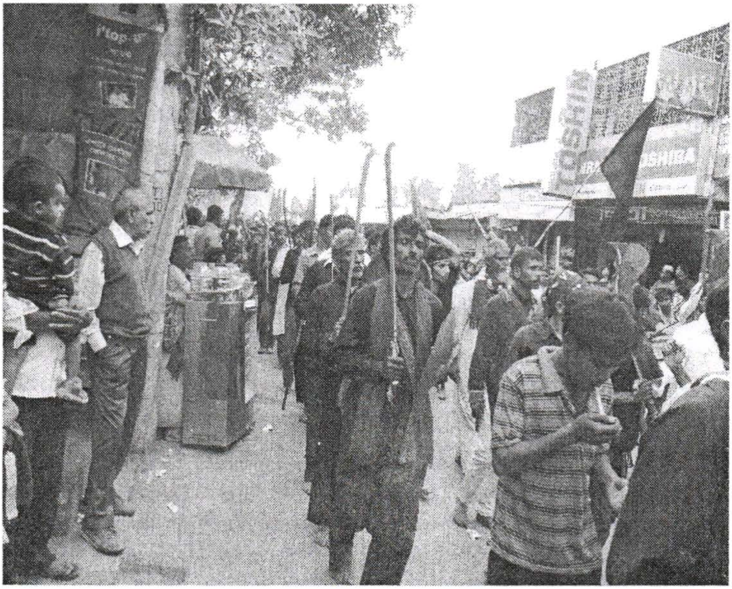

মহররমের তাজিয়া মিছিলে কাশেদ দল

মহররমের মিছিল মানিকগঞ্জ শহর প্রদক্ষিণ করছে

www.pathagar.com

মহররমের মিছিলে ইমাম হোসেনের গদি সজ্জিত ঘোড়া

৮. বরকত মার থল

বরকত মার থল মহররম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। বরকত মার থল মাটি দিয়ে তৈরি করা চার কোণা বিশিষ্ট মাটির তিনটি থাক বা স্তর। এটি দেখতে মাটির উঁচু ভিটির মতো। এটি থল নামে পরিচিত। থলের তিন দিকে মাটির তৈরি ছোটো ছোটো পুতুল বসানো থাকে। সামনের দিকে থাকে স্বর্ণ বা রূপার তৈরি চোখ। বরকত মার থল হচ্ছে মায়ের প্রতীক। তিনদিকে বসানো ছোটো ছোটো পুতুল হচ্ছে সন্তানের প্রতীক। ছোটো বেলায় শিশু সন্তান যেভাবে মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে তেমনি বরকত মাকেও বিশ্বের সমস্ত মানব সন্তান আঁকড়ে ধরে আছে। এই অর্থে বরকত মার থল সর্বজনীন মানবতার প্রতীক। সোনা-রূপার তৈরি চোখ হচ্ছে মানুষের চোখের প্রতীক। গড়পাড়া ইমাম বাড়ি, চান্দইর আয়নাপুর, তিল্লি, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ সদর, কলতা, বাঠইমুরি, ঝিটকা এইসব এলাকায় বরকত মার থল বর্তমানেও উঠানো হয়।

২০১১ সালে আয়নাপুর গ্রামে আবদুর রহিমের বাড়িতে বরকত মার থল উঠানো হয়। আবদুর রহিমের স্ত্রী ছালেহা বেগম জানান যে গত বছরের আগের বছর একজন মৌলবি এসে বরকত মার থল উঠাতে দেয়নি। বরকত মার থল না উঠানোর ফলে তার পরিবারে অনেক অশান্তি নেমে আসে, রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়, সংসারে উন্নতি হয়নি, গরু বাছুরের রোগ হয়। তাই এই বছর মার থল উঠানো হয়েছে। তার শাশুড়ি তাকে বরকত মার থল উঠানোর দায়িত্বটা দিয়ে গেছেন। তার শাশুড়িও এই দায়িত্বটি পেয়েছিল শাশুড়ির কাছ থেকে। আর ছালহা বেগমও তার ছেলের বউ-এর কাছে এই

www.pathagar.com

দায়িত্ব দিয়ে যাবেন। থলের বিবরণ দিতে গিয়ে ছালেহা বলেন, "যেদিন মহররমের চাঁন দেখি ঐদিন সরগাই (ছেহেরি) খাইয়া পরের দিন রোজা রাখি। রোজা থাইকা পবিত্র এক হাজি (ঝুড়ি) মাটি আইনা দুয়ারের মাঝখানে রাইখা দিই। হেদিন থেইকা সন্ধ্যা বাতি ও শিরনি দেই। প্রতিদিন আর না হইলেও বাতাসা পানি দিতেই অইব। পাঁচদিনের দিন সকাল বেলা ঐ মাটি পানি দিয়া ছাইনা ঘরের দরজার সামনাসামনি দুয়ারের মধ্যখানে থল উঠাই বা বানাই। ঐ দিন ক্ষীর শিরনি দেই। তারপর থেইকা এক একদিন এক এক শিরনি দেই, যেমন : খিচুরি, গোস্ত, রুটি, শাক-ভাত। সেমাই, খই, দুধ, বাতাসা তো প্রত্যেক দিন আছেই। মার সামনে পুকুর কাটা আছে। ওখানে বারাইয়া দেই (নিবেদন করা)। দুধ যদি আসে মার মাথায় ঢাইলা দেই। দুধ, বাতাসা প্রত্যেক দিনই আসে। কিছুই আমার ঘরে রাখি না। সব বিলাইয়া দেই। অনেকে মানতি করে যেমন—দয়া কইরা মা বরকত গরু, বাছুর, ছেলে সন্তানের উপর থেইকা সমস্ত বালা মুছিবত দূর কইরা রাখে। তাহলে আমি সোয়াসের দুধ দেই। অনেকে অনেক কিছু মানতি করে। সন্ধ্যার সময় অনেক পোলাপাইন আইসা হাজির হয়, তখন আগরবাতি জ্বালাইয়া মোমবাতি জ্বালাইয়া শিরনি বারাইয়া দিয়া পোলাপাইনকে খাইতে দেই। এই যে চাঁন চোখ দেখেন এগুলো খুইলা রাখি। চাইর কোণার মাটি সরাইয়া মার থল উঠাইয়া ঝাঁকায় রাখি। এরপর পোলাপাইন 'হায় হোসেন' 'হায় হাসান', 'হায় আলী', 'হায় ফাতিমা' কইতে কইতে নদীর ঘাটে নিয়া যায়। যাইবার সময় খৈ ছিটাই। বুক পানিতে নিয়া ডুবাইয়া দেই। তারপর বাড়িতে আইসা গোসল কইরা রোজা ভাঙ্গি, তারপর রাতে বৈঠকি গান হয়। ক্ষীর, খিচুরি, শিরনি করি রাতে। বরকত মার থল হইল আসল। মা যেমন সন্তানের মঙ্গল কামনা করে, বরকত মাও আমাদের জন্য রহমত বা দয়া করে।"[৭]

০২.১২.২০১২ তারিখে সন্ধ্যায় দক্ষিণচর আয়নাপুর গ্রামের ইনাম আলীর বাড়িতে বরকত মার থল পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় ইনাম আলীর স্ত্রী বরকত মার থল সামনে রেখে ভোগ, বাতি ও শিরনির ব্যবস্থা করছেন। সন্ধ্যাবাতি ও সালাম ভক্তি শুরু হয়ে যায়। অনেক মা তাঁর শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে বরকত মার থলকে ভক্তি জানিয়ে থলের সামনে থেকে ধূলো গায়ে মাখছে। ক্ষীর, খিচুরি, বাতাসা বিতরণ করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের নাম কী জিজ্ঞাসা করা হলে ইনাম আলী বলেন এর নাম বরকত মার থলের অনুষ্ঠান। ইনাম আলীর স্ত্রী আম্বিয়া বিবি বলেন, "বরকত মার থল আমার শাশুড়ি উঠাইতো। সেই থেইকা এই নিয়ম। দশদিন নিরামিষ খাই, রোজা রাখি। প্রথম দিন থেকে সন্ধ্যার সময় বাতি জ্বালাইয়া প্রথমদিন দিই তিন চাক আদা আর কিছু ফল। দ্বিতীয় দিন দিই আতপ চাল, চিনি ও দুধ। তার পরদিন দিই সাদা জাই। তার পরদিন দিই আতপ চাউল। দুধ চিনি দিয়া লবণ ছাড়া শিরনি পাক করি। পঞ্চম দিন দিই মিষ্টান্ন বা ক্ষীর। ছয় দিনের দিন দিই খিচুরি। সাত দিনের দিন হাতেকাটা সেমাই পিঠা। আট দিনের দিন দিই মোরগের মাংস ও রুটি। নয় দিনের দিন দেই আতপ চালের ভাত আর কচুর শাক। শেষের দিন সন্ধ্যা ছয়টা সাতটায় খই, তিল, আউলা চাউল (আতপ চাল) নারিকেল কোরাইনা কাঁচা দুধ দিয়া মাইখা ভোগ দেই। শিরনি

www.pathagar.com

দেই, পরে কাঁচা দুধ দিয়া মারে গোসল করাইয়া বোরাইবার নিয়া যাই পুকুরে বা নদীতে। এই সময় ধান না বাইছা খৈ ছিটাইতে ছিটাইতে নিয়া যাই। ছোটো ছোটো পোলাপানরা হাতে লাল কালো নিশান নিয়া হায় হোসেন, হায় হোসেন ধ্বনি দিতে দিতে নিয়া যায়। বুক পানিতে নাইমা ছাড়ি দিয়া গোসল কইরা বাড়ি চইলা যাই। রাত্রিতে বড়ো কইরা শিরনি করি। তবে শিরনির জন্য অনেকে চাইল, ডাইল, চিনি, দুধ, গুড় দেয়। সব বিলাইয়া দেই। মার দোয়ায় সন্তান অইলে কেউ মোরগ দেয়, কেউ বিশ কেজি চাল দেয়, কেউ খাসি দেয়। যদি শিরনির দিন এসব আসে সব বিলাইয়া মানুষের সেবায় দেই। পোলার বউগো বলছি আমার কাজ তোমরা করবা। বরকত মার দোয়ায় তোমরা সুখে থাকবা। বউরা রাজি আছে।"[৮]

ভক্তদের নিকট বরকত হচ্ছেন মা ফাতেমা। তিনি তাঁর সন্তানদের সব সময় রোগ, শোক থেকে রক্ষা করে চলেছেন। বরকত শব্দের অর্থ হচ্ছে আয় উন্নতি। বরকত মা হচ্ছেন মা ফাতেমার প্রতীক। আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হচ্ছে বরকত মা এই ধরিত্রীর প্রতীক আর ধরিত্রী মায়ের মতো। ধরিত্রীর বুকেই মানুষের জন্ম আর মৃত্যু। এই ধরিত্রী ফলে, ফুলে মানুষের জীবনকে ভরে তোলে। মা যেমন সন্তানকে লালন করে, স্নেহ মমতায় মানুষ করে, তেমনি ধরিত্রীও মানুষকে লালন পালন করে। জন্ম, স্থিতি এবং মৃত্যু সবকিছু এই ধরিত্রীর উপর। মহররমের করুণ ও মর্মস্পর্শী শোকাবহ ঘটনা থেকে বরকত মার থলের প্রচলন হয়। এটি মহিলাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারাই এটি বেশি মানেন।

আয়নাপুর গ্রামে বরকত মার থল

www.pathagar.com

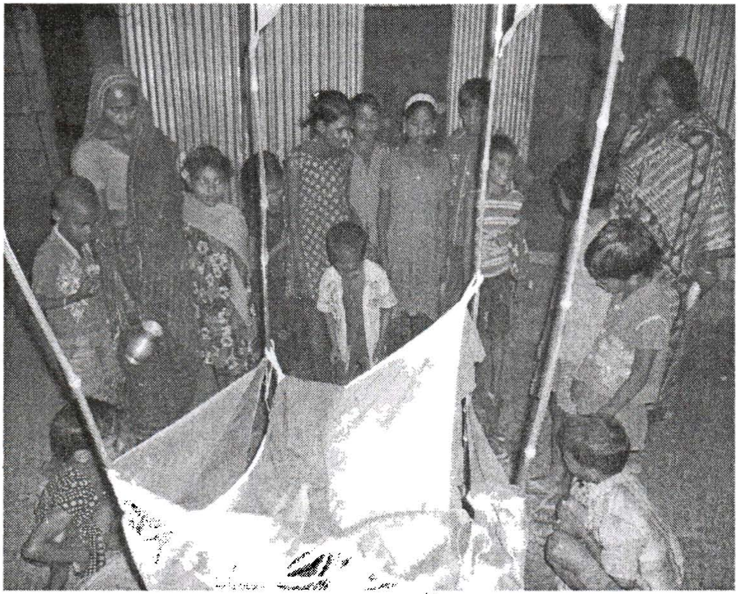

বরকত মার থলের সামনে উৎসুক জনতা

৯. ভেলা ভাসানো উৎসব

মানিকগঞ্জে লোকউৎসবের মধ্যে 'ভেলা ভাসানো' একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। ভেলা ভাসানোর প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছিল তার সঠিক কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে মুসলিম শাসকগণের আগমনের পর থেকে হযরত খোয়াজ খিজির (আঃ) এর উপর বিশেষ বিশ্বাস স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট এই ভেলা ভাসানো উৎসব। তাদের বিশ্বাস হযরত খোয়াজ খিজির (আঃ) একজন নবী বা জিন্দা পির। তাঁর মরণ নাই। পানিতে যত জীব আছে তিনি তাদের ত্রাণকর্তা। এমনকি এই দুনিয়ায় কিয়ামত হবার পরেও তিনি আড়াই দিন পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। কোনো এক সময় মুসা নবীর সঙ্গে হযরত খিজির (আঃ)-এর সাক্ষাত হয়। সপ্তাহকাল তারা একত্রে থাকেন। ঐ সময় খিজির (আঃ) নদীতে ভেসে ভেসে এসে মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত দেন। সেই থেকেই এই কলাগাছের ভেলা ভাসানোর সূচনা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

ভক্তদের বিশ্বাস ভেলা ভাসালে খিজির (আঃ) এই ভেলায় এসে সওয়ার হন, কৃপা বর্ষণ করেন এবং ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন। তাই তারা ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। হযরত খোয়াজ খিজির (আঃ) এর অনুসারীরা বিশ্বাস করেন তাঁর নামে কেউ যদি রোগ-ব্যাধি, বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কিছু মানতি করে তাহলে তিনি তার প্রতিকার পান। উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে এদেশের

www.pathagar.com

মানুষ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাচার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল। তৎসময়ে ভারতীয়দের মধ্যে নদী-পূজা, নির্ঝর-পূজা, কূপ-পূজার প্রচলন ছিল। হিন্দুরা বিশ্বাস করতো নদ-নদীতে দেব-দেবীরা অবস্থান করে। তাই হিন্দুদের কাছে নদী আজো পূজনীয়। আজো তারা শুচি-হবার জন্য গঙ্গাস্নান করে থাকে। ধারণা করা হয়, হিন্দুদের এজাতীয় বিশ্বাসের প্রভাবেই মুসলমানদের আউলিয়া খোয়াজ খিজির (আঃ) পানির কর্তা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। ভেলা ভাসানো হচ্ছে বংশপরম্পরায় পালিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এখানে উল্লেখ্য যে খিজিরিয়া তরিকা নামে একটি তরিকা রয়েছে। এরা ভেলা ভাসায় না। কিন্তু খোয়াজ খিজিরকে মানেন। মানিকগঞ্জের হিজলাইন, সৈয়দপুর, ভাটরা গ্রামে খিজিরিয়া তরিকার লোক অদ্যাবধি আছেন। এই তরিকাকে আহলে ছুন্নত নামে অবিহিত করা হয়। এরা ইমাম আবু হানিফাকে মানেন।

ভেলা ভাসানোকে লোকজ সংস্কার বলতে নারাজ হযরত খোয়াজ খিজির (আঃ) প্রেমিকরা। তারা মনে করেন ভেলা ভাসানো কোনো সংস্কার, বিশ্বাস বা উৎসব নয়, এটি আধ্যাত্মিক কর্মের অংশ। উল্লেখ্য, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের যে কোনো বৃহস্পতি-রবিবারগুলোতে ভেলা ভাসানো উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভাদ্র মাসে ভরা ভাদরে নদী, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট পানিতে একাকার হয়ে যায়। তাই এই সময়ে ভাদ্র মাস থাকতেই ভেলা ভাসানোর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। সন্তান লাভের জন্য খোয়াজ খিজিরের নামে কেউ কেউ গরু, ছাগল, মুরগি, চাউল, ডাল প্রভৃতি মানত করেন। সন্তান হলে সে মানত পূর্ণ করেন। অনেকে ফসল মানত করেন। রোগ মুক্তির জন্য মানত করেন অনেকে। বেতিলা, চারিগ্রাম, গোলাইডাঙা, নবগ্রাম এসব এলাকায় খোয়াজ খিজিরের ভক্তবৃন্দ বসবাস করেন। ভক্তবৃন্দের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা বেশি। চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, হিন্দু ভক্তও আছেন এক চতুর্থাংশ। মানিকগঞ্জে একসময়ে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ভেলা ভাসানোর প্রচলন ছিল। বর্তমানে মানিকগঞ্জে ভেলা ভাসানোর সবচেয়ে বড়ো আয়োজন হয়ে থাকে সদর উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের চর বরইল গ্রামের মেছের ফকিরের বাড়িতে।

ভক্তবৃন্দের সুসজ্জিত ভেলা একটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। ভেলা ভাসানো সমাজের নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেমন— বেদে সম্প্রদায় যারা সান্দার নামে পরিচিত। এরা সারা জীবন পানির মধ্যে নৌকায় বসবাস করে। নৌকায় বসবাস করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা চুড়ি, কানের বালা, আলতা, স্নো, সাবান, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কোনো কোনো বেদেনী সাপ নিয়ে খেলা করে। সাপের খেলা দেখায় আর থালা, ঘটি, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি বিক্রি করে। পুরুষরা ছাতি মেরামত করে, হুঁকা বানায়, মাছ ধরার যন্ত্র টেঁটা (লোহার তৈরি) বিক্রি করে, পাখি শিকার করে শর দিয়ে বিভিন্ন ফাঁদ পেতে। মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই ঘরে বা নৌকায় অধিকাংশ সময় বসবাস করে। তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এদেরকে বলা হয় ঘরিয়াল, 'শূন্য খতিয়ান' অর্থাৎ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি

www.pathagar.com

নেই। বর্তমান যুগে বেদেরা উন্নত ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে, যেমন তারা এ্যালুমিনিয়াম, সিলভার, কাঁসা, পিতলের ব্যবসা করে থাকে। অনেকের মিল কারখানাও রয়েছে, যেমন– চাউল, আটা, তেল প্রভৃতি ভাঙানোর মিল। অনেকে লেখাপড়া শিখছে। অর্থনৈতিকভাবে তারা উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করছে। বেদেদের মত বৈদ্য নামে এক শ্রেণির জনগোষ্ঠী রয়েছে। কবিরাজি চিকিৎসা করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং অধিকাংশ সময় পানিতে, নদীতে ও খালে-বিলে-নৌকায় বসবাস করে। এরাই মূলত ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা এরা মনে করে খোয়াজ খিজির পানির দেবতা। যেহেতু তারা পানিতে বসবাস করে সেহেতু ভেলা ভাসালে তাদের আর্থিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় উন্নতি সাধিত হবে বলে এদের বিশ্বাস।

ভেলা তৈরির পদ্ধতি

মোহাম্মদ আব্বাস দেওয়ান ও শওকত দেওয়ান কলাগাছের ভেলা তৈরি করেন। তাঁরা বলেন, "এই কাজ প্রতিবছর করি। এজন্য পাঁচটি কলাগাছ লাগে। কলাগাছের ছোপ বা ঝাড় থেকে কলাগাছ কাটা হয়। পিরের নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্ঠা সহকারে ধান-দূর্বা দিয়ে কলাগাছ বরণ করা হয়। ধান, দূর্বা, সিঁদুর, বাতাসা, আগরবাতি, মোমবাতি ও নতুন একটা গামছা কুলার উপর রাখা হয়। এই কাজের জন্য ব্যবহৃত কুলা গৃহস্থালী কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না। পাঁচটি কলাগাছকে নির্দিষ্ট করে এই বরণ দিতে হয়। নির্দিষ্ট কলাগাছই কাটা হয়। প্রথম কলাগাছ ধারালো দা দিয়ে এক কোপে এক নিশ্বাসে কাটতে হয়। বাদ্যযন্ত্র যেমন : কর্নেট বাঁশি, ক্ল্যানুয়েট বাঁশি, সানাই বাঁশি, সাইড ড্রাম, বিগ ড্রাম, কাঁসা, ঝুমুর প্রভৃতি একযোগে বাজানো হয় মুর্শিদি গানের সুরে। সকাল দশটা বা দুপুর বারোটায় কলাগাছ কাটতে হয় পিরের নির্দেশে। কলাগাছ কেটে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। এরপর ছিলতে হয়। তেল হলুদ মাখাতে হয়। এটাকে তেলাই দেওয়া বলে। মাটি থেকে শূন্যে একটা মাচার উপরে কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরি করতে হয়। ভেলার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত এবং প্রস্থ পৌনে দুই হাত। পাঁচটি কলাগাছ বাঁশের ফালি দিয়ে আটকানো হয় বা বাঁশের খিল দেওয়া হয়। বাঁশের চিকন নুরিয়া বা বাতা দিয়ে একটি চারচালা বিশিষ্ট ঘর তৈরি করা হয় বারান্দা সহ। চালে রঙিন কাগজ দিয়ে ছাউনি দেওয়া হয়। চর্তুদিকে রঙিন কাগজের বেড়া দিতে হয়। ঘরের তিনটি দরজা থাকে। দরজায় ডেকোরেশন এর জন্য কাগজের ঝালর দেওয়া হয়। একটি ভেলা তৈরি করতে আনুমানিক ৫০০/- টাকা ব্যয় হয়।

ভেলা সাজানোর পর ঘরের ভিতরে নৈবেদ্য উপাচারে সাজানো হয়। মিষ্টান্ন, ক্ষীর, খিচুরি, বাতাসা, রুটি, ভাজা পিঠা, তেল চিতই, পাটিসাপটা, কোরানো নারিকেল, পাকানো খৈ, মোয়া, নারিকেলের নাড়ু, মুড়কি, কিছু কয়েন বা কাঁচা টাকা, মোমবাতি, আগরবাতি, ধূপ প্রভৃতি দেয়া হয়। নারিকেলের ছোবরার মধ্যে ধূপ জ্বালানো হয়। ভক্তবৃন্দের মানত করা দ্রব্যের কিছু অংশ ঘরের ভিতর দেওয়া হয়। যিনি ভেলা ভাসাবেন তাঁর নিকট এসব উপকরণ দেওয়া হয়। রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যেই

www.pathagar.com

ভেলা ভাসানো হয়। বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে ভেলা নদীতে ভাসানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ছেলে-মেয়ে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিছিল সহকারে ভেলা নিয়ে যান।

কলাগাছের ভেলা তৈরি হচ্ছে

চর বারইল গ্রামে ভেলা ভাসান উৎসব

২০১১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মেছের ফকিরের বাড়িতে ভেলা ভাসানোর উৎসব আয়োজন করা হয়। মেছের ফকিরের উত্তরসূরি আবদুল কুদ্দুছ বলেন—তারা ছয় পুরুষ ধরে এই ভেলা ভাসানোর আয়োজন করে আসছেন। প্রথমে তোরাব আলী ফকির 'ভেউরা' (ভেলা) ভাসানো শুরু করেন। তারপর যথাক্রমে মেছের ফকির, হায়াত আলী ফকির, মাদারী ফকির, বরকত ফকির এ আয়োজন করেন। বর্তমানে তিনি এই দায়িত্বে আছেন। আবদুল কুদ্দুছ ফকির ভেলা নির্মাণের কথা বলতে গিয়ে বলেন—ভেলা তৈরি করতে পাঁচটি বিচিকলা গাছ লাগে। পাঁচটি বিচিকলা গাছ ছাড়া হয় না। এটা খোয়াজ খিজিরের নিয়ম। কলাগাছ কাটারও নিয়ম আছে—কলাগাছ কাটার পূর্বে কলাগাছ ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তারপর সিঁদুর, পান-সুপারি, বাতাসা, ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এরপর খোয়াজ খিজিরের নাম স্মরণ করি ও তাঁর নামের ধ্বনি দেয়া হয়। এ সময় আল্লাহ ও খোয়াজ খিজিরকে অনেক ডাকাডাকি করা হয়। সবাই মিলে প্রথমে আল্লাহর নামের ধ্বনি দেয়। তারপর খোয়াজ খিজিরের ধ্বনি দেয়, যেমন : 'বলরে—আল্লার ধ্বনি, বলরে খোয়াজ খিজিরের ধ্বনি'। একই ভাবে প্রত্যেকে পূর্বপুরুষদের নামেও ধ্বনি দেয়া হয়, যেমন : 'বলরে—তোরাব আলী ফকিরের ধ্বনি'। ধ্বনি দেয়া শেষ হলে দা বা ছ্যান দিয়ে এক কোপে কলাগাছ কাটা হয়। এই কলাগাছ সংগ্রহ করা হয় যারা খোয়াজ খিজিরের নামে কলাগাছ মানত করে তাদের বাড়ি থেকে।

www.pathagar.com

মানতকৃত কলাগাছ না থাকলে অন্যের বাড়ি থেকে চেয়ে সংগ্রহ করা হয়। কলাগাছ কাটার সময় ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কলাগাছ কাটার পর ভক্তবৃন্দই ভেলা নির্মাণ কাজ করে থাকেন।

পাঁচটি কলাগাছ একত্রিত করে কলাগাছের মাঝখানটায় চিকন বাঁশ খণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে কলাগাছ খণ্ডগুলোকে একত্রীবদ্ধ করা হয়। তারপর বাঁশের ইতরী চিকন 'বাতা' দিয়ে একত্রীবদ্ধ কলাগাছের উপর ছোটো একটি ঘরের ফ্রেম তৈরি করা হয়। বাঁশের 'বাতা' দিয়ে ঘরের ফ্রেম তৈরি হলে তাতে কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে সেগুলো কাগজের মত সমতল করা হয় এবং তা দিয়ে ছাউনি দেয়া হয়। ছাউনি দেয়ার কাজে মূল উপাদান হলো—কলাগাছের খোল, বাঁশের চিকন সরু বাতা ও সুতা বা দড়ি। ভেলা তৈরি শেষ হলে ভেলাটি প্রথমে পানি ও পরে দুধ দিয়ে গোসল করানো হয়। ভেলাটি দুধ দিয়ে গোসলের সময় অনেক ভক্ত কাঁচা দুধ খেয়ে থাকেন। তাদের বিশ্বাস এতে কল্যাণ নিহিত আছে। ভেলা যখন দুধ-পানি দিয়ে গোসল করানো হয় তখনও খোয়াজ খিজিরের নামের ধ্বনি দেয়া হয়। এরপর ভেলাটিকে বাড়ির দুয়ারের মাঝখানে রাখা হয়। ভেলার সামনে কতগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে তারপর একটি থালায় ভোগ দেয়া হয় এবং ভেলার পূজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। এরপর আগত খোয়াজ খিজিরের অনুসারীগণ যার যার মানত সামগ্রী দিয়ে ভক্তি দিতে শুরু করেন। মানত দুই রকমের হয়। একটি হলো ভেউরার (ভেলার) জন্য, অন্যটি হলো দরবারের জন্য। ভেলার জন্য যে মানত আসে সেটি ভেলার ভিতর দেয়া হয়, আর যে মানত দরবারের জন্য হয় সেটি দরবারে দেয়া হয়। মানত সামগ্রীর মধ্যে মোমবাতি আর নগদ টাকা-পয়সা বেশি হয়। এছাড়া দুধ, চাল, ডাল, বাতাসা, আগরবাতি, কবুতর প্রভৃতিও মানত করে থাকেন অনেকে।[৯]

উৎসবে আগত ভক্ত মানিকগঞ্জ সদরের বেলি গ্রামের ভাগ্য বিবি (৭০) বললেন, "দুধ আনছি ভেউরার জন্য আর চাল আনছি দরবারের জন্য।" মানতের কারণ জানতে চাইলে বললেন, "আমার পেটে বেদনা আছে। প্রতিমাসে এই দরবারে আমার হাজিরা দেওন লাগে। আজ অনুষ্ঠান তাই দুধ আর চাল নিয়া আইছি"। বারইল গ্রাম থেকে আগত ভক্ত রশীদ চরণ ঘোষ (২৫) কোনো মানত করেন নাই অথচ ভেলার সামনে গিয়ে আদবের সাথে বসে একটি ভক্তি দিলেন। কারণ জানতে চাইলে বললেন—"আমি কোনো মানতি-টানতি করি নাই, বাবা দাদারা ভক্তি দিত তাই এহানে আসি, ভক্তি দেই। ভক্তি দেয়াতো দুষের কিছু না"। বালিয়া বিল গ্রামের পোষাকী বেগম (৪০) এসেছেন দুই বছরের নাতি আশরাফুলকে নিয়ে। সাথে নিয়ে এসেছেন একপোয়া দুধ। তিনি বললেন, "নাতির হাঁপানি হইছিল। এখন সারছে তাই এক পোয়া দুধ খোয়াজ খিজিরের নামে দিয়া গেলাম।" রেণু বেগম (২৫) এসেছেন কুশের চর থেকে। তিনি এনেছেন এক বাক্স মোমবাতি। তিনি বললেন, "গত শনিবার ছেলে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেকে হাসপাতালে নিছিল, ভালো হইছে। তাই মানসী সারবার আইছি।"

চর বারইলের ঐতিহ্যবাহী ভেলা ভাসানোর প্রধান ব্যক্তি আব্দুল কুদ্দুছ ফকির জানান, মানিকগঞ্জের সবচেয়ে বড়ো 'ভেউরা' ভাসানো হতো এখানে। এখানে 'ভেউরা' ভাসানোকে কেন্দ্র করে সাত দিন যাবত মেলা হতো। মেছের ফকিরের অনেক

www.pathagar.com

ভক্তবৃন্দের সমাগম হতো। হাজার হাজার মানুষের রাতদিন ২৪ ঘণ্টা যাতায়াত ছিল। অনেক বড়ো বড়ো বয়াতি গান গাইতো। সাতদিন যাবত দিন-রাত জারি, সারি, কবিগান, বিচার গান, বৈঠকি গান হতো। এখন সেই আগের দিন আর নাই। আব্দুল কুদ্দুছ ফকির বলেন, "আমরা জাতে সান্দার। আগে আমরা একতাবদ্ধ ছিলাম। এখন একেক জন একেক জায়গায় চলে গেছে–কেউ বান্দুরা, টাঙ্গাইল, সাটুরিয়া, বেউলায় আছে। আমার জমি-জমা নাই। নিজে বড়ো আয়োজন করতে পারি না। ভক্তবৃন্দ টাকা-পয়সা, চাল-ডাল যা কিছু দেয় তাই দিয়ে সাধ্যমত পূর্ব পুরুষের কাজটা করি। আগে মেলার জন্য যে জায়গা ছিল সেই জায়গা নাই। আগের দিনের মতো কেউ তেমন সহযোগিতাও করেন না। আগে কত অনুষ্ঠান হতো আর আজ রাতে শুধু বৈঠকি গান হবে, তারপর শেষ।"

সেওতা গ্রামে ভেলা ভাসানো উৎসব

মানিকগঞ্জ শহরে সেওতায় মাক্কু মিয়ার বাড়িতে ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠান হয় ১৫.০৯.২০১১ তারিখে। মাক্কু মিয়ার বয়স আনুমানিক ৯০ বছর হবে। তিনি বলেন, "খোয়াজ খিজিরের ভেলা ভাসাই। খোয়াজ খিজিরের দয়ায় আমি বাঁইচা আছি। আমার সাত পুরুষ ধইরা এই অনুষ্ঠান চলছে। আমি এখন অচল হইয়া গেছি। আমার নাতির ঘরের পুতি আবুল কালাম আজাদ এইসব করছে। ঐ যে আসন আছে, দেখবেন একটু পরে চাইল, ডাইল, খাসি, মোরগ, দুধ এইসব নিয়া আসবো। শিরনি করি। বারো/চৌদ্দ ডেক খিচুরি পাকাই। শেষ পর্যন্ত টান পইড়া যায়। ভেলার মধ্যে থাকে মোরগের গোস্ত, খাসির গোস্ত, নারিকেল, খই, দুধ, সাতপদের পিঠা ও কিছু টাকা। আগেরদিনে ভেলায় একটু স্বর্ণও দিতাম। বর্তমানে একরতি স্বর্ণ ধুইয়া একটু পানি দিই।"

কলাগাছের ভেলা/ভেউরা যারা তৈরি করছেন তাদের সঙ্গে কথা হয়। কাজেম ফকির (৭৮) বলেন, সাতটি ছোব থেকে সাতটি বিচা কলাগাছ গোড়া থেকে কাইটা নিয়া একটি চৌকির উপর রাখি। ভালো কইরা ছিলা নিয়া মাঝখানের সাদা অংশ রাখি। তারপর পাঁচহাত লম্বা ও তিনহাত পাশ কলাগাছগুলো একত্র করে দুপাশে লম্বা বাঁশ কেটে ছিব গেঁথে দেই। নাইলনের সুতা দিয়া মজবুত কইরা বাঁইধা দেই। আড়াই হাত উচ্চতা এবং দুই হাত প্রস্থ বিশিষ্ট কলাগাছের একটি ঘর বানাই। বাঁশের শলা, বাতা ও ছিলকা দিয়া বাঁইধা দেই। পরে রঙিন ও সাদা কাগজ দিয়া ছাউনি দেই। কলাগাছের খোলের সাদা অংশ দিয়া পাতলা কইরা বেড়া দেই। তারমধ্যে রঙিন কাগজের ঝালর, ফুল, ঝিলমিল কাগজ ও মালা দিয়া সুন্দর কইরা সাজাইয়া দেই। আমরা সাতটা কলাগাছ দেই। কেউ আবার পাঁচটাও দেয়। ঘর সাজানো টাকার কোনো পরিমাণ নাই। যার যেমন ইচ্ছা সে তেমন খরচ করে। তবে আমাদের ৭০০/৮০০ শত টাকার কমে হবে না। খোয়াজ খিজির জিন্দা পির। কালু গাজী জিন্দা পির। এরা মরে নাই, এই সব পির ফকিরের নামে এসব কইরা থাকি। রাইত ১২.০১ মিনিটে ভেলা/ভেউরা পানিতে নামান চাই-ই চাই।"[১০]

www.pathagar.com

সেওতায় ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগত দর্শনার্থীদের সবাইকে খিচুরি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। রাতে বৈঠকি গান হয়। রাত ১১-৩০ মিনিটের দিকে ইংরেজি বাজনার তালে তালে চারজন পুরুষ ভেলা কাঁধে নিয়ে ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করে ভেলা কালীগঙ্গা নদীতে ভাসানোর জন্য নিয়ে যায়। কলাগাছের ভেউরা নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভেলা ভেসে ভেসে নদীর স্রোতে চলে যায়।

বেতিলা গ্রামে ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠান

২০১১ সালে বেতিলা গ্রামের শাজাহান দেওয়ানের বাড়িতে ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শাজাহান দেওয়ানের মৃত্যুর পর তার ছেলে ইয়াকুব আলী দেওয়ান বর্তমানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন। তাদের পূর্ব পুরুষরা বৈদ্য ও বেদে সম্প্রদায়ের মানুষদের ভেলা ভাসানোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারা বেদে এবং বৈদ্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেই ধারাবাহিকতায় এই ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। ইয়াকুব আলী দেওয়ান বলেন যে, তার বাবা শাজাহান দেওয়ান একজন কবিরাজ ছিলেন। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার খোয়াজ খিজিরের 'ভেউরা ভাসানো' অনুষ্ঠান হতো তাদের বাড়িতে। শাজাহান দেওয়ানের ইন্তেকালের এক বছর আগে থেকে তিনি ইয়াকুব আলী দেওয়ানকে শিক্ষা দেন। বাবার আদেশ মতো সেও এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। খোয়াজ খিজির সম্পর্কে তিনি বলেন, "খোয়াজ খিজির হচ্ছেন পানির একটা মহাজন। সৃষ্টিকর্তা নামের উপরে তিনি একজন অছিলা, তাঁর উছিলায় আমি 'ভেউরা' ভাসাই। মানব দেহ একটা ভেলা বা ভেউরা। আমার বলতে কিছু নেই। একমাত্র তুমিই সব। এই কলাগাছের ভেলা হচ্ছে মানব দেহের প্রতীক। ভাসানোর অর্থ হচ্ছে নিজেকে ভাসানো। গাছেরও জান বা প্রাণ আছে এবং দেহের মালিক জিন্দা আছেন। ভেউরার মালিকও এখনো জিন্দা আছেন। এই বিশ্বাসে তাঁর নামের উপরে ভেউরারূপ দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নদীর কিছুটা স্রোতে ভেলা ভাসিয়ে দেওয়া হয়।"[১১]

ভেলা ভাসানো উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ তাদের বাড়িতে আসে। ক্ষীর, খিচুরি, ডাল, ভাত ও সবজি পাক করা হয়। এদিন মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ। মূল যিনি ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তিনি সেদিন রোজা রাখেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে শিরনি বিতরণ করা হয়। রাত দশটায় ইয়াকুব আলী দেওয়ান তাঁর ছোটো ভাই শওকত দেওয়ান, আক্কাছ দেওয়ান, মোহাম্মদ ফেদু বেপারি, কাজী ছুন্নত, পলাশ দেওয়ান, শেখ মাসুম, আনছার দেওয়ান সহ মোট আটজন ভেলা ভাসিয়ে দেন পার্শ্ববর্তী ধলেশ্বরী নদীতে। ভেলা ভাসানোর পরে বৈঠকি গান ও ভাবগান হয়। ভেলা ভাসানো উপলক্ষে শিষ্য ও ভক্তরা চাল, ডাল, নারকেল, ফল-মূল, টাকা-পয়সা, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি দান করেন। যিনি অনুষ্ঠান আয়োজন করেন তাঁর আর্থিক সঞ্চয় হয়। সংসারে সচ্ছলতা আনার জন্যই মূলত তারা ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠনের আয়োজন করেন। ঝাড়ফুঁক, তাবিজ, গাছ গাছালীর ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করেন। কবিরাজি চিকিৎসার সঙ্গেও ঐ ভেলা ভাসানোর একটি সম্পর্ক রয়েছে।[১২]

www.pathagar.com

১০. মাদার বাঁশ অনুষ্ঠান

এককালে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে মাদার পিরের ব্যাপক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মাদার পিরের আচার অনুষ্ঠান, ভক্তের সংখ্যা অনেকটা সীমিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে গুটিকয়েক জায়গায় এর প্রচলন রয়েছে। মাদার বাঁশ অনুষ্ঠানও মাদার পিরের অনুসারীদের একটি বাৎসরিক উৎসব। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাদার পিরের ভক্তরা পিরকে সম্মান জানিয়ে থাকেন।

২০১২ সালে পৌষ সংক্রান্তিতে মানিকগঞ্জের পুটাইল ইউনিয়নের কৃষ্ণনগর গ্রামে মোহাম্মদ সাইদ আলী দেওয়ানের বাড়িতে মাদার বাঁশ উঠানোর অনুষ্ঠান হয়। মোহাম্মদ সাইদ আলী দেওয়ান মাদার পিরের অনুসারী। বংশ পরম্পরায় সাইদ আলী দেওয়ান মাদার পিরের অনুষ্ঠান পালন করে চলেছেন। তার পূর্বপুরুষরা বলেছেন যে মাদার একজন মস্ত মহান জেন্দা পির (Living Pir)। তার আব্বা জমির দেওয়ান মানুষের চিকিৎসা করেছেন। তার বাবা সাধনালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা করতেন। রোগীদের ফুঁক দিতেন, গায়ে হাত বুলাতেন এবং মাদারের নামে মানত করতে বলতেন। রোগীরা মোরগ, চাল, ডাল, দুধ যার যা ইচ্ছা মানত দিতেন মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার পর।

বাঁশ সংগ্রহ

মাদার বাঁশ সংগ্রহের সময় বাঁশের ঝাড় থেকে এক কোপে বাঁশ কাটা হয়। সেবক শিষ্যরাই মহল্লার বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটেন। জাওয়া এবং মাকলা বাঁশ দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে তেরোটি বাঁশ তোলা হয়। এর আগে ৪১টি বাঁশ উঠানো হতো। লোকসংখ্যা কম, তাই বাঁশের সংখ্যাও কমে গেছে। জাওয়া বাঁশের মূল্য ৫০/- টাকা, মাকলা বাঁশের মূল্য ২৫/- টাকা। বাঁশকে গোসল করিয়ে কাপড় পড়িয়ে হলুদ, তেল, আতর-গোলাপ মাখিয়ে শূন্যের উপর রাখা হয়। ধান-দূর্বা দিয়ে বাঁশকে বরণ করা হয়। এই উপলক্ষে মাদার বাঁশের গান গাওয়া হয়। বাঁশের মাথায় চামর (চুলের তৈরি চুলগুচ্ছ) লাগানো হয়। নির্দিষ্ট বয়কুত এই উপলক্ষে মাদার বাঁশের জারিগান পরিবেশন করেন। বাঁশকে আর মাটিতে রাখা যায় না। যেদিন বাঁশ তোলা হয় সেদিন থেকে তিনদিন বা পাঁচদিন বা সাতদিন বাঁশ মাচার উপর রাখা হয়। যিনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাকে রোজা রাখতে হয়।

মাদার বাঁশ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে বেড়ানো হয়। গানের বয়াতি এই মিছিলে থাকেন। চাল, ডাল, টাকা-পয়সা ও দুধ দেয় গ্রামবাসীরা। সংগৃহীত চাল, ডাল দিয়ে বাঁইশাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে তিন/পাঁচ/সাত দিন চলে। হিন্দু-মুসলমান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই অনুষ্ঠানে আসেন। বাঁশ বিসর্জনের আগের দিন রাতে অগ্নিধামাইল হয়। তেঁতুল গাছের লাকড়ি দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। প্রজ্বলিত আগুনের মধ্যে ভক্তবৃন্দ নৃত্য করেন। নৃত্য করতে করতে আগুনও নিভে যায়। ধামাইলের আগুনে তাপ লাগে না। ঢাক, ঢোল ও সানাই বাজানো হয়।

www.pathagar.com

মাদার বাঁশ বিসর্জনের আগের দিন রাতে একটি অনুষ্ঠান বা মাদারের 'নুট' পালন করা হয়। মাদারের নুট হলো চাউলের গুড়ার সঙ্গে মোরগের সিনার মাংস বিভিন্ন মসলা দিয়ে একত্রিত করে দলা করে আনুষ্ঠানিকভাবে আগুনে পুড়িয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা। সকাল বেলা বাঁশ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। রাতে শিরনির (ক্ষীর, খিচুরি) ব্যবস্থা করা হয়। সারারাত ভাব বৈঠকি, মুর্শিদি গান চলে। ঐদিন রোগীরা বিভিন্ন দূরদূরান্ত এলাকা থেকে আসেন। রাতে তাদের চিকিৎসা করা হয়। যে কোনো একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে (গুপ্তমন্ত্র, যা প্রকাশ করা যায় না) ফুঁ দেওয়া হয়। তাবিজ বা ঔষধ দেয়া হয় না।

বেশির ভাগ রোগী আসেন বিষ ব্যথা, খোঁড়া রোগ, ঘা, নিঃসন্তান ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য। ভালো হওয়ার পর রোগী মাটির তৈরি ঘোড়া মাদার পিরের আসনে রেখে যান। সারা বছর এভাবে মাটির তৈরি ঘোড়া এখানে জমা হয়। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে সারা বছর জমাকৃত ঘোড়া বাঁশ বিসর্জনের দিন নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ঘোড়া হচ্ছে গতির প্রতীক। সুস্থ হওয়ার পর যেহেতু রোগী হাঁটতে পারেন সেহেতু তারা মাটির ঘোড়া মানত করে। মাটির ঘটে দুধ ও পানি রাখা হয়। জ্বাল দিয়ে দুধ খাওয়া যাবে না, কাঁচা দুধ খেতে হবে। ভক্তবৃন্দ এই দুধ পান করে থাকেন। কোনো কোনো রোগী আছে যেমন–হাত পা লুলা হয়ে গেছে, পক্ষাঘাতে অন্ধ হয়ে গেছে এবং পঙ্গু হয়ে গেছে–এসব রোগী সাধারণত ভালো হয় না। রোগ সারলে রোগীর মন যা চায় তাই হাজত (মানত) দিতে হয়। রোগী-ভক্ত সারা বছরই আসেন।[১৩]

তথ্যনির্দেশ

১. কালী প্রসাদ কুণ্ডু , বয়স : ৭২ বৎসর, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৯.১০.২০১১, স্থান : লক্ষ্মী মণ্ডপ

২. বাবুল, বয়স : ৪০ বৎসর, গ্রাম : তরা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৬.১০.২০১১, তথ্য সংগ্রহের স্থান : লক্ষ্মী মণ্ডপ, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৩. কবিতা বণিক, বয়স : ৪০ বৎসর, গ্রাম : পূর্ব দাশড়া, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৬.১০.২০১১, তথ্য সংগ্রহের স্থান : লক্ষ্মী মণ্ডপ, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৪. শংকর চন্দ্র রায়, পেশা : শিক্ষক, গ্রাম : লেমুবাড়ি, ইউনিয়ন : পুটাইল, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ , তারিখ : ২১.০৬.২০১২, স্থান : রথের মেলা, মানিকগঞ্জ সদর

৫. সৈকত, সদস্য–'শতদল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন', বয়স : ২১ বৎসর, থানা : শিবালয়, জেলা : মানিকগঞ্জ

৬. আমিনুর রহমান, (দর্শনার্থী) বয়স ২৫ বৎসর, পেশা : চাকরি, বাগেরহাট, খুলনা, তারিখঃ ০৬.১২.২০১১, স্থান : গড়পাড়া ইমাম বাড়ি; মোঃ সাহাজুদ্দিন, (দর্শনার্থী) বয়স : ৪৫ বৎসর, গ্রাম : মালুটিয়া, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ :

www.pathagar.com

০৬.১২.২০১১, স্থান : গড়পাড়া ইমাম বাড়ি; রুবেল, বয়স : ২৩ বৎসর, গ্রাম : চান্দইর, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৬.১২.২০১১, স্থান : গড়পাড়া ইমাম বাড়ি

৭. ছালেহা বেগম, স্বামী : আবদুর রহিম, গ্রাম : আয়নাপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০১.১২.২০১১, স্থান : নিজ বাড়ি

৮. আম্বিয়া বিবি, স্বামী : ইনাম আলী, বয়স : ৫৪ বৎসর, গ্রাম : দক্ষিণচর আয়নাপুর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০২.১২.২০১২, স্থান : নিজ বাড়ি

৯. নাজমা আক্তার, স্বামী : আব্দুল কুদ্দুছ ফকির, বয়স : ৪৫ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : চর বারইল, ইউনিয়ন : নবগ্রাম, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৫.০৯.২০১১, স্থান : নিজ বাড়ি

১০. মাক্কু মিয়া, বয়স : ৯০, গ্রাম : সেওতা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৫.০৯.২০১১, স্থান : নিজ বাড়ি

১১. ইয়াকুব আলী দেওয়ান, পিতা : শাজাহান দেওয়ান, গ্রাম : বেতিলা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৫.০৯.২০১১, স্থান : নিজ বাড়ি

১২. লালমিয়া দেওয়ান, বয়স : ৫৫ বৎসর, গ্রাম : বেতিলা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৫.০৯.২০১১, স্থান : নিজ বাড়ি

১৩. মোহাম্মদ সাইদ আলী দেওয়ান, পিতা : জমির দেওয়ান, বয়স : ৭৫ বৎসর, শিক্ষা : নিরক্ষর, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : কৃষ্ণনগর, ইউনিয়ন : পুটাইল, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০১২ (পৌষ সংক্রান্তি) স্থান : নিজ বাড়ি

www.pathagar.com

লোকমেলা

মেলা আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। যার অর্থ হলো মিলন। আবহমান কাল থেকে বিভিন্ন বর্ণে-বৈচিত্র্যে শোভামণ্ডিত হয়ে মেলা বয়ে নিয়ে আসে গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। পল্লিজীবনের একঘেয়েমি ও সংসারের একটানা সংগ্রামের মধ্যে গ্রামের মেলা জানায় উৎসবের এক বিশেষ শুভ সংবাদ। মানিকগঞ্জে শত-সহস্র বছরের একটি গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। মানিকগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মেলাকে কেন্দ্র করে যে আনন্দ-উৎসব করতে দেখা যায় তা দেশের অন্য অঞ্চলে খুব কমই চোখে পড়ে। মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামীণ মেলাগুলো মিলিয়ে দেয় মানুষে-মানুষে, আত্মীয়-স্বজনে, জামাই কুটুম্বে, জিনিসে-পণ্যে এবং চিনিয়ে দেয় নিজেদের শিল্প-সংস্কৃতি-সমাজকে। এ জেলার সবগুলো উপজেলাতেই 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' উপলক্ষে অনেকগুলো মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণত কোনো পার্বণ উপলক্ষে বছরের কোনো নির্দিষ্ট দিনে এখানকার মেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১. বৈশাখী মেলা

বাংলা নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে বৈশাখী মেলা। মানিকগঞ্জে সর্বজনীন উৎসবের মধ্যে বৈশাখী মেলা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মেলাগুলো এখানকার মানুষকে সম্মিলিত হতে ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। গ্রামে বৈশাখী মেলা বসে বেশি। মানিকগঞ্জে পুরো বৈশাখ মাসব্যাপী মেলা বসে। তবে সবচেয়ে বড়ো বৈশাখী মেলা বসে মানিকগঞ্জ সদরের বাড়ারিয়া ইউনিয়নের খাবাশপুর-কৃষ্ণপুর গ্রামে। তাছাড়া মানিকগঞ্জ সদরে চর গড়পাড়া, নবগ্রাম, বগজুরি, রাজীবপুর, ঘিওরের বড়টিয়া, ঘিওর-ঋষিপাড়া, পুকুরিয়া, বাঠইমুরি, উভাজানী, সিংজুরী, সিংগাইর জামসা, গেরাদয়া, ইরতা, কলাবাগান, শিবালয়ের নয়াচর, কাশাদহ, কাওয়ার বিল, মহাদেবপুর ও সাটুরিয়া এবং দৌলতপুরের বিভিন্ন জায়গায় ছোটোখাটো বৈশাখী মেলা বসে।

মানিকগঞ্জ জেলার সমস্ত বৈশাখী মেলার উপকরণ প্রায় একই। বৈশাখী মেলায় পাওয়া যায় মূলত বিভিন্ন কৃষিপণ্য এবং কামার-কুমারদের তৈরি জিনিসপত্র। বর্তমান মেলায় বেশি চোখে পড়ে কাঠের তৈরি আসবাবপত্র। শিশুদের জন্য চরকি, বেলুন, লাটিম, ঘুড়ি, টমটম গাড়ি ও বিভিন্ন খেলনা চোখে পড়ে। তবে মাটির তৈরি জিনিস, যেমন খেলনা আগে পাওয়া যেতো, সে সবের বদলে এখন ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা হিসাবে প্লাস্টিকের তৈরি অথবা মোটা সিনথেটিকের খেলনা সামগ্রী চোখে পড়ে বেশি। মাটির তৈরি হাতি, ঘোড়া, পুতুল, হরিণ, মোরগ, ময়না, টিয়ে, মাছ, ফল-মূল এসবের পরিবর্তে এখন মেলায় পাওয়া যাচ্ছে প্লাস্টিকের খেলনা পিস্তল, সিনথেটিকের বল, এরোপ্লেন, সাপ, কুমির, বাঘ, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি। লোকখাদ্যের মধ্যে পাওয়া যায় হাওয়াই মিঠাই, উড়কি-মুড়কি, বিন্নি, বাতাসা, কদমা, মুরালী, চানাচুর, আচার, শরবত,

www.pathagar.com

চটপটি, ঝালমুড়ি, বাদাম, বাঙ্গি, তরমুজ, মিষ্টি, দই, চিতই পিঠাসহ অন্যান্য খাদ্য। বৈশাখী মেলায় যে বায়োস্কোপ ছিল এখন তা আর চোখে পড়ে না। নাগরদোলা কোনো রকমে টিকে আছে।

বৈশাখী মেলার অন্যতম আকর্ষণ পুতুল নাচ সেই আগের মতো আর নেই। আদি পুতুল নাচ এখনকার ছেলে মেয়েরা দেখতে চায় না। তাই সামান্য কিছু নামেমাত্র পুতুল নাচ হচ্ছে। বৈশাখী মেলায় এসব উপকরণ ছাড়াও বহুবিধ উপকরণের সমাবেশ ঘটে। মানুষের মধ্যে বৈশাখী মেলা নিয়ে প্রচুর আগ্রহ রয়েছে।

পালরা বৈশাখী মেলায় মাটির তৈরি সামগ্রী

২. নিমাই চান্দের মেলা

মানিকগঞ্জ জেলা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ভাড়ারিয়া ইউনিয়নের বালিরটেক হাট সংলগ্ন পশ্চিম কৃষ্ণপুর গ্রামে "নিমাই চান্দের মেলা" একটি সুপরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মেলা। এই নিমাই চান্দের মেলা কখন থেকে শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। নিমাই চান বিগ্রহের প্রয়াত পূজক মাখন চন্দ্র রায়ের মতে—"প্রায় আড়াইশত বছর আগে এই মেলার শুরু হয়েছিল। এখানে ছোট্ট একটি চার চালা টিনের ঘরের ভিতর কাঠের তৈরি একটি ভাস্কর্য রয়েছে। এই ভাস্কর্যটির নাম নিমাই চান। এই নিমাই চান বিগ্রহের পূজাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণপুর গ্রামে গড়ে ওঠে নিমাই চান্দের মেলা। এই মেলা আজ সমগ্র মানিকগঞ্জে নিমাই চান্দের মেলা নামে পরিচিত।"

www.pathagar.com

আগের দিনে ৭ দিনব্যাপী নিমাই চান্দের মেলা হতো। এখন হয় ১৫ দিন। ১লা বৈশাখ থেকে ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত প্রতিদিন বিভিন্ন ধর্ম-গোত্রের মানুষ নিমাই চান্দের মেলায় আসে। নিমাই চান্দের ভক্তরা মানত সামগ্রী নিয়ে আসে। যে ক'দিন মেলা হয় সেই কয়েকদিন চারজন ভক্ত মণ্ডপ ঘরের সামনে থাকেন। ভক্তবৃন্দ বাতাসা, ফল, কলা, মিষ্টি, চাল, ডাল, টাকা-পয়সা মানত করেন।

বৈশাখী মেলার সব উপকরণই এখানে পাওয়া যায়। তবে কৃষিপণ্য তুলা একমাত্র এই নিমাই চান্দের মেলাতেই পাওয়া যায়। অন্য কোনো মেলায় তুলা পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই মেলায় প্রচুর পরিমাণে ধনিয়া পাওয়া যায়। মেলা উপলক্ষে কাঠের আসবাবপত্র, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, বাঁশ-বেতের তৈরি ডুলা, চালন, কুলা, বেতের ধামা, কাটা, কাপড়ের তৈরি পাখা, সিলভারের হাঁড়ি-পাতিল প্রভৃতি বিক্রি হয়। লোহার তৈরি দা, খন্তা, কুড়াল, কোদাল, কাঁচিও বিক্রি হয় এ মেলায়। মেলা প্রাঙ্গনে তেজপাতা, পেয়াজ, শুকনা মরিচ, ধনে, চাল, গম-এর দোকান বসে। বিন্নি-বাতাসার দোকান এই মেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য। মেলা উপলক্ষে নাগরদোলা, পুতুলনাচ, যাত্রাপালার আসর বসে।

৩. চান্দইর বুড়ির মেলা

মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে দুই কিলোমিটার উত্তরে প্রচুর বাঁশঝাড় ঘেরা একটি গ্রাম, নাম—চান্দইর। এখানে বসে মানিকগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বুড়ির মেলা। প্রায় দুইশত বছর আগে এই মেলার সূচনা হয়েছিল বলে জানা যায়। এই চান্দইর গ্রামে আনুমানিক দুইশত বছর আগে অন্তিম মালিনী নামে এক হিন্দু মহিলা বাস করতেন। এই মহিলা বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র জানতেন এবং বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারতেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের কবিরাজি চিকিৎসা করতেন। তার বাড়িতে সাধু দরবেশ, পাগল ও মস্তানদেরও আনাগোনা ছিল। অন্তিম মালিনী একশ বছরেরও বেশি কাল জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। বয়স বাড়ার পর এই মহিলা হাতে একটি লাঠি ব্যবহার করতেন। এই লাঠি দিয়ে তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। শেষ দিকে এই মহিলাকে সবাই "বুড়ির মা" বলে ডাকতেন। মানিকগঞ্জ, ধামরাই, ঢাকা, নবাবগঞ্জ, রাজবাড়ী প্রভৃতি এলাকা থেকে জটিল ও কঠিন রোগ মুক্তির জন্য তৎসময়ে তাঁর বাড়িতে লোকজন আসতো। বুড়ি মূলত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে চিকিৎসা করতেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনি বেশি চিকিৎসা করতেন। বুড়ি কালীপূজা করতেন। কালীপূজা উপলক্ষে বহু লোকজন আসতো তাদের মানত সামগ্রী নিয়ে। মানত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল পাঁঠা, কবুতর, হাঁস-মোরগ, চাল, দুধ, ফল-ফলাদি ও নগদ টাকা পয়সাসহ আরো অনেক কিছু।[১]

বুড়ির মৃত্যুর পর তার বাড়িতে জনসমাগম বাড়তে থাকে। সেই সাথে বিভিন্ন দোকানীরা এসে তাদের পণ্য সামগ্রী বিক্রি করতো। এভাবে বুড়ির বাড়িকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে মেলা জমে ওঠে। এই এলাকার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকরা বুড়ির স্মৃতিকে ধরে রাখতে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ শনিবার অথবা মঙ্গলবার বুড়ি মা'র পূজা ও মেলার দিন নির্ধারণ করে দেয়। সেই থেকে অদ্যাবধি প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ শনিবার অথবা মঙ্গলবার চান্দইর বুড়ির পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

বর্তমানে ছোটো একটি টিনের ছাপড়া ঘরে বুড়ির অবয়বে একটি মূর্তি ও একটি হাতের লাঠি তৈরি করে নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে ভক্তবৃন্দ কালীপূজা ও বুড়ি মা'র পূজা দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য বর্তমান চান্দইর মেলা স্থলে ৩টি ভিন্ন জায়গায় এই একই বুড়ির বিগ্রহ বানিয়ে পূজা করা হয়। মেলার দিন ভোর বেলা থেকে অসংখ্য নরনারী হাজির হন বুড়ির বেদীমূলে তাদের মানত সামগ্রী নিয়ে। যারা মানত দিতে আসেন মন্দিরের পাণ্ডা তাদের কপালে একটি সিঁদুরের টিপ দিয়ে দেন। কারণ জানতে চাইলে বললেন এটি তাদের পুরনো রেওয়াজ। আরো জানা যায়, এই সংস্কারের মর্মকথা হলো এতে মা-বুড়ি মানত গ্রহণ ও কবুল করেন বলে তাদের বিশ্বাস। এখানে হিন্দু-মুসলিম সবাই মানত করেন।[২]

এই বুড়ির মেলার ভিন্ন রকমের একটি আকর্ষণ হলো—"নয়ন ভানুর গান"। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সৌখিন কিছু লোক মিলে কেউ মেকি নয়ন ভানুর মা সেজে গোটা মেলা জুড়ে গান করে আর দোকানীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা তুলে। এই টাকা পয়সা দিয়ে তারা মিষ্টি, চানাচুর ইত্যাদি কিনে সবাই একসাথে খায় এবং আনন্দ করে। এই নয়ন ভানুর গানে একজন নিমাইয়ের মা-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তার কোলে থাকে একটি কৃত্রিম শিশু। তাকে নিয়ে মা নৃত্য করে আর শিল্পী ও যন্ত্রী দল বাদ্য-বাজনা বাজায়। তাদের গানটি এরূপ—

"দাঁড়াও দাঁড়াও রে ভানু
দেখি চন্দ্র মুখ
চন্দ্র মুখ দেইখা আমার জুড়াইতো বুক ॥
....
আহারে দারুণ বিধি কলমে নাই কালি
মোর কপালে লেখছে বুঝি
শুধু দুঃখের ডালি ॥"

প্রায় দু'শ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই বুড়ির মেলার অনেক উপকরণ এখন আর নেই। আগে ৪০/৫০টি পাঁঠা উঠতো এবং প্রচুর সিদ্ধ ও পোড়া মিষ্টি আলু পাওয়া যেত। পোড়া ও সিদ্ধ মিষ্টি আলু এই মেলায় ঝাঁকা বোঝাই করে বিক্রি হতো। দূর দূরান্তের মানুষ এই মিষ্টি আলু খেয়েই দুপুরের ক্ষুধা নিবারণ করতো। এছাড়া আগে এই মেলায় বংকুল ফলের মালা পাওয়া যেত, এখন আর পাওয়া যায় না। জামের মতো কালো এক ধরনের মিষ্টি ফল সুতায় গেঁথে মালার মতো করে বিক্রি করা হতো, একেই বলা হতো বংকুল ফলের মালা। মেলায় অন্যান্য সব উপাদান অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। বর্তমানে এই মেলায় চারুপণ্য, কারুপণ্য, শিশুদের প্লাস্টিকের তৈরি হরেক রকমের খেলনা, বাঁশের বাঁশি, ঢোল, বিভিন্ন প্রকার ঘুড়ি পাওয়া যায়। তাছাড়া পুতুলনাচ, নাগরদোলা ইত্যাদির আয়োজনও আছে মেলায়। এই মেলায় খাদ্য দ্রব্যের

www.pathagar.com

মধ্যে স্থান করে নিয়েছে মিষ্টির দোকান। বর্তমানে মেলায় জনসমাগম বাড়লেও মানতকারীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে বলে জানা যায়।[৩]

৪. পুটাইলের লক্ষ্মীপূজার মেলা

হিন্দু সম্প্রদায়ের লক্ষ্মীপূজাকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জ সদর থানার পুটাইল গ্রামে আয়োজিত হয় লক্ষ্মীপূজার মেলা। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের চাঁদের পূর্ণিমা তিথিতে এই মেলা বসে। এই ঐতিহ্যবাহী মেলা প্রায় শতাধিক বছর আগে থেকে নিয়মিত চলে আসছে।

পুটাইল গ্রামের উত্তর পাশের হিজলাইন গ্রামটি ছিল এক সময় সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের আবাসভূমি। আর পুটাইল গ্রামটি ছিল নিম্ন বর্ণের হিন্দু যেমন— জেলে, পাটনা, নাপিত, ধোপা অধ্যুষিত এলাকা। তবে পুটাইলে ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের বসবাস। হিজলাইন গ্রামে সেই হাজার বছর আগে থেকেই শারদীয় দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজাকে কেন্দ্র করে দুটি মেলার আয়োজন করা হতো। কিন্তু পুটাইলের নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের ঐ মেলায় গেলে অমর্যাদা করা হতো। এতে পুটাইলের নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা মনোক্ষুণ্ন হয় এবং তারা পুটাইল গ্রামের জহির উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে তৎসময়কার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ইন্তাজ উদ্দিন বিশ্বাসের কাছে তাদের মনোকষ্টের কথা প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালত রায় ঘোষণা করে যে, হিজলাইনে হবে দুর্গাপূজার মেলা আর পুটাইলে হবে লক্ষ্মীপূজার মেলা। আদালতের রায়ের পর পুটাইলে হিন্দু-মুসলিম সবাই মিলে এই লক্ষ্মীপূজার মেলা শুরু করে।[৪]

বর্তমানে হিজলাইনের সেই হিন্দুদের আধিপত্য আর নেই। কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে হিজলাইনের দুর্গাপূজার মেলা। কিন্তু পুটাইলের লক্ষ্মীপূজার মেলা অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। অতীতে লক্ষ্মীপূজা মেলার সময় আশেপাশের গ্রামগুলোর মধ্যে একটি উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়তো। প্রত্যেক ঘরে ঘরে মেয়ের-জামাইদের নিমন্ত্রণ করা হতো। এতে কন্যা জামাতারা বেজোড় সংখ্যক নারকেল আর আখ বা গেণ্ডারি নিয়ে শ্বশুরালয়ে বেড়াতে আসতো। আত্মীয় স্বজনে বাড়ি ঘর থৈ থৈ করতো। প্রত্যেক বাড়িতে তৈরি হতো নারকেলের নাড়ু, মুড়ি, খই। আমন্ত্রিত কন্যা জামাতাদের উপহার দেয়া হতো ছাতা নতুবা চাদর। পুটাইলে এখনো সেই লক্ষ্মীপূজার মেলা হয়, কিন্তু সেই কন্যা জামাতাদের নিমন্ত্রণ করে নারকেল, আখ, নাড়ু, খই, মুড়ি দিয়ে আপ্যায়নের সংস্কৃতি আর নেই। ঘরে ঘরে উৎসবের এই আয়োজনটি এখন কেবলই অতীত।

লক্ষ্মীপূজার মেলা এখন কেবল মেলা কেন্দ্রিক আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে মেলা আয়োজনের জন্য একটি মেলা কমিটি আছে। কমিটির লোকজনই লোকসংগীত পরিবেশন, লোক যাত্রাপালা, শিশুদের জন্য নাগরদোলা, পুতুল নাচ এসবের আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য মেলার সমস্ত উপকরণ এই মেলায় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

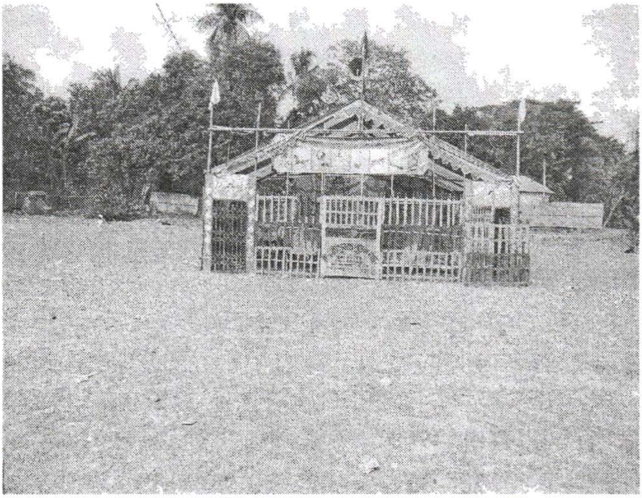

পুটাইলে লক্ষ্মীপূজার মেলায় পুতুল নাচের ঘর

লক্ষ্মীপূজার মেলায় কাঁসার দোকান

৫. মানতা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী গরু-ঘোড়া দৌড় মেলা

পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘোড়-দৌড় ও গরু-দৌড়ের অনেক মেলা বসে। মানিকগঞ্জের সট্যি, বালিয়া বিল, খোস্তা, তেরশ্রী, বাঙালা, কুষ্টিয়া, বইন্যা, মানতা প্রভৃতি অঞ্চলে ঘোড়া দৌড় ও গরু দৌড়ের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মানিকগঞ্জ সদর থানার মানতা গ্রামের ঘোড়া-গরু দৌড়ের মেলা অত্যন্ত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী।

www.pathagar.com

মানিকগঞ্জ শহর থেকে দক্ষিণে কালীগঙ্গা নদীর পশ্চিমে মানতা গ্রাম অবস্থিত। মানতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে রয়েছে বিশাল মাঠ। প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে ৩০শে পৌষ এখানে মেলা বসে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত মেলা চলে। কখন থেকে এই মেলা বসে তা কেউ বলতে পারেন না। তবে ধারণা করা হয়, প্রায় আড়াই শত বছর পূর্ব থেকে এই মানতার মাঠে ঘোড়া, গরু দৌড়ের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর এই মানতার মেলার জন্য সবাই অপেক্ষা করেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকজন মেলায় আসেন। কোনো প্রচারণার প্রয়োজন হয় না। মেলার আগে থেকে প্রত্যেক বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনে ভরে যায়। প্রতি বছর ১লা মাঘ হাজার হাজার শিশু, কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, নর-নারী এই মানতার বিশাল মাঠে বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো ছুটে আসে গরু দৌড় ও ঘোড়-দৌড় দেখতে। সাংসারিক জীবনের নানা ব্যস্ততার মাঝেও মানুষ একটুখানি চিত্ত বিনোদনের জন্য ঐতিহ্যবাহী গরু দৌড় মেলায় ছুটে আসেন। এই গরু দৌড়ের মেলা সবার জন্য বয়ে আনে মধুর আনন্দ ও অনাবিল শান্তি।

মেলা কর্তৃপক্ষ যিনি গরু নিয়ে এসেছেন সেই ব্যক্তির নাম ও গ্রামের নাম মাইকে ঘোষণা করেন। ঘোষণা শুনে গরুর মালিক খুশি হন। এই দৌড়ের জন্য কোনো পুরস্কার দেয়া হয় না। শুধু নাম প্রচার হয়। এতেই গরুর মালিক খুশি হয়। সবাই শুধুমাত্র মনের আনন্দে গরু দৌড়ে অংশ নেয়। মেলায় অংশ নেয়াটা আভিজাত্য, সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক বলে তারা মনে করে। মানতার ঘোড়দৌড় মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব আনুমানিক দুহাজার গজ হবে। পটকার আওয়াজে গরু-ঘোড়া চমকে উঠে এবং মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ে যায়। প্রথমে গরু ও ঘোড়া মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্তের দিকে দৌড়ে যায়। ঘোড়ার ওপর সহিস লাগাম ধরে বসে থাকে। আবার উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে দৌড়ে আসে। দুপাশে হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ে গরু ও ঘোড় দৌড়ের এই দৃশ্য দারুণভাবে উপভোগ করে। অনেক মহিলা বাড়ির ঘরের চালার উপর উঠে এই দৃশ্য উপভোগ করে। যুবক ছেলেরা গাছের উপর বসে এই দৃশ্য উপভোগ করে।

মানতার এই মেলাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের গ্রামগুলোতে শীতের পিঠা-পুলি খাবার ধুম পড়ে যায়। তবে সময়ের বিবর্তনে মানতার মেলার পুরনো দিনের অকৃত্রিম সৌন্দর্য হারিয়ে যেতে বসেছে। মানতা গ্রামের সেই বিশাল মাঠ, গরু, গেরস্থ, মানুষজন সবই আছে কিন্তু গরুদৌড় মেলার যে আকর্ষণ আর আয়োজনের পরিধি তা বহুলাংশে কমে গেছে। বর্তমানে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গরু ও ঘোড়ার সংখ্যা কমে গেছে। আগের দিনে ধনী জমিদার এবং সৌখিন ধনী লোকেরা গরু-ঘোড়া লালন পালন করতেন। রাখাল রাখা হতো গরু ও ঘোড়ার যত্নের জন্য। কিন্তু বর্তমানে জমিদার ও সৌখিন ধনী লোকের প্রচণ্ড অভাব। তাই মেলায় জৌলুস অনেক কমে গেছে। এ প্রসঙ্গে ১লা মাঘ, ১৪১৯ গরু দৌড় প্রতিযোগিতায় আগত সাগর আলী বলেন, "এখন আর দৌড়ের গরু নাই। কারণ আগের মতো সেই পরিবেশ নাই। দৌড়ের গরু তৈরি করতে

www.pathagar.com

হলে তাকে বাইন্ধা রাখা যাবে না, খোলা রাখতে হবে। কিন্তু এখনতো একটা গরু খোলা মাঠে ছাইড়া দেওয়া যায় না। আগে গরু ছাইড়া দিতাম খোলা মাঠে, ইচ্ছা মতো মাঠে যাইয়া খেশারি খাইতো, কিন্তু এখন কি সম্ভব?"[৫]

৩০শে পৌষ, ১৫ই জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মানতা মাঠে বসে ঘোড়া ও গরুদৌড় মেলা। হাজার হাজার মানুষ মেলায় আসে। সেদিন নারী পুরষের একটি মিলন মেলায় পরিণত হয় এই মেলা। মানিকগঞ্জ সদর-এর সট্যি গ্রামের মোন্নাফ মিয়া মাতবর বলদ গরু নিয়ে মেলায় আসেন। গরুটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গরুটির বড়ো বড়ো শিঙ এবং গায়ের রং হলুদ। তাছাড়া ছোটো ছোটো ২০/২৫টি গরুও এসেছিল। খাবাসপুর গ্রামের মধু মিয়া একটি ঘোড়া নিয়ে আসেন। তিনি ময়মনসিংহ থেকে ৬৫,০০০/- টাকা দিয়ে ঘোড়াটি ক্রয় করেছেন বলে জানান। ঘোড়ার গলায় কাপড়ের মালা। ঘোড়ার পিঠের গদি নতুন কাপড় দিয়ে তৈরি। ঘোড়াটি বেশ মোটা-তাজা ও নাদুস-নুদুস এবং খয়েরি রঙের। সাদা রঙের একটি ঘোড়াও সেখানে দেখা যায়। ঘোড়ার মালিকের নাম মন্নু বিশ্বাস। ছেলেটির বয়স মাত্র ২২ বৎসর। সে সাখরাইল গ্রাম থেকে এসেছে। সে নিজে ঘোড়ার সহিসদার। তার পিতা পান্নু বিশ্বাসও একজন সৌখিন ঘোড়সওয়ার ছিলেন। সে বলে যে কেবলমাত্র মনের আনন্দে সে এখানে এসেছে।

মানতার মেলায় নানা ধরনের পণ্যের দোকান বসে। মাটির হাঁড়ি, পাতিল, বাঁশের ডুলা, চালন, কুলা ইত্যাদি বিক্রি হয়। তাছাড়া মিষ্টির দোকান ও কসমেটিকস-এর দোকানও বসে। মেলায় রাতে জারি, কবি ও যাত্রাগানের আসর বসে।

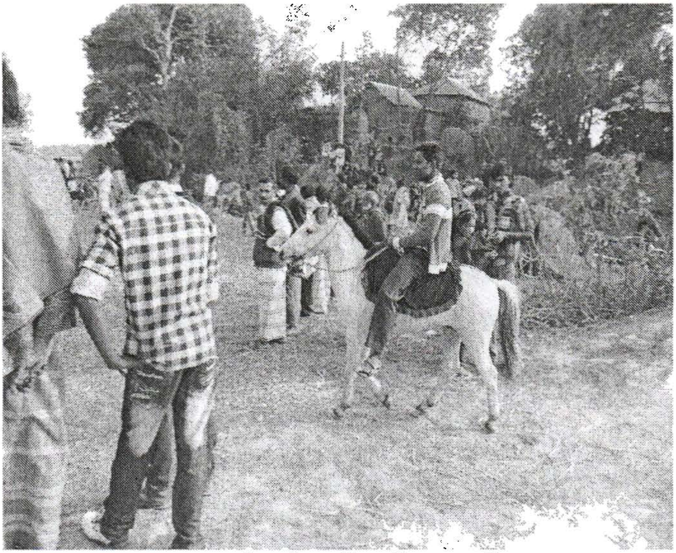

মানতার মেলায় ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতার সুসজ্জিত ঘোড়া

www.pathagar.com

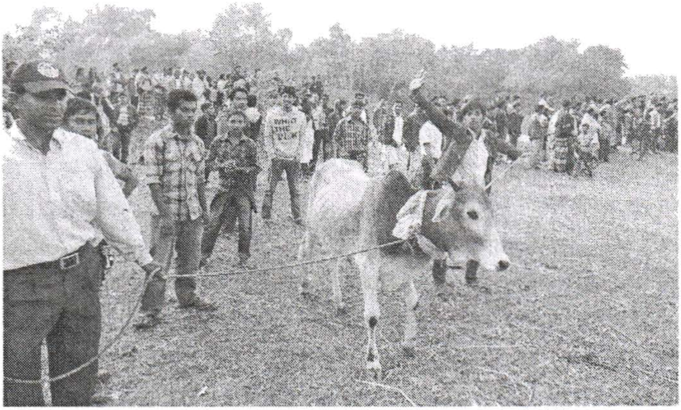

মানতার মেলায় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া গরু ও দর্শনার্থীদের একাংশ

৬. রথের মেলা

আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে রথপূজা এবং রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ শহরের কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে রথের পূজা ও মেলা হয়। এছাড়াও মানিকগঞ্জ জেলার বানিয়াজুরি, হেলাচিয়া, কৈতরাসহ মানিকগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে রথপূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাতদিন যাবত রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রথের মেলা উপলক্ষে মানিকগঞ্জের কালীবাড়িতে নানাবিধ পণ্যের দোকানপাট বসে।

রথের মেলায় বাঁশ ও বেতের সামগ্রী

www.pathagar.com

মেলায় বেশি পাওয়া যায় মাটির তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, সরা, মুড়ি ভাজার আইন বা তইলা, খেলনা ইত্যাদি। এছাড়া আনারস, আম, কলা, কাঁঠাল, নটকনাও বিক্রি হয় মেলায়। চুড়ির দোকানে মেয়েদের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। মাটির হাঁড়ি পাতিলের দোকানেও ভিড় বেশি হয়। বাঁশের তৈরি সাজি, চালনা, কুলা, ডুলা, ঝাঁকা ইত্যাদিও রথের মেলায় বিক্রি হয়ে থাকে। সকল ধর্মের লোকজন মেলায় আগমন করে।

৭. সাহরাইল সিদ্ধাবাড়ির মেলা

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ঢাকা-বালিরটেক সড়কের সিংগাইর থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে সাহরাইল গ্রামে আনুমানিক ৫০০ বছর আগে থেকে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এখানে অবস্থিত শ্রী গুরু বৈষ্ণব গোঁসাই মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের মূল প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শম্ভু চান সিদ্ধা। যে সাধক সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনি হচ্ছেন সিদ্ধা। প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান আসেন বাবা শম্ভু সিদ্ধার বাড়িতে। বর্তমানে মন্দিরের ১১ বিঘা ১১ ডেসিমেল জমি আছে। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় ৩০শে বৈশাখ এবং ২৬শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এই মেলা চলে।

নিম কাঠের তৈরি শিব ঠাকুরকে ২০শে বৈশাখ মন্দিরের নিকটবর্তী পুকুরে স্নান করানো হয় পূজা-অর্চনার মাধ্যমে। ২১শে বৈশাখ ঠাকুর মন্দিরে থাকেন। ২২ ও ২৩শে বৈশাখ পর্যন্ত ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে নগর/গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ঠাকুরকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজা-অর্চনা করা হয়। ঢাকার নবাবগঞ্জ থানা, সিংগাইর থানা, ধামরাই থানার আস্তানায় ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যেসব সন্ন্যাসী আসেন তাদের সেবা করা হয়। এটাকে অতিথি সেবা বলে। এইভাবে ২৯শে বৈশাখ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভক্তের বাড়িতে বাবা বৈষ্ণব গোঁসাই যান এবং কৃপা বর্ষণ করেন। ৩০শে বৈশাখ বিশেষ পূজা-অর্চনায় অসংখ্য ভক্তের সমাবেশ ঘটে। ৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বাবার অনুষ্ঠান চলে। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বিশেষ আম দুধের ভোগ হয়। অসংখ্য ভক্ত বিভিন্ন রকমের ফল, আম-দুধ, তরি-তরকারি নিয়ে আসেন। তাদের আম দুধ দিয়ে সেবা করা হয়। ২৫শে অগ্রহায়ণ নতুন শস্যের ভোগ হয়। চাল, দুধ ও পাটালি গুড়ের মিষ্টান্ন হয়। অসংখ্য ভক্ত আসেন। ডাল, ভাত ও লাবড়া তৈরি হয়, অন্ন প্রসাদ হয়। বাবার আঙিনায় ২৪ প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় এবং লীলা কীর্তন ও ভগবত পাঠ হয়।[৬]

বৈষ্ণব গোঁসাই মন্দির প্রাঙ্গণে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ২০টি গাব গাছ। এই গাব গাছের ছায়াতে বসে সিদ্ধাবাড়ির মেলা। আগের দিনে মিছিলে মিছিলে পূর্ণ হয়ে যেত মেলা প্রাঙ্গণ। বতর্মানে তেমন একটা দেখা যায় না। আগে জারিগান, কবিগান, যাত্রাগান হতো। বর্তমানে পাগল মস্তানরা ইচ্ছামতো গান করে থাকে। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে আসে। মেলার কয়টা দিন তারা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে যার যার আসন করে বসে। তাদের পোশাক হচ্ছে লাল রঙের। কারো কারো গায়ে কালো রঙের পোশাক দেখা যায়। কোনো কোনো পাগলকে নেঙটি পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। ২০শে বৈশাখ থেকে ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত সন্ন্যাসীরা এই

www.pathagar.com

পোশাক পরে থাকেন। ভ্রমণের সময় সন্ন্যাসীরা খালি পায়ে থাকেন। ধুতি, জামা, ওড়না, গেঞ্জিও পরে থাকেন। কারো কারো হাতে থাকে ত্রিশূল, লাঠি এবং তরবারির মতো অস্ত্র। এরা গান বাজনার তালে তালে নাচতে থাকে। গাছের বড়ো বড়ো টুকরো বেদির মধ্যে জ্বালিয়ে রাখা হয়। প্রথম দিন পাটখড়ি, একটু চন্দনকাঠ, ধূপ, বেলপাতা, একটা কলা, দুধ, কয়েকটা তিল এবং তুলসী পাতা মন্ত্র পড়ে আগুন জ্বালানো হয়.। মেলা যতদিন চলবে ততদিন বেদিতেও আগুন জ্বলতে থাকে। অধিকাংশ পাগল ও সাধু সিদ্ধি বা গাঁজা পান করে।

মন্দির সেবায়েত যারা তাদেরকে সন্ন্যাসী বলা হয়। তাদের পোশাক লাল রঙের। তারা রান্না করে, দর্শনার্থীদের সেবা করে, মন্দিরের সামনে বাদ্য বাজায় এবং ভক্তদের মানত গ্রহণ করে। দই, মুড়ি, চিড়া, ছাতু, ফল, গুড়, মিষ্টি দিয়ে সন্ন্যাসী-ভক্তদের সেবা করা হয়। প্রকৃত সন্ন্যাসী খালি পায়ে থাকেন। ১০ দিন তেল, সাবান ব্যবহার করেন না। কিন্তু গোসল করতে পারবেন। মাছ মাংস খাওয়া যাবে না। পেয়াজ, রসুন ব্যবহার করা যাবে না। উল্লেখ্য, সিদ্ধাবাড়ির বর্তমান কর্তা সুনীল সরকার নিজে কুণ্ডতে আগুন জ্বালান।

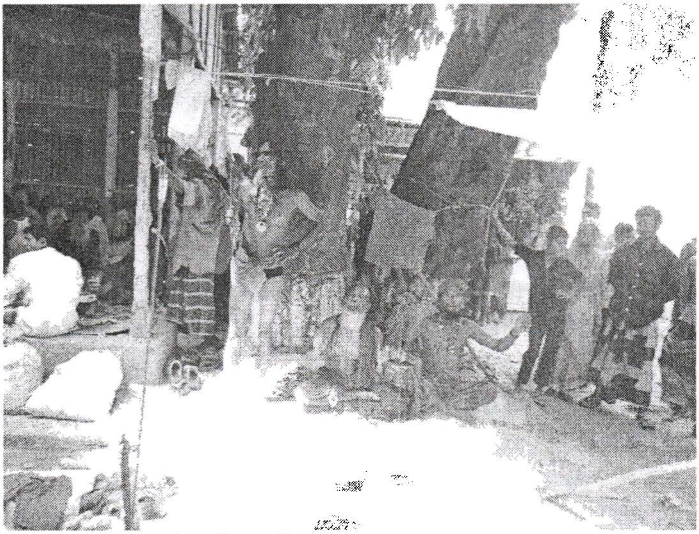

সাহরাইল সিদ্ধাবাড়ির মেলায় আগত পাগল মস্তানেরা

রাতে এখানে শিবের নৃত্য হয়। পূজা পরিচালনা করেন মন্দির পুরোহিত মদন গোস্বামী। ভক্তবৃন্দ পূজা উপলক্ষে নগদ অর্থ প্রদান করেন। তাছাড়া ফল, মিষ্টি, বাতাসা, আগরবাতি, মোমবাতি, ধান, চাল, দুধ ইত্যাদি নিয়ে আসেন। পাকা ধানের ছড়া মন্দিরের সামনে ঝোলানো থাকে। এখানে মহিলারা মন্দিরের বাইরে থাকেন। তারা ভক্তি শ্রদ্ধা করে চলে যান। মন্দিরের ভেতর কেউ প্রবেশ করেন না। উল্লেখ্য, শম্ভু সিদ্ধা ছিলেন কায়স্ত ঘোষ বংশের লোক। তাই এই বংশের লোকই কেবল মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে।[৭]

www.pathagar.com

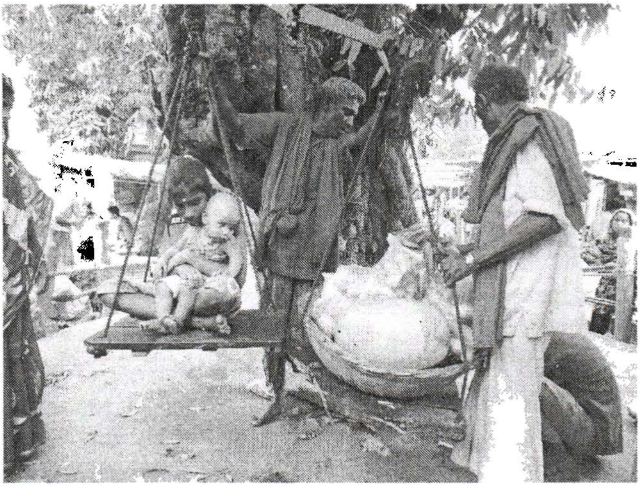

মানত করা ব্যক্তির দেহের সঙ্গে ফলের ওজন করা হচ্ছে

এই মেলা ও পূজা উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ নানাবিধ মানত দ্রব্য নিয়ে আসেন। মন্দিরের বাম পাশে একটি বিরাট গাব গাছ আছে। গাব গাছের গোড়া পাকা করা। এই গাছের মোটা একটা ডালের সঙ্গে দাড়ি বা কাটা, কামান পাল্লা বাঁধা রয়েছে। যারা মানত করেন তারা পাল্লায় ফল ভর্তি ঝাঁকা বসায়। অপর পাল্লায় থাকে যার নামে মানত করা হয়েছে সেই শিশু/ব্যক্তি। পাঁচ/সাত/নয় রকমের ফল দিয়ে যার নামে মানত করা হয়েছে সেই ব্যক্তির দেহের সঙ্গে ফলের ওজন করা হয়। দেহ থেকে ফলের ওজন বেশি হতে হবে। কম হওয়া চলবে না। ফলের ওজন কম হলে দেহের ক্ষতি হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। মা বাবার নিকট সন্তান হচ্ছে ফলতুল্য। তাই মানতের মাধ্যমে সন্তান লাভ করার পরই কেবলমাত্র এই মানত দেয়া হয়।

মানতের দ্রব্য ভক্তবৃন্দ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এগুলো তারা বিক্রি করেন না বলে জানান। তরমুজ, আম, লিচু, কাঁঠাল, কলা, বাঙ্গি, নারিকেল, আনারস, পেয়ারা অর্থাৎ যে ঋতুতে যে ফল পাওয়া যায় তা দিয়ে মানত করা হয়। মন্দিরের ভেতর অসংখ্য মাটির তৈরি ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তারা জানান যে, এগুলো সব মানত করা ঘোড়া। যাদের পায়ে অসুখ হয়, হাটতে পারে না, তারা শম্ভু সিদ্ধার মন্দিরে মাটির তৈরি ঘোড়া মানত করেন। তাদের বিশ্বাস ঘোড়া হচ্ছে দ্রুতগামী প্রাণী। তারা যেন রোগমুক্ত হয়ে ঘোড়ার মতো দৌড়াতে পারেন এই বিশ্বাসে তারা মাটির ঘোড়া মানত করেন।

৮. রাস মেলা

রাস মেলা হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড়ো উৎসব। কথিত আছে দাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদের নিয়ে রাস লীলা করতেন। শ্রীমতি রাধারানিকে শ্রীকৃষ্ণের

www.pathagar.com

বাম পাশে একটি দোলনার ওপর বসাতেন। শ্রীকৃষ্ণ ডান পাশে বসতেন। চন্দ্রা, চপলা, বৃন্দা, বিশখা প্রমুখ সখি একে অপরের হাত ধরাধরি করে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানির চতুর্দিকে দোলনা ধরে ঘুরত। সেই তখন থেকেই হিন্দু ধর্মে রাস ঘুরানো উৎসব চলে আসছে।

মানিকগঞ্জের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রাচীন মেলা হলো বেতিলার রাস মেলা। আগের মতো জমজমাট ভাবে না হলেও বেতিলায় বর্তমানে পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাস পূজা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও গোঁসাইদের মধ্যে হয়ে থাকে। মানিকগঞ্জ জেলার বেতিলায় দুটি গোঁসাই পরিবার আছে। উত্তর গোঁসাই বাড়ি ও দক্ষিণ গোঁসাই বাড়ি। ৯০৮ বঙ্গাব্দে বেতিলার গোঁসাইরা এই গ্রামে বসতি গড়েন। সেই থেকেই এই রাস মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বেতিলার গোঁসাইরাই এই মেলার প্রবর্তক, আয়োজক ও রক্ষক। প্রতি বছর রাস পূর্ণিমা তিথিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আগের দিনে নহবত বাজনা, ইংরেজি বাজনা এবং ঢাকঢোল বাজনা থাকতো। দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী আসতো এই বাড়িতে। ডিঙি নৌকার মধ্যে খিচুরি রান্না করে রাখা হতো এবং ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। ২২শে কার্তিক/ ৯ই নভেম্বর ২০১১ তারিখে বেতিলায় রাস মেলার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে বেতিলার দক্ষিণ গোঁসাই বাড়িতে কামু গোঁসাইর ছেলে বাবুল গোঁসাই রাস লীলা বা রাস ঘুরানোর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে রয়েছে চারচালা টিনের একটি ঘর। তার পূর্বপাশে পুতুল নাচের ঘর। এখানে পুতুল নাচ হয়ে থাকে।

বেতিলার রাস মেলায় মিষ্টি তৈরি হচ্ছে

বাড়ির দক্ষিণ দিকে দূর্বাঘাসে ঢাকা বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠে রাসের মেলা বসে। মেলা উপলক্ষে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, নাম কীর্তন, পদাবলী কীর্তন প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। মেলায় যাত্রাগান, সার্কাস, পুতুল নাচ প্রভৃতি চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি চলে সপ্তাহব্যাপী। শিশুদের অনেক খেলনা সামগ্রী, মেয়েদের সাজসজ্জার সামগ্রী এবং নানা ধরনের মিষ্টি যেমন রসগোল্লা, আমির্তি, জিলাপি, ছানার আমির্তি, বালুশাই, চমচম

www.pathagar.com

প্রভৃতি এই মেলার প্রধান আকর্ষণ। মেলায় মাটির হাঁড়ি, সিলভার, পিতল, কাঁসার বিভিন্ন থালা, ঘটি-বাটির দোকানও থাকে। এছাড়াও বাঁশ ও কাঠের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সোয়াজ (ধনে) ও তেজপাতাও এ মেলায় কিনতে পাওয়া যায়। বাজারের বাইরে বিরাট হলে যাত্রাগানের আসর বসে।

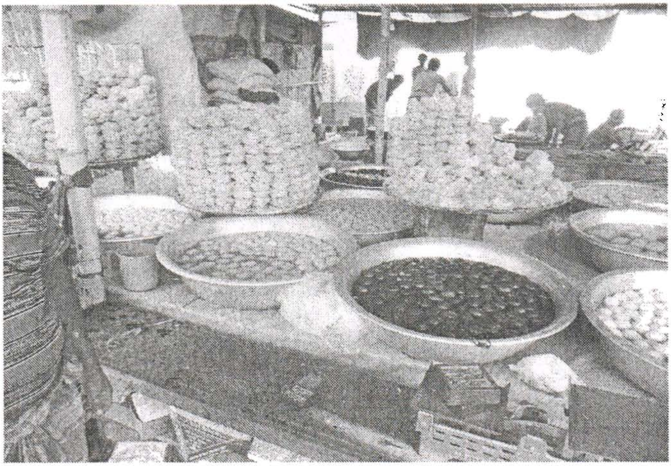

বেতিলা রাস মেলায় মিষ্টির দোকান

৯. দিব্যচাঁন্দের মেলা

সিংগাইর উপজেলার সানাইল গ্রামটি তিনভাগে বিভক্ত। সর্বদক্ষিণে কতিপয় মুসলমান পরিবার, মাঝে হিন্দু পাড়া এবং উত্তর ও পূর্ব দিকে রয়েছে মুসলমান পাড়া। এই গ্রামে কোনো বর্ণ হিন্দুর বসতি নেই, সকলেই নমঃশূদ্র। সানাইল গ্রামের নমঃশূদ্র পরিবারের এক বাড়িতে আনুমানিক ১৮৪০ সালে দিব্যচাঁন সাধ্বীর জন্ম। তাঁর বিয়ে হয়েছিল পার্শ্ববর্তী স্বরূপপুর গ্রামে। দিব্যচাঁন একজন বাকসিদ্ধ সাধিকা ছিলেন। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তি থেকে তাঁর মেলা শুরু হয়ে ২রা মাঘ পর্যন্ত চলে।

১০. দোলের মেলা (দোল পূজার মেলা)

দোল পূজাকে কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে দোলের মেলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় জেলার অনেক জায়গায় দিনব্যাপী দোলের মেলা বসতো। এই মেলায় বেশি পাওয়া যায় বিন্নি ও চিনির তৈরি খেলনা হাতি, ঘোড়া, পাতা ইত্যাদি। সেই দোল পূজা ভিত্তিক মেলাগুলো বর্তমানেও হয়। বর্তমানে মানিকগঞ্জে দোল পূজার সবচেয়ে বড়ো মেলা বসে মানিকগঞ্জ সদরের হাটিপাড়া গ্রামে। এখানে পক্ষকালব্যাপী মেলা চলে। বিন্নি, মিষ্টি, কাঠের তৈরি জিনিসপত্র এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। তাছাড়া মানিকগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব দাশড়া রায় পাড়া, ঘিওরের নারচী, ঘিওর সদর এবং মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বেতিলা গ্রামে দোলের মেলা বসে।

www.pathagar.com

লেমুবাড়ি হাইস্কুল মাঠে দোলের মেলায় মৃৎশিল্পের দোকান

১১. জসমের মা'র মেলা

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার নালি ইউনিয়নের কুন্দরিয়া গ্রামের পূর্ব প্রান্তে ফসলী মাঠের মাঝখানে রয়েছে একটি হিজল গাছ। এই হিজল গাছকে কেন্দ্র করে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে (বর্তমান গ্রন্থের 'লোকসাহিত্য'-এর 'কিংবদন্তি' দ্রষ্টব্য)। ১৯৮৪ সালে দিঘুলিয়া গ্রামের মুসলেম উদ্দিনের পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী সুফিয়া বেগম স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পরেন হিজল গাছে ভোগ দিতে হবে। এরপর হিজল গাছের তলায় গিয়ে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে ভক্তি দিয়ে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এরপর তিনি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে হিজল তলায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দুই বছর ভোগ দেন। পরবর্তীতে সুস্থ হওয়ার পর আর ঢাক ঢোল না নিয়ে শুধু ভোগ দেন আর ছোটো করে শিরনি করতেন। এখন সুফিয়া বেগম প্রতি বছর ২১ শে চৈত্র শিরনি ও মেলার আয়োজন করেন। এই মাঠে ঐ হিজলতলায় দূরদূরান্তের মানুষ এসে হাজির হয়। অত্র এলাকায় এই মেলা "জসমের মা'র মেলা" নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, সুফিয়া বেগমের বড়ো ছেলের নাম জসীম—এই জসীম সবার কাছে জসম নামে পরিচিত। সুফিয়া বেগমের নামটি উচ্চারিত না হয়ে এটি এখন "জসমের মা'র মেলা" হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

জসমের মা'র মেলা উপলক্ষে বহু নর-নারী তাদের মানত সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়। ২১ শে চৈত্র শিরনি হয় এবং রাত্রে ভাববৈঠকি গান হয়। ১৪১৮ বঙ্গাব্দের ২২শে চৈত্র মেলা পরিদর্শনে যান বর্তমান গ্রন্থের তথ্য সংগ্রাহক মোঃ মোশাররফ হোসেন। তিনি মেলায় আগত দর্শনার্থীদের সাথে কথা বলেন। মেলায় কেন এসেছেন জানতে

www.pathagar.com

চাইলে বাঠইমুরি গ্রামের কুব্বাত আলী (৪৫) বললেন, "দেখতে আইছি, ভালো লাগে। দুই ঘণ্টা হয় আইছি, যাইতে মন চায় না।" সানাই গ্রামের মতিমান বেগম (৭০) এসেছেন নাতবউকে নিয়ে। তিনি বললেন, "নাতি বউয়ের বাচ্চা অইতো না, মানত করছিলাম—বাচ্চা আইছে, মানসী হাইরা গেলাম।" শিবালয় থেকে ফজলুল হক (৪৫) এসেছেন দুধ, মোরগ ও সন্দেশ নিয়ে। তিনি বললেন, "বড়ো বিপদে আছি, এই ছোটো মেয়ের পেটে ব্যথা, স্ত্রী রাতে নানা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে, সাপ কুকুর স্বপ্ন দেখে, ঘুমাইতে পারে না। বর্তমানে অনেক ভালো অইছে। তাই মানতি দিয়ে গেলাম।" শিবালয় কেশব ফুটির মুনছের আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাক বললেন—"আল্লাহ পাক এক এক জায়গায় বিশেষ আকর্ষণ শক্তি দান করেছে, সেই শক্তির টানে মানুষ সেখানে যায়। এই হিজল গাছ হইতেছে একটা উপলক্ষ মাত্র।"

১২. মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করা এবং তাদের দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনাবোধে উজ্জীবিত করে সুস্থ ধারার সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হোক আজকের প্রজন্ম" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর ১৩ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ হানাদার মুক্ত দিবসে মানিকগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা যাত্রা শুরু করে। জেলা প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিজয় মেলা উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক অফিসের পশ্চিম পাশের মাঠে পক্ষকালব্যাপী মানিকগঞ্জ বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বরের ১৩ তারিখ থেকে শুরু করে মেলা চলে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বিজয় মেলা আজ আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। রাজনৈতিক দলসমূহের মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও বিজয় মেলা সফল ও সার্থক করে তুলতে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ অনন্য ও বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই বিজয় মেলা রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সংস্কৃতি কর্মীসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে এক মঞ্চে মিলিত হবার দুর্লভ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই মেলায় প্রতিদিন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক ও বিভিন্ন পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে প্রতিদিন তুলে ধরা হয় জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি গান সহ লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান। এই মেলায় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক, কবিতা ও গান প্রতিদিন পরিবেশিত হয়। তাছাড়া মেলায় দাড়িয়াবান্ধা, কাবাডি, লাঠি খেলা সহ অন্যান্য লোক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

মানিকগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা শুধু মেলা নয়, এই মেলা সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার মহামিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। এ মেলার উৎসব এখন অনেক বিস্তৃত, বহুমাত্রিক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ধারণ করার জন্য প্রতি বছর কৃত্রিম বধ্যভূমি প্রদর্শিত হয় মেলায় এবং তা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে

www.pathagar.com

আকর্ষণ করে। বিজয় মেলার প্রবেশ গেটের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও গোটা বাংলার ঐতিহাসিক পটভূমির দৃশ্য তুলে ধরা হয়, যা আগত দর্শকদের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব ইতিহাস জানতে সহায়ক হয়ে থাকে। বিজয় মেলায় প্রতিদিন রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন সহ প্রতিদিনই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বিজয় মেলায় মূল আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয় সার্কাস, পুতুল নাচ, নাগরদোলা, ঘোড়ায় চড়া সহ নানা আয়োজন। বাহারী খাদ্য দ্রব্যের দোকান, কুটির শিল্প, স্টেশনারি, মনিহারি, কাঠ, লোহা, পিতল, কাঁসা, ক্রকারিজ, কাপড়-চোপড়, শীতবস্ত্র, জুতা, শিশুর খেলনা, বিন্নি, বাতাসা, নিমকি, জিলাপি, মিষ্টি, চটপটি, হালিম, পিঠাপুলিসহ অনেক ভ্রাম্যমাণ ক্ষুদে ব্যবসায়ী এ মেলায় অংশ নিয়ে থাকেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বিজয় মেলা মানিকগঞ্জের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই মেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, গ্রামীণ অর্থনীতি, নির্মল চিত্তবিনোদন সহ বহু মাত্রিক উপাদান। বর্তমানে মানিকগঞ্জের গ্রামে ও শহরে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ শহর ছাড়াও বিজয় মেলা উদ্‌যাপন পরিষদ-এর উদ্যোগে প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সিংগাইরে বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয় মেলায় নাগরদোলা (গোপালপুর, মানিকগঞ্জ)

১৩. সাধুর মেলা

আজিমপুরের সাধুর মেলা প্রচলন করেন বাউল শিল্পী রশিদ সরকার। এ মেলার বয়স খুব একটা বেশিদিন নয়। বিভিন্ন শিল্পীদের বাউল গান পরিবেশন এ মেলার মূল আকর্ষণ। রশিদ সরকারের তিরোধানের পর এ মেলার ব্যাপ্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

১৪. মধুর মেলা

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ১ ও ২ তারিখে জয়মন্টপের প্রখ্যাত বাউল শিল্পী মমতাজ বেগম আয়োজন করেন তার পিতা মধু বয়াতির নামে মধুর মেলা। এ মেলার মূল আকর্ষণ পালা ও বাউল গান।

১৫. অন্যান্য মেলা

এছাড়াও মানিকগঞ্জ জেলায় অন্যান্য কিছু মেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মানিকগঞ্জের বেউথা ঘাটে অনুষ্ঠিত হয় বারুণী মেলা। শিব চতুর্দশী তিথিতে শহরের শিববাড়িতে বসে শিব চতুর্দশীর মেলা। এই মেলা থেকেই এলাকাটির নামকরণ শিববাড়ি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মেলার স্থায়িত্বকাল দুই দিন। চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে গড়পাড়ার চান্দইর গ্রামে একটি মেলা বসে; চলে দুই দিন ব্যাপী। একই তিথিতে উপজেলার আটিগ্রামে বসে বুড়ির মেলা। এই মেলার স্থায়িত্বকালও দুই দিন। বৈশাখের শেষ শনিবার মানিকগঞ্জের পটল বিলে বসে বুড়ির মেলা; থাকে তিন দিন।

তথ্যনির্দেশ

১. বিশ্বনাথ মণ্ডল, পিতা : গদাধর মণ্ডল, গ্রাম : উকিয়ারা, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০১২, স্থান : চান্দইর বুড়ির মেলা

২. আনন্দ সূত্রধর, বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম : মান্ধাতা, উপজেলা : দৌলতপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০১২, স্থান : চান্দইর বুড়ির মেলা; বাবুর আলী, বয়স : ৬৫ বৎসর, গ্রাম : সিংজুরি, উপজেলা : ঘিওর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০১২, স্থান : চান্দইর বুড়ির মেলা; সুকুমার গুপ্ত, বয়স : ৬০ বৎসর, গ্রাম : দাশড়া, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০১২, স্থান : চান্দইর বুড়ির মেলা

৩. হরেন্দ্র চন্দ্র মন্ডল, বয়স : ১০০ বৎসর, গ্রাম : চান্দইর, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০১২, স্থান : চান্দইর বুড়ির মেলা; অনিল চন্দ্র শর্মা, বয়সঃ ৬০ বৎসর, পেশা : কাঠ মিস্ত্রী, গ্রাম : মত্ত, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০১২, স্থান : চান্দইর বুড়ির মেলা

৪. নেয়াল, বয়স : ৬০ বৎসর, গ্রাম : পুটাইল, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ; মনোয়ার হোসেন, বয়স : ৬৫ বৎসর, গ্রাম : পুটাইল, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৫. সাগর আলী, পিতা : মোহাম্মদ নাসিম মিয়া, গ্রাম : সটি্য, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৪.০১.২০১৩, স্থান : মানতার মেলা

৬. সুনীল সরকার, পেশা : বৈষ্ণব গোঁসাই মন্দিরের সেবায়েত, তারিখ : ১৫.০৫.২০১২, স্থানঃ বৈষ্ণব গোঁসাই মন্দির, গ্রাম : সাহরাইল, উপজেলা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৭. মদন গোঁসাই, পেশা : বৈষ্ণব গোঁসাই মন্দিরের পুরোহিত, তারিখ : ১৫.০৫.২০১২, স্থান : বৈষ্ণব গোঁসাই মন্দির, গ্রাম : সাহরাইল উপজেলা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ

www.pathagar.com

লোকাচার

মানিকগঞ্জ ধানের দেশ, গানের দেশ, সুফি সাধকদের দেশ। মানিকগঞ্জে রয়েছে উৎসব, মেলা ও পূজা-পার্বণের এক মহান ঐতিহ্য। পূজা, উৎসব উপলক্ষে আচার-অনুষ্ঠান পালন মানুষকে একত্রিত করে, মানুষের একঘেয়েমি দূর করে ও চিত্ত বিনোদনের সৃষ্টি করে। আচার-অনুষ্ঠান পবিত্রতার প্রতীক যা মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্য সৃষ্টি করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পূজা, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান অসাম্প্রদায়িক চিন্তা সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। এই অঞ্চলেও বিভিন্ন লোকাচার প্রচলিত রয়েছে এবং সেগুলো আজো গ্রামাঞ্চলে পালন করা হয়ে থাকে। এসব লোকাচারের সাথে মিশে আছে মানুষের শত শত বছরের বিশ্বাস।

১. লক্ষ্মীপূজা

লক্ষ্মী দেবী হচ্ছেন আর্থিক উন্নতির প্রতীক। লক্ষ্মীপূজা একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণিমার দিন করা হয়। লক্ষ্মীপূজার দিন চালের গুঁড়া পানিতে গুলিয়ে মেয়েরা বাড়ির উঠানে আলপনা আঁকে। তাদের বিশ্বাস মা লক্ষ্মী এই আলপনার পথ ধরে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন পঞ্চশস্য। পঞ্চশস্য হচ্ছে ধান, গম, কলাই, মসুর ও টাকা। মানিকগঞ্জ শহরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বাজার খোলা মণ্ডব ও কালীখোলা মন্দিরে প্রতিমা দিয়ে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

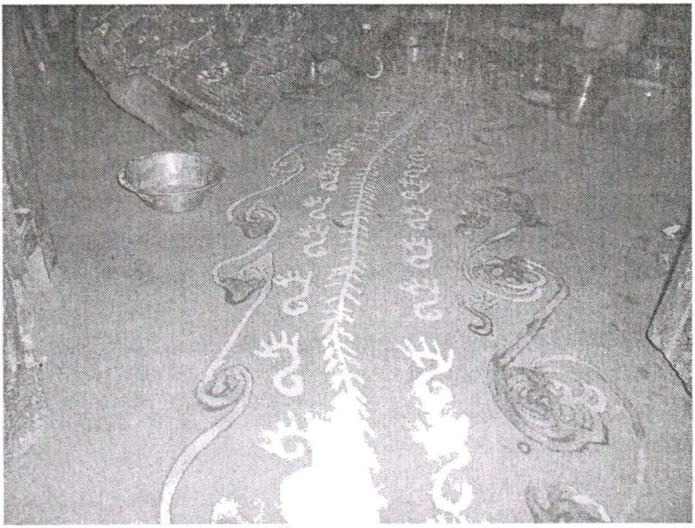

লক্ষ্মী পূজার আলপনা

লক্ষ্মীপূজা দু'ভাবেই করা যায়— প্রতিমা দিয়ে এবং লক্ষ্মীর সরা দিয়ে। সানবান্ধা পালবাড়ি ও পালরা পালবাড়িতে পূজা উপলক্ষে কুমাররা লক্ষ্মীর সরা তৈরি করে থাকেন। মাটির সরার উপরে লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতিমূর্তি অঙ্কন করা হয়। তাছাড়া সরার উপর ধানের ছড়া, কাঁচা টাকা এবং লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা অঙ্কিত থাকে। এক একটি লক্ষ্মীর সরা বাজারে প্রায় ২০/২৫ টাকায় বিক্রি হয়।

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে কলাগাছের খোল দিয়ে পাঁচটি ক্ষুদ্র ডোল বানানো হয়। পাঁচটি ডোলে পাঁচটি শস্য রাখা হয় এবং ডোলগুলো বড়ো ঘরের মাচার সামনে আসন বা চৌকির উপর রাখা হয়। আসনের উপর লক্ষ্মীর সরা উপুড় করে রাখা হয়। পুরোহিত পূজা পরিচালনা করেন। তিনি মন্ত্র পাঠ করে পূজা শুরু করেন। লক্ষ্মীর সরার উপর ফুল, বেলপাতা, ধান, দূর্বা, তুলসী পাতা নিবেদন করেন। লক্ষ্মীপূজার ভোগে তিন চার রকম নাড়ু : নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, ঢেপের (শাপলা) নাড়ু, খইয়ের মোয়া, পাকানো খই, দুধ, চিনি, মিষ্টান্ন ও সন্দেশ ইত্যাদি থাকে। তাছাড়া থাকে পঞ্চফলের ভোগ—শসা, পেঁপে, কুসুল/গেন্ডারি, জাম্বুরা, আনারস। পূজা শেষে ভোগ প্রসাদ হিসেবে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মানিকগঞ্জের লেমুবাড়ি গ্রামের মনীন্দ্র শীলের বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানান আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তারা দুর্গাপূজা করতে পারেন না কিন্তু বংশানুক্রমিক ভাবে লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। তবে তারা ঠাকুর বানিয়ে পূজা করেন না, লক্ষ্মীর সরা দিয়ে পূজা করেন। লেমুবাড়ির হাট থেকে তারা লক্ষ্মীর সরা কিনে আনেন। তাঁর স্ত্রী জানান পূজা করার মানে হলো ঘরের লক্ষ্মীকে পূজা করা। তাই তারা লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা একসঙ্গে করেন। এই জন্য প্রসাদও দু'রকম হয়ে থাকে।[১]

কালীগঙ্গা নদীর পশ্চিম পাড়ে পুটাইল গ্রামের নিমাই রাজবংশীর বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীর প্রতিমা দিয়ে। নারকেল পাতা দিয়ে তিনি একটি অস্থায়ী মণ্ডবঘর তৈরি করেন। এখানে লক্ষ্মীর প্রতিমা রেখে পূজার কাজ সম্পন্ন করেন। নিমাই রাজবংশী জানান তিনি তিন বছর যাবত প্রতিমা দিয়ে এই পূজা করছেন। ঢাকি, ঠাকুর ও ভোগের সামগ্রী বা উপকরণ বাবদ এ বছর (২০১১) ব্যয় হয়েছে ১৫/১৬ হাজার টাকা। তিনি আনন্দের সাথেই লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করে থাকেন। নিমাই-এর স্ত্রী বাসনা দেবী জানান তাদের সংসারের অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল না। তবে বর্তমানে মা লক্ষ্মীর কৃপায় একটু ভালো হয়েছে। তাই তিন বছর ধরে তারা প্রতিমা দিয়েই পূজা করছেন।

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে কালীগঙ্গা নদীর পশ্চিম পাড়ে খেয়াঘাটে লক্ষ্মীপূজার মেলা বসে। এ মেলা ৭/৮ দিন ধরে চলে। এখানে দিনে কবিগান, জারিগান, বিচারগান হয় এবং রাতে লোকযাত্রা হয়।

২. কাত্যায়নী পূজা

বারো মাসে তেরো পূজার দেশ বাংলাদেশ। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে যে পূজা হয় তা হচ্ছে কাত্যায়নী পূজা। কাত্যায়নী পূজা একটি বারোয়ারী পূজা। মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার তিল্লি ইউনিয়নের তিল্লি গ্রামের মনিদাপাড়ায় ১৪১৮ বঙ্গাব্দে ১২ই

www.pathagar.com

অগ্রহায়ণ থেকে ১৭ই অগ্রহায়ণ–এই ছয় দিনব্যাপী কাত্যায়নী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ বছর যাবত এই পূজা চলে আসছে। এই গ্রামে মাত্র পঁচিশ ঘর মুনি ঋষিরা বাস করে। সবাই মিলে এই পূজার আয়োজন করে। পূজার অন্যতম আয়োজক নরেশচন্দ্র মনি দাস নিজের জমি লিখে দিয়েছেন মন্দিরের জন্য। তিনি নিজে চামড়া, ঢাক-ঢোল ও খোল-চামড়া দিয়ে ছাউনি দেয়ার কাজ করেন। বিষ্ণু মনি দাস পূজা কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন গোবিন্দ মনি দাস। গড়পাড়ার গোপাল চক্রবর্তী পূজার পুরোহিত। মূর্তি বানিয়েছেন পাষাণ। তাঁর বাড়ি পায়সানা। তিনি জানান, প্রতিমা বানানোর জন্য এ বছর (২০১১) দেউরি চার হাজার টাকা সম্মানী নিয়েছেন এবং পুরোহিত সম্মানী নিয়েছেন তিন হাজার টাকা। এই পূজা আয়োজনের জন্য মোট ব্যয় হয়েছে পঁচাশি হাজার টাকা।[২]

কাত্যায়নী পূজার প্রতিমা অবিকল দুর্গা দেবীর মতো। দুর্গা দেবীর মতো এ দেবীরও দশটি হাত। তিনি দশ হাতে দশটি অস্ত্র নিয়ে সিংহের ওপর পা রেখে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তাঁর দু'পাশে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁকে সাহায্য করছেন। তবে তাদের ভিন্ন নাম কেন এই প্রশ্নের উত্তরে পুরোহিত জানান, মা দুর্গা হচ্ছেন আদ্যা শক্তি। তিনি এক এক সময় এক এক নাম ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। এইজন্য এক এক নামে তাকে পূজা করা হয়ে থাকে। শুধু মন্ত্র পাঠ করার সময় মা কাত্যায়নী এবং মা দুর্গা বলে ফুল-জল দেয়া হয়।[৩]

পূজার মন্দির ঘরটি টিনের তৈরি। সামনে দুয়ার বা উঠান। মন্দিরের মাঝখানে মূর্তি রাখা হয়েছে। সুন্দর পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গৌরদাস ও শ্রীদাম দাস নামক দুজন পূজারিকে দুটি ধূপের সরা বা ধূপতি হাতে নিয়ে নেচে নেচে ঢাকের তালে তালে আরতি দিতে দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক পূজা দেখতে আসেন। হিন্দু মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশি। রং বেরঙের শাড়ি, গয়না পরে মেয়েরা ভক্তি দেন এবং উলুধ্বনি দিয়ে পূজাকে আরো সজীব করে তোলেন। রাত বলে মুসলমান মেয়েরা কম আসেন। পূজার প্রসাদ দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়।

৩. দোল পূজা

দাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রাধারানি বৃন্দাবনে গাছের শাখায় রশি বেঁধে দোলনায় দুলতেন এবং সখিরা তাই দেখে আনন্দ উপভোগ করত। কথিত আছে যে, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাতে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে দোলনায় দোল খেলত। তখন থেকেই দোল পূজা চালু হয়। বর্তমানেও দোল পূজা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়।

মানিকগঞ্জে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের যেসব ধর্মাচারভিত্তিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার মধ্যে দোল পূজার অনুষ্ঠান অন্যতম। এক সময় মানিকগঞ্জের গ্রামগঞ্জে ব্যাপকভাবে দোল পূজা অনুষ্ঠিত হতো। ফাল্গুন মাস এলেই দোল পূজার আয়োজনের জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে থাকতো। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে এই দোল পূজা হয়ে থাকে। এই দোল পূজার আয়োজন সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পারিবারিকভাবে করে থাকে। দোল পূজা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মত আছে। তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক

www.pathagar.com

সাধনার ক্ষেত্রে ৩টি স্তর আছে, যেমন—'সতঃ', 'রজঃ', 'তমঃ'। এই তিন স্তরের মধ্যে 'সতঃ' হচ্ছে শীর্ষ স্তর, আর এই 'সতঃ' স্তরের লোকেরাই কেবল দোল-পূজার অধিকারী হয়। কিন্তু বাস্তবে অনেকেই দোল পূজা করছে। মানিকগঞ্জের মিতরা, বেতিলা, পালরা, পূর্ব দাড়শা, বেউথাসহ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বর্তমানে দোল পূজা হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা যেমন হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ বড়ো পূজা তেমনি দোল পূজাও তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ।[৪]

দোল পূজার আচার অনুষ্ঠান

দোল পূজার আগের দিন রাত আটটায় কিছু ছন, পাটখড়ি, কলাপাতা, নাড়া, বিচালি, খড়, বাঁশের কঞ্চি প্রভৃতি উপাদান দিয়ে উন্মুক্ত স্থানে ছোট্ট ঘর নির্মাণ করা হয়। এই ছোট্ট ঘরটিকে 'ডেরা-কুড়া' বলা হয়। এই ঘরের ভিতর গোপাল কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করে তার চরণে আবির রং, মৌসুমী ফল, যেমন—বাঙ্গি, তরমুজ, অন্যান্য ফল-ফলাদি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। ঐদিন আবার সন্ধ্যা বেলায় ঐ ডেরা-কুড়াটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ডেরার মধ্যে সন্ধ্যাসুর নামে এক অপদেবতা ঢুকেছে বলে তাদের ধারণা। তাই অপদেবতাকে ধ্বংস করার জন্য ঐ ডেরাঘর তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এখান থেকেই দোল পূজার শুরু। এটাকে বলা হয় ডেরা পোড়া। পরের দিন ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মাটি দিয়ে আড়াই হাত উঁচু তিনস্তর বিশিষ্ট ভিটি প্রস্তুত করা হয়। একে দোল ভিটি বলা হয়। ভিটির ওপর কাঠ স্থাপন করে তার মধ্যে কাগজ এবং কাপড় দিয়ে বিশেষ ধরনের একটি দোলনা তৈরি করা হয়। দোলনার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের পিতলের তৈরি দুটি ক্ষুদ্র যুগল মূর্তি স্থাপন করা হয়। রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের চরণে আবির রং দিয়ে প্রণাম করা হয়। দোল পূজার মূল উপাদান আবির রং। তারপর ফল-ফলাদি অথবা মিষ্টান্ন-খিচুরি ভোগ দেয়া হয়। পাঁচ প্রকারের ফল বা পঞ্চফল পূজার প্রধান নৈবেদ্য। আতপ চাল, দুধ, কলা, নারকেল, মিষ্টান্ন ঘিয়ে ভাজা লুচি এবং খিচুরি দিয়ে পিতলের বা তামার থালায় নৈবেদ্য সাজানো হয়। পূজা শেষে পঞ্চফল, খিচুরি, মিষ্টান্ন, লুচি দিয়ে ভক্তকে আপ্যায়ন করা হয়।

দোল পূজা পরিচালনা করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়া দোল পূজা করা যায় না। লাল রঙের আবির ছিটিয়ে দোল পূজা শুরু হয়। এই আবির রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির পায়ে ছিটানো হয়, ভিটির ওপরও ছিটানো হয়। এরপর ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা বড়োদের দু'পায়ে আবির ছিটিয়ে ভক্তি প্রণাম করে। এই পূজায় কোনো মানত করা হয় না। পূজার দিন উপবাস করে। পূজা শেষ হওয়ার পর উপবাস ভাঙে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এই পূজা দেখতে সমবেত হয়। উল্লেখ্য, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা দোল পূজা দেখতে যায়।

০৭.০৩.২০১২ তারিখ লেমুবাড়ি মিস্ত্রি বাড়িতে দোল পূজা অনুষ্ঠিত হয়। লেমুবাড়ি গ্রামে কিছু শীল, মিস্ত্রি, কপালী, পাটনি ও জেলে বসবাস করেন। লেমুবাড়ি গ্রামের সুনীল চন্দ্র রায় (সূত্রধর) এই পূজার আয়োজন করেন। তাঁদের বাড়িতে প্রায় দু'শ বছর আগে থেকে এই পূজা হয়ে আসছে বলে জানান। দোল পূজা উপলক্ষে লেমুবাড়ি হাই স্কুলের উত্তর পাশে মেলা বসে। এটি দোলের মেলা নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

মেলা উপলক্ষে মাটির হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা পুতুল থেকে শুরু করে চুড়ি, বিন্নি, বাতাসা প্রচুর পরিমাণে বেচা কেনা হয়। উল্লেখ্য, দোল পূজা উপলক্ষে বিন্নি-বাতাসার সরবরাহ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তখন বিন্নির মৌসুম। বিন্নি হচ্ছে ধান থেকে তৈরি এক প্রকার মুড়ি জাতীয় খাদ্য। আগে ভোগের দিন ভোগরাগ গান হতো। ভজন ভক্তিমূলক গান হচ্ছে ভোগরাগ গান।

লেমুবাড়িতে ছন, খড় ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নির্মিত ডেরা-কুড়া

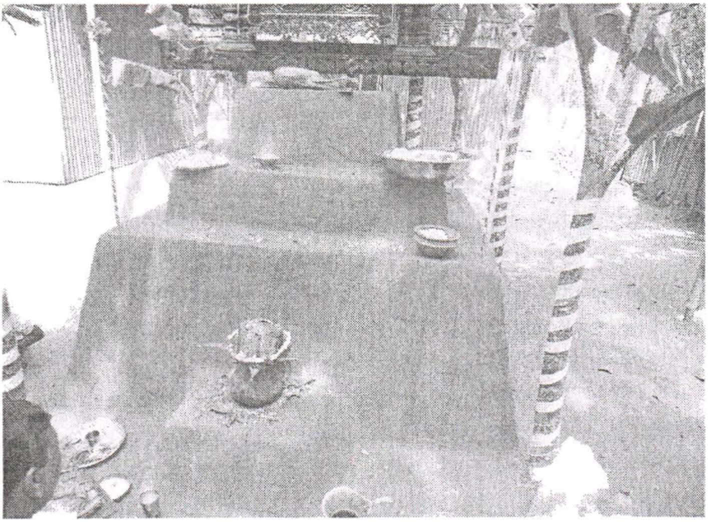

তিনস্তর বিশিষ্ট মাটির দোল ভিটি

www.pathagar.com

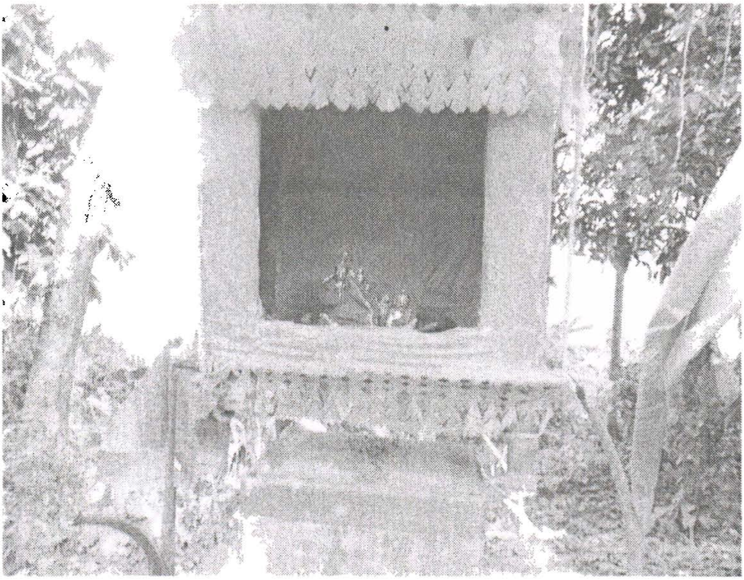

দোল ভিটির উপর দোলনায় পিতলের তৈরি রাধা কৃষ্ণের ক্ষুদ্র যুগল মূর্তি

দোল ভিটির সামনে অর্চনারত পুরোহিত

www.pathagar.com

মানিকগঞ্জ সদর থানার হাটিপাড়া গ্রামের বিজয় ঠাকুর (৫০) এর বাড়িতে বেশ বড়ো আকারে দোল পূজার আয়োজন হয়। হাটিপাড়া হাই স্কুলের সামনে দোল পূজা উপলক্ষে ১৫ দিনব্যাপী মেলা বসে। মানিকগঞ্জ মূল শহর কালীবাড়িতে দোল যাত্রাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও কবিগানসহ জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শিবালয় থানার উথুলি গ্রামের শ্যামল চন্দ্র গোস্বামীর বাড়িতে দ্বিতীয় দোল যাত্রার উৎসব হয়। এতে কৃষ্ণলীলা গানসহ অন্যান্য লোকজ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।[৫]

দোল পূজার অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম সবাই একাকার হয়ে যেত এক সময়। দোল পূজার মূল আনন্দ উপাদান হচ্ছে আবির রং। হিন্দু-মুসলিম সবাই এই আবির রঙের খেলায় মেতে উঠতো। সেই সাথে চলতো অন্যান্য রঙের হোলি খেলা। আজ থেকে মাত্র কুড়ি বছর আগে মুসলমান তরুণ-তরুণীরা রঙের হোলি খেলায় মেতে উঠতো। বাঁশের তৈরি পিচকিরি দিয়ে একে অপরকে রং ছিটানোর দৃশ্য অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন। বালতি বোঝাই করে রঙের পানি ভরে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে ঘুরে রং ছিটানোর দৃশ্য ছিল বড়ো মনোমুগ্ধকর। নিজেদের কাপড় চোপড় রঙে নষ্ট হবার পরেও যেন সবার মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। দোল পূজার সেই নির্মল আনন্দ এখন আর চোখে পড়ে না। সেই যে আবির রঙের রঙিন আনন্দ এখন গ্রাম বাংলা থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে। খোদ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেও এই দোল পূজার আয়োজন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৪. নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠান

নাম সংকীর্তন হচ্ছে—

যাগ যজ্ঞ আর ব্রতাদি
কলিতে নাই অন্য বিধি
হরের নাম : হরের নাম :
হরের নাম কেবলম
কল্য নাস্তব্য নাস্তব্য নাস্তব্য
গতির অন্যথা।

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রচার করে গেছেন যে কলিযুগে গুরু নাম বা গোবিন্দ নাম ছাড়া আর অন্য কোনো পূজা-পার্বণের প্রয়োজন নেই। তাঁর এই কথার উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয় হিন্দুধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান 'নাম সংকীর্তন'। এই কীর্তন সময় অনুযায়ী চলে, যেমন— অষ্ট প্রহর, ষোল প্রহর, চৌষট্টি প্রহর অহর্নিশি— এমনি করে এই নাম অদ্যাবধি প্রবহমান। এই নামের সারমর্ম হলো—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।

মানিকগঞ্জ শহরে লক্ষ্মী মন্দিরে তিন দিনব্যাপী এই নাম সংকীর্তন হয়ে থাকে। প্রতি বছর মানিকগঞ্জের পালরা গ্রামে মনোরঞ্জন সাহার বাড়িতে নাম সংকীর্তনের

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রথম দুই দিন শ্রীমত ভাগবত পাঠ হয়। এরপর দু'দিন নাম সংকীর্তন হয়। এ বছর ০৭.০২.২০১২ থেকে ০৯.০২.২০১২ তারিখ পর্যন্ত বেতিলা ইউনিয়নের পালরা গ্রামের পালপাড়ায় তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলে।

মঞ্চের উত্তর দিকে কালী মন্দির, মাঝখানে কীর্তনের মঞ্চ, পূর্বদিকে রাধা কৃষ্ণের কুঞ্জ সাজানো হয়। নারী-পুরুষ, ছেলে মেয়েদের মহামিলনকেন্দ্রে পরিণত হয় স্থানটি। এখানে মোট ছয়টি দলের আগমন ঘটে। দলগুলো হচ্ছে নয় সদস্যের সন্তোষ পাগল সেবাসংঘ, শিবালয়। এটির দলনেতা শংকর দেবনাথ। তারা গেরুয়া রঙের ধুতি এবং গেঞ্জি পরিহিত এবং কোমরে উত্তরীয় বাঁধা। গেঞ্জির সামনে ও পেছনে পাগল সেবাসংঘ নাম ছাপানো রয়েছে। সকাল, দুপুর, বিকেল ও সন্ধ্যাকালের সঙ্গে মিল রেখে হরে কৃষ্ণ নাম সুর, তাল ও ছন্দে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর তারক ব্রহ্ম নাম গীত হয়। সেদিন গায়ক যখন গানের সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, চোখের জলে অবগাহন করতে থাকেন, তখন দর্শক শ্রোতা একে অপরকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে থাকেন। মহিলা দর্শকরাও সেদিন উলুধ্বনি দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করে। মেয়েরাও একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। কোনো কোনো দর্শক মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে অপূর্ব এক ভাবধারার সৃষ্টি করে। প্রতিটি দল দু'ঘণ্টা কীর্তন পরিবেশন করে। কীর্তনে ভৈরবী, ভাটিয়ালি, খাম্বাছ, বাগেশ্রী, রাগমল্লার বেহাগ এসব সুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শেষদিন অষ্টকাল কীর্তন দিয়ে কীর্তনের আসর শেষ হয়। পরদিন কুঞ্জভঙ্গের আসর বসে। কীর্তন শেষ হওয়ার পরদিন রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জভঙ্গ হয়। এটি তারা নদীতে, পুকুরে বা জলাশয়ে ফেলে দেয় এবং মাছ বা মৎস্যমুখী করে এই বছরের মতো অনুষ্ঠান শেষ হয়। কীর্তন দলকে দশ হাজার টাকা থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত সম্মানী দেয়া হয়। চাঁদা উঠিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। আশপাশের গ্রাম থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনও কীর্তন শুনতে যায়।

নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে রাধা কৃষ্ণের কুঞ্জ

www.pathagar.com

নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে

৫. ত্রিনাথের পূজা

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনজন হিন্দু ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। এই তিনজন দেবতাকে মিলিতভাবে ত্রিনাথ বলা হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রহ্মা হচ্ছেন স্রষ্টা, বিষ্ণু হচ্ছেন পালন কর্তা এবং শিব হচ্ছেন সংহার কর্তা। ত্রিনাথের পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুদের বিশ্বাস এই পূজার মাধ্যমে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং আর্থিক অনটন দূর হয়। বছরব্যাপী এই পূজা করা যায়। বিশেষ করে শনি ও মঙ্গলবারে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার আয়োজন ব্যয়বহুল নয়। একটি গানে বলা হয়েছে—

শুধু তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
কলিতে ত্রিনাথের মেলা।

....

এক পয়সার পান সুপারি
আর এক পয়সার তৈলে
আর এক পয়সার গাঁজা হইলে
ত্রিনাথ মেলা চলে।

পূজার আচার-অনুষ্ঠান

একটা কাঠের চৌকি বা পিড়ির ওপর আসন সাজানো হয়। আসনের উপর ত্রিনাথের তিনটি মাথা বিশিষ্ট একটি কল্পিত ছবি রাখা হয়। আসনের সামনে পিতলের থালার উপর পঞ্চফলের ভোগ রাখা হয়। খিরা, তরমুজ, বাঙ্গি, শসা, আনারস এই পাঁচটি ফলের টুকরা রাখা হয়। ছোটো একটি পিতলের থালায় বাতাসা রাখা হয়। মাটির

www.pathagar.com

একটি ঘটিতে পানি রাখা হয়। ঘটির উপর আম গাছের মুচি বা ডগা রাখা হয়। বাড়ির মালিক প্রথমে ১০০/- টাকার একটি নোট আসনের উপর রেখে ভক্তি দেন। তিনটি খিলি পান বানিয়ে ভক্তি দেয়া হয়। তিনটি সলতা বিশিষ্ট প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং একটি গাঁজার কলকি সাজিয়ে ঐ আসনের সামনে রাখা হয়। "ত্রিনাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল" এই কথা তিনবার ধ্বনি দিয়ে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একেই তিন, তিনেই এক–এই কথাটা তিনবার বলে গান ধরে। উল্লেখ্য, ত্রিনাথের মেলায় অবশ্যই ত্রিনাথের গান গাইতে হয়। গান শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদের মধ্যে প্রথমে দেয়া হয় ফলের টুকরো। এছাড়া সবজি-খিচুরি, পায়েস, বাতাসা ও খৈ দেয়া হয়। ত্রিনাথের মেলায় বাড়ির মালিক সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ত্রিনাথের পূজা সর্বজনীন নয়। এটি একটি ব্যক্তিগত পূজা। ভক্তবৃন্দ কোনো কিছু নিয়ে যায় না।

ত্রিনাথের আসনের উপর ত্রিনাথের ছবি ও একশত টাকার নোট

মানিকগঞ্জের লেমুবাড়ি গ্রামে ত্রিনাথের পূজা

০৮.০৫.২০১২ তারিখ মঙ্গলবার রাত আটটায় মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের লেমুবাড়ি গ্রামে হরিপদ শীলের বাড়িতে ত্রিনাথের মেলা বসে। হরিপদ শীলের মা জীবনবালা শীল (৮০) প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শেষ যে কোনো মঙ্গলবার বা শনিবারে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়) পূজার আয়োজন করেন। তাঁর বাড়িতে একটি ছোটো মন্দির বা মণ্ডব ঘর আছে। সেদিন ত্রিনাথের গান পরিবেশন করে হিজলাইন গ্রামের ত্রিনাথ সংঘ নামে সাতজনের একটি গানের দল। হারমোনিয়াম, খোল, দুই জোড়া জুরি ও একটি কাসর বাজিয়ে গান করেন।

প্রথম গান — শুধু তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
কলিতে ত্রিনাথের মেলা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় গান— হরি নাম বিনে আর কী আছে সংসারে।
তৃতীয় গান— রাধা বল্লভ সরকার রচিত একটি গান গাওয়া হয়। গানটি হলো —
প্রাণ পাখি পিঞ্জিরায় বসে
গাওরে হরি নাম
আমার অন্তর দুয়ার খুলে
বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥
হরি নাম যার সঙ্গের সাথী
আধার ঘরে তার জ্বলবে বাতি
ওরে পাবে সেই পারের সারথী
মুগ্ধ হয়ে বল তার নাম ॥

গান শুনে দর্শক-শ্রোতা আবেগে উদ্বেলিত হয়। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে। ত্রিনাথের গান ছাড়াও বৈঠকি, বিচ্ছেদী ও ভাবসংগীত গাওয়া হয়। সারারাত গান চলে। সবশেষে গাওয়া হয় মিলন গীতি।

৬. পাঁঠা বলি

ঢাকা-বালিরটেক রাস্তার পাশে মিতরা গ্রামে আনুমানিক চারশ' বা পাঁচশ' বছর আগে থেকে পাঁঠা বলির রীতি চলে আসছে বলে পূজায় আগত ভক্তবৃন্দ জানান। কদম গাছের তলায় পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একটি কালীমন্দির আছে। এখানে কালী পূজা ও শীতলা পূজাও হয়। বট গাছের গোড়ায় বুড়ির পূজা এবং পাগল নাথের বা নিস্কাইন্দা পূজা হয়। এখানে পূজা করতে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ফকির বা ঋষিরা নিজেরাই পূজা পরিচালনা করে। মানিকগঞ্জের অনেক গ্রামেই এসব পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন এই পূজায় খুব একটা যান না।

মিতরা গ্রামে পাঁঠা বলি

www.pathagar.com

৭. বুড়ি ঠাকুরের পূজা

বুড়ি ঠাকুরের পূজা মানিকগঞ্জের পালরা, মিতরা, বগজুরি, দীঘি চান্দইর, নাগরা, তিল্লি এসব এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের লোকজন যেমন–ঋষি সম্প্রদায়, জেলে সম্প্রদায়, মালাকার সম্প্রদায়ের লোকজন এ পূজা করেন। এই পূজা উপলক্ষে যারা মানত করেন তারাই বেশি পূজায় অংশ নেন। উল্লেখ্য, মহিলারা বেশি যোগ দেন। মেয়েরা সন্তানের রোগমুক্তির জন্য মানত করেন। সন্তানের রোগমুক্তির পর তারা মানত দিতে যান। ধান, চাল, টাকা, ফল, দুধ, হাঁস, মুরগী, ছাগল, কবুতর, হাঁসের ডিম, পাঁঠা ইত্যাদি মানত করা হয়ে থাকে। মানিকগঞ্জের বগজুরিতে রাস্তার পাশে বিরাট ও পুরনো একটি বটগাছ আছে। বটগাছের তলায় বগজুরি ঋষিবাড়ির তিনটি গৃহস্থের পূজা হয়। তিনটি জায়গায় তিনটি আসন বা মণ্ডব তৈরি করা হয়। আসন মাটি দিয়ে তৈরি। বুড়ি ঠাকুরের প্রতিমাও তৈরি করা হয়। বুড়ি ঠাকুর দেখতে বৃদ্ধা মহিলার মতো। হিন্দু শাস্ত্রমতে বৃন্দাবনে এক বৃদ্ধা মহিলা বাস করতেন। তাঁর নাম উঁরজুতি বুড়ি। রাধা কৃষ্ণের মিলন বিরহ ইত্যাদি কাহিনি তিনি জানতেন। সেই বুড়িকে কেন্দ্র করেই হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের লোকজন বুড়ি ঠাকুরের পূজা করেন।

বগজুরি গ্রামে বুড়ি পূজায় বুড়ি ঠাকুরের প্রতিমা

৮. নিকাইন্দা পূজা

লোক চিকিৎসক, কবিরাজ, তন্ত্রমন্ত্রের ফকির যারা তারা নিকাইন্দা পূজা করেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা মানত পরিশোধ করার জন্য এসব পূজায় অংশ নেয়। মানিকগঞ্জের বগজুরি ফকির বাড়িতে পূজার মধ্যে 'ভাব' বা 'বায়াল' অর্থাৎ নির্দিষ্ট কয়েকজন ফকিরের ওপর দেব-দেবতা আছর বা ভর করে। একে ভার আসাও বলে। ভর করা অবস্থায় ঢাকের বাড়ির তালে তালে ভর আসা ফকিররা নাচতে নাচতে

www.pathagar.com

বটগাছের তলায় আসে। এ সময় একজন ফকির কালীর মুখোশ পরিধান করে, আর একজন শিবের অভিনয় করেন। তারাও বাজনার তালে তালে নাচতে থাকে এবং বটগাছের তলায় আসে। ফকিরদের ভর কেটে জ্ঞান ফিরে আসার পর পূজার কাজ শেষ হয়। বটগাছ তলায় অনেকে রোগমুক্তির জন্য মানতের ঘোড়া রেখে যায়। অনেকে আবার চিকিৎসার জন্য বট গাছের গোড়া থেকে মাটি নিয়ে যায়।

বায়রা গ্রামে নিকাইন্দা পূজার মূর্তি

পাড়িল গ্রামে বটগাছ তলায় নিকাইন্দা পূজার মূর্তি

www.pathagar.com

কালী ও শিবের বেশে মুখোশ নৃত্য

ফকিরদের ভার আনার আয়োজন চলছে

www.pathagar.com

ভার আসা অবস্থায় একজন ফকির

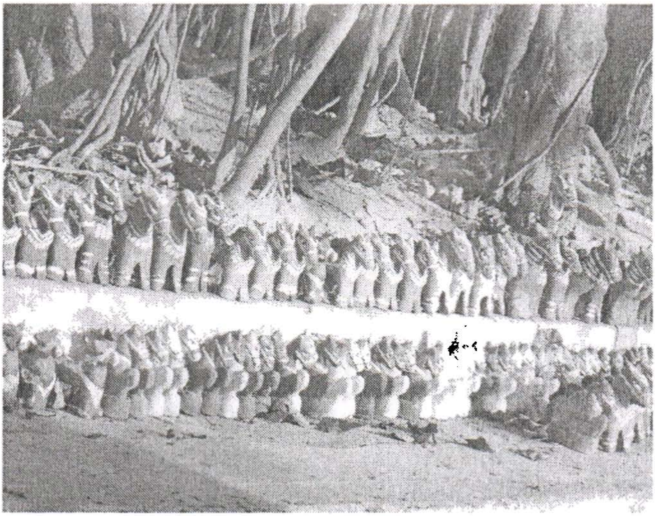

বটগাছ তলায় অসংখ্য মানতের ঘোড়া

www.pathagar.com

চিকিৎসার জন্য বটগাছের গোড়া থেকে মাটি নেয়া হচ্ছে

৯. সরস্বতী পূজা

হিন্দুধর্মে সরস্বতী হচ্ছেন বাকদেবী বা স্বরের অধিপতি। হিন্দু শাস্ত্রে বলা আছে–

চোরাতে চোরামণি
ব্রহ্ম পাশে স্থিতি
আলজিহ্বায় বসা আছে
লক্ষ্মী সরস্বতী।

এখানে বাক দেবীর কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, মানুষের কণ্ঠমূলে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী অধিষ্ঠিতা। সরস্বতী পূজার মূলমন্ত্র হচ্ছে, "ও মাতা স্বরেস্বতে নমস্তে বিদ্যাদায়িনী নমস্তে হংস বাহিনী নমস্তে বাক দেবী নমস্তে নমঃনমঃ"। সরস্বতী নমস্তে হচ্ছেন বিদ্যাদায়িনী দেবী। তাঁর বাহন হংস। হাঁসকে পানির সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খেতে দিলে হাঁস দুধ খেয়ে পানি রেখে দেয়। হাঁসের এই অলৌকিক ক্ষমতার জন্য হাঁস হচ্ছে সত্য ও বিশুদ্ধতার প্রতীক। সরস্বতী দেবীর হাতে থাকে বীণা যন্ত্র। বাদ্যযন্ত্র বীণা হচ্ছে সুর বা শব্দের প্রতীক। দেবীর পায়ের কাছে রাখা একটি বই। বই হচ্ছে জ্ঞানের প্রতীক। তাই সরস্বতী একাধারে মানুষের কণ্ঠস্বর, জ্ঞান এবং পূত পবিত্রতার প্রতীক। বাহ্যিক জগতে প্রতিবছর মাঘ মাসে যে চন্দ্র উদয় হয় সেই চন্দ্র উদয়ের পাঁচ তারিখকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। সেই তারিখেই এই সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে। সাধারণত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সরস্বতী পূজা করে থাকে। মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সরস্বতী পূজা হয় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। এদিনে মানিকগঞ্জ সদরের কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের হয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে।

www.pathagar.com

এছাড়াও কালিখোলা কালীবাড়ি, লক্ষ্মীমণ্ডব, গঙ্গাধর পট্টি, শিববাড়ি, হিজুলি এসব এলাকা থেকে সরস্বতীর প্রতিমা নিয়ে বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। রাতে সরস্বতীকে বিসর্জন দেওয়া হয় পুকুরে। তখন রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার দুধারে হাজার হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে মিছিল উপভোগ করেন।

মানিকগঞ্জ সদরে সরস্বতী পূজার প্রতিমা

১০. চৈত্র সংক্রান্তির পূজা

চৈত্র মাসে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে চৈত্র পূজা। চৈত্র মাসের ২৫ তারিখ এলেই ঢাক-ঢোলের শব্দে ভরে উঠে গোটা গ্রাম। হিন্দুদের চৈত্র সংক্রান্তির পূজা গ্রামীণ সংস্কৃতিতে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। উল্লেখ্য, চৈত্র সংক্রান্তির পূজা মুখ্যত জেলে, ঋষি, মাঝি, বাগদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে দেখা যায়। চৈত্র পূজা যেন নতুনের একটি বার্তা নিয়ে আসে। চৈত্র পূজা উপলক্ষে ভালো-মন্দ খাওয়া-দাওয়া হয়। আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে নতুন কাপড় চোপড় দেয়া নেয়া হয়। নতুনের আবির্ভাবে মনটাও অন্য রকম এক অনুভূতিতে ভরে ওঠে।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের বালিয়াবিল গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে পূজা হয়। চৈত্র মাসের ২৫ তারিখ থেকে মহাদেব পূজা হয়ে থাকে। এই সময় প্রতিদিন টাকা-পয়সা, চাল-ডাল সংগ্রহের জন্য পূজারিরা দলে দলে বেরিয়ে পড়েন এবং বিকেল বেলায় বাড়িতে ফিরে আসেন। মুসলমানদের মহররমের সাথে তাদের এই পূজার মিল আছে। মহররমের মধ্যে যেমন কাশির দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে— তারাও তেমনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে এসে মহাদেবের পূজা দেন। প্রতিদিন রাতে ভোগ দেয়া হয়। ভোগ হিসেবে বাঙ্গি, তরমুজ, কলা, শসা, গুড়, মোমবাতি, আগরবাতি, সিঁদুর প্রভৃতি দেয়া হয়। ২৯শে চৈত্র দিবাগত রাতে পূজা শেষ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের মন্ত্র পাঠ, ঢাক-ঢোল, সানাই বাজিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করা হয়। তারপর পূজা শেষে আগত দর্শক শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য মুখোশ নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন বয়সী

www.pathagar.com

ছেলেরা মুখোশ পরে কেউ দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ, মহাদেব সেজে অভিনয় করে। তাছাড়া বাঘ-ভাল্লুক-হনুমানের মুখোশ পরেও নৃত্য করে। এইসব আয়োজন হিন্দু-মুসলমান নরনারী সবাই মিলে একসাথে উপভোগ করে।

মানিকগঞ্জ জেলায় বিপুল সংখ্যক জেলে সম্প্রদায় রয়েছে। তারা আজো চৈত্র পূজা করে আসছে। বালিয়াবিল, বান্দুটিয়া, তরা, কাটিগ্রাম, কইট্টাসহ বিভিন্ন জায়গায় চৈত্র সংক্রান্তির পূজা হয়। চৈত্র পূজা উপলক্ষে অনেক জায়গাতে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক জায়গায় চৈত্র সংক্রান্তির মেলাও বসে। তবে মানিকগঞ্জে চৈত্র সংক্রান্তির সবচেয়ে বড়ো মেলা বসে সাটুরিয়া উপজেলার কইট্টা গ্রামে। মানিকগঞ্জ শহরের শিববাড়িতেও চৈত্র পূজা হয়।[৬]

চৈত্র পূজার ছাতু খাওয়া

পূজা উপলক্ষে এই এলাকায় চৈত্র মাসে ছাতু খাওয়ার একটি রীতি প্রচলিত আছে। চৈত্র পূজায় বাড়িতে মেহমান এলে ছাতু-মুড়ি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এছাড়া চৈত্র মাসে ছাতু খাওয়ার অনুষ্ঠানও প্রচলিত রয়েছে। চৈত্র মাসে ভাই তার বোনের বাড়িতে নতুন কাপড় কিনে নিয়ে যায়। তখন বোন নতুন শাড়ি পরিধান করে ভাইকে নিজের কোলে বসিয়ে ছাতু খাওয়ায়। যদি কোনো ভাইয়ের বিবাহিতা বোন না থাকে তবে তাদের নিজ বাড়িতেই এই ছাতু খাওয়ার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান মূলত ভাই বোনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় করার উপায়। ভাই বোনের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করা হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কাঁচা দুধের দধি, চিড়া, মুড়ি, কলা, চিনি ও কচি আমের দু'একটি টুকরাও ছাতুর সঙ্গে মিশিয়ে বোন ভাইকে নিজের হাতে তিন লোকমা খাওয়ায়। ছাতু ছাড়া অন্য খাবারও খেতে পারে বোনের কোলে বসে। এইভাবে ছাতু খাওয়া অনুষ্ঠান শেষ হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন বেশি।[৭]

হাসুলি গ্রামের তাছলিমা খাতুন ভাই আরিফ হোসেনকে ছাতু খাওয়াচ্ছেন

www.pathagar.com

১১. কাল বৈশাখী হাজরা পূজা

এই পৃথিবীতে মানুষ যতো রকমের ক্রিয়াকর্ম করে তার পিছনে কেবলমাত্র একটি কারণই লক্ষ্য করা যায়, তাহলো– মানুষ চায় শান্তি, স্বস্তি, একটুখানি নিরাপদে, নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকতে। মানুষ শান্তির অন্বেষণে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আগুন-পানি, পাহাড়, নদ-নদী, তারা-বৃক্ষ সবার দ্বারস্থ হয়েছে। কত জীব ও জড়বস্তুর কাছে লৌকিক বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করেছে। এমন একটি লৌকিক বিশ্বাস হলো—কাল বৈশাখী হাজরা পূজা। কাল বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব থেকে রক্ষা জন্য মানুষ আজো যে কত কিছু করে তার শেষ নেই। আজো দেখা যায় কাল বৈশাখী ঝড় শুরু হলে মুসলমানরা আযান দেয়, হিন্দুরা শঙ্খ বাজায়। আবার অনেক মায়েরা ঝড়ের সময় কাঁসার বাটি বাজায় এবং কলেমা পড়ে, নিড়ানি কাঁচির অগ্রভাগ ঘরের মেঝেতে পুঁতে দেয়। এমনি বহু সংস্কার আছে লোক সমাজে। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাল বৈশাখীর হাজরা পূজা উল্লেখ করার মতো। হিন্দুরা বিশ্বাস করে মহাদেব হলো মহা শক্তির আধার। তাই ঝড়ের তাণ্ডব হ্রাস করতে একমাত্র মহাদেবই পারে। তাই কাল বৈশাখী হাজরা পূজায় তারা মূখ্যত মহাদেবের বিশেষ পূজা দিয়ে থাকে।

মূল পূজার সাত দিন আগে থেকে পূজার প্রাথমিক আয়োজন শুরু হয়। এ সময় কিছু ছেলের দল খালি পায়ে হেঁটে বিভিন্ন বাড়ি, ব্যবসা কেন্দ্রে গিয়ে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে। যারা এই কাজে নিযুক্ত হয় তাদের সন্ন্যাসী বলে। সন্ন্যাসীরা সাত দিন মাছ-মাংস খায় না। তারা নিরামিষ খায়। এদের মধ্যে যে 'মহাদেব ঠাকুর' নিয়ে ঘুরে তাকে 'মাগ্যমা' বলে। সাত দিন বিভিন্ন জায়গায় টাকা-পয়সা, চাল-ডাল ইত্যাদি সংগ্রহের পর পূজার দিন রাত ২টার সময় পূজার মূল পর্ব শুরু হয়।

এই পূজার মূল বিষয় হলো একজন লোক 'ভার' আসে (ভার মানে দেহ মনে এক বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া)। যার 'ভার' আসে তিনি আধপোড়া গজার মাছ, আধভাজা পিঠা এবং কিছু পরিমাণ মদ খেয়ে নেন। তারপর শুরু হয় ভার আসা। যখন ভার আসে তখন সে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান। তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার হয়। এই অবস্থায় সে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যায় পূজার স্থানে অর্থাৎ যেখানটিতে পূজা দেয়া হবে সে স্থানে। তার সাথে অন্যান্য পূজারিরাও সে স্থানে যায়। এরপর পূজা দেবার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই ধরনের পূজাকে হাজরা পূজা বলে। তারা বিশ্বাস করে এতে কাল বৈশাখীর ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।[৮]

সরুন্ডি গ্রামে কাল বৈশাখী হাজরা পূজা

মানিকগঞ্জ পৌরসভার সরুন্ডি গ্রামের সুনীল চন্দ্র দাস (৫০) এই কাল বৈশাখীর পূজা করে থাকেন। ২০১২ সালের ৭ মে তারিখ থেকে পূজার আয়োজন শুরু হয়। সাত দিন বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা-পয়সা, চাল-ডাল ইত্যাদি সংগ্রহের পর ১৩.০৫.২০১২ তারিখে রাত ২টার সময় পূজার মূল পর্ব শুরু হয়। সবার উপস্থিতিতে পরেশচন্দ্র মনি দাস (৪৮) নামক একজন পূজারি কিছু আধপোড়া গজার মাছ, আধভাজা পিঠা এবং কিছু পরিমাণ মদ খেয়ে নেন। এরপর যখন তার ভার আসে তখন সে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যায় দাশড়ার পটল বিলের সন্নিকটে শ্মশানের কাছে। এই সময় ৫০/৬০ জন সাধারণ

www.pathagar.com

লোক তার পিছনে পিছনে যায়। পটল বিলের শ্মশানের কাছে একটি হিজল গাছ আছে। এই হিজল গাছের তলায় গিয়ে পূজা দেওয়া হয়।

১২. বিশ্বকর্মা পূজা

হিন্দু সম্প্রদায়ের কামার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, করাতি, শাঁখারি লোকজন বিশ্বকর্মা পূজা পালন করেন। যারা হাতুড়ি, বাটাল, কুড়াল, করাত, বাইস, ছেনি, সাঁড়াশি, দা ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে কাজ করেন তারাই মূলত এই পূজা করে থাকেন। বিশ্বকর্মা হিন্দুদের একজন দেবতা, যিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুদক্ষ কারিগর। হিন্দু সম্প্রদায়ের কারিগরেরা বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বকর্মার পূজা করলে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করা যাবে। তারাও তাদের পেশায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন।

মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বিশ্বকর্মা পূজা পালন করেন। ভাদ্র মাসের শেষ দিন বিশ্বকর্মা পূজা হয়ে থাকে। এ পূজা পুরোহিত ছাড়াও নিজেরাই সম্পন্ন করা যায়। বিশ্বকর্মার প্রতিমা বা ছবি যে কোনোটি বিগ্রহ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পূজার সময় কারিগর তার যন্ত্রপাতি ভালো মতো পরিষ্কার করে তেল সিঁদুর দিয়ে বিগ্রহের সামনে রাখেন। পঞ্চফলের ভোগও বিগ্রহের সামনে রাখা হয়। এরপর পূজারি মন্ত্রপাঠ করে পূজা দিয়ে থাকেন।

পুটাইল গ্রামে বিশ্বকর্মা পূজা

১৮.০৯.২০১২ তারিখে দক্ষিণ পুটাইল গ্রামের বিদ্যুৎ কর্মকারের বাড়িতে বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। লেমুবাড়ি হাটে তাঁর সোনা ও রূপার একটি দোকান আছে। বিশ্বকর্মার কোনো প্রতিমা তাঁর বাড়িতে দেখা যায় না। বিশ্বকর্মার একটি ছবি কাঠের একটি চৌকির উপর বসিয়ে পূজার ব্যবস্থা করা হয়। ছবির সামনে হাতুড়ি, বাটাল, সাঁড়াশি, চিমটা অর্থাৎ সোনা রূপার গহনা তৈরির যন্ত্রপাতি ধুয়ে মুছে সরষের তেল মাখানো হয়। যন্ত্রের উপর সিঁদুরের একটি ফোঁটাও দেওয়া হয়। তাছাড়া পঞ্চফলের ভোগ—শসা, আনারস, আম, পেয়ারা, কলা রাখা হয়। আতপ চাল, তিল, চিনি, মিষ্টান্ন, সন্দেশও চৌকির উপর রাখা হয়। কাঠের একটি বাক্সের উপর যন্ত্রপাতি রাখা হয়। এরপর বিদ্যুত কর্মকার পূজা করার জন্য আসেন। তিনি ফুল, জল, তুলসী পাতা, বেলপাতা প্রভৃতি দিয়ে একটি মন্ত্র পড়ে নিজেদের পূজা নিজেরাই সম্পন্ন করেন। তিনি একটি মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

এতে গন্ধ পুস্পে বিল্ল পত্রে
শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মায়ে নমস্তে
নমঃ নমঃ

এই মন্ত্র পাঠ করে পূজা শেষ করেন। পূজা শেষ হওয়ার পর হিন্দু-মুসলমান সবার মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। খিচুরি, পায়েস ও ফল প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

www.pathagar.com

বাঙ্গালা গ্রামে বিশ্বকর্মা পূজা

১৯.০৯.২০১১ তারিখে মানিকগঞ্জের বাঙ্গালা গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র শিল-এর বাড়িতে বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিশ্বকর্মার একটি বিগ্রহ বা প্রতিমা মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রতিমা পুরুষ আকৃতির, হাতির পিঠে চারহাত বিশিষ্ট বিশ্বকর্মা উপবিষ্ট। তাঁর চার হাতে চারটি যন্ত্র— একহাতে কুড়াল, একহাতে হাতুড়ি, একহাতে চিমটা এবং এক হাতে বাটাল। উল্লেখ্য, বিশ্বকর্মা সুঠাম দেহের অধিকারী একজন সুদক্ষ কর্মী। তাঁর গায়ের রং কালো। মাথায় একটি চূড়া বা মুকুট পরিহিত। এই পূজা পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে পরিচালনা করেন।

১৩. চড়ক পূজা

আমাদের দেশে লৌকিক সংস্কারের মধ্যে চড়ক পূজা একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার। এই চড়ক পূজার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে জানা যায়, এই চড়ক পূজায় সাধারণত মহাদেব ও শিবের পূজা দেয়া হয়। চড়ক পূজার মূল আয়োজন হলো একটি ২০-৩০ ফুট উঁচু গাছ মাটিতে পুঁতে তার মাথায় চক্রাকার চড়ক তৈরি করা হয়। এতে শক্ত দড়ি বা রশির সাথে বড়ো বড়ো বড়শি যুক্ত করা হয়। তারপর চড়ক খেলায় যে লোকটি অংশগ্রহণ করে তার পিঠের নিচের অংশের মেরুদণ্ডের দুপাশে মাংসের ভিতর দুটি বড়ো বড়শি বিঁধিয়ে দেয়া হয়। তারপর ঐ লোকটিকে উপুড় করে চড়ক গাছের চারদিকে ঘুরানো হয়। এই ধরনের শারীরিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ একটি খেলা প্রদর্শন করা হয়। এটি এতই আশ্চর্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ খেলা যে তা দেখলে যে কারো গা শিউরে উঠবে। চড়ক পূজার খেলা দেখতে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে।

এই চড়ক পূজায় কোনো ব্রাহ্মণের দরকার হয় না। 'মাথ্‌মা গুরু' নামে একজন এই চড়ক পূজার কার্যাদি সম্পন্ন করেন। মাথ্‌মা গুরু চড়ক গাছ ঘুরানোর আগে কিছু কাজ করেন। জানা যায় গুরু কিছু তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে এই কাজ করেন। প্রথমে মাথ্‌মার মন্ত্র বলে একজন নির্ধারিত লোক 'ভার' আসে। এই ভারের মধ্যে দিয়ে লোকটির শরীরে বিপুল শক্তির সঞ্চার হয়। তখন 'ভার' আসা লোকটি বিভিন্নভাবে তার দেহে সঞ্চারিত শক্তি প্রদর্শন করে। এই সময় সে 'দা খেলা', 'তরবারি খেলা', উন্মত্ত নৃত্য সহ নানা ধরনের শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে। ভার আসা এবং শারীরিক কসরত প্রদর্শন শেষে চড়ক ঘুরানো খেলা হয়।[৯]

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় ধানকোড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ খল্লী গ্রামে বর্তমান রূপচান গোঁসাই-এর আশ্রমে এই চড়ক পূজা ও চড়ক খেলার আয়োজন হয়ে থাকে। এই আশ্রমে চড়ক পূজা প্রায় ১০/১২ বছর আগে থেকে শুরু হয়। প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে এই চড়ক পূজা ও চড়ক খেলার আয়েজন করা হয়। এ বছর বাংলা ১৪১৮ সনে চৈত্র সংক্রান্তিতে এই অনুষ্ঠান হয়। এতে অসংখ্য লোক চড়ক পূজা ও

www.pathagar.com

চড়ক খেলা দেখতে আসেন। এই খল্লী গ্রামের চড়ক পূজা এখন মানিকগঞ্জের বিশেষ লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে রূপচান গোঁসাই-এর বংশধর প্রফুল্ল চন্দ্র চড়ক পূজার ও খেলার আয়োজন করে আসছেন। তাছাড়া মানিকগঞ্জ সদরের দয়ারামপুর গ্রামেও এই চড়ক পূজার আয়োজন হয়ে থাকে।[১০]

পিঠে বড়শি বিঁধিয়ে এভাবে চক্রাকারে ঘুরে চড়ক খেলা দেখানো হয়

১৪. চাটি পূজা

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া ইতিহাস ঐতিহ্যের এক উন্নত জনপদ। এখানে বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, ধানকোড়া গিরিশচন্দ্র বাবুর জমিদারিসহ অনেক ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যের উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ধানকোড়া জমিদার বাড়িকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক হিন্দু লোকের যে বসবাস তা উল্লেখ করার মতো। এখানে আজো সব বর্ণের হিন্দু লোকের বসবাস রয়েছে। তাই এই এলাকায় বিচিত্র লৌকিক ধর্ম ও লোকাচার দেখতে পাওয়া যায়।

সাটুরিয়ার ধানকোড়া গ্রামের দীনেশ চন্দ্র সাহার বাড়িতে 'চাটি' পূজার একটি লোকাচার বর্তমানে চালু আছে। চাটি হচ্ছে মাটির তৈরি ছোটো পাত্র যা হাতের তালুতে বসানো যায়। এই চাটিতে তেল দিয়ে তাতে সুতার সলিতা দিয়ে আগুন দিয়ে চাটির বাতি হয়। এক সময় মুসলিম পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চাটির বাতি প্রজ্বলন করা হতো। বহু দিন আগে ধানকোড়া গ্রামে গোসাই চাঁন সাহার গোপাল চন্দ্র সাহা নামে এক পুত্র ছিল। তার একটি ঘোড়া হঠাৎ মারা যায়। মারা যাবার পর এক স্বগোত্রীয় সাধক তার মৃত ঘোড়া জীবিত করে দেয় এবং সেই সাথে গোপাল সাহাকে নির্দেশ করেন, তার বাড়ির সামনে বট গাছের চারদিকে ১০৮টি চাটির বাতি দিয়ে বটগাছের পূজা করতে। সেই থেকে গোসাই চাঁনের বাড়িতে বট গাছের চারপাশে ১০৮টি চাটির

www.pathagar.com

বাতি প্রজ্বলন করে পূজা দেয়া হয়। এই পূজা স্থানীয়ভাবে চাটির পূজা নামে পরিচিত হয়েছে। আনুমানিক দুশ' বছর আগে এই চাটি পূজার প্রচলন হয় বলে জানা যায়। তখন থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে চাটি পূজা চলে আসছে। বর্তমানে প্রতি বছর কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে গোসাই চাঁনের চতুর্থ বংশধর দীনেশ চন্দ্র সাহা গোসাই বাড়িতে এই পূজার আয়োজন করে থাকে।

এই চাটি পূজায় করণীয় কাজের মধ্যে প্রথমে মোটা বাঁশ ফেড়ে তা বটগাছের চারপাশে খুঁটির সাহায্যে উঁচুতে স্থাপন করা হয়। তারপর সেই ফাটা বাঁশের উপর বট গাছের চারপাশে পর্যায়ক্রমে ১০৮টি চাটির প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। বট গাছের চারদিকে ১০৮টি চাটি প্রদীপ যখন জ্বলতে থাকে তখন খুব সুন্দর দেখায়। এই ধরনের চাটি পূজা বাংলাদেশে আর কোথাও হয় বলে জানা নেই। ঐতিহ্যবাহী এই চাটি পূজা দেখতে ঢাকা থেকে দর্শনার্থীরা আসে বলে জানা যায়।[১১]

১৫. শীতলা পূজা

শীতলা হচ্ছেন একজন দেবী। তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করে বলে ভক্তবৃন্দ বিশ্বাস করেন। তিনি রোগব্যাধি থেকে বিশেষ করে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। মানিকগঞ্জের পালরা, মিতরা, বগজুরি, দীঘি চান্দইর, নাগরা, তিল্লি এসব এলাকায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা উপলক্ষে যারা মানত করেন তারাই বেশি পূজায় অংশ নেন। বাবা মা সন্তানের রোগমুক্তির জন্য মানত করেন। সন্তানের রোগমুক্তির পর তারা মানত দিতে যান। ধান, চাল, টাকা, ফল, দুধ, হাঁস, মুরগী, ছাগল, কবুতর, হাঁসের ডিম, পাঁঠা ইত্যাদি মানত করা হয়।

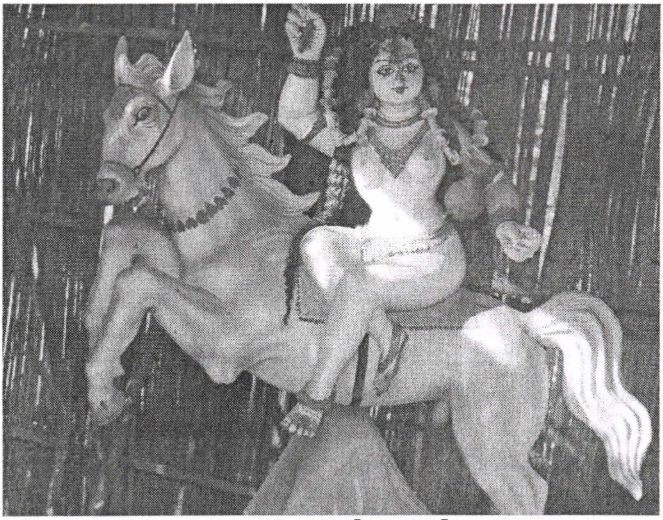

ঘোড়ায় উপবিষ্ট শীতলা দেবী

www.pathagar.com

১৬. নারায়ণ পূজা

নারায়ণ হচ্ছেন লক্ষ্মী দেবীর স্বামী। এক কথায় বলা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ। হিন্দুদের বিশ্বাস নারায়ণ পূজা করলে সংসারের অর্থনৈতিক উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হয়। লক্ষ্মী পূজা বছরে একবার প্রতিমাসহ অনুষ্ঠিত হয়। সাতদিন পর পরও এই পূজা করা যায়, কিন্তু প্রতিমা লাগে না। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার এবং শনিবার নারায়ণ পূজা করা যায়। এ পূজা ব্যয়বহুল নয়। পূজা পরিচালনার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। শনিবারে যদি পূজা হয় তাহলে বারের পূজা এবং নারায়ণ পূজা একসঙ্গে করা যায়। বারের পূজা অর্থ শনির পূজা। দুধ, ময়দা, চিনি ও কলা দিয়ে সামান্য খরচে নারায়ণ পূজা করা হয়।

পঞ্চফল, দুধ, চিনি, ময়দা অথবা আতপ চালের গুড়া ও কলা একত্রিত করে নারায়ণ পূজার প্রসাদ তৈরি করা হয়। পূজা শেষে এই প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রসাদের সঙ্গে মুড়িও দেয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান সবাই প্রসাদ খেয়ে থাকেন। এই প্রসাদ আগুনে জ্বাল দিয়ে তৈরি করা যায় না। সবকিছু কাঁচা তৈরি করা হয়। এটি নারায়ণ পূজার নিয়ম। সবই কাঁচা জিনিস। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। কোনো মূর্তির প্রয়োজন হয় না। বড়ো ঘরের দরজা বরাবর দুয়ারের মাঝখানে একটা কাপড় টাঙিয়ে তার নিচে আসন বানিয়ে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে এই পূজা শেষ করেন। এ পূজায় ক্ষীর, খিচুরি জাতীয় প্রসাদ দেয়া হয় না।

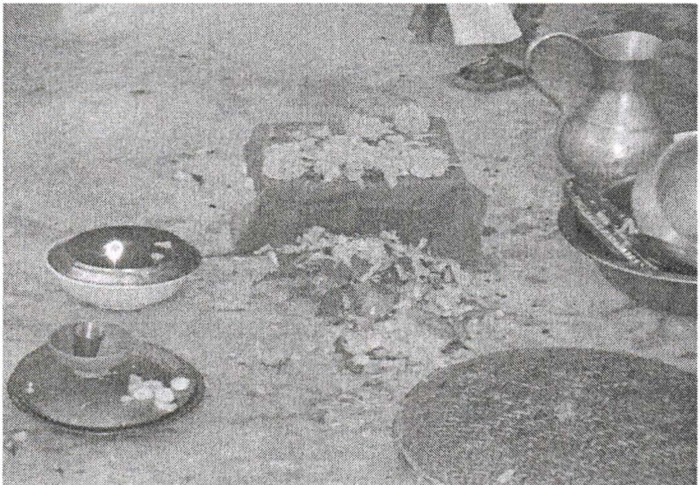

নারায়ণ পূজার আসন

১৭. অর্ধকালী পূজা

অর্ধকালী হচ্ছে কালীর একটি অংশ। পুটাইল ইউনিয়নের নাগরা গ্রামে প্রায় দু'শ বছর আগে থেকে এই অর্ধকালী পূজা চলে আসছে বলে জানা যায়। প্রতি বছর পৌষ

www.pathagar.com

সংক্রান্তি এবং বৈশাখী সংক্রান্তিতে অর্ধকালী পূজা হয়। নাগরা গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের সামনে বিরাট একটি বটগাছ। পশ্চিমে বিরাট একটি পুকুর। চারদিকে ফসলের মাঠ। মাঝখানে শূন্য একটি ভিটিবাড়ি। এই ভিটিবাড়ির মাঝখানে এই মন্দির। এখানে দিনে রাতে একা একা গেলে ভয়ে গা শিউরে উঠে। মন্দিরের ভেতরে এই অর্ধকালীর মূর্তি দণ্ডায়মান। মূর্তিটি প্রায় দু'শ বছরের পুরনো। এটি মাটির তৈরি। কে এই মূর্তি তৈরি করেছে তা কেউ বলতে পারে না। এমনকি নতুন কোনো শিল্পী বা কারিগর এই মূর্তির অনুকরণে মূর্তি তৈরির সাহস করেন না।

পুটাইল ইউনিয়নের নাগরা গ্রামে অর্ধকালী মূর্তি

অর্ধকালীর সামনে মানতের কবুতর দেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

কালী মূর্তিটি নাভি পর্যন্ত মাটির উপরে। নিচের অংশ মাটির মধ্যে প্রোথিত। মূর্তির বিরাট দেহ। কালো রংয়ের চেহারা। বিরাট দুটি হাত দু'দিকে প্রসারিত করে লেলিহান জিহ্বা বের করে মুণ্ডমালা কণ্ঠে ধারণ করে মাটির নিচ থেকে উপরের দিকে উঠছে কালী– এমনি ভাব নিয়ে কালী মূর্তি দাঁড়িয়ে। কালো চেহারা, লকলকে জিহ্বা এবং খড়্গ ধারণ করে কাকে যেন সংহার করবে এমনভাবে মন্দিরের মধ্যে কালী দাঁড়িয়ে আছে।

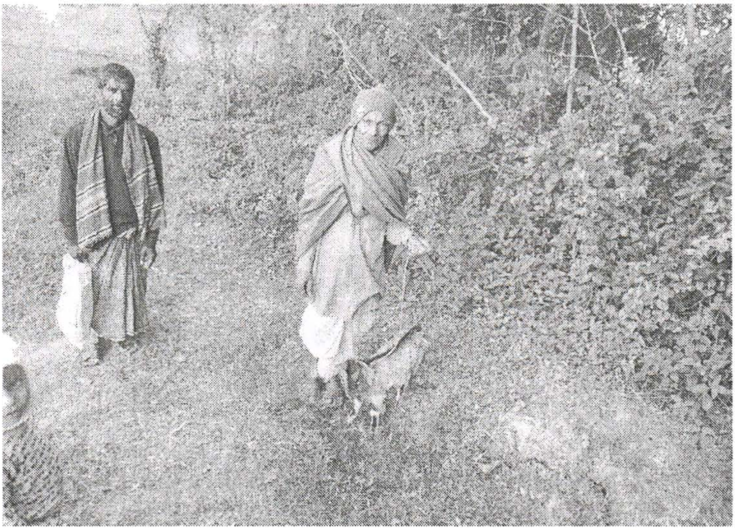

মানতের ছাগল নিয়ে এসেছেন জনৈক মানতকারী

আগের দিনে পূজা উপলক্ষে পূজার পরদিন গরু ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা হতো, পাঠা বলি হতো, উলুধ্বনিতে পুরো এলাকা মুখরিত থাকতো। বর্তমানে সেসব হয় না। অনেকেই তাদের মানতের দ্রব্য নিয়ে পূজার সময় এখানে আসেন। ভক্তবৃন্দ বাতাসা, টাকা, ফল, আগরবাতি, মোমবাতি, দুধ, চাল নিয়ে আসেন। অর্ধকালী পূজা করার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। সাধক ভক্ত মন্ত্র দিয়ে পূজা করে না। মন-দেহ ও সাধনা দ্বারা তারা পূজা করে। বর্তমানে (২০১২ সাল) মন্দির দেখাশুনা করেন শানবাদা গ্রামের দুখীরাম বিশ্বাস (৬৫)। মন্দিরটি সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

১৮. নিমাই চান্দের পূজা

মানিকগঞ্জ জেলা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ভাড়ারিয়া ইউনিয়নের বালিরটেক হাট সংলগ্ন কৃষ্ণপুর গ্রামে নিমাই চান্দের পূজা হয়ে থাকে। এই নিমাই চান্দের পূজা কখন থেকে শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ভারতের শান্তিপুরে নিমাই চাঁদ নামে এক আধ্যাত্মিক পণ্ডিত ব্যক্তির কথা জানা যায়। তিনি আধ্যাত্মিক

www.pathagar.com

সাধনায় পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করার জন্য সংসার ত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তবে মানিকগঞ্জের নিমাই চান্দের পূজা সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো–এ পূজা প্রায় আড়াইশত বছর আগে শুরু হয়েছিল। নিমাই চান্দের পূজায় কাঠের তৈরি একটি নিমাই চাঁন বিগ্রহকে পূজা দেয়া হয়। এখানে ছোট্ট একটি চার চালা টিনের ঘরের ভিতর কাঠের তৈরি একটি ভাস্কর্য রয়েছে। এই ভাস্কর্যটির নাম নিমাই চান। এই কাঠের তৈরি নিমাই চান বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই নিমাই চান্দের পূজার সূচনা হয়।

শোনা যায় কৃষ্ণপুর গ্রামে তুলসীবালা নামে এক মহিলা ছিল। তার সাত ভাই ছিল। একদিন চার ভাই গরু চড়াতে পদ্মার পাড়ে যায়। পদ্মার পাড়ের কাশবন থেকে আজগুবি শব্দ ভেসে আসে "তোরা আমাকে নিয়ে যা"—চার ভাই এই শব্দ শুনে কাশবনের ভিতর যেয়ে দেখে নিম কাঠের তৈরি একটি বিগ্রহ। এই বিগ্রহ থেকে শব্দ হচ্ছে। চার ভাই অবশেষে নিম কাঠের মূর্তি কাঁধে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। একদিন রাতে আবার শব্দ হয়—"তোরা আমাকে পূজা দে, পূজা দিলে তোদের মঙ্গল হবে।" তুলসীবালার বোন মহামায়া সিদ্বেশ্বরী ছিলেন এক সাধিকা। তিনি সমস্ত কিছু বুঝতে পেরে অবশেষে এই নিম কাঠের তৈরি বিগ্রহের চৈত্রী পূজা দেওয়া শুরু করেন। নিমাই চান পূজা দেয়ার আগে ঘর থেকে বের করে ১০ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে কাঁধে করে ঘুরানো হয়। বিভিন্ন জায়গায় এই বিগ্রহ ভ্রমণকে সন্ন্যাস ভ্রমণ বলে। এই নিমাই চান বিগ্রহের নামে রোগমুক্তি, সন্তান-সন্ততি লাভ, মনের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য সব ধর্ম-বর্ণের লোক মানত করে থাকে। সন্ন্যাস ভ্রমণ শেষে কালীগঙ্গা নদীতে সানবান্ধা ঘাটে কাঠের মূর্তিকে স্নান করানো হয়। এই গঙ্গা স্নানে এই এলাকাসহ দূর-দূরান্তের হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে।

নিমাই চান্দের পূজা উপলক্ষে এখানে ১লা বৈশাখ থেকে বিভিন্ন ধর্ম-গোত্রের মানুষ আসে—নিমাই চাঁন নামের মানত সামগ্রী নিয়ে। কেউ নিয়ে আসে 'মাইটা ঘোড়া', জাম্বুরা, নারকেলসহ বিভিন্ন ফল। তাছাড়া অনেকে নগদ টাকা দিয়ে নিমাই চান্দের ঘরের দক্ষিণ দরজায় ভক্তি দিয়ে চলে যায়। চোখের রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকে রূপার তৈরি চোখ মানত করেন। অনেকে পায়ের ব্যথা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মাটির তৈরি ঘোড়া মানত করেন। তাছাড়া ভক্তবৃন্দ দুধ, চিনি, কলা, নানা রকমের ফল, চাল, ডাল নিয়ে আসেন। এই নিমাই চান বিগ্রহের পূজাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণপুর গ্রামে গড়ে ওঠে নিমাই চান্দের মেলা।

১৯. খোদাই শিরনি

কার্তিক মাসের শেষ দিন বা সংক্রান্তির দিন মুসলমানরা এই শিরনি করে। রাস্তার পাশে বা মাঠে সন্ধ্যার সময় যে শিরনি করা হয় তাকে খোদাই শিরনি বলে। খোদা বা আল্লাহর নামে যে শিরনি করা হয় তাই খোদাই শিরনি। আগের দিনে গ্রামে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিত। প্রতিদিন দু'চারজন লোক মারা যেত। তখন গ্রামের মুরুব্বী

www.pathagar.com

বা মাতব্বররা গ্রামবাসীকে ডেকে সভা করতেন এবং সিদ্ধান্ত নিতেন সাতদিন রাতে জিকির করে এরপর শিরনি করতে হবে। প্রত্যেক বাড়ি থেকে প্রতিজন মানুষ হিসেবে এক পোয়া চাল উঠানো হতো। এ চাল বিক্রি করে দুধ, চিনি, গুড় প্রভৃতি ক্রয় করে নদীর পাড়, রাস্তার পাশে, মাঠে এই শিরনি পাক করা হতো এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে এই শিরনি কলাপাতায় বিতরণ করা হতো।

বড়ো ডেকচি বা পাতিলে খোদাই শিরনি প্রস্তুত হচ্ছে

খোদাই শিরনির ভোগ নিচ্ছেন ভাটরা গ্রামের আব্দুল জলিল

www.pathagar.com

১২.১২.২০১১ তারিখ শুক্রবার মানিকগঞ্জের ভাটরা গ্রামে মসজিদের পাশে খোদাই শিরনির আয়োজন করা হয়। এই শিরনির ব্যবস্থা করেন ভাটরা গ্রামবাসী। ভাটরা গ্রামের আবদুল জলিল (৩৯) এই শিরনির পরিচালক। সিদ্ধ চাল বিক্রি করে বাজার থেকে আতপ চাল, গুড়, দুধ, বাতাসা, পান-সুপারি, মোমবাতি, আগরবাতি কিনে নিয়ে আসেন। মদনা বা চিনি চাম্পা কলাও ক্রয় করে নিয়ে আসেন।

মাটির পাতিলে সোয়া সের আতপ চাল, সোয়া সের দুধ, সোয়া সের চিনি এবং চব্বিশটি মদনা কলা মিশিয়ে শিরনি পাক করা হয়। প্রথমে আধা চামচ শিরনি একটি কলাপাতায় রাখেন। এরপর সামান্য কাঁচা দুধ ও কয়েকটি বাতাসা ও কলা একত্রিত করে রাস্তার পাশে রেখে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালিয়ে ভোগ দেয়। ভোগ দিয়ে যেখানে শিরনি পাক করা হবে সেখানে এসে আল্লার নামে তিনটি ধ্বনি দেয়। যে চৌকা বা চুলায় শিরনি পাক করা হয়েছে সেখানেও একটু দুধ, একটা পান, একটু শিরনি দিয়ে পানি ঢেলে চুলার আগুন নিভিয়ে দেয়া হয়। এরপর বড়ো একটি ডেকচিতে প্রচুর পরিমাণ শিরনি পাক করা হয়। এই শিরনি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এ শিরনির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগমুক্তি। একে গাইয়ালি শিরনিও বলা হয়। বর্তমানে এটি আর আগের মতো হয় না। বর্তমানে কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগ নেই বললেই চলে। তথাপি পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য কোনো কোনো জায়গায় এখনও খোদাই শিরনি চালু আছে। এটি একেবারে বিলুপ্ত বা হারিয়ে যায়নি।

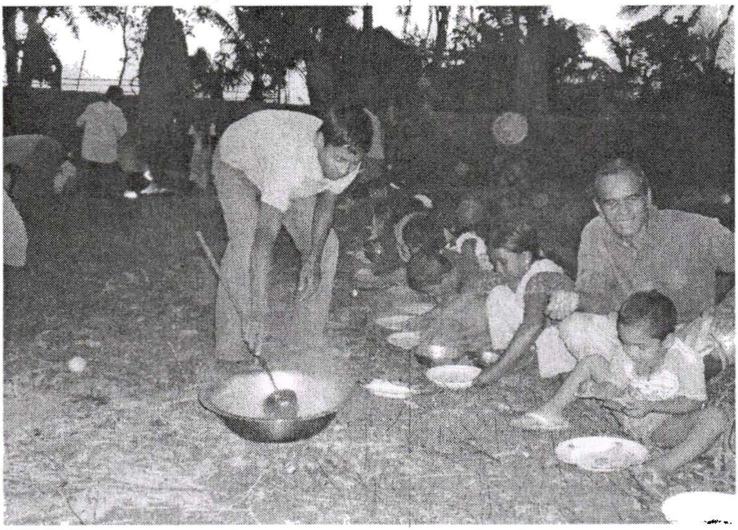

জনগণের মাঝে শিরনি বিতরণ করা হচ্ছে

২০. সাতশা

মানিকগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরাঞ্চলেও বিভিন্ন স্থানে সাতশা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্তান-সম্ভবা কোনো মহিলার গর্ভ সাত মাস পূর্ণ হলে তাকে পিতামাতার

www.pathagar.com

বাড়িতে আনা হয়। তারপর সেখানে যে নিয়ম পালন করা হয় তাকে সাতশা বলে। এটি পালনের জন্য কনের বাপের বাড়িতে চিনি বা গুড় এবং চাউল দিয়ে ক্ষীর রান্না করা হয়। পাতিলের মুখে কোনো ঢাকনা দেয়া হয় না। এরপর পাড়ার আরো তিনজন সন্তান-সম্ভবা মহিলাকে বাড়িতে ডেকে আনা হয়। ক্ষীরের উপরিভাগ যদি সর পড়ার মতো সমান হয়ে থাকে তাহলে পুত্রসন্তান হবে বলে মনে করা হয়। আর যদি উপরিভাগ ফেটে ফেটে যাবার মতো হয় তাহলে মেয়েসন্তান হবে বলে ধরে নেয়া হয়। উপরোক্ত তিন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা মেয়ের মুখে এক এক করে ক্ষীর নিজ হাতে তুলে খাওয়ান। আবার সন্তান-সম্ভবা মেয়েও ওই তিন সন্তান-সম্ভবা মহিলাকে ক্ষীর খাওয়ান। এছাড়া এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যান্য ফলমূল, তৈরি খাবার, মিঠাই-মিষ্টান্ন খাওয়ানো হয়।

২১. হালখাতা

প্রাচীনকাল থেকেই হালখাতা আমাদের লোকসংস্কৃতির একটি বিরাট উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। আজো হালখাতা প্রচলিত আছে। আগের দিনে বড়ো দোকান থেকে বাকি সওদা নিলে বাংলা বছরের পয়লা বৈশাখ দোকানি হালখাতার আয়োজন করে তার দোকানের খরিদ্দারদেরকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করতেন। এ দিনে খরিদ্দারগণও তাদের বাকি পরিশোধ করতেন। হালখাতার দিন দোকানির গদি ঘরে কিংবা দোকানের জায়গায় সুন্দরভাবে সাজানো হয়ে থাকে। দোকানে দোকানে খরিদ্দারদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে। হালখাতা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে আন্তরিকতার সম্পর্ক সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

২২. শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান

শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান মানিকগঞ্জের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। মুসলিম শরিয়ত অনুযায়ী আকিকা দিয়ে নামকরণ করা হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে শিশুর নামকরণ ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। ছেলের জন্য বিজোড় মাসে এবং মেয়ের জন্য জোড় মাসে 'অন্নপ্রাশন' অনুষ্ঠান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে শিশুর নাম রেখে প্রথম মুখে ভাত বা অন্ন তুলে দেয়া হয়।

২৩. অন্নপ্রাশন

অন্নপ্রাশন হচ্ছে নবজাত শিশুর মুখে প্রথম খাবার তুলে দেওয়া। শিশু জন্মের পর প্রাকৃতিক নিয়মে মায়ের দুধ পান করে থাকে। কিন্তু শিশুর বয়স যখন তিন/পাঁচ/সাত মাস হয় তখন রান্না করা খাবার আনুষ্ঠানিকভাবে তার মুখে তুলে দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই লোকাচার পালন করে থাকেন। মুসলমানরা নবজাত শিশুর মুখে প্রথম রান্না করা যে খাবার তুলে দেন তাকে 'শিরনি মুখে দেওয়া' বলা হয়। এই খাবার সাধারণত মিষ্টিজাতীয় হয়। যেমন—বাতাসা, ক্ষীর, সন্দেশ,

www.pathagar.com

রসগোল্লা ইত্যাদি। এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নবজাত শিশুর মুখে প্রথম রান্না করা যে খাবার তুলে দেন তাকে 'অন্নপ্রাশন' বলা হয়।

এদিন শিশুকে গোসল করিয়ে নতুন পোশাক পরিধান করানো হয়। শিশুর কপালে তিলক এবং মাথায় শোলার মুকুট পরানো হয়। এরপর শিশুকে কোলে নিয়ে প্রথমে তুলসী পাতা, জল, ধান, দুধ দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করা হয়। পরে শিশুর মুখে ক্ষীর তুলে দেয়া হয়। এ সময় মহিলারা উলুধ্বনি এবং পুরুষরা হরিধ্বনি দিতে থাকে। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মহাপ্রভুর ভোগের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ময়দা, সয়াবিন তেল ও চিনি দিয়ে লুচি, ভাত, দু'তিন রকমের ডাল, লাবড়া এবং মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়ে থাকে।

০৯.০৯.২০১১ তারিখ শুক্রবার লোকশিল্পী সাইদুর রহমান বয়াতি (বর্তমান গ্রন্থের তথ্য সংগ্রাহক) অন্নপ্রাশন দেখার জন্য কালীগঙ্গা নদীর পূর্ব পাশে অবস্থিত লেমুবাড়ি গ্রামের দাগু মিস্ত্রির বাড়ি যান। দাগু মিস্ত্রির ছেলে সুনীল সূত্রধর। সেদিন ছিল সুনীল সূত্রধরের নাতির অন্নপ্রাশন। শিশুটির নাম গোবিন্দ সূত্রধর। এই উপলক্ষে তারা আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন। অনেক মুসলমান বন্ধু-বান্ধবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মানিকগঞ্জ স্কনের ভক্ত আত্মারাম শ্যাম দাস (পূর্ব দাসরা), সর্বগুণময়ী রাধারানি ও শিলারানি সূত্রধর ভোগের জন্য রান্না-বান্না করেন। গোবিন্দের সেবার জন্য 'গোবিন্দ ভোগ' রান্না করার জন্য তারা কোনো সম্মানী নেননি।

নয় মাসের শিশু গোবিন্দকে গোসল করিয়ে নতুন পোশাক পরিধান করানো হয়। শিশুর কপালে তিলক এবং মাথায় শোলার মুকুট পরানো হয়। শ্যামদাস শিশুকে কোলে নিয়ে প্রথমে তুলসী পাতা, জল, ধান, দুধ দিয়ে শিশুকে আশীর্বাদ করেন এবং পরে শিশুর মুখে ক্ষীর তুলে দেন। এসময় বাদকদল ক্ল্যানুয়েট, কর্নেট, সাইড ডাম, বিগ ড্রাম, কাসর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সমগ্র এলাকা মুখরিত করে তোলে। মহিলারা উলুধ্বনি এবং পুরুষরা হরিধ্বনি দিতে থাকে। হিজলাইনের 'ত্রিনাথ সংস্কৃতি সংঘ' ভোগ-আরতি গাওয়ার জন্য আসেন। প্রথমে তারা দাঁড়িয়ে আসরে কুমদকান্ত সরকার রচিত ভোগ-আরতির গান শুরু করেন।

গৌর নিতাই এসো দুই ভাই বলে
এমন মধুর নাম কে শুনাল
দূরে কেন আসো আমার কাছে।

এরপর রাধা বল্লভ সরকার রচিত—

প্রাণ পাখি পিঞ্জিরায় বসে
লওরে হরি নাম
ঐ নামে যাবে ভব ব্যাধি
পাবেরে আরাম ॥

www.pathagar.com

ঐ নাম হয় জীবের ঔষধি
প্রাণ খুলিয়া ডাকবি যদি
দূরে যাবে ভব ব্যাধি।

বিজয় সরকার রচিত ভোগ-আরতির শেষ গান ছিল—

ভজ পতিত পাবন গৌর হরি
শ্রী গৌর হরি নবদ্বীপ বিহারি।

গান শেষ হওয়ার পর আসরে উপস্থিত সবাইকে সেবার ব্যবস্থা করা হয়। খেজুর পাতার পাটি ও চট বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়। খাবারের মধ্যে ছিল গরম ভাত, মিষ্টি লাউ, কলার থোড়, ডাল, আলু, বাদাম, ঘি, নানা ধরনের সবজি দিয়ে লাবড়া, দু'পদের ডাল, ঝালবিহীন সুকদ ডাল এবং কাওরা ডাল (ঝালযুক্ত)। সবশেষে দেয়া হয় পায়েস। এভাবে আনন্দ ও চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যমে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান শেষ হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে মানিকগঞ্জে প্রায় সব হিন্দু বাড়িতে 'অন্নপ্রাশন' পালন করা হয়ে থাকে। মুসলমানরা এভাবে ঘটা করে অনুষ্ঠান না করে মসজিদে শিশুকে নিয়ে যায় এবং মসজিদের ইমামকে দিয়ে শিশুর মুখে শিরনি তুলে দেন।

২৪. খতনা

পুত্রসন্তানের বয়স চার থেকে ছয় বছর হলে বাড়িতে হাজাম (যারা খতনা করে থাকে) ডেকে তার খতনা করে নেয়া হয়। এটিকে সুন্নত করা বা মুসলমানি করাও বলা হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও এ উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরকে দাওয়াত করা হয়ে থাকে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা ওই সন্তানকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে থাকে।

২৫. চল্লিশা

কোনো ব্যক্তি মারা গেলে সেই বাড়িতে চল্লিশ দিন পর মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাত কামনা ও বাড়িতে যাতে সবাই সুখে থাকতে পারে সে জন্য মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ দিন পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয়।

২৬. বৃক্ষ উপাসনা

প্রাগ-ঐতিহাসিক কাল থেকেই বন-বৃক্ষদেবতার উপাসনা মানুষের একটি অন্যতম বিশ্বাস ও লোকাচার হিসাবে চলে আসছে। সিন্ধু সভ্যতায় ধর্ম বিশ্বাসের অন্যতম অঙ্গ ছিল বৃক্ষ উপাসনা। মানিকগঞ্জে লোকায়ত বিশ্বাসের মধ্যে বৃক্ষ উপাসনা একটি অন্যতম উপাদান। মানিকগঞ্জের বহু জায়গায় এই উপাসনা দেখা যায়। তবে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার চালা ইউনিয়নের অন্তর্গত লাউতা গ্রামে আনুমানিক তিনশত বছর আগে থেকে 'অচিন গাছ' নামে একটি বৃক্ষের উপাসনা করে আসছে এখানকার হিন্দু মুসলমান সবাই। ঝিটকা হরিরামপুর রাস্তার ধারে লাউতা গ্রামে এখলাছ উদ্দিন মোল্লার ছেলে রিয়াজ উদ্দিন মোল্লার (৬০) বাড়ির রাস্তার ধারে পরিত্যাক্ত জায়গায় এই কথিত অচিন বৃক্ষটি রয়েছে। ২০১৩ সালের ১৪ই জানুয়ারি সকাল ১১টায় রিয়াজ

www.pathagar.com

উদ্দিন মোল্লার সঙ্গে কথিত অচিন বৃক্ষ নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি জানান আগে থেকেই অচিন গাছটি বর্তমান স্থানে আছে। এই গাছ তার পূর্বপুরুষরা আসামের কুচার থেকে এনেছিল। তার পূর্বপুরুষরা কবিরাজ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা এই প্রজাতির গাছ চিনতে না পেরে একে 'অচিন গাছ' বলে ডাকে।

হরিরামপুর এলাকা এক সময় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। তাই এই বৃক্ষ পূজা অর্চনার ক্ষেত্রে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই অচিন গাছে হিন্দু মুসলমান সবাই যার যার মতো পূজা, ভক্তি, প্রণাম, মোমবাতি প্রজ্বলন প্রভৃতি উপায়ে উপাসনা করে থাকে। এখানকার হিন্দু রমণীগণ পুত্র সন্তানাদি লাভ, বাড়িঘর, পুত্র, কন্যা, স্বামী, আত্মীয়-স্বজন সবার কল্যাণের জন্য এই 'অচিন গাছের' উপাসনা করে থাকেন। তারা এই অচিন গাছকে দেবতা বলে মানেন এবং হিন্দুমতে বেলপাতা, ফুল, জল, সিঁদুর দিয়ে নিজেদের মঙ্গলের জন্য পূজা দেন। গোসল ছাড়া অপবিত্র অবস্থায় তারা গাছের কাছেও যান না। এই গাছের গোড়ায় প্রতিদিন মানুষ মিষ্টি, বাতাসা, দুধ, কাপড়, মাটির ঘোড়া, পুতুল, হাঁস, মোরগ, প্লাস্টিকের হাত, পা ইত্যাদি মানত হিসাবে রেখে যায়। কারো হাত-পা ভেঙে গেলে এবং মানত করে ভালো হলে প্লাস্টিকের হাত-পা অথবা 'মাটির ঘোড়া' দিয়ে যায়।

'অচিন গাছ' এর বর্তমান মালিক বলেন, এই গাছকে নিয়ে অনেকে ব্যবসা করতে চায়। এখানে প্রতিবছর আনুষ্ঠানিক উৎসব করতে চায়। কিন্তু তিনি তা করতে দেন না। অনেকের গাছটির চারপাশে পাকা করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান মালিক রিয়াজ মোল্লা তা নির্মাণ করতে দেন না।[১২]

২৭. দুলী পাগলীর মাদারের আসন

মুনি, ঋষি, সাধু, দরবেশ বা পির-ফকিরদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করার বা ভক্তি করার যে প্রথা সনাতন ধর্মে প্রচলিত তা মুসলিম সমাজেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। মুসলিম পির ফকিরের মধ্যে মাদারিয়া সম্প্রদায়ের এক প্রকার পির ফকির আছেন। তারা মাদার নামের শিরনি, মাদার বাঁশ, মাদার নামের ধ্বনি দিয়ে জ্বলন্ত আগুনের উপর হেঁটে যাওয়া ইত্যাদি করে থাকেন। একসময় মাদার ফকিরের মস্তবড়ো আয়োজন ছিল মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার ভাকলা গ্রামে দুলী পাগলীর আস্তানায়। প্রায় পৌনে তিনশত বছর আগে ভাকলা গ্রামের দুলী পাগলী দমের মাদারের আচার-অনুষ্ঠান করতেন। তার মুরুব্বীরা মাদারের বাঁশ নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল ডাল সংগ্রহ করতো তারপর শিরনি হতো। দুলী পাগলীর জীবদ্দশায় আস্তানায় মাদারের আসন স্থাপন করা হয়। সেই আসনটির মধ্যে ছিল বালু সিমেন্ট দিয়ে তৈরি কলসি সদৃশ দেড় ফুট লম্বা একটি বস্তু। এই মাদারের আসনে সবাই ভক্তি করতো। সেই পৌনে তিনশত বছর আগে থেকে আজ অবধি দুলী পাগলীর মাজার সংলগ্ন আস্তানায় মাদারের আসনে মানুষ ভক্তি প্রণাম করে আসছে। তবে এখন আর সেই আগের মতো মাদার বাঁশ বের হয় না। তবে মাদারের আসনের যাবতীয় কর্মাদি সম্পন্ন হয়।[১৩]

১১ জানুয়ারি, ২০১৩ আস্তানায় গিয়ে দেখা যায় সেখানে হিন্দু রমণীদের উপস্থিতি বেশি। হিন্দু মুসলমান সবাই একইভাবে আসনের সামনে এসে আদবের সাথে বসে কেউ দুহাত জোড় করে প্রণাম করছে, কেউ ভক্তি দিচ্ছে। হাজার হাজার নর-নারী

www.pathagar.com

কোলের ছোট্ট শিশুসহ হাজির হয়েছে। কেউ এসেছে মোরগ-হাঁস নিয়ে, কেউবা এসেছে ব্যাগ ভর্তি করে চাল, ডাল, কলা, দুধ নিয়ে। অনেকে ছাগলও আনে মানতি দেওয়ার জন্য। অনেকে নগদ টাকাও দিচ্ছে। আস্তানায় লাল রঙের কলসি বা গম্বুজ সদৃশ্য বস্তুটির সামনে সমতল আসন আছে আর এই আসনের সামনে লম্বাকৃতির গর্ত করে কিছু ধূলামাটি রাখা আছে। আগত ব্যক্তিগণ আসনে ভক্তি বা প্রণাম করে এই ধূলো গায়, কপালে মেখে নেয়। কেউ কেউ আবার সামান্য পরিমাণ মাটি কাগজে করে পেঁচিয়ে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ভাকলা গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ মাষ্টার (৮০) বলেন, "মুরুব্বীদের দেখেছি এই কাজ করতে, এখনও তাই দেখছি। যুগ পাল্টে গেলেও এই মাদার আসনের প্রতি মানুষের ভক্তি বিশ্বাস কমে নাই। আগের চেয়ে মানুষ আরো বেশি হয়।" ভাকলা গ্রামের আয়নাল উদ্দিন মেম্বার (৭০) বলেন, "সারা বছরই লোকজন এখানে আসে। এখানে এসে সবার মনের বাসনা পূর্ণ হয়, তাই আসে। তিনি জানালেন এখানে এসে অনেকের অন্ধ চোখও ভালো হয়ে গেছে। তার বদলে ঐ লোক স্বর্ণের চোখ মানতি দিয়ে গেছে। দুলী পাগলীর মাদারের আসনে ভক্তি প্রণাম করে সকল ধর্মের সকল মানুষ একটা জিনিসই কামনা করে, তাহলো নিজের মনকে সন্তুষ্ট করা এবং একটু সুখে শান্তিতে বসবাস করা।"

২৮. নতুন ঘর তৈরি সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান

নতুন টিনের ঘর তৈরি করার পূর্বে এক ধরনের আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বর্তমানেও এই রেওয়াজ প্রচলিত আছে। নতুন ঘর তৈরিকে একটি শুভক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়। তাই ঘরের প্রথম খুঁটি গাড়ার সময় এই বিশেষ ক্ষণ বা মুহূর্তকে শুভক্ষণ বলা হয়। ঘরের পশ্চিম কোণে প্রথম বাঁশ বা কাঠের খুঁটি গাড়া হয়। খুঁটি গাড়ার আগে খুঁটিকে ধান, দূর্বা, সিঁদুর দিয়ে বরণ করা হয়। ঘরের মালিকের স্ত্রী প্রধান মিস্ত্রিকে একটি নতুন গামছা ও নগদ অর্থ দেন। ঘর তৈরির সময় সমবেত বাচ্চা ছেলেমেয়ে, নারীপুরুষের মধ্যে বাতাসা বিতরণ করা হয়। ঘরের ভিটির মাঝখানে মাটির কলসি ভর্তি পান ও কলসির মুখে আমগাছের ডগা ভেঙে দেওয়া হয়। এই আচার অনুষ্ঠান পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো ঘরে বসবাসকারী লোকজনের সার্বিক মঙ্গল কামনা এবং নানা বিপর্যয় থেকে ঘরকে রক্ষা করা।

২৯. ওরস

খাজা বাবার ওরস

খাজা বাবার ওরস বাংলাদেশে একটি বিরাট সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। শহরে ও গ্রামে বিপুল সংখ্যক মানুষ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় গাম্ভীর্য নিয়ে এই ওরস পালন করেন। শহরের বিভিন্ন মাজার এবং পাড়া মহল্লায় লাল সালু দিয়ে ঢেকে খাজার ডেকচি বসানো হয়। তেমনি গ্রামেও খাজা বাবার আস্তানা গড়ে উঠেছে। এখানে খাজা ভক্তরা খাজা বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদান করে তাঁকে স্মরণ করে। খাজা বাবার ওরস বাংলাদেশের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

www.pathagar.com

খাজা বাবা মাঈনদ্দিন চিশতি (রঃ) এর দরবার শরিফ

পালরা চিশতিয়া দরবার শরিফে খাজা বাবার ওরস

গাবতলি-বালিরটেক সড়কে বেতিলা মোড়ে পালরা বাজার। প্রতিদিন সকালে মাছ, তরিতরকারি ও দুধের বাজার বসে। এখানে একটি প্রাচীন বটগাছ ও শ্মশান রয়েছে। এই বটগাছের পশ্চিমপাশে ছোটো একটি বটগাছের গোড়ায় চিশতিয়া দরবার শরিফ তৈরি করা হয়েছে। ওপরে টিনের ছাউনি। চারদিকে লাল কাপড় দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে। গাছের গোড়া ইট সুরকি দিয়ে পাকা করা। প্রতিবছর এখানে ওরস হয়। খাজা বাবার ভক্তবৃন্দ রাতে ভাবসংগীত পরিবেশন করে।

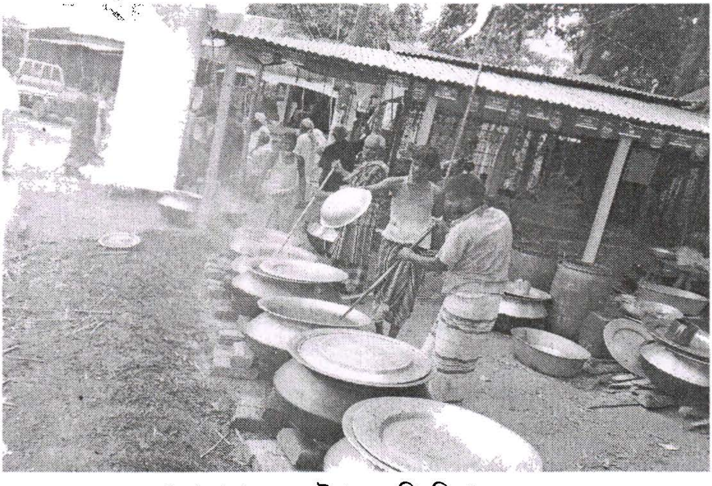

খাজা বাবার ওরস উপলক্ষে শিরনি প্রস্তুত হচ্ছে

www.pathagar.com

প্রতি বছর রজব মাসের ৩০ তারিখে বাজার কমিটির মিলিত প্রচেষ্টায় এই ওরস উদ্‌যাপিত হয়। খাজা বাবার ওরসের দু'তিন মাস আগে থেকে এখানে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে ডেকচি বসানো হয় নগদ টাকা সংগ্রহের জন্য। তাছাড়া ভক্তরা গরু, চাল, ডাল, তেল, মসলা নিয়ে আসেন। অনেকে নগদ টাকা পয়সাও দেয়। শিরনি হয় ডাল, চাল ও সবজির খিচুরি। সন্ধ্যার পূর্বে মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আসর বসে। মিলাদ শেষে ভক্তদের মধ্যে শিরনি বিতরণ করা হয়। দিনব্যাপী কোরান শরিফ খতম করা হয়।

এছাড়াও সিংগাইর উপজেলার নয়াবাড়ি গ্রামে লোকচিকিৎসক কুরবান আলী ব্যক্তিগতভাবে খাজা বাবার ওরস পালন করেন। তাঁর কিছু ভক্ত আছে। তিনি নিজ বাড়িতে খাজা বাবার আস্তানা তৈরি করেছেন। তাঁর স্ত্রীও খাজা বাবার একজন ভক্ত। এখানে পুরুষ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলারাও উপস্থিত হন। রাতে ভক্তদের মধ্যে তবাররক বিতরণ করা হয়। নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে এই ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

সিংগাইর উপজেলার বাঙ্গালা গ্রামে পবিত্র ওরস

সিংগাইর উপজেলার বাঙ্গালা গ্রামে জাহির আলী বয়াতি (জাহির পাগলা)-এর স্মরণে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ বছর ধরে এই ওরস পালিত হচ্ছে। জাহির বয়াতি জারিগানের একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। আসরে গান গাওয়ার সময় তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠতো হাসি। তিনি আসরে আইয়ুব নবী ও ইসমাইল কোরবানির জারি পরিবেশন করতেন। তিনি ঝিটকাস্থ দিয়াইল গ্রামে আবদুর রশীদ পির সাহেবের নিকট ওয়ায়েছিয়া তরিকার মুরিদ হন। বাইতরা গ্রামের প্রখ্যাত কবিয়াল রাধা বল্লভ সরকারের নিকট হিন্দুশাস্ত্র সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। পরে তিনি নিজে পির হন। তাঁর কিছু মুরিদ বা শিষ্য আছে। তাঁর বড়ো ছেলে তাঁর মৃত্যুদিবস উপলক্ষে প্রতিবছর ওরস করে। ওরস উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ চাল, ডাল ইত্যাদি নিয়ে আসে। অনেক পাগল সন্ন্যাসী আসে। তারা গাঁজা সেবন করে। শিরনি পাক করা হয়। ভক্তদের মধ্যে শিরনি বিতরণ করা হয়। এরপর গানের আসর বসে।

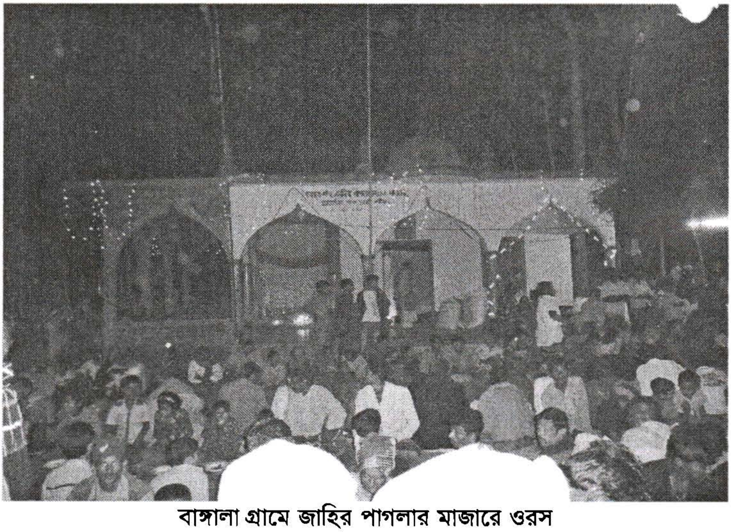

বাঙ্গালা গ্রামে জাহির পাগলার মাজারে ওরস

www.pathagar.com

৩০. বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান

মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান

ইসলাম ধর্মে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ের মাধ্যমে সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ জাগ্রত হয়। বিয়ে মানব জীবনের আদি ও অনন্তকালের একটি চিরন্তন রূপ। এটি মানব সভ্যতার সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মানিকগঞ্জে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়েতে তিনদিন ব্যাপী উৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন যে আচার পালিত হয় তাকে তেলাই দেওয়া বলে। ছেলে বা মেয়েকে সন্ধ্যার সময় একটি কাঠের পিঁড়িতে বসিয়ে গোসল করানো হয়। ছেলে বা মেয়েকে বড়ো ভগ্নিপতি বা দাদা বা নানা কোলে করে ঘরে নিয়ে যান এবং মিষ্টিমুখ করান। সন্ধ্যার পর হলুদ বেটে ছেলে বা মেয়ের গায়ে হলুদ মাখা হয়। একে 'তেলানো' বা গায়ে হলুদও বলা হয়। বিয়ের দিন ছেলে বা মেয়েকে গোসল করানো হয়। এরপর নতুন জামা কাপড় পরানো হয়। এসময় মেয়েরা গান গেয়ে থাকেন। বিয়ের প্রথম দিন ছেলে বা মেয়ের বাড়িতে ছেলের মাকে বা মেয়ের মাকে গোসল করানো হয়। ঘরের সামনে একটি জায়গা মাটি দিয়ে লেপা হয়। মাঝখানে মাটির কলস ভর্তি পানি রাখা হয়। কলসির মুখে আমের ডগা রাখা হয়। বিয়ের তিন দিন পর অর্থাৎ বৌ ভাতের দিন বা ফিরানির দিন ঐ পানি দিয়ে ছেলে বা মেয়েকে গোসল করানো হয়।

সাধারণত কনের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন হয়ে থাকে। বরপক্ষ কনের বাড়িতে আসে। তাদের বসবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। বর এবং কনেকে প্রথমেই এক সাথে বসানো হয় না। বিয়ে পড়ানোর সময় বর এবং কনেকে একত্রে বসানো হয় এবং কাজি বিয়ে পড়িয়ে থাকেন। বিয়ের অনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে বরপক্ষ কনেকে নিয়ে বরের বাড়ি চলে আসেন। বিয়ের দিন তিনেক পর বরের বাড়িতে বৌভাত অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কনেপক্ষ বরের বাড়িতে যান।

কাফাটিয়া গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে ছেলের হাতে মেহেদি দেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

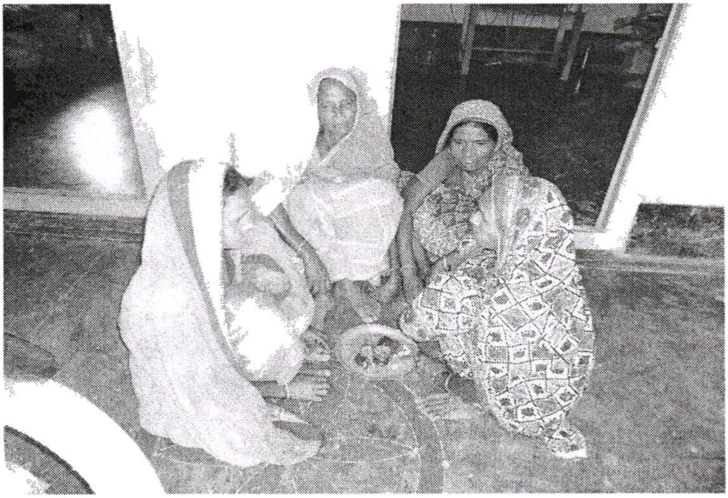

বিয়ের গীত পরিবেশন করছেন গীতালিগণ

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান মুসলমান সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন ধরনের। মুসলমানদের বিয়ে হয় ঘরের মধ্যে। হিন্দুদের বিয়ে হয় ঘরের বাইরে। হিন্দু বিয়ে উপলক্ষে বড়ো ঘরের সামনে চারটি কলাগাছ চারকোণে পোঁতা হয়। রং বেরঙের কাগজ দিয়ে বাসর তৈরি করা হয়। এই বাসর হতে হয় কনের বাবার বাড়িতে। বাসর সাজিয়ে এর মাঝখানে আলপনা আঁকা হয়। উত্তরপাশে শিলপাটা বা মসলা বাটার পাটা রাখা হয়।

বিয়ের জন্য কুলায় করে ধান-দূর্বা নেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

হিন্দু বাড়ির বিয়ের আলপনার উত্তর পাশে রাখা শিলপাটা

লেমুবাড়ি গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে

www.pathagar.com

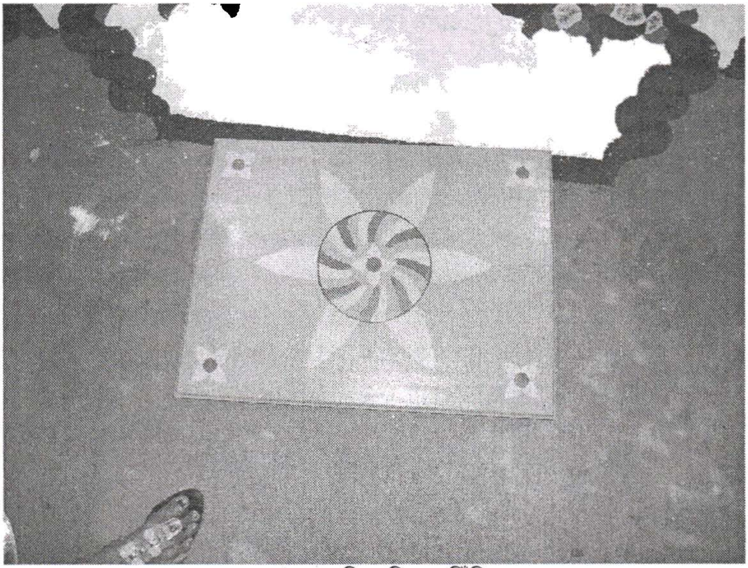

আল্পনা অঙ্কিত বিয়ের পিঁড়ি

বিয়ে পড়ানোর সময় বর পাটায় বসে এবং কনে ছেলের সামনে বসে। আলপনা অঙ্কিত পিঁড়া বা কাপড়ের তৈরি আসনে মেয়েকে বসানো হয়। মেয়ের সামনে ছয় আঙুল দৈর্ঘ্য ও ছয় আঙুল প্রস্থের চারকোণা বিশিষ্ট একটি পুকুর কাটা হয়। পাশে একটি চৌকিতে বসেন ঠাকুর বা পুরোহিত। বেলপাতা, তুলসী পাতা, দূর্বাঘাসের মাথা, পাঁচটি হরিতকি, নতুন জামা, ধুতি প্রভৃতি নৈবেদ্য সাজিয়ে বিয়ের কাজ শুরু হয়। ঠাকুর মন্ত্র পাঠ করেন। বর ও কনে তুলসী পাতা, ফুল ও জল ঐ পুকুরে দিতে থাকেন। পঞ্জিকার মতে শুভলগ্নে বিয়ে পড়ানো শুরু হয়। মন্ত্র পাঠ করে বিয়ে সম্পাদনের পর ছেলেকে সাতপাক মেয়ের চারপাশে ঘুরিয়ে আনা হয়। এটাকে বলা হয় সাত পাকে বাঁধা। এরপর মালা বদল হয়। ছেলের মালা মেয়ের গলায় এবং মেয়ের মালা ছেলের গলায়। হিন্দুদের বিয়ে দু'দিন হয়। প্রথমদিনকে বলা হয় হাজ বিয়া ও দ্বিতীয় দিনকে চলা হয় বাসি বিয়া। এই দু'দিনে বিয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন মেয়ের পিতামাতা। হিন্দুদের বিয়েতে মুসলমানদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রথমদিন মুরগির মাংস, বিরানি, দধি ও মিষ্টান্ন খাবার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে লুচি ও ডাল নাস্তা হিসেবে দেওয়া হয়। দুপুরে মাছ ও ভাত খাবার দেওয়া হয়।

৩১. গাস্যি

লোকচিকিৎসক, ফকির, কবিরাজ, সাধু, তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসকদের এটি একটি বাৎসরিক বিষু বা দিনক্ষণ। আশ্বিন মাসের শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিবাগত

www.pathagar.com

রাতে গাস্যি পালন করা হয়। ঐদিন রাতে লোকচিকিৎসক, ফকির ও কবিরাজরা লোকজনের চিকিৎসা করেন এবং সারারাত গান বাজনা হয়। এসব গানকে বলা হয় বৈঠকি গান। গাস্যির শ্লোগান হচ্ছে 'আশ্বিনে জাগায়, কার্তিকে খায়, যে বর মাঙ্গে সে বর পায়।'

জাগায় শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐদিন রাতে বরই পাতা, পেয়ারা পাতা, কাঁচা হলুদ, জীবিত একটি শামুক, পাটপাতা, কচুরিপানা, ধানের থোড়, কিছু সরষে, শুকনো মরিচ, আদা, নারিকেল, তালের আঁটি বা দানা দিনের বেলায় যোগাড় করে বাড়ির বড়ো ঘরের সামনে এক জায়গায় জমা করে রাখা হয়। একে বলা হয় 'জাগানো'। শেষ রাতে লোকজন ঘুম থেকে উঠে ঐখানে বসে। পাটের খড়ি দিয়ে আগুন জ্বালায় এবং জ্বলন্ত আগুনে নিজের গায়ে তাপ লাগায়। জাগানো ঐসব জিনিস থেকে কিছু কিছু জিনিস চিবাতে হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। একে বলা হয় গাস্যি জাগানো। হিন্দু বাড়িতে মেয়েরা বসে উলুধ্বনি দেয় এবং প্রার্থনা করে বলে, "গাস্যি ঠাকুর, আমাদেরকে সারা বছর রোগমুক্ত রাখিও।"

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে জাগানো বিভিন্ন পাতা বেটে গায়ে মেখে গোসল করা হয়। গোসল সেরে এসে তালের দানা বা আঁটি থেকে শাঁস বের করে খাওয়া হয়। তাছাড়া নারকেলও খাওয়া হয়। এরপর আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল এসব ফলের গাছে পাটের 'কাস্টা' বেঁধে দেয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এর ফলে ফলের গাছে ফল ধরবে এবং গাছের রোগব্যাধি হবে না।

১৮.১০.২০১১ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বাঙ্গালা গ্রামের নরেশচন্দ্র শিলের বাড়িতে গাস্যি হয়। নরেশচন্দ্র শিল জানান, লোকনাথ পঞ্জিকার তারিখ মতে আশ্বিন মাসের সাকরাইন বা সংক্রান্তির দিন তারা এই গাস্যি পালন করে থাকেন। তার পূর্ব পুরুষরা এটি করতেন, তাই তারাও করেন। গাস্যির পরের দিন তারা সকালে খালি পেটে একটু কাঁচা তেঁতুল পুড়িয়ে খান। তাতে সারাবছর তাদের শরীরে খুজলি, পাচড়া হবে না। তাছাড়া আগুন জ্বালিয়ে শরীরে তাপ নিয়ে থাকেন, এতে শরীর রোগমুক্ত থাকে।

পার্শ্ববর্তী ছানোয়ার হোসেন নামক জনৈক মুসলমানের বাড়িতে গাস্যি জাগাতে দেখা যায়। সেখানে দেখা যায় পানি ভর্তি একটি মাটির ছোটো হাঁড়ির মুখে আমপাতার একটি ডাল দেয়া। একটি নারকেল, চালকুমড়া ও তরমুজে সিঁদুর দিয়ে সুন্দরভাবে আলপনা আঁকা হয়েছে। দু'তিনটা শামুকও সেখানে রাখা আছে। সকালবেলায় হলুদ, নিমপাতা, বরই পাতা, পাটের দানা, সরষে আলাদাভাবে পাটায় বেটে নেয়া হয়। এগুলো গায়ে মেখে মুসলমান নারী পুরুষকে পুকুরে গোসল করতে দেখা যায়। গোসল সেরে এসে তারা কাঁচা হলুদ, তেঁতুল পোড়া খায় এবং হাঁড়ি থেকে একটু পানি খায়।

পূর্বে গাস্যিকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর কালিয়াকৈর কেবল সাধুর বাড়ি, জহুরুদ্দি ফকিরের বাড়ি মেলা বসতো এবং জারিগান ও কবিগান হতো। বর্তমানে এভাবে গান হয় না। তবে রাতের বেলায় বৈঠকি গানের আসর বসে।

www.pathagar.com

৩২. মৃত্যুবার্ষিকী পালন

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার ঘিওর পূর্বপাড়া গ্রামে বহুকাল হতে মরহুমের বিদেহী আত্মার স্মরণে এলাকার স্থানীয় মসজিদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় মিলাদ মাহফিল, দোয়া এবং দুপুরে মহল্লার পুরুষ ও মহিলাদের খিচুরি ও পায়েস খাওয়ানো হয়।

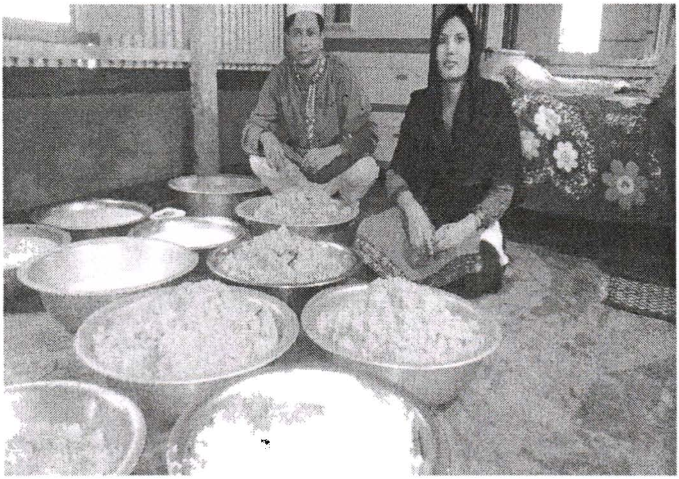

মরহুম রেয়াজউদ্দিনের বাড়িতে মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত পায়েস ও খিচুরি

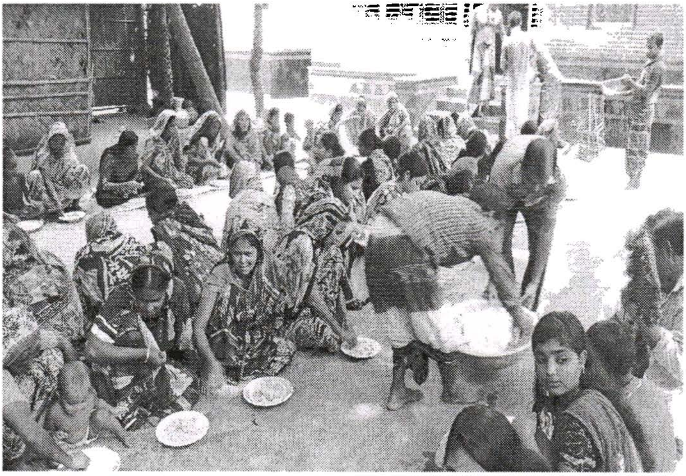

মৃত্যুবার্ষিকীতে এলাকাবাসীকে খিচুরি খাওয়ানো হচ্ছে

www.pathagar.com

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পায়েসের দুধ এলাকার বিভিন্ন পরিবার হতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এমনি একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির সচিব ও 'লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ' কর্মসূচির পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেন। এটি ছিল ঘিওর উপজেলার ঘিওর পূর্বপাড়া গ্রামের মরহুম রেয়াজউদ্দিনের বাড়িতে। প্রতি বছর মে মাসের তৃতীয় শুক্রবার বাদ জুম্মা মিলাদ মাহফিল এবং দোয়া অনুষ্ঠিত হয় ও মাংস খিচুরি দিয়ে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মনীন্দ্র শীল, বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম : লেমুবাড়ি, ইউনিয়ন : পুটাইল, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১১.১০.২০১১, স্থান : নিজ বাড়ি; রূপালী রাণী শীল, স্বামী : মনীন্দ্র শীল, বয়স : ৪২ বৎসর, গ্রাম : লেমুবাড়ি, ইউনিয়ন : পুটাইল, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১১.১০.২০১১, স্থান : নিজ বাড়ি

২. নরেশচন্দ্র মনিদাস, গ্রাম : তিল্লি, ইউনিয়ন : তিল্লি, উপজেলা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০১.১২.২০১১, স্থান : পূজা মণ্ডপ

৩. গোপাল চক্রবর্তী, পেশা : পুরোহিত, গ্রাম : গড়পাড়া, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা: মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০১.১২.২০১১, স্থান : পূজা মণ্ডপ

৪. সুকুমার সাহা, বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম : দাশড়া, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২, সময় : সকাল ১১টা

৫. স্বপন কুমার ঘোষ, বয়স : ৩৫ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : হাটিপাড়া, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৭.০৩.২০১২

৬. তেজেন্দ্র রাজবংশী, বয়স : ৬০ বৎসর, গ্রাম : বালিয়াবিল, ইউনিয়ন : পুটাইল, উপজেলা: মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৩.০৪.২০১২; নিরোদচন্দ্র রাজবংশী, বয়স : ৪৫ বৎসর, গ্রাম : বালিয়াবিল, ইউনিয়ন : পুটাইল, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৩.০৪.২০১২

৭. আনন্দ চন্দ্র রাজবংশী, বয়স : ৪৮ বৎসর, পেশা : মাছের ব্যবসা, গ্রাম : বালিয়াবিল, ইউনিয়ন : পুটাইল, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৩.০৪.২০১২

৮. সুনীল চন্দ্র দাস, বয়স : ৫০ বৎসর, গ্রাম : সরুন্ডি, পৌরসভা : মানিকগঞ্জ, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৩.০৫.২০১২

৯. প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, বয়স : ৫৬ বৎসর, গ্রাম : দক্ষিণ খল্লী, ইউনিয়ন : ধানকোড়া, উপজেলা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ

১০. সোহরাব হোসেন, বয়স : ৪০ বৎসর, গ্রাম : খোর্দ্দ খোলা, ইউনিয়ন : ধানকোড়া, উপজেলা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ

www.pathagar.com

১১. রফিকুল ইসলাম, বয়স : ৫৪ বৎসর, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : খল্লী, ইউনিয়ন : ধানকোড়া, উপজেলা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ

১২. রিয়াজ উদ্দিন মোল্লা, পিতা : এখলাছ উদ্দিন মোল্লা, বয়স : ৬০ বৎসর, গ্রাম : লাউতা, ইউনিয়ন : চালা, থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৪.০১.২০১৩ সময় : সকাল ১১টা, স্থান : নিজ বাড়ি; দশমী রানী, বয়স : ৬৫ বৎসর, গ্রাম : লাউতা, ইউনিয়নঃ চালা, থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৪.০১.২০১৩; নারায়ণ বিশ্বাস, বয়স : ৪৫ বৎসর, গ্রাম : লাউতা, ইউনিয়ন : চালা, থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৪.০১.২০১৩

১৩. পর আলী, বয়স : ৯০ বৎসর, গ্রাম : ভাকলা, থানা : শিবালয়, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১১.০১.২০১৩, সময় : বিকেল ৪টা

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

মানিকগঞ্জ জেলার সাধারণ খাদ্যগুলো হলো : ভাত, মাছ, ডাল, আলু, খিচুরি, রুটি এবং গরমের দিন পান্তাভাত ইত্যাদি। এই খাবারগুলো সাধারণত সকল উপজেলায় প্রচলিত। প্রধান খাদ্যশস্য ধান হওয়ার কারণেই এই অঞ্চলের প্রধান খাদ্য ভাত। এর সাথে আলুর তরকারি, আলুর ডাল, আলুভর্তা অনেকেরই প্রিয়। তবে আধুনিককালে ভুনা খিচুরি, পরোটা, পোলাও, তেহেরি, বিরানি, মোগলাই পরোটা, তন্দুর রুটি ইত্যাদি সুখাদ্য হিসেবে পরিচিত। মানিকগঞ্জের বিশেষ লোকখাদ্যের মধ্যে ঝিটকার হাজারি গুড়, মুড়ি, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি ও পিঠা, ছাতু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঝিটকার হাজারি গুড়

মানিকগঞ্জ জেলার ঝিটকার বিশ্বখ্যাত 'হাজারি গুড়' ও 'পাটালি গুড়' সুদীর্ঘকাল থেকে অন্যতম লোকখাদ্য হিসাবে পরিচয় বহন করে আসছে। একসময় ঝিটকার হাজারি গুড়ের দুনিয়া জোড়া নাম ছিল। জনশ্রুতি আছে এক সময় ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের সদস্যরা হাজারি গুড় দিয়ে পায়েস, ফিরনি, ক্ষীর তৈরি না হলে খেতেন না। ঝিটকার হাজারি গুড় ছিল নবাবদের খাদ্য তালিকার অন্যতম আকর্ষণীয় উপাদান। শীতকালে নবাব পরিবারের গৃহিণীরা ঝিটকার হাজারি গুড়ের জন্য আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করতেন। তাছাড়া আরো জানা যায়, এই হাজারি গুড় এদেশ থেকে তৎকালীন দিল্লির বাদশা ও ইংল্যাণ্ডের রানিকে উপহার হিসেবে পাঠানো হতো। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনামলে মহকুমা প্রশাসকগণ এই হাজারি গুড় উপহার হিসেবে পাঠাতেন বলে জানা যায়। ঝিটকার খেজুর গাছ এবং হাজারি গুড় আমাদের দেশের এক বিশাল কৃষিশিল্প ছিল। এখনও দেশে বিদেশে এই গুড়ের কদর রয়েছে। কিন্তু আগের মতো সেই খেজুর গাছ ও গাছি না থাকায় সেই ঐতিহ্য এখন হারাতে বসেছে।

আজ থেকে প্রায় তিনশত বছর পূর্বে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানার ঝিটকা গ্রামে মোঃ হাজারি নামে এক গুড় চাষি তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও কৌশল ব্যবহার করে খেজুরের রস থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে ভিন্ন স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের পাটালি গুড় তৈরি করেন। পরবর্তীতে তার নামানুসারে এ পাটালি গুড় হাজারি গুড় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই বিশেষ ধরনের গুড় আবিষ্কারের পর থেকে রাজপথ থেকে রাজদরবার পর্যন্ত এই গুড়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজারি গুড় তৈরির ফরমায়েশ আসতো। ফলে এই গুড় তৈরি তৎসময়ে বিশাল কৃষিশিল্পে রূপ নেয়। সেই আমলে এই গুড়ের বিশেষত্বের জন্য মহকুমা প্রশাসক অনুমোদিত গুড়ের গায়ে মার্কা বা সিল মারা হতো বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, হাজারি গুড় তৈরির পদ্ধতি কেবল মাত্র হাজারি বংশের লোকদের জানা ছিল। তাই অন্য কেউ এই গুড় তৈরি করতে পারতো না।

www.pathagar.com

০৮.০১.২০১২ তারিখ হাজারি গুড় বানানোর প্রক্রিয়া দেখার জন্য শফিকুর রহমান চৌধুরী (প্রধান সমন্বয়কারী) এবং সাইদুর রহমান বয়াতি (তথ্য সংগ্রাহক) ঝিটকা শিকদারপাড়া গাছিবাড়িতে যান। ঝিটকার কালই গ্রামের নজরুল ইসলাম শিকদার-এর সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় যে আগের দিনের হাজারি গুড়ের সেই স্বাদ ও গন্ধ এখন আর নেই। হাজারি বংশের মন্তাজ উদ্দিন গাছি পর্যন্ত এই গুড় ভালো ছিল। পূর্বে এক প্রকার সাদা গুড় বাজারে পাওয়া যেতো। প্রতি সের বিক্রি হতো দেড় টাকা/দুই টাকা। গুড়ের উপর পাটার বুকে হাজারি কথা লেখা থাকতো। গুড় এতোই নরম ও মোলায়েম ছিল যে, একটি পাটাকে দুহাতে চাপ দিলে পাউডারের মতো হয়ে যেতো এবং খেজুরের টাটকা রসের ঘ্রাণ বের হতো। বর্তমানে হাজারি বংশের সোহরাব হোসেন, মোহাম্মদ আলী পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী হাজারি গুড় তৈরি করে সীমিত আকারে বাজারজাত করছেন। এক কেজি হাজারি গুড় বর্তমানে পাঁচশত টাকা থেকে ছয়শত টাকায় বিক্রি হয়।[১]

কথিত আছে হাজারি গুড়ের প্রথম প্রস্তুতকারক হাজারি প্রামাণিক একদিন সকাল বেলায় খেজুর গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নিয়ে মাটিতে নামার পর গাছের গোড়ায় একজন দরবেশের মতো লোককে দেখতে পান। দরবেশ কাঁচা রস খেতে চান। হাজারি প্রামাণিক এক বাটি ভর্তি রস তাঁকে খেতে দেন। রস খেয়ে তিনি খুশি হন এবং বলেন, তোমার গুড় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুড় হবে এবং তোমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে গুড়ের নাম হবে হাজারি গুড়। এরপর থেকে তিনি রস দিয়ে গুড় তৈরি শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকারের লোকজন তার তৈরি গুড় খেয়ে খুশি হন এবং তার নাম অনুসারে গুড়ের সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স দেন। সেই থেকে সাতপুরুষ ধরে হাজারি প্রামাণিকের বংশধরেরা এই গুড় তৈরি করে আসছে।[২]

গুড় তৈরির প্রক্রিয়া

নির্দিষ্ট মৌসুমে গাছ থেকে রস সংগ্রহ থেকে শুরু করে গুড় বাজারজাত করা পর্যন্ত কতগুলো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, যেমন–

প্রয়োজনীয় উপকরণ

খেজুরের রস, জ্বালানি বা নাড়া, রস জ্বাল দেয়ার জন্য পাতিল, ওরন বা চামচ, নাকর, ছাকনি, পাত্র ইত্যাদি।

রস সংগ্রহ

হাজারি গুড় প্রস্তুতের জন্য প্রথমে খেজুর গাছ কেটে রস সংগ্রহ করতে হয়। হাজারি গুড় বানাতে উন্নতমানের রস প্রয়োজন। কার্তিক মাসের শেষ এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম থেকেই খেজুর গাছ কেটে রস বের করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমে খেজুর গাছের মাথায় যেসব মরা পাতা বা ডগা আছে সেগুলো কেটে পরিষ্কার করা হয়। যারা এসব কাজ করে তাদেরকে গাছি বলা হয়। একাজে সবাই অভ্যস্ত নয়। গাছিরা যাদের বাড়িতে খেজুর গাছ আছে তাদের বাড়িতে গিয়ে খেজুর গাছ চেয়ে নেন।

www.pathagar.com

রস সংগ্রহের জন্য খেজুর গাছ কাটা হচ্ছে

রস সংগ্রহের জন্য গাছে হাঁড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে

www.pathagar.com

অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত গাছি মালিকের নিকট থেকে খেজুর গাছ বর্গা নেন। কথা থাকে অর্ধেক রস গাছি পাবে এবং অর্ধেক রস মালিক পাবে। সপ্তাহের তিনদিন গাছ থেকে রস নামানো হয়। তিনদিন রোদে শুকানোর জন্য গাছকে বিশ্রাম দেয়া হয়। খেজুর গাছের মাথা ধারালো ছ্যান/ছেনি দিয়ে ভালোভাবে চেঁছে পরিষ্কার করা হয়। বাঁশের তৈরি আট আঙুল লম্বা একটি নল বসিয়ে দেয়া হয়। নলটি কলসির/ হাঁড়ির মুখে ঢুকিয়ে রশি দিয়ে গাছের ডগার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ে কলসি ভরে যায়। সকাল বেলা গাছ থেকে কলসি নামিয়ে আনা হয়। প্রথম কাটা রস হচ্ছে পাইল কাটা এবং দ্বিতীয় কাটা রস হচ্ছে শেষ কাটা। বর্তমানে এক সিজনে একটা গাছের দাম ২০০/- টাকা। এক কেজি রসের মূল্য বর্তমানে ৫০/- টাকা। এক কেজি হাজারি গুড় বানাতে কমপক্ষে দশ কেজি রস লাগে। আবহাওয়া ভালো থাকলে ৫/৬ কেজি গুড় তৈরি করা যায়।

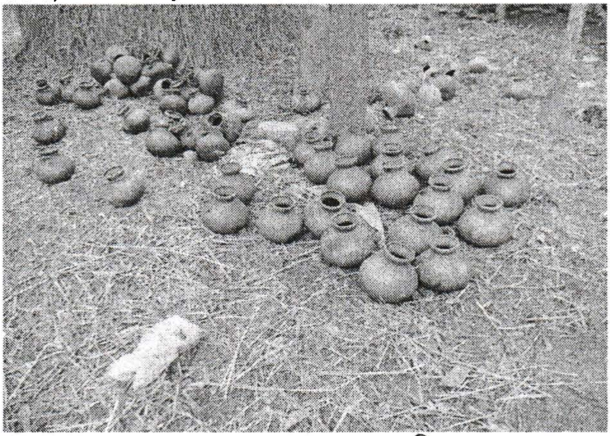

খেজুরের রস সংগ্রহ করার পাতিল

জ্বালানি সংগ্রহ

রস জ্বাল দেবার জন্য জ্বালানি প্রয়োজন হয়। এই জ্বালানি সাধারণত বাজার থেকে ক্রয় করা হয়।

রস জ্বাল দেয়া

বলক তোলা গরম পানি দিয়ে জালা (যে পাতিলে রস জ্বাল দেওয়া হয়) পরিষ্কার করে নিতে হয়। পয়ঃপরিষ্কার না হলে হাজারি গুড় ভালো হয় না। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি নালও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। প্রথমে মাটির জালায় খেজুরের রস কাপড় দিয়ে ছেঁকে দিতে হয়। নারকেলের আঁচা দিয়ে ওরন বানাতে হয়। রস পাতিলে দেওয়া বা উঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয় 'ওরন' বা চামচ। বাঁশের ডাণ্ডার মাথায় লাগানো নারকেলের খোল বা মালই হচ্ছে ওরন। ধানের নাড়া দিয়ে রস জ্বাল দেওয়া হয়। রস জ্বাল দেওয়ার চুলোকে আঞ্চলিক ভাষায় বায়েন/বাইমা বলা হয়। চুলার সাতটি চোখ আছে। সাতটা চোখে সাতটা মাটির জালা বসানো হয়। একটি জালায় ওরন দিয়ে অল্প

www.pathagar.com

অল্প 'খাওয়া' বা রস দেওয়া হয়। প্রথম জালাতে আধা কেজি পরিমাণ রস দিয়ে জ্বাল দেওয়া শুরু হয় আস্তে আস্তে। একটি পাত্রে যেখানে অনেক পরিমাণ রস জমা থাকে সেখান থেকে ওরন দিয়ে জালায় রস বা খাওয়া দেওয়া হয়। জো বা ফোট আসা পর্যন্ত খাওয়া দিতে থাকে। ছয়টা জালা থেকে ঘুরে ঘুরে একটা জালায় 'ফোট' বা জো আনতে হয়। কারিগর বুঝতে পারেন কখন চুলা থেকে নামাতে হবে। চুলা থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখা অন্য আরেকটি জালায় ঢালতে হয়। বাঁশের বা তালের ডাল বা খেজুরের ডাল দিয়ে নাকর বানাতে হয়। নাকর দিয়ে জালাতে ঢালা ফোটওয়ালা রস ১০/১৫ মিনিট ঘুঁটতে হয়। লোকজনকে সারাক্ষণ ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে হয়। গুড় যতক্ষণ পর্যন্ত পাটা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোথায়ও যাওয়া যায় না।

গুড় তৈরির জন্য খেজুরের রসের ডানা উঠানো হচ্ছে

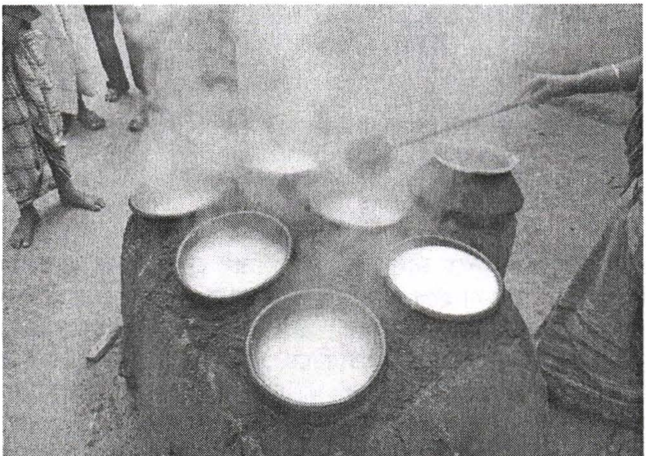

কাঁচা রস জ্বালের জন্য পাত্রে ঢালা হচ্ছে

www.pathagar.com

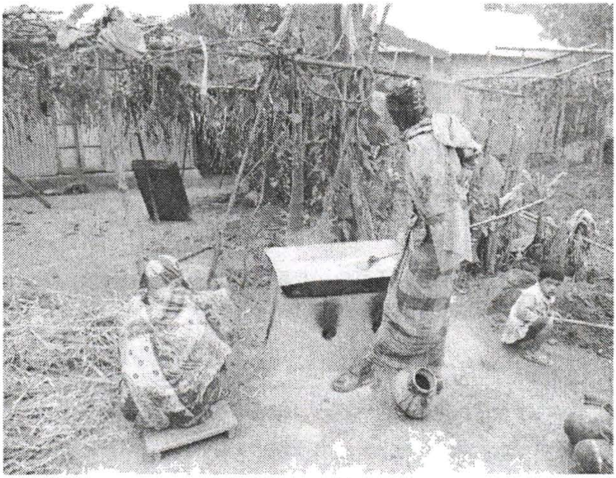

জ্বালের সময় রস ঘুটে দেয়া হচ্ছে

পাটা তৈরির জন্য তরল গুড় ছাঁচে ঢালা হচ্ছে

সিল দেয়া

গুড় তৈরি হওয়ার পর এর উপর সিল মারতে হয়। সিলযুক্ত গুড় খাঁটি হাজারি গুড় বলে ধরে নিতে হবে।

বাজারজাতকরণ

গুড় তৈরির পর তা বাজারজাত করা হয়। স্থানীয় বাজার ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে এই গুড় বাজারজাত করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এক কেজি গুড়ের মূল্য ৫০০/- টাকা।

www.pathagar.com

বাজারে বিক্রি করা ছাড়াও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে অনেকে এই গুড় উপহার হিসেবে পাঠান।[৩]

হাজারি গুড়ের নামে বর্তমানে নিম্নমানের অনেক রকমের গুড় ঝিটকা বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায়। হাজারির সিল নকল করে গুড় বিক্রি হতেও দেখা যায়। বর্তমানে খেজুরের রসের সঙ্গে চিনি, ক্ষতিকর হাইড্রোজ মিশিয়ে কৃত্রিম গুড় বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তাছাড়া আগের দিনে খেজুরের পাটাগুড়, খেজুরের চৌরস গুড়, খেজুরের নারকেলি গুড়, ঝোলা গুড়, ঝরা গুড় তৈরি হতো। বর্তমানে এধরনের গুড় তৈরি হয় না। কারণ খেজুর গাছের উৎপাদন কমে গেছে এবং গাছিও নেই। তাছাড়া রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানির দামও বর্তমানে বেশি। এতদসত্ত্বেও মানিকগঞ্জের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে খেজুরের রস ও গুড় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

খেজুরের রসের গুড়

হাজারি গুড়ের মতো ঝিটকার খেজুরের রস ও পাটালি গুড়ও বিখ্যাত। বর্তমানেও এই গুড় তৈরি হয়। খেজুরের রস আগুনে জ্বাল দিয়ে পাটালি গুড় তৈরি করা হয়। এই গুড় কয়েকভাগে বিভক্ত যেমন : ঝোলা গুড়, খামা গুড়, চৌরস গুড়, পাটা গুড় ইত্যাদি। পাটা গুড় আবার দু রকমের : সাধারণ পাটা ও নারকেলের পাটা। সাধারণ পাটা দিয়ে ক্ষীর, পায়েস, পিঠা খাওয়া হয়। নারকেলের গুড় দিয়ে মুড়ি, দুধভাত ইত্যাদি খাওয়া হয়।

পাটা বানানোর সময় কোড়ানো নারিকেল খেজুরের রসের সঙ্গে মিশিয়ে যে পাটা বানানো হয় তাকে নারকেল পাটা বলে। এই রস ধানের নাড়ার (ধান কাটার পর ধান গাছের পরিত্যক্ত অংশ) আগুনে জ্বাল দিয়ে উন্নতমানের পাটালি গুড় তৈরি করা যায়। রস জ্বাল দিতে হয় মাটির তৈরি 'জালা'তে। জ্বাল দিতে দিতে রস লাল রং ধারণ করে, পরে ঘন হয়। এক পর্যায়ে রসের দানা বানাতে হয়। দানা থেকে পাটা তৈরি হয়।[৪]

মুড়ি

মানিকগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির মহিলারাই মুড়ি ভাজতে পারেন। আজো মানিকগঞ্জের অনেক মানুষ সকালে নাস্তা হিসেবে মুড়ি খেয়ে থাকেন। এটি একটি জনপ্রিয় খাবার। ধনী-দরিদ্র সর্বস্তরের মানুষ মুড়ি খেয়ে থাকেন। মুড়ির সঙ্গে পাটালি গুড়, নারকেল, পেয়াজ, কাঁচা মরিচ, আদা, সরষের তেল ইত্যাদি মাখিয়ে খাওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া ডাল, মাংস, তরকারির সঙ্গেও মুড়ি মিশিয়ে খাওয়া হয়। এছাড়া দুধ, কলা মিশিয়েও মুড়ি খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। মানিকগঞ্জের বিয়ে শাদি উপলক্ষে দই, চিনি-মুড়ি উল্লেখযোগ্য খাদ্য হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। ক্ষীর পায়েসের সঙ্গেও মুড়ি মিশিয়ে খাওয়া হয়। অতিথি আপ্যায়নে মুড়ির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুড়ি তৈরির প্রক্রিয়া

মুড়ি তৈরির জন্য কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়ে থাকে, যেমন-

উপকরণ

মুড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো একটি ছোটো পাতিল, একটি বড়ো পাতিল, হলুদ, রসুন, বালি, ঝাঁজর, বাঁশের চালনি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ধান প্রস্তুতকরণ

মুড়ির প্রস্তুতের জন্য ধান আলাদাভাবে তৈরি করে নিতে হয়। সাধারণত এই ধান দুবার সিদ্ধ করতে হয়। আগের দিনে কেছালিবরণ, পঙ্খিরাজ, সোলাই মুড়ি, বাত্তইঝাক, সোনা আঞ্জুল এসব ধানের মুড়ি উন্নতমানের ছিল। বর্তমানে ২৬ নং, ৩২ নং ইরি এবং লাল বর্ণের মোটা ধান দিয়ে মুড়ি বানানো হয়।

ধান থেকে চাল তৈরি

প্রথমে মহিলারা সামান্য গরম পানিতে ধান গরম করে নেয়। এরপর ঐ ধান ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখে। দু'দিন পর ঐ ধান আগুনে জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করা হয়। এরপর রোদে শুকানো হয়। রোদে শুকানোর সময় ঐ ধানের মধ্যে কয়েকটি রসুনের কোষ এবং কয়েকটি গোটা হলুদ দিতে হয়। রোদে শুকানোর পর ঢেঁকিতে বা মেশিনে চাল তৈরি করা হয়। টাটকা চাল দিয়ে উন্নতমানের মুড়ি তৈরি হয়।

মুড়ি ভাজা

মুড়ি ভাজতে একটি মাটির পাতিল বা তৈলা এবং একটি ছোটো পাতিল লাগে। বড়ো পাতিল বা তৈলাতে বালি গরম করতে হয়। ছোটো পাতিলে এক পোয়া পরিমাণ চাল একটু লবণ গোলানো সামান্য পানি দিয়ে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নাড়তে হয়। চাল লাল বর্ণ ধারণ করার পর যে তৈলাতে বালি গরম করা হচ্ছে সেখানে বড়ো পাটের খড়ি বা কাঠি দিয়ে ৪/৫ সেকেন্ড নাড়তে হয়। কাঠির মাথায় যখন ধোঁয়া দেখা দেয় তখন ধরে নিতে হবে যে মুড়ি ভাজার সময় হয়ে গেছে। লাল বর্ণের চাল বালির তৈলায় ঢালতে হবে। তখন তৈলাটা দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে ঘুরাতে হয়। এসময় চাল থেকে মুড়ি হতে থাকে এবং শপ্ শপ্ শব্দ হয়। ভাজা হয়ে গেলে মাটির তৈরি ঝাঁজরের মধ্যে ঢেলে দেয়া হয়। ঝাঁজরের ছিদ্র দিয়ে বালি বের হয়ে মাটির তৈরি ছাকনিতে জমা হয় এবং ওপরে ঝাঁজরের মধ্যে মুড়ি পড়ে থাকে। এখান থেকে মুড়ি আলাদা পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। পরে ছোটো ছিদ্র বিশিষ্ট বাঁশের তৈরি চালনা দিয়ে ঝেড়ে মুড়ি সংরক্ষণ করা হয়।

মুড়ি ভাজার দৃশ্য

www.pathagar.com

ঝাঁজর থেকে ভাজা মুড়ি চালনিতে ঢালা হচ্ছে

পিঠা

মানিকগঞ্জ এককালে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। এখানে অনেক হিন্দু জমিদার ছিলেন। হিন্দু জমিদারগণ পূজা, পার্বণ, উৎসব ও মেলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হিন্দুদের নাটাই পূজা, পাটাই পূজা, নিকাইন্দা পূজা, ভুল পূজা উপলক্ষে পিঠা একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল। পিঠা সংস্কৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিকশিত হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও তা প্রচলিত হয়। বর্তমানে মানিকগঞ্জের প্রতিটি বাড়িতে পিঠা তৈরি হয়; তাছাড়া অতিথি আপ্যায়নে পিঠা পরিবেশন করা হয়। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিয়ে শাদির মধ্যে অবশ্যই কিছু পিঠা তৈরি করা হয়। বর্তমানে মানিকগঞ্জের উল্লেখযোগ্য পিঠা হচ্ছে সেমাই পিঠা, ভাপা পিঠা, কুলি পিঠা, ভিজাইন্যা পিঠা (ভিজানো পিঠা) বা দুধ পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, চিতই পিঠা, তালের পিঠা, তেল চিতই, বোরা পিঠা, রুটি পিঠা, পাকন পিঠা, মোরগ-সংসার পিঠা, ছিট রুটি পিঠা, দইলা পিঠা, মুইঠা পিঠা, পাতা পিঠা ইত্যাদি।

পৌষ মাসের সংক্রান্তি উপলক্ষে নানা ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে যে পিঠা তৈরি হয় তা শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়, গবাদিপশুকেও এই পিঠা খাওয়ানো হয়। তাছাড়া গরু, ছাগলের গায়ে চালের গুড়া পানিতে গুলে ছাপ দেওয়া হয়। তুলসী গাছের গোড়ায়, শ্মশান ঘাটে ও মন্দিরে এই পিঠার ছাপ দেওয়া হয়। মানুষ সহ সকল প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা ও মমতাবোধ থেকে এই পিঠা খাওয়ানো হয়। পিঠা খাওয়ার জন্য আত্মীয়-স্বজনকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা ও কুলি পিঠা এই তিনটি পিঠাই বেশি তৈরি হয়। শীতকালে মানিকগঞ্জের হাটে বাজারে ও মেলায় অস্থায়ী চুলা বসিয়ে মহিলারা চিতই পিঠা ও ভাপা পিঠা তৈরি ও বিক্রি করেন।

www.pathagar.com

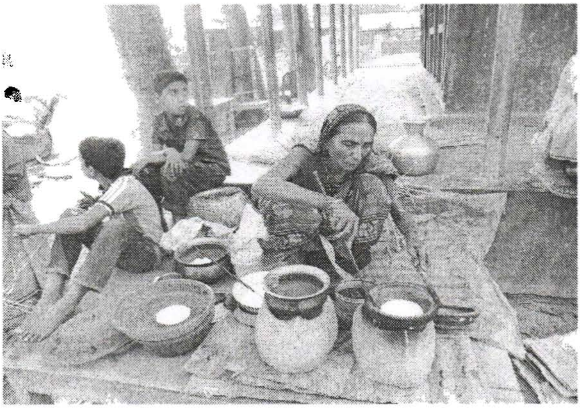

লেমুবাড়ি হাটে চিতই পিঠা তৈরি হচ্ছে

পিঠা তৈরির উপকরণ

আতপ চালের গুড়া, গুড়, চিনি, নারকেল প্রভৃতি পিঠা তৈরির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। তিলকুলি পিঠা তিল ছাড়া হয় না। আবার গোস্ত পিঠা বানাতে গেলে মুরগি, গরু বা খাসির মাংসের প্রয়োজন হয়।

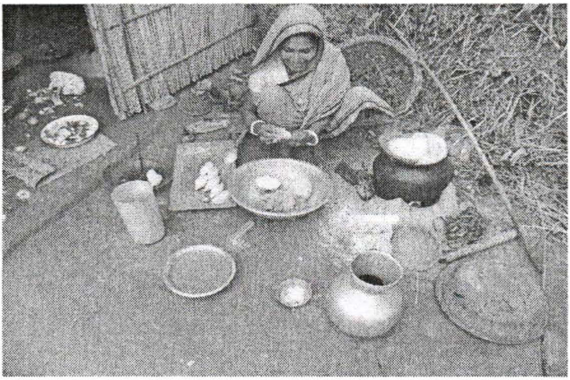

কুলি পিঠা তৈরি করছেন পুটাইল ইউনিয়নের গুরুসেওতা গ্রামের অঞ্জলি সিংহ

কুলি পিঠা

কুলি পিঠা তৈরির জন্য প্রথমে নারকেল, চিনি বা গুড় ও আতপ চালের গুড়া জ্বাল দিয়ে হালুয়া তৈরি করা হয়। এরপর চালের গুড়া সিদ্ধ করে আটা বা খামি তৈরি করা হয়। খামির থেকে বাটি বানানো হয়। সেই বাটির মধ্যে আগে প্রস্তুতকৃত হালুয়া ভরে দেয়া হয়। বাটির মুখ আটকিয়ে পুনরায় গরম পানিতে বাঁশের চটি বিছিয়ে তার উপর সে বাটি সিদ্ধ করা হয়। পিঠাগুলো ঝিনুকের আকৃতির। এই পিঠা ঠান্ডা বা গরম উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। এটি খেতে খুবই সুস্বাদু।

www.pathagar.com

ভাপা পিঠা

এই পিঠা তৈরিতে গরম পানির ভাপ প্রয়োজন হয়। একটি কলসে অর্ধ-কলস পানি নিয়ে গরম করে কলসের মুখে কাপড় দিয়ে বেঁধে তার উপর পিঠা তৈরি করা হয়। চালের ময়দা, লবণ, গুড় বা চিনি এবং নারিকেলের মিশ্রণে এই পিঠা তৈরি করা হয়। একটি পিঠা তৈরিতে একটি বাটিতে কিছু চালের ময়দা, গুড় বা চিনিতে নারিকেলের মিশ্রণ দিয়ে তার উপর হালকা শুকনো ময়দা ছিটিয়ে বাটির মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে আলতো উপুড় করে কলসের মুখে চার/পাঁচ মিনিট রাখলেই তৈরি হয়ে যায় ভাপা পিঠা।[৫]

মিষ্টি

মানিকগঞ্জের গ্রামে ও শহরে মিষ্টি তৈরির ঐতিহ্য অনেক পুরনো। আগের দিনে শীল ও ঘোষ সম্প্রদায়ের লোকজন মিষ্টি তৈরি করতেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনও মিষ্টি তৈরি করেন। মানিকগঞ্জে রসগোল্লা, সন্দেশ, চমচম, গজা, জিলাপি, আমিরতি, রসমালাই, কালজাম, রাজভোগ প্রভৃতি মিষ্টি তৈরি হয়। এক কেজি রসগোল্লার মূল্য বর্তমানে ১২০/- টাকা। বর্তমানে বড়ো বড়ো হাটবাজার ও রাস্তার মোড়ে মিষ্টির দোকান রয়েছে। তাছাড়া রাসমেলা, রথমেলা, বৈশাখী মেলা ও দোলের মেলা উপলক্ষে প্রচুর মিষ্টি বিক্রি হয়। মেলাতে মিষ্টির চাহিদা বেশি থাকে।

উপকরণ

মিষ্টি তৈরির প্রধান উপকরণ হচ্ছে দুধ। বাজার থেকেই মূলত দুধ ক্রয় করা হয়। বর্তমানে বাজারে প্রতি কেজি দুধের মূল্য ৩৫/- টাকা।

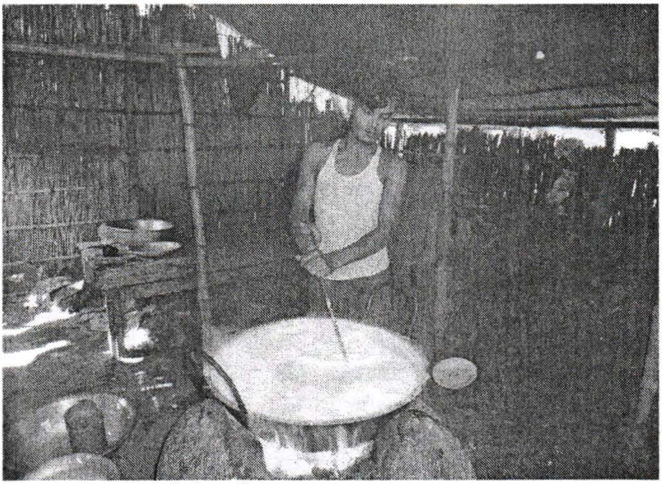

মিষ্টি তৈরির জন্য দুধ জ্বাল দেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

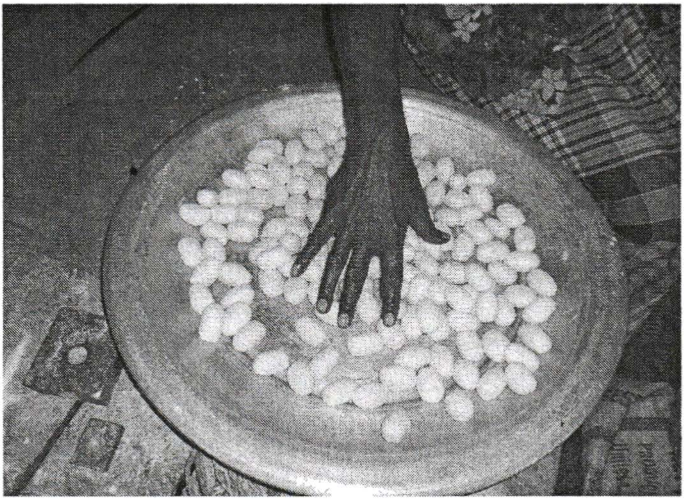

ছানাকে গোল গোল করে আকৃতি দেয়া হয়েছে

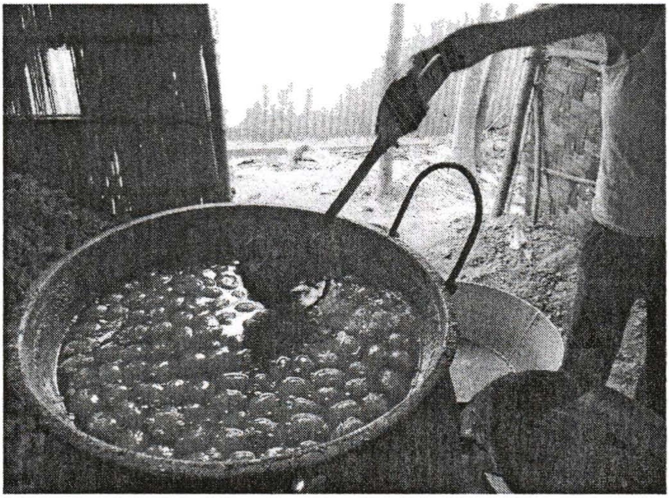

ছানার টুকরোকে চিনির সিরাতে জ্বাল দেয়া হচ্ছে

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে ছানা তৈরি করা হয়। ছানা তৈরি হওয়ার পর ঐ ছানা রসশূন্য করার জন্য পরিষ্কার কাপড়ে বেঁধে ঝরনা দেয়া হয়। ছানা যখন ঝরঝরে হয় তখন ছানা পিতল অথবা স্টিলের গামলায় রাখা হয়। এরপর ছানার সঙ্গে চিনি ও ময়দা মিশানো

www.pathagar.com

হয়। এরপর ছানাকে গোল গোল করে আকৃতি দেয়া হয়। এই গোলাকার বা লম্বাকৃতির ছানার টুকরাকে চিনির সিরাতে দিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। জ্বাল দেওয়ার সময় ছানার টুকরা আস্তে আস্তে বড়ো হয়। বাদামি রং ধারণ করার পর সেগুলো চিনির ঘন সিরার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। তৈরি মিষ্টি কাঁচের আলমারির মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।[৬]

বাতাসা

বাতাসা মূলত চিনির তৈরি। তবে গুড় দিয়েও বাতাসা তৈরি করা হয়। একটি কড়াই নিয়ে তাতে যে পরিমাণ চিনি/গুড়ের বাতাসা তৈরি করা হয় তার এক চতুর্থাংশ ওজনের পানি দিয়ে আগুনে জ্বাল দেয়া হয়। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট জ্বাল দেবার পর উত্তপ্ত হয়ে বুদবুদ উঠতে শুরু করে। এরপরও কিছু পরিমাণ অপদ্রব্য কড়াইয়ের ধার দিয়ে জমা হয় যা সাধারণত ভেজা কাপড়ের অংশ দিয়ে মুছে নেয়া হয়। এক সময় ভালোভাবে মিশ্রণ তৈরি হয়ে গেলে কড়াই চুলা থেকে নামিয়ে নেয়া হয়। ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধার আগেই একটু গরম থাকা অবস্থায় গোলাকার বড়ো চামুচে নিয়ে তা থেকে একটি কাঠি দিয়ে একটি বাতাসা তৈরির জন্য পরিমিত পরিমাণে মিশ্রণ একটি শীতল পাটির উপর ঢেলে দেয়া হয়। অল্প কিছুক্ষণ পর ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধলে সেগুলো পাটি থেকে তুলে নেয়া হয়।

চিনির ছাঁচ

এক সময় গ্রাম্য মেলায় বিক্রি হওয়া আকর্ষণীয় মিষ্টান্নর মধ্যে চিনির ছাঁচ এর ব্যাপক কদর ছিল। এই মিষ্টান্নগুলো ছিল বিভিন্ন আকারের। সাধারণত ঘোড়া, হাতি, ফুল, পাখি, মাছ ইত্যাদি আকারের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাতাসা মিছরি তৈরির মিশ্রণটি বিভিন্ন আকারের ছাঁচের ভেতরে ঢেলে দেয়া হয় এবং ঠান্ডা হলে তা ছাড়িয়ে নেয়া হয়। ফলে তা বিভিন্ন পশু, পাখি, ফুল, মাছ ইত্যাদির আকার হয়ে থাকে।

শবেবরাতের হালুয়া ও রুটি

মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট শবেবরাত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিশ্বাস এই রাতে আল্লাহতালা বা সৃষ্টিকর্তা আগামী বছরের ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেন। তাই তারা রাত জেগে প্রার্থনা করেন। আগামী বছরের দিনগুলোকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দময় ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য মানিকগঞ্জের সর্বত্রই শবেবরাত উদ্‌যাপিত হয়। শবেবরাত উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতেই হালুয়া ও রুটি তৈরি করা হয়। দুধ, চিনি, গুড়, চালের গুড়া ও নারকেল দিয়ে হালুয়া তৈরি করা হয়। অনেকের বাড়িতে ডালের ও গাজরের হালুয়া তৈরি করা হয়। হালুয়া প্রস্তুতের পর তা চ্যাপ্টা থালায় রেখে সমতল করা হয়। এরপর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে চারকোণা আকৃতির বরফি বানানো হয়। চালের রুটি দিয়ে এই হালুয়া খাওয়া হয়ে থাকে। চালের গুড়ার সঙ্গে পরিমাণমত লবণ ও পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করে রুটি তৈরি করা হয়। এই হালুয়া-রুটি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাছাড়া প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও হালুয়া-রুটি বিতরণ করা হয়।

www.pathagar.com

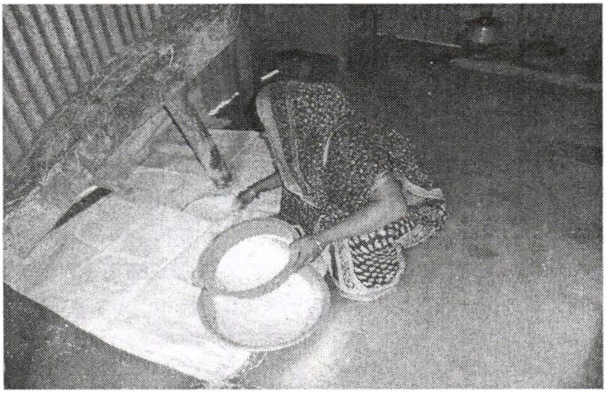

শবেবরাতের রুটি তৈরির জন্য ঢেঁকিতে চাল গুড়ো করা হচ্ছে

রুটি তৈরির জন্য প্রস্তুত চালের গুড়ো

শবেবরাতের রুটি তৈরি হচ্ছে

www.pathagar.com

ছাতু

বর্তমানে মানিকগঞ্জের অনেক এলাকায় ছাতু খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। যব বা পায়রার গুড়াকে ছাতু বলা হয়। যবকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ছাতু বানানো হয়। এই ছাতুর সঙ্গে গুড়/চিনি/দুধ মিলিয়ে খামি বা ছাতু তৈরি করে খাওয়া হয়। এটি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু। এই ছাতু চৈত্র/বৈশাখ মাসে কৃষকের ঘরে আসে। যবের গাছ দেখতে গমের গাছের মতো। এটি আশ্বিন/কার্তিক মাসে মাঠে বপন করা হয় এবং চৈত্র মাসে পাকে। তখন যব ঘরে তোলা হয়। যবের ছাতু একটি উল্লেখযোগ্য খাবার। যব দিয়ে পায়েস, পিঠা ও খিচুরি তৈরি করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে আয়োজিত চৈত্র পূজায় ছাতু খাবার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ সময় বোন ভাইকে ছাতু খাইয়ে থাকে। তাছাড়া বাড়িতে মেহমান এলেও ছাতু দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। এ বছর (২০১২) এক কেজি ছাতু বাজারে ২০০/- টাকা দরে বিক্রি হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. নজরুল ইসলাম শিকদার, গ্রাম : কালই, ঝিটকা, থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৮.০১.২০১২; সাইদুর রহমান বয়াতি, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮১ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৮.০১.২০১২, স্থান : ঝিটকা, শিকদারপাড়া গাছিবাড়ি

২. আবদুল মালেক, গ্রাম : ঝিটকার শিকদারপাড়া (গাছিবাড়ি), থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৮.০১.২০১২, স্থান : ঝিটকা, শিকদারপাড়া গাছিবাড়ি

৩. আবদুল মালেক, গ্রাম : ঝিটকার শিকদারপাড়া (গাছিবাড়ি), থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৮.০১.২০১২, স্থান : ঝিটকা, শিকদারপাড়া গাছিবাড়ি; রুনা আক্তার, স্বামী : আবদুল মালেক, গ্রাম : ঝিটকার শিকদারপাড়া (গাছিবাড়ি), থানা : হরিরামপুর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৮.০১.২০১২, স্থান : ঝিটকা, শিকদারপাড়া (গাছিবাড়ি)

৪. রহিম মিয়া, পেশা : গাছি, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ: ০৮.০১.২০১২

৫. অঞ্জলি সিংহ, স্বামী : অনিল সিংহ, বয়স : ৩২ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : গরুসেওতা, ইউনিয়ন : পুটাইল, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৩.০১.২০১২, স্থান : নিজ বাড়ি

৬. ময়নাল হোসেন, বয়স : ২৮ বৎসর, পেশা : মিষ্টি ব্যবসায়ী, গ্রাম : গোপালপুর, থানা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ

www.pathagar.com

লোকনাট্য

যাত্রা

বিভিন্ন উৎসবে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে যাত্রা গাওয়া হয় তা হচ্ছে লোকযাত্রা যেমন—রূপবান, মুলুক চাঁন, ইমাম যাত্রা ইত্যাদি। আগে যাত্রাকাহিনি ছিল দু'ভাগে বিভক্ত : ঐতিহাসিক ও সামাজিক যাত্রা, যেমন—নবাব সিরাজউদ্দৌলা, টিপু সুলতান, নাদির শাহ, হরিশচন্দ্র, ঈশা খাঁ, মান সিংহ প্রভৃতি। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যাত্রাপালা লিখিত হয়। এছাড়া সামাজিক ও কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনি থেকেও বই লেখা হয়, যেমন–দুধ মেহের, সুরুজ–জামাল ইত্যাদি। বেহুলা-লখিন্দর-এর ঘটনা থেকে যে বই লেখা হয় বা যাত্রার রূপ দেওয়া হয় তার নাম ভাসান যাত্রা। সর্প দংশনের পর লখিন্দরকে কলাগাছের ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বলে এটি ভাসান যাত্রা নামে পরিচিত। আগে পুরুষ নারী সেজে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। বর্তমানে মেয়েরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। বর্তমানে বাহারি পোশাকের চাকচিক্য ও অঙ্গভঙ্গি এবং সুরের বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। বাদ্যযন্ত্রেও পরিবর্তন এসেছে। ঢোল, বাঁশি, দোতারা, জুরি, মন্দিরা বর্তমানেও আছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কি-বোর্ড, ম্যান্ডোলিন, বেহালা, ড্রাম ইত্যাদি। বর্তমানে দর্শক-শ্রোতা গানের কথার চেয়ে যন্ত্রসংগীত দ্বারা বেশি আকৃষ্ট হয়। বর্তমানে মানিকগঞ্জে বেশ কয়েকটি যাত্রা দল রয়েছে। প্রতিবছর কমপক্ষে দশটি যাত্রাপালা পরিবেশন করা হয় মানিকগঞ্জে। মেলা, উৎসব, লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজা উপলক্ষে লোকযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত গ্রাম ভিত্তিক এই লোকযাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা করেন স্থানীয় জনগণ এবং দর্শক-শ্রোতা। গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ লোকযাত্রা উপভোগ করে।

মুলুক চাঁন যাত্রা

মুলুক চাঁন যাত্রার মূল উৎস মানিকগঞ্জের লোককিচ্ছা। কাহিনিটিকে নাট্যরূপ দান করেন মো. সাইদুর রহমান বয়াতি।[১]

চরিত্র :

(পুরুষ)

১. জামাল বাদশা

২. আলেক চাঁন

৩. মুলুক চাঁন

৪. ঠাকুর

৫. বনরাজ

www.pathagar.com

৬. দরবেশ
৭. বিবেক
৮. ডাক্তার
৯. তিন জন মগ (বন মানুষ)
১০. একজন মোল্লা সাহেব
১১. মাস্টার সাহেব
১২. তিন ছাত্র (জটা, খটা, পইতা)
১৩. হাজী সাহেব (১ম মস্তান)
১৪. সৈয়দ সাহেব (২য় মস্তান)
১৫. বড়ো হুজুর
১৬. হামিদ ও নাজিম
১৭. পহ্লাম
১৮. বাদশা শুফিয়ান

(নারী)
১. ১ম বেগম (রানি)
২. ২য় বেগম (রানি)
৩. আরজালের মা
৪. বছিরের মা
৫. হামিদা বেগম
৬. একজন দাসী
৭. হামিদার সখি

বিস্‌মিল্লাহে রহমানের রাহিম

(ইচ্ছে হলে বন্দনা সংগীত দিয়ে শুরু হবে বা জাতীয় যে কোনো গান দিয়ে শুরু হবে)
বন্দনা সংগীত :
ওগো আল্লা, প্রভু নিরঞ্জনো–
হায় গো, প্রথমে বন্দনা গো করি আল্লা নিরঞ্জনো-(২)
আমি দ্বিতীয় বন্দনা গো করি নবীজির কদম গো–
ওগো আল্লা, প্রভু নিরঞ্জনো–
হায় গো পশ্চিমে বন্দনা গো করি মক্কা ও মদিনা–
ওগো যেখানেতে গেলে বান্দার মাপ হয়ে যায় গুনা গো–

www.pathagar.com

ওগো আল্লা, প্রভু নিরঞ্জনো–
হায় গো উত্তরে বন্দনা গো করি হিমালয় পর্বতো (২)
শিবা আর শংকরি যেথায় চালায় সদায় রথ গো–
ওগো আল্লা, প্রভু নিরঞ্জনো–
হায় গো পূর্বেতে বন্দনা গো করি পূর্বে উদয় ভানু (২)
এক দিক থেকে উদয় ভানু চৌদিকে হয় আলো গো–
ওগো আল্লা, প্রভু নিরঞ্জনো–
হায় গো দক্ষিণে বন্দনা গো করি নদী সাগরো (২)
সেই সাগরে বাণিজ্য করে সাধু সদাগরো গো–
ওগো আল্লা, প্রভু নিরঞ্জনো–

(বন্দনা সংগীত সমাপ্ত ও ঠাকুরের প্রবেশ)

ঠাকুর : (গান)
ভেবে দেখ ভাই দুনিয়াতে সুখ-সুবিধা নাই।
আমি চিন্তায় চিন্তায় হলেম সারা (২) চিন্তা নিয়ে কাটাই ॥
কেহ হয় রাজা, প্রজা তারা খায় ভাজা গজা–
কেহ আবার ভাতের জ্বালায় হয় বড়ো সাজা
তাদের দেহ নাই তাজা, তাদের মরতে নাই মজা
আমি থাকি ডাংগা মড়ে, মেঘে ভিজে রাতি কাটাই ॥
কেহ হয়ে কারবারি ও নাম বানায় বেপারি
দালান কোঠা টিনের ঘর দেয় সারি সারি।
তাদের নাম হবে জারি তাদের বৌ হয় সুন্দরী
কেহই আবার ভিক্ষা করে দুঃখের তাদের সীমা নাই ॥
কেহ দুনিয়ার উপর করে সুখেতে সংসার
কেহ আবার রোগে শোকে জীবন হয় অসার
এসব ভাগ্যেরই কারবার মিছা দোষ দেই পরয়ার
সাইদ বলে লীলা আল্লার কারো বুঝবার সাধ্য নাই ॥

(গান সমাপ্ত ও সংলাপ শুরু)

শোনেন বন্ধুগণ একটি মজার ঘটনা, সতাই মায়ের যন্ত্রণা মা থাকতে কেহ বুঝবে না, সাইদ মিয়ার রচনা, আমরা করবো বর্ণনা।

(গান)
মা মরিলে এ সংসারে (২) দুঃখের তাদের সীমা নাই
দুনিয়াতে সুখ সুবিধা নাই ॥ (প্রস্থান)

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(বাদশা তার বাসভবনে বসে বসে চিন্তা করছেন আর আপন মনে কথা বলছেন। এমন সময় বেগমের প্রবেশ)

বাদশা : হে আল্লা পরয়ারদেগার, ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য কতই দিয়েছ, দিয়েছ মহারাজ্যের অধিকার। তবু কেন করে রেখেছ একাকী, পুত্র সন্তানের দারুণ হাহাকার। এতো সুখ পেয়েও মনে হয় অনন্ত অশান্তির অনলে পুড়ে হচ্ছি তিলে তিলে অঙ্গার। বেগম সাহেবানিও সন্তানের মা ডাকের ভিক্ষারিণী।

বেগম : জাহাপনা, জাহাপনা, আপনি সারাক্ষণ একা একা বসে কি যেন ভাবনার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে চলেছেন। এমনি ভাবে আপনার স্বাস্থ্য যে ভেঙে পড়বে। বলুন, বলুন জাহাপনা, একটিবার খুলে বলুন আমাকে। আমি জানতে পারি না কি সে এমন চিন্তার কারণ? কি হয়েছে, জাহাপনা, কি হয়েছে আপনার?

বাদশা : কিছুই হয়নি বেগম, কিছুই হয়নি। রাজ্যের রাজা হয়েছি, হয়েছি লক্ষ লক্ষ প্রজার মহারাজ, কিন্তু–

বেগম : কিন্তু কি জাহাপনা, আপনি পরিষ্কার করে আমাকে খুলে বলুন।

বাদশা : শুনবে, শুনবে বেগম? কোনো অভাব না থাকলেও আমি যে একটি সন্তানের কাঙাল হয়ে আছি বেগম। দিবানিশি তাই প্রাণে বহে দারুণ অভাবের ঘূর্ণিঝড়।

বেগম : স্বামী, স্বামী গো, এতোদিন মনের জ্বালা বুকে রেখেছি, বলি নাই কখনো। আজ আপনার মুখে সন্তানের কথা প্রকাশ হলো বলে আমার সন্তানের জ্বলন্ত অগ্নি দাও দাও করে জ্বলে উঠেছে। কি, কি করবো স্বামী?

বাদশা : শোন বেগম, আমার আদেশ রইল আজ থেকে যে কোনো হেকিম-কবিরাজ কিংবা জ্যোতিষী-বৈদ্য পেলেই একটিবার চিকিৎসা করে দেখ বেগম আমাদের কোনো পুত্র, কন্যা, সন্তান আছে কি নাই। আমি বললাম, মনে রেখ বেগম, মনে রেখ। (প্রস্থান)

(ঠাকুরের প্রবেশ)

ঠাকুর : ওমঃ শান্তি, ওমঃ শান্তি, ওমঃ শান্তি। মা, মাগো, কালী করালিনী মা দুর্গা, শিবঃ শংকরি। বলে দে মা, মানুষের আগুম নিগুম আমার কানে কানে বলে দে মা। জয়ঃ জয়ঃ মা তারা ॥

বেগম : বাবা ঠাকুর মশাই, আপনি কি মানুষের হাত দেখে তার ভালো-মন্দ বলতে পারেন?

ঠাকুর : হা মা, মানুষের হাত দেখা, তাদের আগুম বলে দেয়া ও তার বিধি বিধান করাই আমার কাজ।

www.pathagar.com

বেগম : বাবা ঠাকুর মশাই, তবে দেখুন তো আমার হাত খানা, আমার ভাগ্যে কোনো পুত্র সন্তান আছে কিনা। (বেগম নিরব রইল)

ঠাকুর : (স্বগত) ছোটো বেলায় ঠাকুর দাদার কাছে যা শিখেছিলাম ছাই ছাতু কিছুই তো মনে নাই। এবার বাদশার বেগম সাহেবানির হস্তরেখা বলতে হবে, ভাগ্যে যে কি আছে? একবার এক যুবকের হাত দেখে বলেছিলাম–সাত দিনের মধ্যে তোমার বিবাহ হবে। আর যায় কোথায়, দিল দু'গালে দুই থাপ্পড়। কারণ সে নাকি বিবাহ করেছে এক মাস আগেই। যাক দেখি একবার মা দুর্গা আমার মুখ রাখে কিনা। (প্রকাশ্যে) দেখি, দেখি মা, তোমার বাম হাতটা একটু দেখে নেই। (হাত দেখে) মঙ্গলাময়ী, মা ভবানি আমার ডাক শুনিস মা। এ্যা–হ্যা–হ্যা মা জননী, আমি এই যে একটি বড়ি দিয়ে গেলাম। বড়িটি একটু আদার রস, একটি লবঙ্গ দিয়ে বেটে, বাসি পেটে, মাত্র একদিন শনিবারে সেবন করবেন। ভগবানের কৃপায় আপনার কোলে আঁধার ঘর আলো করে একটি পুত্র জন্ম নেবে। দিন, দিন মা, আমার হাজত দিন। আবার অন্য বাড়িতে যেতে হবে তো।

বেগম : বাবা ঠাকুর মশাই আপনার কথায় খুশি হয়ে আমি আপনাকে পাঁচশত টাকা দিলাম। খুশি মনে আমার জন্য আর্শীবাদ করবেন। (প্রস্থান)

ঠাকুর : পাঁচশত টাকা ! পনের দিন ঘুরে পাই না দশ টাকা, আর এক বাড়িতেই পাঁচশত টাকা ! যাক, মা দুর্গা, এবার গিন্নি আর আমাকে মারতে সাহস পাবে না। (প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

(বাদশার প্রবেশ)

বাদশা : শুনেছি বেগম সাহেবানির সন্তান প্রসবের কাল উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো সংবাদ এলো না। আজ আমি সন্তানের পিতা হবো, হে আল্লা, এ যে আমার কতো বড়ো আনন্দের কথা।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী : (গান)

শুনেন শুনেন শুনেন গো বাদশা শান্ত করেন প্রাণো
হায় গো শান্ত করেন প্রাণো
আপনার একটি ছেলেগ হইছে পূর্ণিমারো চন্দ্র গো
শুনেন বাদশা, শুনেন সমাচারো ॥
হায় গো, চাঁদের গায়ে আছে কলঙ্ক দেখে সবাই চাইয়া
হায় গো দেখে সবাই চাইয়া।
আপনার ছেলের নাই কলঙ্ক দেখে যান আসিয়া গো
রূপে আলো করেছে ভুবনো ॥

www.pathagar.com

বাদশা : দাসী, দাসী গো, তোমার মুখে–আমার পুত্র জন্মেছে–এই সংবাদ শুনে আমি তোমাকে একশত টাকা বকশিশ দিচ্ছি। (বকশিশ নিয়ে সালাম করে দাসীর প্রস্থান)

কোথায় সর্দার?

(সর্দার প্রবেশ করে কুর্নিশ করবে)

সর্দার : জি হুকুম জাহাপনা?

বাদশা : যাও সর্দার ঐ রামকানাই ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আসবে, আমার পুত্রের একটি নাম রাখার জন্য।

সর্দার : জি হুকুম জাহাপনা, এখনই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

(ঠাকুরের প্রবেশ)

ঠাকুর : (ভয়ে ভয়ে) প্রণাম হই জাহাপনা। তা হঠাৎ এ গরিবকে–

বাদশা : না ঠাকুর মশাই, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি আমার বেগম সাহেবানিকে হাত দেখে সন্তান হবার জন্য ঔষধ দিয়েছিলেন না? আল্লার রহমতে তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। (ঠাকুর খুশি হয়ে–'জন্ম হয়েছে'–হাসি)

এবার ভালো একটি নাম রেখে দাও।

ঠাকুর : হ্যা, হ্যা, হ্যা, সবই মা দুর্গার খেলা। মা করুণাময়ী আমার কথাটা রেখেছে। হা হুজুর এই আমি পুথি-পুস্তক ঘেঁটে দেখি মা দুর্গা এবার কি করে। হে করুণাময়ী মা, হে ভুলা মহেশ্বর, হে সিদ্ধি দাতা– নমঃ নমঃ। (পুথি ঘাটবে) পেয়েছি জাহাপনা এবার বড়োই চমৎকার নাম পেয়েছি। আপনার নাম জামাল বাদশা, আপনার পুত্রের নাম রাখলাম মুলুক চাঁন বাদশা। তা বলুন এবার নামটা কেমন হলো?

বাদশা : আপনার নাম রাখা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি।

ঠাকুর : খুশি হবেন না? খুশি হবার কথাই যে, আমি কি এতোই বোকা ঠাকুর যে আমার নাম রাখা দেখে আপনি খুশি হবেন না? দিন হুজুর আপনার বকশিশ দিন। এবারে কুড়ি টাকা না দিলেই নয়।

বাদশা : না ঠাকুর আমার পুত্রের নাম রাখা শুনে আমি আপনাকে পাঁচশত টাকা বকশিশ দিলাম।

ঠাকুর : (হেসে) হাঃ হাঃ পাঁচশত টাকা, এবার এই টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণীর জন্য একটি নছিমনের কেসেট কিনে দিব। নমস্কার মহারাজ, নমস্কার। (প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

(স্কুলের কাছে জটা, খটা ও পইতা তিনজন ছাত্রের প্রবেশ)

জটা আর ইস্কুলে আসা যাবে না খটা, আর আসা যাবে না।

www.pathagar.com

খটা খটার ইস্কুল কামাই যাবে না তা যত বানরের দলই হোক না কেন।

জটা আমাকে যে দিন ধরছিল, ঐ...

(মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : এই বখাটের দল, কি গল্প হচ্ছিল?

জটা : না স্যার, ইস্কুলে আসার সময় দেখি ঐ কচু ঝোপের আড়ালে চার জনে তাস খেলতেসে, তাই আর কি।

মাস্টার : হা জটা তুমি ঠিকই বলেছ, আমি থানায় গিয়ে ওসি সাহেবকে বলে এর একটা ব্যবস্থা করবো।

সকলে : স্যার, ওরা আমাদের ওপর শুধু শুধু রাগ করে আর গালি দেয়।

মাস্টার : ঠিক আছে ওদের ধরিয়ে দিতে হবে, তা না হলে দেশের অমঙ্গল হবে। যাও তোমাদের আজকের মত ছুটি। (সবার প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

(রাজ প্রাসাদ)

(বাদশা ও বেগমের প্রবেশ)

বাদশা : বেগম, মুলুক চাঁন এখন ছোটো নেই, সে বুঝতে পারে সবই। তাকে স্কুলে দিতে হবে, তা না হলে যে আমাদের ক্ষতি হবে।

বেগম : জাহাপনা আমিও তাই ভাবছি। (মুলুক চাঁনের প্রবেশ)
এইতো আমাদের মুলুক চাঁন আসছে।

বাদশা : এসো বাবা মুলুক চাঁন, আমাদের বক্ষে এসো। (উভয়ে কোলে নিল)
সর্দার কোথায়?

সর্দার : জি হুকুম জাহাপনা।

বাদশা : যাও, তুমি এখনই ঐ মাস্টার সাহেবকে ডেকে আনবে।

সর্দার : যথা আজ্ঞা জাহাপনা।

(মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : সালাম জাহাপনা, আমায় কেন তলব করেছেন?

বাদশা : মাস্টার সাহেব, আমার একটি মাত্র পুত্র মুলুক চাঁনকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য আপনার স্কুলে ভর্তি করে নেবেন। যাও বাবা মুলুক চাঁন, তোমায় আজ হতে এই মাস্টার সাহেবের নিকটে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সাবধান কারো সাথে খারাপ ব্যবহার কোরো না।

মাস্টার : এসো মুলুক চাঁন আমার সঙ্গে চলে এসো। (উভয়ের প্রস্থান)

www.pathagar.com

৫ম দৃশ্য

(স্কুল বসেছে)

(গণ্ডগোল হচ্ছে এমন সময় মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : এই জটা, খটা, পইতা তোমরা চুপ করো, যার যার জায়গায় বসো। এই জটা, তুমি কাল স্কুলে আসো নাই কেন?

জটা : স্যার, আমার শরীরটা একটু খারাপ খারাপ মনে হয়েছিল কিনা, তাই।

মাস্টার : হুঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা খটা বলতো তোমার বইটার নাম কি?

খটা : শিশু শিক্ষা স্যার।

মাস্টার : বেশ, বানান করত শিশু শিক্ষা।

খটা : স্যার আমরা মায়ের কোলে ছিলাম শিশু আর স্কুলে করি শিক্ষা এইতো হলো শিশু শিক্ষা।

মাস্টার : আহঃ, একেবারে বিনা অক্ষরে বানান আর কি। (বেত্রাঘাত) এই পইতা তুমি নাকি পাশের বাড়ির বিধবা বুড়িকে গালি দিয়েছিলে?

পইতা : স্যার ঐ বিধবা বুড়ির স্বামী না খুব পাজি, সে আমাকে গালি দেয়, তাই আমি গালি দিয়েছিলাম।

মাস্টার : দুষ্টু ছেলের কথা শোনো, বিধবার আবার স্বামী থাকে নাকি। (বেত্রাঘাত) আচ্ছা মুলুক চাঁন, তুমি আজকের পড়া শিখেছ?

মুলুক : জি স্যার, শিখেছি।

মাস্টার : বলত আজকের ছড়াটি।

মুলুক : কবিতার নাম 'বাসনা', লিখেছেন কবি সাইদুর রহমান।
আমি যেন ভালো ভাবে শিখি লেখা পড়া
তাদের আদেশ মেনে চলবো বড়ো আছে যারা
পিতা মাতা ভাই বোনের হবো আদরীয়,
ছোটো যারা হবে তারা আমার কাছে প্রিয়।

মাস্টার : বাহঃ, চমৎকার মুখস্থ করেছ। যাও আজকের মত সকলের ছুটি। (সকলের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(রাজ প্রাসাদ)

(বাদশা আপন মনে ভাবছে)

বাদশা : সন্তানের ওপর কিনা মহব্বত, মায়া, মমতা দিয়েছ পরয়ারদিগার।

(বেগমের প্রবেশ)

বেগম : জাহাপনা, আপনি যেন সব সময় আপন মনে কি ভাবতে থাকেন। খুলে বলুন জাহাপনা কি এমন চিন্তার কারণ হতে পারে?

www.pathagar.com

বাদশা : কি আর বলব বেগম, আমার মুলুক চাঁনকে এক দণ্ড না দেখলেই যেন সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়। তাই ভাবছি বেগম।

বেগম : জাহাপনা আমি যদি মরে যাই আমার মুলুক চাঁনকে রেখে আর আপনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং সে ঘরেও যদি এমনি পুত্র হয়, তখনও কি আমার মুলুক চাঁনকে এমনি করে ভালোবাসবেন?

বাদশা : কি বলছো প্রেয়সী? আমার রাজত্ব ও প্রতিপত্তি একদিকে, আর আমার মুলুক চাঁন একদিকে। আমার সর্বস্বর বিনিময়েও আমার পুত্রের মুখে আব্বা ডাক বড়ো।

বেগম : তা ঠিক স্বামী। আমি বলতে চাই সন্তান রেখে যদি কোনো নারী মারা যায়, আর ঐ স্বামী পুনরায় বিবাহ করে এবং সেই বিবির গর্ভে সন্তান হলে প্রথম সন্তানকে তার পিতা একেবারেই ভুলে যায়।

বাদশা : না না না বেগম, আমাকে ঐ সব সামান্য ছোটো লোকের মত ভেবো না। আমার এক হাতে চন্দ্র আরেক হাতে যদি সূর্যও এনে দেয় তবু আমার মুলুক চাঁনকে ভুলতে পারবো না।

বেগম : ঐ তো জাহাপনা আমাদের মুলুক চাঁন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে।

(মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

বাদশা : এসো বাবা মুলুক চাঁন (কোলে নিবে), আজ তোমার বাড়ি ফিরতে এতো দেরি হলো কেন?

মুলুক : আব্বা, রাস্তায় এসে দেখি একজন অন্ধলোক পথ হারিয়ে অন্য পথে চলছে। আমি তার হাত ধরে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এসেছি, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

বাদশা : দেখেছ বিবি, এই বয়সেই আমার পুত্র মুলুক চাঁন ধর্মের প্রতি কত আগ্রহী। (মুলুককে কোলে নিয়ে দু'জন আদর করতে থাকবে)

(পাগল বেশে বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

আজ যে ছেলে কোলে নিয়ে আদর করছো এতো

কাল না ছেলে ধূলায় পড়ে কাঁদবে কত শত ॥

কোলে নিয়ে রং তামাশা, তবুও মিটেনা আশা (২)

কোথায় যাবে এই পিপাসা (২) ভালোবাসা যত ॥

বাদশা : কিরে বেটা, আমার ছেলে ধূলায় পড়ে কাঁদবে–এ কথা বলতে তোর বুকটা কেঁপে ওঠেনি?

বিবেক : (গান)

কেমনে খণ্ডাবি বলি, দুনিয়ারো স্বভাব গুলি (২)

বলে পাগল সাইদ আলী (২)

স্বভাবে সব রত ॥ (প্রস্থান)

www.pathagar.com

বেগম : ওহঃ আমার বুকের ভেতরটা ব্যথা করে উঠলো কেন, আমি যে আর সইতে পারছি না। (শুয়ে পড়ল)

মুলুক : মা, মাগো, অমন করছো কেন মা, কথা বল মা। আব্বা, আব্বা গো, মা যে কথা বলছে না। মার কি হলো আব্বা?

বাদশা : কোথায় আমাদের ডাক্তার, ডাক্তার কোথায়, ডাক্তার?

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার : জাহাপনা, বেগম সাহেবানির কি হয়েছে?

বাদশা : ডাক্তার সাহেব দেখুন বেগমের কি হলো।

ডাক্তার : আমি দেখছি, চিন্তা করবেন না। (দেখে নিল) জাহাপনা, বিবি সাহেবার ডবল নিউমনিয়া হয়েছে, অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

মুলুক : আব্বা, আব্বা গো, ডাক্তার কি বলছে? তবে কি মা আর বাঁচবে না? আমি কাকে মা ডাকবো?

বাদশা : ডাক্তার সাহেব যত টাকা লাগে আমি দিচ্ছি, আপনি ভালো করে দেখুন কি হলো বেগমের।

ডাক্তার : হা, এইতো দু'টি বড়ি দিচ্ছি, এক ঘন্টা অন্তর খাওয়াবেন। আগামী দিন আবার এসে দেখবো।

বাদশা : আপনার ভিজিট নেবেন না?

ডাক্তার : কালই নেব। (প্রস্থান)

বেগম : বাবা মুলুক চাঁন, স্বামী, দু'জনেই আমার কাছে আসুন। মুলুক চাঁনকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি, আমি বাঁচবো না। এ জগতে আমার আর থাকা হলো না। অনেক আশা-ভরসা নিয়তির বানে ভেসে গেল। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে আর কথা বলব না, যাই স্বামী–আল্লাহ্...(মৃত্যু)

(বাদশা ও মুলুক কান্না করবে)

মুলুক : মা, মাগো, তুমি কথা বল মা। তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে, কে আমাকে খেতে দেবে? কে আমাকে আদর করে বুকে টেনে নেবে মা?

বাদশা : একি হলো আমার? বেগম, তুমি কেন আমার সাথে অভিমান করে আমাকে একা রেখে বিদায় হলে?

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী : জাহাপনা, যা হবার তা হয়েছে। এতো উতলা হলে মুলুক চাঁনকে কে দেখবে? লোকজন ডেকে বাকি কাজ সমাধানের ব্যবস্থা করুন।

বাদশা : হা দাসী, তাই করবো। আমি ভাবছি কেমন করে আয়শা (বেগম) আমাকে অসহায় করে চলে গেল।

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

www.pathagar.com

তোরা দেখ রে দুনিয়ার লোক, এভাবে সব চলে যায় (২)
আসবে সমন করবে দমন, নিয়ে যাবে করে বন্ধন (২)
কাঁদবে কত আত্মীয়-স্বজন (২) ভুলবে কারো মমতায় ॥
কই গেল ছেলের মমতা, কোথায় বল পিতা মাতা (২)
মায়ার ভুবন গেল কোথা ভেবে কয় সাইদ পাগলায় ॥ (প্রস্থান)

(লোকজন মৃতদেহ নিতে চায়, মুলুক চাঁন বাধা দেয়। এ অবস্থায় সকলের প্রস্থান।)

মুলুক : নিয়ো না আমার মাকে, নিতে দেব না। মাকে ছাড়া যে আমি বাঁচবো না। মা, মা, মা– (প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

(মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

মুলুক : (গান)
হায় গো কোথায় গেল মা জননী আমাকে ছাড়িয়া
আমি কার কাছে যাই, কারে বা জানাই, ডাকবো মা বলিয়া গো ॥
কেনবা বিধি আমায় মা হারা করিলা–
হায় গো কে আমাকে আদর করে বুকে নিবে তুলে
আমি আদর সোহাগ কোথায় পাবো বসে মায়ের কোলে গো ॥
কেনবা বিধি আমায় মা হারা করিলা
হায় গো মায়ের মত বান্ধব আমার কে আছে সংসারে
এমনো দরদির কথা কেমনে যাই ভুলিয়া গো ॥

(বাদশার প্রবেশ)

বাদশা : বাবা মুলুক চাঁন, তুমি যদি এমনি করে শুধু কাঁদো, আমি কেমন করে সইতে পারবো? বাবা, তোমার মা মরেছে কিন্তু আমি তো আছি। আমি তোমার সব অভাব মোচন করে রাখবো। চল যাই খাবার সময় হয়েছে, খেতে হবে যে। (পুত্র কোলে নিয়ে বাদশার প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(বাদশার প্রবেশ)

বাদশা : ওহঃ খোদা, তোমার একি বিচার, আমি কি ভেবেছিলাম আর তুমি কি করলে দয়াময়? আমি দ্বিতীয় বিবাহের বর সাজবো একি সম্ভব? কে জানে এর পরে আবার কি হবে।

www.pathagar.com

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী : জাহাপনা, আপনি সব সময় মিছেমিছি চিন্তা করে সোনার বর্ণ শরীরটা যে একেবারে শেষ করে দিলেন। আজ যে আপনার বিবাহের দিন ভুলে গেলে চলবে কি?

বাদশা : হা দাসী, আজ আবার আমাকে বিয়ে করতে হবে। নতুন বধূ আসবে আমার পাশে। কিন্তু সেকি আমার পুত্র মুলুক চাঁনকে তার মায়ের মত আদর করে বুকে স্থান দিয়ে তার মাতৃবিয়োগের জ্বালা দূর করতে পারবে?

(মুলুকের প্রবেশ)

মুলুক : আব্বা, আব্বা গো আপনি শুধু আনমনে কি যেন বলতে থাকেন, আর আমাকে দেখা মাত্র চুপ হয়ে যান। বলুন না আব্বা কি বলতে চান আপনি?

বাদশা : বাবা মুলুক চাঁন, কি আর বলতে চাই, বলব, বলব বাবা বলব–তোমার নতুন মা আসবে আবার আমাদের ঘরে।

মুলুক : কোন সময় আসবে আব্বা? আমি যে মা বলে নতুন মায়ের কোলে যাব।

বাদশা : ওহঃ খোদা, এমন যে সরল সহজ বালক, তাকে করেছ মাতৃহারা। তুমি কি এতোই নিষ্ঠুর খোদা?

দাসী : হুজুর, বেহারা সহ লোকজন বাইরে অপেক্ষা করছে, চলে আসুন।

বাদশা : হা দাসী, বিয়ে করতে যাব আজ–চল দাসী, এসো মুলুক চাঁন। (সকলের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

(দু'জন সখির প্রবেশ)

১ম : আ-লো বোন, দেখছিস তো, মেয়ে মানুষ তার কত অহংকার। আমাদের বাদশাজির ভাগ্যে ছিল, তাই বিবাহ করে ঘরে তুলেছে, তা না হলে অমন মেয়েকে আবার দেখতে পাই নাকি?

২য় : হ্যা-লো বোন, সত্যি বলেছিস। বাদশার বেগম বলে আমরা একটু সালাম জানাতে গেলাম, হায়, হায় একটু ফিরেও চাইল না। বিবি হয়ে এসেছে বলেই কি এতো অহংকার?

১ম আ-লো, শুধু কি তাই, এক বছর যেতে না যেতেই এক ছেলে জন্মেছে, নাম রেখেছে আলেক চাঁন।

২য় ওমা, তাইতো বলে–আমার ছেলে তো বাদশা হতে পারবে না, বাদশা হবে সতীনের ছেলে মুলুক চাঁন–এ কি কথা গো?

১ম আহঃ পর কি আর আপন হয়? আপন যে ছিল সে মারা গেছে। এখন সৎ মায়ের মুখে তাকিয়ে থাকবে মুলুক চাঁন।

২য় : একটি দুঃখের কথা শুনলাম–মুলুক চাঁন নাকি কোনো কোনো দিন না খেয়েই স্কুলে যায়। আবার বাসি, পচা, পুড়া ভাতও নাকি মুলুক চাঁনকে খেতে দেয়।

www.pathagar.com

১ম   মা যার ঘরে নাই তার দুঃখেরও শেষ নাই। ঐ আলেক চাঁনকে সব সময় মুলুক চাঁন কোলে করে রাখে। আর একটু যদি নিজের ছেলে কাঁদে আর ওমনি বড়ো ছেলেটাকে মারধোর করে। আহঃ ছেলেটার ভাগ্যে এই ছিল।

২য়   সবই সত্য গো, সবই সাচ্চা কথা। তবে আপন মা যখন মরে গেছে তখন মুলুক চাঁনের ভাগ্যে যে কত দুঃখ আছে তা আল্লাহ্ই জানে।

১ম   চল যাই বোন। যদি ছোটো বিবি জানতে পারে আমাদের কথা তবে আবার বাদশাজি আমাদের ওপর রাগ করবে।

২য় : হা, চল যাই, কথায় বলে না–মা মরিলে বাপ তাওই, ভাই হয়ে যায় বনের বাওই। হে আল্লাহ্ তুমিতো সবই দেখ, মা হারা ছেলেটার তুমিই একমাত্র বল-ভরসা। হে আল্লা, তুমি সত্য, সত্য,. তুমি সত্য। (উভয়ের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

(দ্বিতীয় বেগমের প্রবেশ)

২য় বেগম : কি করি, কিছুই ভালো লাগছে না। সতীনের ছেলে হবে বাদশা, আর আমার ছেলে হয়ে থাকবে তার গোলাম। না, না আমি তা হতে দেব না। আমি বেঁচে থাকতে আমার ছেলে আলেক চাঁনকে বাদশা না করে ছাড়বো না। এখন আমার প্রথম কাজ হবে স্বামীকে আমার হাতের মুঠোয় আনা। তার-পর, তারপর ঐ মুলুক চাঁনকে ছলে-বলে-কৌশলে দেব দেশান্তরিত করে।

(আলেক চাঁনের প্রবেশ)

আলেক : মা মা, আব্বা কোথায়?

২য় বেগম : এসেছ বাপ, আলেক চাঁন? চলো খেতে দেই তোমাকে।

আলেক : মা মা, আমার ক্ষুধা পায়নি। মিয়া ভাই আমাকে লিচু, পেয়ারা, নাসপাতি, আপেল–এসব ফল পেড়ে দিয়েছিল, আমি পেট ভরে খেয়েছি।

২য় বেগম : সেকি ঐ বাঁদরটাও বুঝি খেয়েছে?

আলেক : মা মা, তুমি যেদিন থেকে বাগানের ফল খেতে মানা করেছ, সেই দিন থেকে মিয়া ভাই একটি ফলও খেয়ে দেখে না। মা, মিয়া ভাইয়ের বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, সারাদিন কিছুই খায়নি। মিয়া ভাইকে খেতে দাও না?

২য় বেগম : চুপ করো বোকা ছেলে, নিজের চিন্তা করো। তোমার যদি ক্ষুধা পেয়ে থাকে তাহলে ঘরে চলো। মিঠাই, মণ্ডা, মোয়া কত কিছু তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। যখন যা চাবে, তাই খেতে পাবে।

(মুলুকের প্রবেশ)

মুলুক : মা, মাগো বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দাও মা।

২য় বেগম : না, এখনো রান্না হয়নি। যাও, ঐ যে কোদাল নিয়ে যাও, সব্জি ক্ষেতে চারপাশে কুপিয়ে তারপর পানি দেবে। কাজ না করে খেতে চাস কেমন করে? যাও বলছি, রান্না হলে ডেকে এনে খেতে দেব। (মুলুকের প্রস্থান)

www.pathagar.com

২য় বেগম : আর কয়েক দিন এমনি যদি খাবার না খেতে দেই তবে আস্তে আস্তে শুকিয়ে মারা যাবে, তবেই আমার মনের সাধ মিটবে। (আলেককে নিয়ে প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

(কোদাল কাঁধে মুলুকের প্রবেশ)

মুলুক : ওহঃ আহঃ আর যে সইতে পারছি না। গতকাল খেয়েছি সামান্য পুড়া ভাত, আজের দিনও প্রায় যায়। আলেক চাঁন লুচি, পুরি, সন্দেশ খেতে চাইল না, আর আমি কত চেয়েও এক মুঠো খাবার পেলাম না। মা, মাগো, কেন তুমি আমাকে রেখে চলে গেলে? সজি ক্ষেতে পানি দিয়েছি, শরীর থর থর করে কাঁপছে। এখন কেমন করে কোদাল দিয়ে বাগান কুপাবো? আমি যে আর পারছি না।

(গান)

হায় গো কালও গেল আজও গেল, গেল অনাহারে–
হাঁটতে পারি না আর আমি কাঁপি থরে থরে গো–
মনের দুঃখ আমি বলব কার কাছে?
হায় গো অনাহারে জীবন যাবে সহে না পরানে
ওহে কেহ তো নিল না খবর মুলুক চাঁন বলিয়ে গো।
হায় গো হাটতে না পারি আমি পড়ি আছাড় খেয়ে
আমি কেমনে কুপাবো মাটি হাতে কোদাল নিয়ে গো।

(মুলুক বসে আছে এসময় ২য় বেগমের প্রবেশ)

২য় বেগম : কিরে মুলুক চাঁন, কাজ না করে বসে বসে আরাম করছো, কেমন? কাজ না করে খাবার পাবে কোথায়? আজ তোর খাবার নেই।

মুলুক : না মা, সজি ক্ষেতে পানি দিয়েছি। ক্ষুধায় শরীর কাঁপছে, দু'দিন যাবত অনাহারে আছি, মা মাগো তোমার দু'টি পায়ে পড়ি মা, আমায় কিছু খেতে দাও মা। আমি না খেলে মরে যাব মা।

২য় বেগম : আহ্ঃ প্রাণটা জুড়াল আর কি, পা ধরলেই খাবার পাওয়া যায়? খাবার কি হাওয়া থেকে আসে, না ঐ নদীতে ভেসে আসে? কাজ করলে খেতে পাওয়া যায়। যাও বলছি ঐ যে উঁচু নিচু জায়গাটা কোদাল দিয়ে সমান করে এসো। (স্বগত) কাল দিয়েছি সামান্য বাসি পুড়া ভাত, আজকের দিনও যায়। এমনি করে মারতে পারলেই আমার...

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

পিশাচ বলিবে তোমারে, পিশাচ বলিবে তোমারে
সাধ্য কি মারতে পারবে খোদা যদি রক্ষা করে ॥

২য় বেগম : দূর হয়ে যা, পাগল।

www.pathagar.com

বিবেক : (গান)

সাধে কি পাগল হয়েছি, সারা দেশ ভ্রমণ করেছি
তোর মতো আর কজন দেখেছি মনে নাহি পড়ে
বজ্রাঘাত হবে যেদিন তোর মাথার উপরে
হায় হায় করে কাঁদবি সেদিন (২) তখন কি আর কাঁদলে নারে ॥

২য় বেগম : যা পাগল, তোর কথায় আমার গা টা জ্বলে উঠছে।

বিবেক : (গান)

এই আর জ্বলিবে কত, জ্বলবে একদিন চিতার মত
চক্ষে না দেখিবে পথ কাঁদবে উচ্চস্বরে (২)
যেটুকু সহিতে পারে সেটুকু দিস ওরে
বলে পাগল সাইদ মিয়া কাটায় নেবে ওজন করে ॥ (প্রস্থান)

মুলুক : মা, মা গো, আমায় কিছু খেতে দাও মা, আর না হয় আমাকে মেরে ফেল মা।

২য় বেগম : দাঁড়া, সামান্য কিছু খাবার আছে এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান এবং খাবার নিয়ে পুনরায় প্রবেশ)

এই নাও কাজ বলতে কিছুই তো পারবে না, শুধু জানো খেতে। তাও একটু দেরি হলেই আমার দুর্নাম করে বেড়াবে। (প্রস্থান)

(মুলুক চাঁন খাচ্ছে আর আনমনে কথা বলছে)

মুলুক : মা আমাকে যে খাবার দিয়ে গেল, আমার পেটের ক্ষুধা আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। ঐ তো হাঁড়িতে অনেক খাবার আছে, আমি কিছু নিয়ে খাই। (হাঁড়ি থেকে খাবার নিচ্ছে এমন সময় ২য় বেগমের প্রবেশ)

২য় বেগম : কিরে মুলুক যে খানা দিয়েছি তারপরেও চুরি করে খাচ্ছিস? চোর ছেলে রেখে মরে গেছে তোর মা। এবার খা, ভালো করে খা। (ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে প্রস্থান)

মুলুক : একি করলাম আমি! অনাহারে থাকাই যে ভালো ছিল। কেন আপন হাতে খানা নিলাম? আব্বা জানতে পারলে যে আমার রক্ষে নেই। যাই দেখি ঐ কদম তলে একটু শুয়ে থাকি গিয়ে। (প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

(বাদশা, ২য় বেগম ও আলেক চাঁনের প্রবেশ)

বাদশা : বাবা আলেক চাঁন, মন খারাপ করেছ কেন, কি হয়েছে?

২য় বেগম : ওর আর কি হবে, আমার এই পোড়া কপালের দোষ বলার কি কিছু আছে?

www.pathagar.com

বাদশা : একি বলছ বেগম, বাপ আলেক চাঁন যদি মলিন মুখে পাশে দাঁড়ায় আর যদি তোমার বদন খানিও বিষণ্ন দেখি, তবে যে আমার বক্ষটা জ্বলে যায়।

২য় বেগম : জ্বলে যাক আর পুড়ে যাক–এ সবই মুখে মুখে, অন্তরে নয়।

বাদশা : শুধু মুখে মুখে নয় বেগম, যদি সম্ভব হতো বক্ষ চিরে দেখাতাম। তোমার জন্য আমি মরতেও রাজি।

২য় বেগম : (স্বগত) বুঝতে পারছি বাদশা আমার রূপে মগ্ন। এখন যা বলব মেনে নেবে।

(প্রকাশ্যে) তবে শুনুন স্বামী, আপনার ঐ আদুরে ছেলে মুলুক চাঁনকে কি করবেন তাই বলুন।

বাদশা : কেন, সে আবার কি করেছে?

২য় বেগম : কি আবার করবে, আলেক চাঁনের জন্য কিছু সন্দেশ রেখে দিয়েছিলাম, ঐ দুষ্টু, পেটুক, চোরা সব খেয়ে সাবাড় করেছে। গতকাল ওর জন্য কিছু খাবার রেখেছিলাম তাও চুরি করে খেয়েছে। আলেক চাঁন আমার না খেয়ে কেমন হয়ে গেল। এতো কি সইতে পারা যায়?

বাদশা : (অবাক হয়ে) চুরি করে খেয়েছে? না না, ওর তো এমন স্বভাব ছিল না।

২য় বেগম : (কাঁদতে কাঁদতে) তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি?

বাদশা : না না না, তুমিও মিথ্যে বলতে পারো না। যাও বাবা আলেক চাঁন, মুলুক চাঁনকে এখনি ডেকে নিয়ে এসো। (আলেক চাঁনের প্রস্থান এবং মুলুক চাঁন সহ পুনঃপ্রবেশ)

মুলুক : আমায় কেন ডেকেছেন?

বাদশা : কেন ডেকেছি শুনবে? চুরি করে খাওয়া শিখেছ কেমন?

মুলুক : মা, আব্বা আমি তো কখনও কিছু চুরি করিনি।

বাদশা : চুপ কর্ হারামজাদা, গতকাল সন্দেশগুলি কে চুরি করেছে সত্যি কথা বল নইলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব তারপর বাড়ি থেকে বের করে দেব।

মুলুক : না, আমি মিথ্যা বলিনি আব্বা। আমি কখনও কিছু চুরি করে খাইনি।

বাদশা : তবু মিথ্যা বলছিস, বেয়াদপ, দেখাচ্ছি মজা। (ঘাড় ধরে মারতে যাবে)

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

বিশ্বাস করলি কার কথায় (২)
বাদশার ছেলে ভাত-তরকারি চুরি করে খায় ॥
এক মুঠো ভাত খেয়ে থাকে, কয় না কিছু মনের দুঃখে (২)
কি দুঃখ যে ওর অন্তরে বুঝবে কে এই ধরায় ॥

২য় বেগম : দেখ্ পাগল, সব সময় গণ্ডগোল করিস না।

www.pathagar.com

বিবেক : (গান)
তুই হলি সর্বনাশের মূল, পাগল না করে গণ্ডগোল। (২)
বুঝবে একদিন পাগলের বোল (২)
জেনো থাকবে না উপায় ॥

বাদশা : যা যা পাগল, চলে যা।

বিবেক : (গান)
সকলি তোর যাবে চলি বলছে পাগল সাইদ আলী
মিথ্যাকে তুই সত্যি ভাবলি (২) নারীর মায়ায় ॥ (বিবেকের প্রস্থান)

বাদশা : শোন মুলুক চাঁন, তুমি চুরি করে খেতে শিখেছ। তোমার এই বাড়িতে আর থাকা চলবে না। এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও।

মুলুক : (মাকে জড়িয়ে ধরে) মা, মাগো আমি কোথায় যাব মা?

২য় বেগম : কোথায় যাবে তা আমি কি জানি? চুরি করার সময় মনে ছিল না? হয় বাড়ি থেকে চলে যাবে নয় গলায় রশি বেঁধে গাছে লটকিয়ে মরগে।

বাদশা : শোন মুলুক চাঁন, এখনো সময় আছে, চাবুকের বাড়ি না খেতে চাইলে এই মুহূর্তে এই বাড়ি ত্যাগ করতে হবে।

মুলুক : মা, আমি সারাদিন অনাহারে আছি, আমায় কিছু খেতে দাও মা।

২য় বেগম : শুনেছ তোমার গুণধর ছেলের কথা, এতো সব চুরি করে খাবার পরেও বলে সারাদিন অনাহারে আছি। (মার দিয়ে বলছে) যা বলছি ঐ রাস্তায় পড়ে মর গিয়ে।

আলেক : সত্যি মা, মিয়া ভাই আর কিছুই খায়নি। আমার জন্য খাবার আছে, আমি এনে দিচ্ছি মিয়া ভাইকে। (প্রস্থান এবং খাবার নিয়ে প্রবেশ) মিয়া ভাই আপনি পেট ভরে খেয়ে নিন। (হাতে দিল)

২য় বেগম : এ কি করছিস, এই খাবার কুকুরকে দেব, তবু ওকে নয়। (মুলুকের হাত থেকে থালা ফেলে দেবে)

বাদশা : না, আমি আর পারছি না, আমি চলে যাই। (প্রস্থান)

২য় বেগম : এমন করে মায়া কান্নায় কাজ হবে না, বেরিয়ে যা (বেত্রাঘাত)। যা বলছি চোর কোথাকার, বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা এ বাড়ি থেকে (বেত্রাঘাত)।

মুলুক : ওহঃ আব্বা, আব্বা গো, আমাকে বাঁচাও, আমি মরে গেলাম। জগতে যার মা নেই, তার আর কেউ নেই। পিতা আমাকে বিদায় দিয়ে চলে গেল, কার ভরসায় আর থাকবো। হে জন্মভূমি জননী, তোমাকে ছেড়ে চললাম, তুমি আমার সহায় থেকো।
(গান)

১. শোন শোন ও আব্বাজান বলি যে তোমারে–
আমি চল্লাম বনবাসে বিদায় দাও আমারে গো–

www.pathagar.com

যার কর্মে যা লিখেছেরে।

২. যার কর্মে যা লিখেছে বিধি আবের কলম দিয়া
এমন বা কার সাধ্য আছে নেবে তাই খণ্ডাইয়া গো-
যার কর্মে যা লিখেছেরে।

৩. শিশু কালে মা মরিল পিতা হইল পর
এমন যে দরদি নাইরে তুলে নেবে কোলে গো
যার কর্মে যা লিখেছেরে।

৪. যে দিন হইতে মা জননী গিয়েছে মরিয়া
সে দিন হইতে কান্দি আমি নিরলে বসিয়া গো।

৫. অনাহারে জীবন গেল সহেনা পরানে-
তুমি যে অনাথের বন্ধু তরাইও আমারে গো
যার কর্মে যা লিখেছেরে।

৬. পিতা মোরে দিল বিদায় মায়া নাই তার প্রাণে
তোমার নাম ভরসা করে চলিলাম এই বনে গো। (মুলুকের প্রস্থান)

আলেক : মা, মা, তুমি বিনা দোষে মিয়া ভাইকে এতো কষ্ট দিয়ে তাড়িয়ে দিলে? আমি কাকে মিয়া ভাই বলে ডাকব? তুমি থাকো মা, আমি যাই দেখি আমার মিয়া ভাইকে ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা। (প্রস্থান)

২য় বেগম : একি করছিস, দাঁড়া, একটু দাঁড়া। (প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

মুলুক : হে অনাথের নাথ, দুখীজনার বন্ধু, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, পিতা থাকতেও পিতা নাই, শিশুকালে জননীকে হারিয়েছি বলে বিমাতার চক্রান্তে বনবাসে এসেছি। তুমি আমার পথের দিশারি থেকো আল্লাহ।

(আলেকের প্রবেশ)

আলেক : মিয়া ভাই, মিয়া ভাই, আপনি কোথায় যাবেন? আমি যেতে দেব না।

মুলুক : একি তুমি এখানে কেন ভাই? তুমি মায়ের কোলে ফিরে যাও।

আলেক : মিয়া ভাই, আমি আপনার সঙ্গে থাকবো মিয়া ভাই।

মুলুক : না ভাই আলেক চাঁন, তা হয় না। তুমি মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যাও।

আলেক : (গান)

www.pathagar.com

১. হায় গো মা মরিলে মা পাওয়া যায়
জোড়ের ভাই মরিয়া গেলে ভাই বলিব কারে গো
ভাই হারায়ে আমি কেমনে রব ঘরে ॥
২. হায় গো সব মরিলে সবই পাবো এ ভব সংসারে
ভাইয়ের মত আর কেহ নাই দুনিয়ার বাজারে গো
ভাই হারায়ে আমি কেমনে রব ঘরে ॥

মুলুক : (গান)
১. শোন, শোন আলেক চাঁন ভাই বলি গো তোমারে
আমি যাব বনবাসে, তুমি যাও মার কোলে গো–
মনের দুঃখ আমি বলিব কাহারে ॥
২. ভবে আর দরদি নাই গো, মা গিয়াছে মরে–
আমারো অন্তরের ব্যথা জানবে কি আর পরে গো ॥

(২য় বেগমের প্রবেশ)

২য় বেগম : কিরে আলেক চাঁন, তোর এখানে কি?

আলেক : তোমার এখানে কি? মিয়া ভাইকে তাড়িয়েছ, আবার আমাকে নিতে এসেছ? আমি মিয়া ভাইয়ের সঙ্গে যাব। আমি তোমার সাথে যাব না। তুমি আমার কেউ না। তুমি চলে যাও এখান থেকে।

২য় বেগম : কি? ছোটো মুখে বড়ো কথা। এবার তোকেও ওর মত করে ছাড়ছি। (আলেককে প্রহার এবং সাথে নিয়ে প্রস্থান এবং ২য় বেগমের পুনঃপ্রবেশ) এই চোরের বাচ্চা তোর গায়ের জামা-কাপড় খুলে দে বলছি, ভিক্ষারির ছেলের শরীরে বাদশাহী পোশাক সাজে না। (জোর করে কাপড় খুলে নিয়ে প্রস্থান)

মুলুক : আহ্ঃ আমি এখন কোন পথে যাই? কে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে? আল্লা তুমি আমাকে মুক্তি দাও। (মুলুক কাঁদছে এ সময় বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)
কাঁদিস নারে ওরে যুবক কাঁদিস না তুই আর
চোখ মেলে দেখ ঐ দেখা যায় তোর রাস্তা পরিষ্কার ॥
কাঁদিস নারে ওরে যুবক কাঁদিস না তুই আর।
দুঃখের নিশি হয়ে গেছে ভোর, কেটে গেছে অমানিশা তোর (২)
হাতছানি ডাক এসেছে তোর পাবিরে কোল পাবি এবার ॥
কাঁদিস নারে ওরে যুবক কাঁদিস না তুই আর।
এগিয়ে চল সম্মুখ পানে, ভয় করিস না ঝড় তুফানে (২)
সেই দয়াল তোর সকল জানে (২)

www.pathagar.com

মৌলা আছে ভব কর্মার ॥
কাঁদিস নারে ওরে যুবক কাঁদিস না তুই আর। (প্রস্থান)

মুলুক : হা, পাগলে বলে গেল, আল্লা আমার সহায় আছে। ঠিক তাই, আমি এখানে বসে তাকেই স্মরণ করবো। (বসে পড়ে মোনাজাত ধরল)

হে আল্লা, তোমার নাম নাকি পরম দয়াল, তবে কি আমি তোমার দয়া পাবো না? মা বলে দিয়েছে ওখানে, ঐ রাজ্যে আমার স্থান নেই। আজ ছ'দিন চলে যায় একটি গাছের পাতাও আমার আহারের ভাগ্য হলো না। আমি যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ওহঃ একটু শুয়ে পড়ি খোদা। (শুয়ে পড়বে)

(বনরাজের প্রবেশ)

বনরাজ : কে রে এখানে একাকী বন মাঝে শুয়ে আছিস? ভাগ্যিস কোনো বাঘ সিংহ তোকে দেখিয়েনি, তুহাকেতু এক্কেবারেই গিল্লিয়া ফেলতো রে। একটু ভালো করিয়ে দেখিনি না, মুর্দা আছে, নেহি প্রাণ আছে। (ভালোভাবে দেখে নিল) হারে এ যে প্রাণ আছে রে। কেরে বাপুনি, তুই কি আদমি আছিস, নহেত দেওতা আছিস? উধিয়ে দেখিয়ে লো। একবার বোল না কুথা, আহারে এমন চান্দু বদন ময়লা হয়ে গিয়েছে। তুই বুঝি কুছ আহার করিসনিরে বাছা? কোথা বোল না কেনেরে, তোহার ঘর আছে কাহা? তোর বাপকা নাম কি আছে?

মুলুক : (গান)

হায় গো বাংলাদেশে, চট্টগ্রামে, শিমুলিয়া গ্রামে
পিতার নাম হয় জামাল বাদশা বলি আপনারে গো
মনের দুঃখ আমি বলবো কার কাছে? (বনরাজা মাথা নাড়বে যেন সব বুঝতে পারছে)
হায় গো পিতা থাকতে নাই গো পিতা, মা গিয়েছে মরে
আমার হাউশ করে নাম রেখেছে মুলুক চাঁন বলে গো
মনের দুঃখ আমি বলবো কার কাছে?

বনরাজ : কিয়া বাত বোলো? তোহার বাপজি, জামাল বাদশা আছে রে, তো এই জঙ্গলমে মরতে এলি কেনরে বাপুজি?

মুলুক : (গান)

হায় গো, পিতা আমায় দিল বিদায় আসিয়াছি বনে
এমনো দরদি নাই কেউ তুলে নিবে ঘরে গো
মনের দুঃখ আমি বলবো কার কাছে?
হায় গো সমুদ্রেও পানার মত ভাসি পাকে পাকে,

www.pathagar.com

সবার চাইতে অধিক দুঃখ আমার কপালে গো
মনের দুঃখ আমি বলবো কার কাছে?

বনরাজ: আর বলিস নারে বেটা, হামি তোহার সব কিছুই বুঝেছি। চল তো হামারি ডেরামে চল। হামারি ডেরাছে বহুত ফল আছেরে, ভক্ষণ করবি চল। আহারে পুরো বদনটাই বিষণ্ন হয়ে গিয়েছেরে। তোহা কুছু দুঃখু হবে নিহিরে। আয়, আয় বেটা হামারি কাঁধমে আয়। (মুলুক চাঁনকে কাঁধে নিয়ে বনরাজের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(মুলুকের প্রবেশ)

মুলুক : হায় খোদা রহমানের রহিম, দশদিন ধরে এই বনরাজ আমাকে পুত্র সম লালন করছে। কিন্তু এখানে থেকে আমার কি ফল হবে? আমি জগতের আর দশটি মানুষের মত জীবন যাপন করতে পারবো না। চিরদিন এই বনেই আমাকে কাটাতে হবে?

(গান)
হায় গো, তুমি খোদা রহমানো, তুমি সোবাহানো
তুমি বিনে আর কেহ নাই আমার এ ভুবনে গো–
তোমায় আমি ডাকি যে কতরে ॥
হায় গো রাখ মার সবই পার সব তোমারি হাতে
তোমারি মহিমা অপার কে পারে বুঝিতে গো–

(বনরাজের প্রবেশ)

বনরাজ: একি বাপুজি তোহার কি হলোরে, কি দুঃখ লেগে একা একা রোদন করছিস?

মুলুক : (গান)
হায় গো যখন আমার মনে পড়ে আমার মায়ের কথা
সহিতে না পারি গো আমি বুকে জাগে ব্যথা গো–
শোন, শোন, শোন বনরাজ
হায় গো যে দিকে চাই সে দিকে আঁধার পথ দেখি চোখে
আমি আর কত কাল থাকবো বাপজান তোমার মায়া বক্ষে গো
শোন, শোন, শোন বনরাজ।

বনরাজ: হো, হো, হামি সমঝেছিরে, হাম বুঝিয়াছি। ভাবিয়া কিয়া করবিরে বাপুজি, ইহা যে তোহার নছিব আছেরে, তোহার নছিব আছে। চোল বাপুজি ঘরমে চোল, কুছ খাবে যে।

www.pathagar.com

মুলুক : আব্বা, আব্বা গো আমার যে ঘরে মন বসতে চায় না। আমার মন বলছে কিছু দিন মানুষের সাথে বাইরে কাটাই। তাই কোনো ধর্মস্থানে গিয়ে কিছুদিন কাটাবো। আপনি চলে যান, আমি আর ফিরে যাব না।

বনরাজ : একি বলিস বাপুজি, তোহাকে না দেখে দণ্ডকাল রহিতে পারি? হাম পাগল হুয়ে যাইব রে, আমি উন্মাদ হুয়ে যাইব।

মুলুক : না বাপুজি, আমি আপনাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাচ্ছিনে। আপনি আমাকে খুশি ও আনন্দিত মনে ছেড়ে দিলে আমি কিছু দিন কোনো ধর্মস্থানে অবস্থান করতে চাই। (বনরাজ কেঁদে ফেলবে)

না আব্বা আপনি যে কোনো সময় আমার নিকটে আমাকে দেখতে যাবেন। আর আমি তো মন যখন চায় তখনই ছুটে এসে আপনার কোলে স্থান নেব। আপনি আশীর্বাদ করুন আমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

বনরাজ : আশীর্বাদ করিরে, তোহারি নাম দুনিয়ামে অক্ষয় হয়ে যাবেরে। আয় বাপুজি হামারি বক্ষে তোহাকে ধারণ করে শীতল হয়ে নেব রে। (কোলে নেবে)

আহঃ তোহার বাপজি বোল যে এমনি মধুর আগে নেহি সমঝে। লেকিন তোহাকে লালন করিতাম নারে, লালন করিতাম না।

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

ছেলে পালার বড়ো জ্বালা, ছেলে পালার বড়ো জ্বালা
সাধ করে পাললি রে ছেলে, সোনার তনু করলিরে কালা (২)
যারা ছেলে পেলেছিল কান্তে কান্তে জীবন গেল
নন্দ আর যশোদা মইল পেলে চিকন কালা
হা গোপাল হা গোপাল বলে প্রাণ থাকে উতালা
তাহার সাক্ষী যশোদা পেয়েছিল চিকন কালা ॥

বনরাজ : হারে বেটা, হামি কেনরে এমন ছোকরা তুলে নিলাম?

বিবেক : (গান)

শোন সর্দার তোমায় বলি ভাগ্যগুণে পেয়েছিলে
মুল্লুকের চাঁদ হয়ে তোর বন করেছে উজালা
এখন অমাবস্যা আন্ধা কাঁদবিরে একেলা
তেমনি পাগল সাইদ মিয়া দিন গুনছে বসে নিরালা ॥

বনরাজ : চোল রে মুলুক চাঁদ, তোহাকে ধর্মস্থানের পথ দেখিয়ে দিয়ে লেই। (মুলুক বনরাজকে সালাম করবে এবং উভয়ে প্রস্থান করবে)

www.pathagar.com

২য় দৃশ্য

(মাজার শরিফ)

(দু'একজন মস্তান বসে আছে, এমন সময় মুলুকের প্রবেশ)

মুলুক : এইতো বায়েজিদ বুস্তান এসেছি, ঐ তো দেখছি সেই পুকুর যার কথা শুনেছিলাম। বাহঃ হাজার হাজার গজার মাছ, ঐ তো কত বড়ো বড়ো কচ্ছপ গুলি কি সুন্দর খেলা করছে। কেহ আবার কচ্ছপ গুলিকে আহার দিচ্ছে। ঐ তো আউলিয়া বুস্তান সাহেবের পবিত্র মাজার শরিফ দেখছি। এবার মাজার খানি আগে জিয়ারত করে আসি। (একটু অগ্রসর হয়ে) বাহঃ কি সুন্দর, মাজারটি আতর গোলাপের সুগন্ধে ভরে আছে। ঐ তো ওখানে শত শত পাগল, মস্তান, মজনু, ফকির লোকের মেলা বসেছে। ওখানে দেখছি হাজার হাজার ভক্ত চক্ষের পানি ফেলে ফেলে দোয়া করছে। সত্যই আল্লার অলি-আউলিয়ার মৃত্যু হয় না। তারা মরেও যেন অমর হয়ে আছে। আচ্ছা যাই মস্তান সাহেবের নিকট থেকে জেনে দেখি–এখানে আমি থাকতে পারি কিনা। (অগ্রসর হয়ে) আব্বা মস্তান সাহেব, আমি বহু দূর থেকে এসেছি। কিছু দিন এখানে থাকতে চাই, পারব কিনা?

মস্তান : কে তুমি এমন মায়া ভরা কণ্ঠে আব্বা বলে ডাকলে? চল আমার সঙ্গে, আমি তোমার যা কিছু প্রয়োজন এবং কোথায় থাকবে সব ব্যবস্থা করে দিব।

মুলুক : তাই চলুন আব্বা। (উভয়ের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

(দু'জন মস্তানের প্রবেশ)

১ম মস্তান : জনাব সৈয়দ সাহেব, কয়েক মাস চলে যাচ্ছে একটি বালক এসেছে দরবার শরিফে, দেখে মনে হয় বালকটি কোনো বড়ো ও ভদ্রলোকের সন্তান হবে।

২য় মস্তান : ঠিকই বলেছেন হাজী সাহেব, কারণ বালকটির স্বভাব-চরিত্র চমৎকার আর মুখে কি কোকিলে মত মায়াপূর্ণ ডাক। যখন যাকে যা বলেই ডাকে তার মন-প্রাণ একেবারে দখল করে ছাড়ে। ভদ্রলোকের সন্তান না হলে কি আর এমনটি হয়?

১ম মস্তান : সত্য কথাই বলেছেন, বড়ো হুজুরকে আব্বা ডেকে একেবারেই জয় করে ফেলেছে। বড়ো হুজুরও তাকে এক মুহূর্ত ভুলে থাকতে পারে না।

২য় মস্তান : বড়ো হুজুর শুধু নয়, আমাকেও ঐ বালক যখনই চাচাজি বলে আমিও আকুল হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি। হাজী সাহেব, ছেলেটার চেহারাটাও কি সুন্দর, যেন আলোপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ।

www.pathagar.com

১ম মস্তান : তবে একটি ধারণা, আমার মনে হয় ওর বক্ষে না জানি কত দুঃখ। কিন্তু স্বভাব পবিত্র বলে অনেকেই বুঝতে পারছে না।

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

স্বভাব গেলে এই ভবে তার তো কোনো দুঃখ নাই (২)
স্বভাবেরই অভাব হলে তার দুনিয়ায় শান্তি নাই ॥
নিজামদ্দিন খুশি ছিল, যখনে তার স্বভাব গেল (২)
ওমনি আউলিয়া হলো জানতে কারো বাকি নাই ॥
রত্নাকর এক দস্যু ছিল, স্বভাব ছেড়ে সাধু হলো (২)
রামায়ণ রচনা করলো (২) শাস্ত্রে তাহা শুনতে পাই ॥

১ম ও ২য় : ঠিকই বলেছ পাগল, ঠিকই বলেছ।

বিবেক : (গান)

তাইতো বলি স্বভাব ছাড় নিচের দিকে লক্ষ্য কর (২)
ওর স্বভাবে স্বভাব গড়ো (২) দেখবে কোনো দুঃখ নাই ॥ (প্রস্থান)

১ম মস্তান : হাজী সাহেব, পাগল গানের সুরে যে কথা বলে গেল চলুন বড়ো হুজুরকে সে সব কথাগুলি বলি গিয়ে। (উভয়ের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

(মস্তান সাহেবের প্রবেশ)

মস্তান : এই পবিত্র মাজার শরিফে বহু লোকই নিয়ত আসা যাওয়া করছে। কিন্তু দরবার শরিফে আজ বহু দিন হতে চলেছে একটি বালক এসেছে এবং আমাকে সে আব্বা বলে ডাকে। কিন্তু আজ অবধি ছেলেটার নাম-ধাম, দেশ, পিতার নাম কোনো পরিচয়ই আমার জানা নেই। এবারে জানতে হবে তার আসল পরিচয়।

(মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

এই তো বলার সাথে সাথেই এসে পড়েছ। আচ্ছা বালক, এবার আমি তোমার কাছে কিছু কথা জানতে চাই। তোমাকে তা সঠিক ভাবে বলতে হবে। রাজি আছ?

মুলুক : জি আব্বা হুজুর, যা জানতে চাইবেন সব কথাই বলব।

মস্তান : না, তেমন কিছুই নয়, আমি জানতে চাই তোমার নামটি কি? তোমার দেশ কোথায়? তোমার পিতার নাম কি? আর কোন অভাবে, কি দুঃখে এই কিশোর বয়সে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছ?

মুলুক : (গান)

হায় গো, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে শিমুলিয়া গ্রামে

www.pathagar.com

ওগো জন্মদাতা পিতা আমার জামাল বাদশা নামে গো–
সত্য করে সাহেব দিলাম পরিচয় তো।
হায় গো শিমুলিয়া বাড়ি আমার সেখানেই হয় মোকাম
হাউশ করে বাপ মা রাখছে মুলুক চাঁন নাম গো ॥
সত্য করে সাহেব দিলাম পরিচয় তো।
পিতা থাকতেও নাই গো পিতা, মা গিয়াছে মরে
এমন কেহ বান্ধব নাই মোর দুনিয়ার ওপরে গো–
সত্য করে সাহেব দিলাম পরিচয় তো।
বিনা দোষে দোষী করে সৎ মায় দিছে বনে
দিন ভিক্ষারী হয়ে আমি ঘুরছি বনে বনে গো ॥
সত্য করে সাহেব দিলাম পরিচয় তো।
মনে বড়ো আশা ছিল থাকিব মাজারে
জন্মের মতো ধর্মের পিতা ডাকিলাম আপনারে গো
সত্য করে সাহেব দিলাম পরিচয় তো।

মস্তান : আর বলতে হবে না বাপ মুলুক চাঁন, বুঝেছি তোমার মনে অনন্ত ব্যথা লুকিয়ে আছে। আমি তোমাকে আজ থেকে পুত্র বলে গ্রহণ করে নিলাম। চল, আর তোমার কোনো অভাব, দুঃখ ও চিন্তার কারণ নেই, চল। (উভয়ের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

(পাগলের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে জামাল বাদশার প্রবেশ)

বাদশা : আগুন, আগুন, চারিদিকেই যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দাও দাও করে আমায় গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। যেদিন থেকে আমার মুলুক চাঁনকে বাড়ি থেকে অনাহারে, বেত্রাঘাত করে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেই দিন থেকে অভাব আর অশান্তি এসে দখল করেছে আমার সংসার। লক্ষ্মী আমায় ছেড়ে চলে গেছে। ডাইনী এসে বসেছে আমার জীবনে। এতো কিছু থাকতেও মুলুক চাঁন আমার পা ধরে কতই না কেঁদেছিল। আমি তার সে কান্না না শুনে কতই না আঘাত দিয়েছি। তারি প্রতিফল আমায় দিতে হচ্ছে। রাজকোষে অর্থ নেই, বাড়িতে নেই আহার, হাঁড়িতে নেই খাদ্য। ওহঃ খোদা, এ মুখ আমি দেখাব কাকে? আমি প্রাণ বিসর্জন দেব। না, না, প্রাণ বিসর্জন দেয়া যে মহাপাপ। কি করি, কোথায় গিয়ে আমি শান্তি পাবো? যে পিতা তার পুত্রকে বিনা দোষে অনাহারে বাড়ি থেকে মরণের দুয়ারে ঠেলে দিতে পারে তার আবার কিসের ধর্ম? আমি, আমি এ প্রাণ আর রাখবো না।

(আলেক চাঁনকে কোলে নিয়ে ২য় বেগমের প্রবেশ)

www.pathagar.com

২য় বেগম : স্বামী, স্বামী গো, এই দেখুন আলেক চাঁন আবার কেমন করছে। কত ডাকলাম একটি কথাও বলছে না। কয়েকদিন চলে গেল, কিছুই আহার করছে না। পয়সা বিনে ডাক্তার দেখাতে পারছি না। বাবা আলেক চাঁন আমার বাঁচবে না। এখন আমার কি হবে গো? বাবা আলেক চাঁন, একবার আমাকে মা বলে ডাক, একবার মা বলে ডাক।

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

তোরে মা বলা যে ভুল, তোরে মা বলা যে ভুল
তুই মাতৃজাতির কলঙ্কিনী (২)
নাই তোর কোনো কূল ॥
পুত্র যে মা' দু ভাব দেখে, তারে কে মা বলে ডাকে (২)
একজন কোলে একজন ধূলে, তুই সর্বনাশের মূল ॥
তোরে মা বলা যে ভুল, তোরে মা বলা যে ভুল।

২য় বেগম : ওরে পাগল তোর গান আমি বুঝতে পারিনি, এক মুঠো খাবারের জন্য মুলুক চাঁন আমার পায়ে ধরে কেঁদেছিল। আমি লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি। সেই পাপের ফলে আমার আলেক চাঁন অনাহারে মরে যাবে। পাগলরে তোকে কতবার গালি দিয়েছি, আমায় ক্ষমা করে দাও বাবা, আমায় ক্ষমা করে দাও।

বিবেক : (গান)

একদিন পাগলকে দূর করেছিলি, ফলছে এবার পাগলের বুলি (২)
বলে পাগল সাইদ আলী, কে লাগায় গণ্ডগোল
তোরে মা বলা যে ভুল, তোরে মা বলা যে ভুল। (বিবেকের প্রস্থান)

বাদশা : তুমি আলেক চাঁনকে কোলে নিয়ে ওখানটায় বসে আল্লাহকে ডাকো, আমি চললাম। (প্রস্থান)

২য় বেগম : বাবা আলেক চাঁন, থাক, এখানে একটু বসে থাক। দেখি স্বামী আবার আত্মহত্যা করে কিনা। (আলেক চাঁনকে বসিয়ে রেখে প্রস্থান)

আলেক : একি, আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে একি দেখলাম! মা–মা–মাগো, এসো, শুনে যাও, আমি স্বপ্নে কি দেখলাম।

(২য় বেগমের প্রবেশ)

২য় বেগম : আলেক চাঁন স্বপ্নে তুমি কি দেখেছ, বলতো একবার শুনি?

আলেক : মা, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি একটি নদীতে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি অমনি মিয়া ভাইয়ের মত কে এসে আমার হাত দু'টি ধরে আমাকে উদ্ধার করল।

www.pathagar.com

(বাদশার প্রবেশ)

বাদশা : আর কে উদ্ধার করবে, যিনি উদ্ধারকর্তা তিনিই উদ্ধার করেছে।

আলেক : আব্বা, আরো দেখলাম আমাকে বাঘে ধরে নিয়ে যায়, আর মিয়া ভাই কতোগুলি দরবেশ, আওলিয়া নিয়ে সেখানে হাজির–

বেগম
ও বাদশা : তারপর কি হলো বাবা আলেক চাঁন?

আলেক : তারপর মিয়া ভাই বলল, 'এই বাঘ, আমার ছোটো ভাইকে ছেড়ে দে'–ওমনি বাঘ আমাকে ছেড়ে দিল। শুধু কি তাই, মিয়া ভাইকে সালাম করে বিদায় নিল। দেখলে আব্বা, দেখলে মা, বাঘেও মিয়া ভাইয়ের কথা শোনে।

বাদশা : নারে অবুঝ, আমার মুলুক চাঁন আর বেঁচে নেই। অনাহারে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন মারা গেছে। আমি আর ঘরে যাবো না। মুলুক চাঁনের মতো আমিও বনে বনে, দেশে দেশে ঘুরবো, আমার বাবাকে তালাশ করবো।

আলেক : আব্বা, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আমার মন বলছে মিয়া ভাই বেঁচে আছে।

২য় বেগম : স্বামী, আমার কারণে নির্দোষ বালককে বনবাসে যেতে হয়েছে, আমিও যাবো আপনার সাথী হয়ে। দেখি তাকে কোথাও পাওয়া যায় কিনা।

বাদশা : তোমরা যদি আমার সাথী হতেই চাও, তবে চলো এখনই বেরিয়ে পড়ি। দেখি হারানো রত্ন ফিরে পাওয়া যায় কিনা। (সবার প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

মুলুক : আল্লাহ, তুমি সকলি করতে পারো। ছিলাম বাদশা পুত্র, বিমাতার চক্রান্তে হলাম বনবাসী। পেয়েছিল বনরাজ, পুত্র স্নেহে বুকে ধরে রাখতে পারলো না। এসেছি বায়েজিদ বুস্তান, এখানে হয়েছি মাজারের খাদেম। তবু প্রাণে শান্তি নেই। মন বলছে একবার দেশে গিয়ে পিতা-মাতাকে দেখে আসি। ছোটো ভাই আলেক চাঁন মিয়া ভাই বলে কতই না দুঃখ করছে। পিতা না বুঝে নারীর চক্রান্তে আমাকে বনবাসী করেছে। তবুও সে যে আমার জন্মদাতা। বাবা মস্তান সাহেব এলে আমার মনের অভিপ্রায় তাকে বলবো। দেখি সে আমাকে দেশে যাবার অনুমতি দেয় কিনা। (বসে পড়ল এমন সময় হামিদা ও এক সখির প্রবেশ)

হামিদা : বহু দিনের আশাটি আজ পূর্ণ হলো। হায় আল্লাহ্, তোমার আওলিয়াদের কি শক্তি দিয়েছ তুমি। নাম শুনেছি বায়েজিদ বুস্তানি মাজার। আজ স্বচক্ষে দেখে মনটা ভরে গেল। দেখ সখি পুকুরে কত গজার মাছ। মাছগুলি মনের সুখে বিচরণ করছে। আর ঐ দেখ কত বড়ো বড়ো কচ্ছপকে মানুষ খাবার দিচ্ছে।

www.pathagar.com

সখি : সত্যিই হামিদা বেগম, আওলিয়াদের লীলা বোঝা মুশকিল।

হামিদা : দেখ তো সখি ওখানে একটি যুবক বসে আছে, সে এখানে কি করছে, ওর নাম কি?

সখি আচ্ছা চল যাই, দুজনেই বালকটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। (কাছে গিয়ে) আচ্ছা যুবক তোমার পরিচয় আমরা জানতে চাই।

মুলুক : আমার নাম মুলুক চাঁন। এই মাজার শরিফে আমি থাকি। লোকে কোনো মানত করতে আসলে আমি তাদের বলে দেই কিভাবে কি করতে হয়। এই আমার কাজ।

হামিদা : হে যুবক, শুধু তোমার নামটাই বললে, কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কি, দেশ কোথায় কিছুই তো বললে না?

মুলুক : বিস্তারিত শুনে লাভ কি?

হামিদা : পরিচয় দিলেই বা ক্ষতি কি যুবক? নতুন মানুষের পরিচয় জানাটাও যে এক প্রকার আনন্দের ব্যাপার।

মুলুক : (গান)

হায় গো, বাংলাদেশে চট্টগ্রামে শিমুলিয়া গ্রামে—
ওগো, জন্মদাতা পিতা আমার জামাল বাদশা নাম গো—
সত্য করে আমি দিলাম পরিচয় তো।

হামিদা : হে যুবক, তুমি কোন দুঃখে এই বয়সে মাজারে রয়েছ?

মুলুক : (গান)

হায় গো, শুন, শুন শাহাজাদী, আমার দুঃখের কথা—
আমার দুঃখ শুনে ঝরে কত বৃক্ষের পাতা গো
সত্য করে আমি দিলাম পরিচয় তো।
হায় গো ভবে আর দরদি নাইরে, মা গিয়েছে মরে
আমার মুখ দেখে যে দুঃখ বুঝবে এমন নাই সংসারে গো—
সত্য করে আমি দিলাম পরিচয় তো।
হারাইলে তালাইশা নাইরে, মা গিয়াছে মরে
জনম দুখী হয়ে আমি ঘুরছি দ্বারে দ্বারে গো—
সত্য করে আমি দিলাম পরিচয় তো।

হামিদা : হে যুবক, তুমি ওমন করে আর বোলো না। তোমার ঐ চোখের পানি দেখে আমি যে আর সইতে পারছি না।

(স্বগত) হে আল্লাহ্ পরয়ারদিগার, শুনেছি তোমার এক নাম বাঞ্ছাকল্পতরু। তুমি তোমার বান্দাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে থাক। আমার মনোবাসনা কি তুমি পূর্ণ করবে? হে আল্লাহ্, আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবার তরে তোমার

www.pathagar.com

আওলিয়ার মাজারে আমি মানত করবো। (মুলুককে) হে যুবক, আমি যদি কাউকে আমার চিরসাথী করতে চাই তাহলে কি পদ্ধতিতে মানত করবো? আমাকে বলে দেবে কি?

মুলুক : ওগো শাহজাদী, তুমি যার অভিলাসী তার নাম ও ঠিকানা আমায় বলতে হবে, তবে আমি সমস্ত নিয়ম বলে দেব। তার নাম মুখে বা মনে মনে উচ্চারণ করে বলতে হবে-'হে আল্লাহ্ আমার এই লোকটিকে আমার চিরসাথী করবো। তাই তুমি আমার ফরিয়াদ কবুল কর খোদা। আমি তোমার অলিদের পবিত্র মাজারে এই দান করবো।'- তাহলে আল্লাহ্র দয়াতে পবিত্র আশা পূর্ণ হবে।

হামিদা : আচ্ছা যুবক, তোমর নাম যেন কি বললে?

মুলুক : কেন আমার নামের দরকার কি? তুমি যাকে পেতে চাও তার নাম বলতে হবে।

হামিদা : আমি পেতে চাই ... মানে, তোমাকেই।

মুলুক : (অবাক হয়ে) কি বলছ শাহজাদী? তুমি এ-কি বলতে চাও?

হামিদা : সখি বল না যুবকটির নাম যেন কি বলল?

সখি : যুবকটির নাম বলেছিল, 'মুলুক চাঁন'।

হামিদা : (করজোড়ে বসে পড়ল এবং প্রার্থনা করছে) হে আল্লাহ্, আমি নিষ্পাপ এক অবলা বালিকা, ভজন-সাধন বিহীন। এই অবলার মোনাজাত কবুল কর খোদা। তোমার মহান আওলিয়ার পবিত্র মাজার সামনে রেখে জানাচ্ছি, এই যুবক মুলুক চাঁনকে আমার জীবনের চিরসাথী করে দাও। সাক্ষী রইল চন্দ্র, সূর্য, সাক্ষী রইল বায়েজিদ বুস্তানী সাহেব। আজ থেকে আমি আমার জীবন, যৌবন, মন, দেহ সবই এই যুবক মুলুক চাঁনের চরণে অর্পণ করলাম। আমার এই নিবেদন কবুল কর খোদা, কবুল কর।

মুলুক : এ-কি করলে শাহজাদী, তুমি একি করলে? তুমি হলে বাদশাজাদী আর আমি একটি দীন-দরিদ্র বালক। তুমি কেন এমন ভাবে নিজেই নিজের সর্বনাশ করলে?

হামিদা : ওগো যুবক, আমিও বলিনি যে আমি বাদশাজাদী। বিধাতার ইচ্ছায় হয়তো বা এমনটি হবে। আমি কখনও ভুল করিনি। যার কর্ম সেই করেছে। তোমার ঠিকানা বলে দাও যুবক। আমি আমার পরিচয় বলছি মনে রাখবে। আমার বাড়ি চিটাগাং লাল দিঘির পাড়, পিতার নাম শুফিয়ান বাদশা।

মুলুক : আমি মাজারের খাদেম সাহেবকে ধর্ম পিতা বলেছি, এখানেই থাকি। এই আমার ঠিকানা ও পরিচয়।

হামিদা : আমার পিতাকে নিয়ে আসব যুবক, এবার বিদায়। আমি আমার ঘরে চললাম। চল সখি। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

মুলুক : হায় আল্লাহ্, আবার আমাকে কোন পরীক্ষায় ফেলে দিলে? আমি তো কখনও ভাবতেও পারিনি। তবে কি আমার ভুল হয়ে গেল খোদা? আমায় আর কত দিন কাঁদাবে তুমি? আমার জীবন কি দুঃখে দুঃখেই যাবে? (প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

(মস্তান সাহেবের প্রবেশ)

মস্তান : মুলুক চাঁন দীর্ঘ বছর আমার এখানে থাকে, তাই বলে ওর পরিচয় আজো আমি জানতে পারিনি। আবার লাল দিঘির পাড় শুফিয়ান বাদশার কন্যার সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব এসেছে। শীঘ্রই এ বিবাহ হয়ে যাবে।

(মুলুকের প্রবেশ)

এই যে বাবা মুলুক চাঁন এসেছ? একি তোমার এমন মায়া জড়ানো বদন খানি মলিন দেখছি কেন? বল বাপ, কি দুঃখ তোমার মনে এসেছে?

মুলুক : আব্বাজান, আমার মন বলছে একবার দেশে গিয়ে পিতা-মাতা, ছোটো ভাই আলেক চাঁনকে দেখে আসতে। আপনি অনুমতি প্রদান করলে দেখতে যেতাম জন্মভূমি।

মস্তান : কি বলছ বালক? তুমিতো বলেছিলে দেশে তোমার কেউ নেই, বিমাতার অত্যাচারে দেশ ছেড়ে এসেছ। আজ বলছ ছোটো ভাই, বিমাতাকে দেখতে প্রাণ কাঁদে?

মুলুক : আব্বা, বিমাতা হলেও যে তাকে মা বলে ডেকেছি। তাই আপনি অনুমতি জ্ঞাপন করলে শেষবারের মত দু চোখ বুলিয়ে দেখেই চলে আসবো।

মস্তান : শোন মুলুক চাঁন, দেশে যেতে চাও ভালো কথা, চলে যাও, কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ পরেই চলে আসবে। কারণ, তোমাকে লাল দিঘির পাড় যেতে হবে।

মুলুক : জি আব্বা, আপনার প্রতিটি বাক্য আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

মস্তান : তবে আর বিলম্ব না করে চল তোমাকে আমি গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসি। (উভয়ের প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য

(মুলুকের প্রবেশ)

মুলুক : হে জননী, জন্মভূমি, তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। অনেক বছর পর আবার তোমার বক্ষে ফিরে এসেছি। কিন্তু হায় একি, কার বাড়িতে এলাম? এই সেই আমার ঘুমানোর ঘর, আমাদের বাড়ি, সবই পড়ে আছে, কিন্তু কোনো জন মানবে সাড়া শব্দ নেই কেন? আমার পিতা, মাতা, ছোটো ভাই আলেক চাঁন, তারা কোথায়? শূন্যপুরী পড়ে আছে, কার কাছে জিজ্ঞাসা করবো? কে বলে দেবে এর রহস্য কি?

(হামিদ ও নাজিম নামে দু'জন লোকের প্রবেশ)

www.pathagar.com

নাজিম : ভাই হামিদ দেখ দেখি, আমার শাহাজাদা মুলুক চাঁনের মতো মনে হয়, সে দেশে এসেছে কিনা?

হামিদ : সত্যিই তো, শাহজাদা মুলুক চাঁন এসেছে। আহা দেখে তো আর চেনাই যায় না।

নাজিম : চেনা যাবে কি করে, সারা জীবন কেঁদে কেঁদে স্বর্ণবদনটি একেবারেই কালো হয়েছে।

হামিদ : আরে কথা রেখে আগে ধর দেখি, হয়ত বা এসব সংবাদ শুনে আরো ব্যথা পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ধর, ধর দেখি। (উভয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে) শাহাজাদা, ভাই মুলুক চাঁন কথা বল, ধৈর্য্য ধারণ কর, আজ এমনি সময় এতো বছর পরে কোথা থেকে এলে?

মুলুক : ভাই হামিদ, ভাই নাজিম, (জড়িয়ে ধরে) তোমরা কেমন আছ? আমার আব্বা, মা, ছোটো ভাই আলেক চাঁন–তারা কোথায় আছে? আমাদের বাড়ির এ অবস্থা কেন? কি হয়েছে ওদের? তবে কি আমার আপন কেউই নেই? (আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলবে)

হামিদ : শাহাজাদা, ধৈর্য্য ধর, সব কথাই খুলে বলছি। তুমি যে বছর বাড়ি থেকে চলে গেলে তার পরের বছর দারুণ দুর্ভিক্ষে আমাদের বহু লোক অনাহারে মারা যায়। আর তখন তোমার আব্বা ঘর বাড়ি জমিদারি সব কিছুই বিক্রি করে দিয়েছে। তবু প্রজা পালন করতে না পারায় অবশেষে আলেক চাঁনকে সঙ্গে নিয়ে কোন দেশে যেন চলে গেছে।

মুলুক : ভাই হামিদ, তারপর কি হলো? কোন দেশে তারা গিয়েছে?

নাজিম : তার আমরা কিছুই জানি না। শুধু যাবার সময় কেঁদে কেঁদে বলে গিয়েছিল, যে দেশে কেউ না চিনতে পারে সেই দেশে চলে যাব।

মুলুক : ওহ্ঃ খোদা, এই দৃশ্য দেখার জন্য কি আমি দেশে এসেছি? আর যে আমি সইতে পারছি না। যাই দেখি কোথায় আছে আমার পিতা, মাতা ও ছোটো ভাই আলেক চাঁন। আলেক চাঁন–আব্বা–মা– (ডাক দিতে দিতে দৌড়ে প্রস্থান, পেছন পেছন নাজিম ও হামিদেরও প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(পাহাড়ের দেশে, বনের মাঝে জামাল বাদশা, ২য় বেগম ও আলেক চাঁনের প্রবেশ)

বাদশা : ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এসে পড়েছি আমরা? যে দিকে চোখ যায় পাহাড় আর পাহাড়। কোনো জনমানবের সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই। শুধু বাঘ, সিংহ, বন হস্তীর বিকট শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। শুনেছি এহেন বন জঙ্গলে হিংস্র জাতি মগের দল বাস করে। তারা নাকি মানুষ ধরে খায়।

www.pathagar.com

২য় বেগম : স্বামী, তবে আমার আলেক চাঁনের কি হবে? মগেরা তো আলেক চাঁনকে ধরে নেবে না?

বাদশা : সে কথা কে জানে। আর ধরে নিয়ে গেলেও কিছু করতে পারবো না বেগম।

আলেক: আব্বা, আব্বা গো, কয়েক দিন যাবত কত গ্রাম, শহর ঘুরে এলাম, মিয়া ভাইকে তো পাওয়া গেল না? তবে কি মিয়া ভাই জীবিত নেই? মা, মাগো, আমি যে আর হাঁটতে পারবো না। (বসে পড়ল)

২য় বেগম : স্বামী, স্বামী গো, আলেক চাঁন হাঁটতে হাঁটতে ও ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমারও পা আর চলছে না। ঐ বৃক্ষ তলায় একটু বিশ্রাম করে নেই।

বাদশা : বিশ্রাম করবে? আচ্ছা চল, একটু বিশ্রাম করে নেই। (তিনজন বসে পড়বে)

আলেক: মা, তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নেই মা? (বেগমের কোলে মাথা রেখে আলেক শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে)

২য় বেগম : আমারও যে দু চোখ ভরে ঘুম আসছে, একটু ঘুমিয়ে নেই। (শয়ন)

বাদশা : অনাহার, অনিদ্রায় শরীর আমার ভীষণ অবসন্ন হয়ে আসছে। আমিও যে আর বসে থাকতে পারছি না। আমিও সামান্য ঘুমিয়ে নেই। (বাদশার শয়ন)

(তিনজন মগের প্রবেশ)

১ম মগ: এইরে খুংরা মানুষ পেয়েছিরে, মানুষ পেয়েছি।

২য় মগ: সত্যিইরে, তিন মানুষ আছেরে, একজন নয়, তিন মানুষ আছে।

৩য় মগ: হারে ভাই খুংরা, নুংরা, এ যে দেখছি নিদ্রায় গেছেরে। ধর ধর, ঐ পিচ্চিকে পহেলা লিয়ে লু।

২য় মগ: আলবত বলেছেরে, ধর ধর, এক এক করে লিয়ে চল। (তিন মগ আলেক চাঁনকে নিয়ে প্রস্থান করবে)

আলেক: (চিৎকার করে) মা, মা, আমাকে মগে ধরে নিয়ে গেল, আমাকে বাঁচাও।

২য় বেগম : (জেগে পাগলের মতো কেঁদে কেঁদে বলছে) একি সর্বনাশ হয়েছে স্বামী, দেখুন আলেক চাঁনকে ধরে নিয়ে গেল। বাঁচাও, বাঁচাও, আমার আলেক চাঁনকে বাঁচাও।

বাদশা : কি করবো বিবি, এমন সাধ্য আমার নেই যে মগদের হাত থেকে আলেক চাঁনকে বাঁচাতে পারি।

২য় বেগম : হায়, হায়, কি করি, কোথায় যাই? কে কোথায় আছ আমার আলেক চাঁনকে উদ্ধার করে দাও।

বাদশা : কেউ নেই আলেক চাঁনকে উদ্ধার করতে পারে। একমাত্র উদ্ধারের মালিক ভিন্ন আর কে আছে বল? ঐ তো, ঐ তো দেখছি দুরন্ত মগেরা দল বেঁধে আমাদের এদিকে আসছে। চল চল দেখি ঐ আড়ালটায় গিয়ে দাঁড়াই। (দৌড়ে প্রস্থান)

www.pathagar.com

২য় দৃশ্য

(মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

মুলুক : কতো দেশ, বন, পাহাড় খুঁজেও মা, বাবা, ভাই আলেক চাঁন কারো কোনো সন্ধান করতে পারলাম না। শুনেছি এ সমস্ত বনের মধ্যে মগ জাতি বসবাস করে। তারা নাকি মানুষ পেলে ধরে খায়। (নেপথ্যে বাঁচাও বাঁচাও শব্দ)

ঐ তো, বালকের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই মগেরা কাউকে আক্রমণ করেছে। দেখি ওকে উদ্ধার করা যায় কিনা। কোথায় ভাই পহলাম? (দৌড়ে প্রস্থান)

(আলেক চাঁনকে ধরে নিয়ে মগের দলের প্রবেশ)

আলেক: আমাকে মেরো না, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার মায়ের কাছে যাবো। কে কোথায় আছো আমাকে বাঁচাও। (২)

নুংরা : বাঁচাব রে, এই তো বাঁচানোর জন্যই এনেছি।

খুংরা : আরে নুংরা, আগে মাথাটা কাটিরে ল।

৩য় মগ: হা খুব মজা হবে রে। একেবারে কচি মাংস আছে যে।

(দৌড়ে পহলামের প্রবেশ)

পহলাম: আরে দুষ্ট মগের দল, ওকে ছেড়ে দে বলছি, নইলে দেখছিস এটা কি। (বন্দুক দেখিয়ে)

নুংরা : আমরা তোমার ঐ বন্দুক-পিস্তলের ভয় করি না পহলাম। আমাদের গুরুজি আমাদের রক্ষা করবে।

খুংরা : পহলাম, দেখতো তোমার বন্দুকে গুলি আছে কিনা?

পহলাম: (ভালো করে বন্দুক দেখে) হায় হায় সর্বনাশ করেছি। বন্দুকে যে গুলি নেই। তবে কি এবার মগদের হাতে আমারও প্রাণ যাবে? ওগো দয়াল, অবতার মুলুক চাঁন, তুমি কোথায়, আমাদের বাঁচাও, আমরা যে মগদের হাতে ধরা পড়েছি।

(মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

মুলুক : ভয় নেই আর, আমি এসেছি।

পহলাম: সত্যিই দয়াল মুলুক চাঁন, তুমি এ যুগের ধর্মাবতার।

খুংরা : ভাই নুংরা, দেবতার মুখে শুনেছি বর্তমান যুগের ধর্মাবতার আছে একজন। নাম তার মুলুক চাঁন। দেখতো সেই মহান আওলিয়া মুলুক চাঁন কিনা। (ভালো করে দেখে নিয়ে) এ যে দেখছি সত্যিই সেই ধর্মাবতার মুলুক চাঁন। (মুলুক চাঁনের পায়ে গিয়ে পড়বে) বাবা ধর্মাবতার, আমরা গুরুজির মুখে শুনেছি আপনি বর্তমান যুগের আল্লাহর একজন মস্ত বড়ো আওলিয়া। আমারা ভুল করেছি। আপনার পবিত্র চরণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আমরা জীবনে আর মানুষের মাংসের আশা করবো না। আমরা এই মুহূর্তে আপনার কাছে দীক্ষিত হবো এবং মানুষের কল্যাণ করবো।

www.pathagar.com

মুলুক : তা বেশ ভালো কথা, আগে বলো যাকে তুমি ধরে এনেছ সে কোথায়?

মগেরা : ঐ তো ঐখানে পড়ে রয়েছে। (দেখিয়ে দেবে)

মুলুক : (কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে) একি, এ যে দেখছি আমার ভাই আলেক চাঁন। আলেক চাঁন ওঠো, কথা বলো, একবার চেয়ে দেখো, আমি তোমার মিয়া ভাই মুলুক চাঁন। কোনো ভয় নেই আলেক চাঁন।

আলেক: মিয়া ভাই, আমার মিয়া ভাই। (জড়িয়ে ধরবে)

মুলুক : ভাই আলেক চাঁন, এবার বলো মা-বাবা, তারা কোথায়?

আলেক: মিয়া ভাই, সে অনেক কথা, পরে বলবো। আপনি এখানে না এলে আমাকে কে বাঁচাত?

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

দেখ ধর্ম কাকে বলে, দেখ ধর্ম কাকে বলে
হাজারো বন্দুকের গুলি যার মুখের কথায় মিলে ॥
ওদের ভয়ে জোয়ান কতো পালায়ে যায় শত শত
সর্দার মরিল কতো পাহাড় ও জঙ্গলে
আজ তারা ছায়া নিল এরি চরণ তলে–
দেখলি ধর্মের কেমন শক্তি (২)
এমনি হবি স্বভাব গেলে ॥
...
আয়নাল হক যে জন ছিল, ধর্মের জোরে অমর হলো
কাজী তারে শূলে দিল, আয়নাল হককে বলে (২)
শিশিতে ভরিয়ে আবার ভাসায়ে দেয় জলে
তবু ধর্মের জোর কমলো না, গায়ের চামড়া দিল খুলে
...

সর্দার : বাবা পাগল, এখানে তুমি এসেছ, ভয় পেলে না?

বিবেক : (গান)

ভয় আর করিব কাকে তিনি যে সব জায়গায় থাকে
যেখানে যেভাবে রাখে থাকি যে সেই হালে
এই দুনিয়া ঘুরতে পারি চক্ষের এক পলকে–
তাই বলে পাগল সাইদ আলী (২)
না বুঝে পড়িস না ঘোলে
ধর্ম কাকে বলে, দেখ ধর্ম কাকে বলে– (প্রস্থান)

মুলুক : ভাই আলেক চাঁন, ভাই সর্দার, তোমরা সকলেই এসো। আমার সাথে ঐ খানে বসে সমস্তই জানতে হবে। (উভয়ের প্রস্থান)

www.pathagar.com

৩য় দৃশ্য

(বনরাজের প্রবেশ)

বনরাজ : (কেঁদে কেঁদে বলছে) হোঃ, হোঃ, হোঃ, হামি কিয়া ভাবছিলুম আর হামার কিয়া হুলোরে। হামি কেনেই মুলুক চাঁনকে জঙ্গল থেকে ডেরামে তুলেছিলামরে। বহুত দিন গত হলো মুলুক চাঁন যে চলি গিল, আর এলো না। ওহার বদন খানি হামি কোবে দেখিবেরে? মুলুক চাঁন হামারি মুল্লুক আন্ধার করিয়ে কোন মুল্লুকে গিয়েছেরে? ওহে দিন দুনিয়ার মালিক, মুলুক চাঁনকে একটি বারে হামার বক্ষে এনে দিবেনেরে মালিক?

(দৌড়াতে দৌড়াতে জামাল বাদশা ও ২য় বেগমের প্রবেশ)

বাদশা ও বেগম : ওগো, কে কোথায় আছ আমাদের বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও।

বনরাজ: কি হলো রে তুদের? তুহারা ওমনি করে কেনে চিৎকার করছিসরে? বোল কি দুশমন আছেরে?

২য় বেগম : ঐ, ঐ তো মগেরা আমাদের ধরতে আসছে।

বনরাজ: নারে বেটি, ঐ মগের দল এখানে আর আসবি না। তোহাদের কুছ ডর নেহি আছে। বোল, বোল রে তোহাদের এমন কি দুঃখ আছে, কেনেই বা এই জঙ্গলমে এসেছিস?

বাদশা : আর কিছুই বলার নেই বনরাজ, আমার সবই গেল, আমাদের সবই গেল।

বনরাজ: খামুশ বেটা, আসল কোথা না বুলে শুধু ছব গেল, ছব গেল, ছব বলতে কি বোল?

২য় বেগম : বনরাজ, দুঃখের কথা বলতে পারবো না। আমার পুত্র আলেক চাঁনকে মগেরা ধরে নিয়েছে। আমার বুকটা যে চৌচির হয়ে গেল। আর আমি বলতে পারছি না।

বনরাজ: হারে বেটি, তোহার বক্ষ চিরে যাক, আর ফেটে যাক তাহাকে তো আর পাবে না। তুই জানি কাকে এমনি দুঃখ দিয়েছিস, আজ তারি বদলছে দুঃখ পাবিরে। কথায় বোলে না, 'যেমনি কাজ আছে, তেমনি তার ফল পাবে'। ইহাতে দুঃখ কি আছেরে?

২য় বেগম : বাবা বনরাজ, ঠিকই বলেছেন, আমি স্বার্থ লোভে এমন যে সরল সহজ নিষ্পাপ বালকটিকে কতোই না কষ্ট দিয়েছি। এক মুঠো খাবার জন্য আমার পা ধরে মা বলে কতোই না কেঁদেছিল। আমি তাকে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিয়েছি। বাবা মুলুক চাঁন, একবার এসে তুমি আমায় মা বলে ডাক বাবা। কোথায় বাবা মুলুক চাঁন, দেখে যাও তোমার পিতা মাতার আজ কি অবস্থা। আমি বুঝতে পেরেছি বাবা মুলুক চাঁন, তোমাকে কাঁদিয়েছি বলে তার ফল আমি পাবো, তার প্রতিফল আজ পেয়েছি।

www.pathagar.com

বনরাজ : কিয়া বাত বোলছিসরে বেটি, মুলুক চাঁন বলিয়ে তোহাদের কুই আছে নাকিরে?

বাদশা : সে কি আর বলবো বনসর্দার, আমার একটি পুত্র মুলুক চাঁনকে রেখে ওর মা পরলোক গমন করে। তখন আমার পুত্র মুলুক চাঁন পাঁচ বছরের বালক। পরে আমি দ্বিতীয় বিবাহ করি। এই সেই স্ত্রী। ওর গর্ভে আর একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় আলেক চাঁন। কিন্তু আলেক চাঁন জন্ম নেবার পর থেকেই ঘটে একটি ষড়যন্ত্র। এই রাক্ষুসীর চক্রান্তে আমার মুলুক চাঁনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তারপর থেকেই আমি ছিলাম বাদশা, আজ হয়েছি দীন দরিদ্র কাঙাল। আলেক চাঁনকে ঐ বন থেকে মগেরা ধরে নিয়ে গেছে। বল সর্দার–তাদেরকে কেমন করে কোথায় পাবো?

বনরাজ : (স্বগত) এবার আলবত বুঝেছি, ঐ মুলুক চাঁনই হামাকে পাগল করেছে। আর এই দুষ্টু নারীই হলো ছব খারাপির মূল।

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বেটা বোলত, তোহার ঘর কাহা আর তোহার নামটাই বা কি আছে?

বাদশা : আমার নাম কি বলব সর্দার, বলতে ঘৃণা ও লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। আমার নাম জামাল বাদশা, বাড়ি হলো শিমুলিয়া পরগনা।

বনরাজ: ঠিকই আছেরে, ঠিকই আছে। তোহার সেই মুলুক চাঁনই হামাকে উন্মাদ করেছে। হামাকে বাপজি বলে ডেকে, আমার মন-প্রাণ হরণ করে কিছু দিন হয় কোথায় চলে গেল, আজও এলো না।

বাদশা : তবে– তবে কি আমার মুলুক চাঁন প্রাণে বেঁচে আছে সর্দার?

বনরাজ: হাঃ, বেঁচে আছেরে, ওকে বনের হিংস্র জানোয়ার দৌড়ে এসে সালাম করে। ওর চরিত্র দেখলে তোহারা পাগল হবিরে, তোহারা পাগল হবি। আমি সারা বন-জঙ্গল, দেশের অলিগলি খুঁজেও তাকে পাচ্ছি না।

বাদশা : তবে কোথায় গেছে বলতে পারেন কি?

বনরাজ: হ্যারে, যাবার সময় এইটুকু বলে গিয়েছে যে সে নাকি কোন ধর্মস্থানে কিছু দিন কাটাবে। তোহারা চল হামার ডেরামে, আজের রজনী কাটাবে। কাল প্রত্যুসে মুলুক চাঁনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবি। (সবার প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

(আলেক চাঁন ও মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

মুলুক : ভাই আলেক চাঁন, এবারে বল তুমি কেমন করে একা এই মগের দেশ, বনের মাঝে এলে? আর কোথায়, কেমন করেইবা মগরা তোমায় পেল?

www.pathagar.com

আলেক : মিয়া ভাই, তোমাকে যেদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল সেই থেকে গোটা সংসারে ভাটা লেগে গেল। মা, আব্বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার তালাশে অনেক দেশ গ্রাম ঘুরে ঐ জঙ্গলে এসেছে। আমরা এক পাহাড়ের নিচে ঘুমিয়ে পড়ি। এই সুযোগেই মগেরা আমায় ধরে নিয়ে যায়।

(গান)

১. যার কর্মে যা লিখেছে বিধি আবের কলম দিয়া
এমন কার সাধ্য আছে কলম দেয় খণ্ডাইয়া গো–
যার কর্মে যা লিখেছেরে ॥

২. রাজ্য গেল, প্রজা গেল, এই ছিল কপালে–
সকলি ফুরায়ে গেল দারুণো আকালে গো–
যার কর্মে যা লিখেছেরে ॥

৩. তোমারো তালাশে মোরা আসিয়া জঙ্গলে
দেশ বিদেশ খুঁজি কত পাহাড়ো জঙ্গলে গো–
যার কর্মে যা লিখেছেরে ॥

৪. ডানে পাহাড় বামে পাহাড়, পাহাড় চতুর্দিকে–
আমাকে ধরিয়া নিল পাহাড়িয়া মগে গো–
যার কর্মে যা লিখেছেরে ॥

৫. তাতে আমি উদ্ধার হলাম উপলক্ষ তুমি
পিতা মাতা কোথায় আছে খবর নাহি জানি গো–

মুলুক : ওহঃ খোদা, তাইতো তোমাকে লোকে লীলাময়ী বলে থাকে। তুমি সবই করতে পারো। ভাই আলেক চাঁন, চল আমার সাথে। ঐ মস্তান সাহেবের বাড়ি আমি থাকি। আজকের রাত ওখানে থাকবে তুমি, আর আগামী দিন আব্বা আম্মার তালাশে আমরা দুজনেই যাব। (উভয়ের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

(মস্তান সাহেবের প্রবেশ)

মস্তান : (আপন মনে) আজ দু সপ্তাহ চলে যায় মুলুক চাঁন স্বদেশে যাবার কথা বলে চলে গেল, আর এলো না। আমার মনে হচ্ছে এক মুলুক চাঁনের অভাবে আমার বহু অভাব দেখা দিয়েছে। কেনই বা পরের ছেলের আব্বা ডাকে তাকে বুকে স্থান দিলাম আমি? লাল দিঘির পাড় থেকে ওর বিবাহের জন্য লোক আসবে। আমি কি করবো এখন?

(মুলুক চাঁন ও আলেক চাঁনের প্রবেশ)

www.pathagar.com

মুলুক : (সালাম জানিয়ে) আব্বা আমি এসেছি। আপনি হয়তো আমার কথাই ভাবছিলেন।

মস্তান : (সালামের উত্তর দিয়ে) এসেছ বাবা মুলুক চাঁন? আমি ভেবেছিলাম আব্বা বলা পাখিটি চলে গেল, আর বুঝি ফিরে না আসে। তা বাবা মুলুক চাঁন তোমার সঙ্গে এ ছেলেটি কে?

মুলুক : আব্বা, এ আমার বিমাতার গর্ভজাত আমার ছোটো ভাই, নাম আলেক চাঁন।

মস্তান : বাহঃ, চমৎকার, এক মুলুক চাঁন হারিয়েছিলাম আর দুই চাঁন পেয়ে গেলাম। ভালোই হলো, আলেক চাঁন-মুলুক চাঁন দু' ভাই। এসো বাবা আলেক চাঁন আমার কাছে এসো। (দুজন দুপাশে দাঁড়ালো) তা এবার বলো বাবা আলেক চাঁন তোমাদের পিতা মাতার খবর কি, তারা কেমন আছে?

আলেক : আব্বা হুজুর, সে অনেক কথা, আমি বলতে পারবো না। মিয়া ভাই বিস্তারিত বলতে পারবে।

মস্তান : তা বেশ, ভালো কথা। এবার তুমি বলো মুলুক চাঁন তোমার পিতা-মাতার সংবাদ।

মুলুক : আব্বা হুজুর, সে সব কথা বলতে অনেক সময় লাগবে। মনে হলেই বুকটা চৌচির হয়ে যায়, দু চোখ অন্ধকার হয়ে আসে। আমার বিমাতার চক্রান্তে পিতা আমাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে। জমিদারি, রাজ্যপাট, বাড়ি ঘর সবই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। অবশেষে পিতা ও বিমাতা আলেক চাঁনকে সাথে নিয়ে আমার খোঁজ করার জন্য পাগলের ন্যায় দেশ বিদেশ ঘুরেছে। এরপর– আমি আর বলতে পারছি না, ভাই আলেক চাঁন বাকিটা বলবে। (আলেক চাঁনকে ইশারা দিবে)

আলেক : (কেঁদে কেঁদে বলছে) আব্বা হুজুর, কি বলবো আমি? আব্বা-আম্মা আমাকে সাথে নিয়ে মিয়া ভাইয়ের উদ্দেশ্যে এক বিরাট বনের মধ্যে এসে পড়ে। অমনি রাত্রি হয়ে এলো। একটি পাহাড়ের পাদদেশে আমি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ি। এই সুযোগে আমাকে মগেরা ধরে নিয়ে যায়। সকাল বেলা আমাকে জবাই করার জন্য যেই মগেরা ধারালো ছুরি বের করেছে ওমনি কোথা থেকে যেন মিয়া ভাই এসে তাদের নিষেধ করলো আর ওমনি মগের দল মিয়া ভাইয়ের পায়ে পড়ে সালাম করলো ও ক্ষমা চেয়ে চলে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল–মুলুক চাঁন মানুষ রূপে বেহেশতের একজন অবতার। আব্বা হুজুর, আমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে?

মস্তান : আল্লার রহমতে অবশ্যই তারা কুশলেই আছে। তার কারণ মুলুক চাঁনের পিতা মাতা কোনো দিন অকালে মরতে পারে না। সত্যিই বাপ আলেক চাঁন, তোমার ভাই মুলুক চাঁন সাধারণ মানুষ নয়। সকলের উপরে মুলুক চাঁনের স্থান। মুলুক চাঁন সব মানুষের উর্ধ্বের মানুষ। তাই ওর এমন অর্থবহ নাম। ওর নাম মুলুক চাঁন আর তোমার নাম আলেক চাঁন। মুলুক চাঁন-আলেক চাঁন দু'ভাই।

(এমন সময় দৌড়াতে দৌড়াতে জামাল বাদশা ও ২য় বেগমের প্রবেশ)

www.pathagar.com

বাদশা : কে বল্লে আমার মুলুক চাঁন, আলেক চাঁনের নাম, কে? কোথায় আমার আলেক চাঁন, মুলুক চাঁন? (দু'ভাই মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরবে)

আলেক : মা, মা তোমরা এসেছ?

২য় বেগম : কোথায় আমার মানিক মুলুক চাঁন?

মুলুক : এইতো আমি এসেছি মা। মাগো, অনেক দিন চলে গেল মা বলে প্রাণ ভরে ডাকতে পারি নাই মা।

২য় বেগম : বাবা মুলুক চাঁন, আগে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি না বুঝে তোমাকে কতই না দুঃখ দিয়েছি। তাই মা হয়ে আজ তোমার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইছি। আমাকে মা বলে ডাক দাও বাবা। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে অনেক কষ্ট সয়ে তোমাকে পেয়েছি। এসো বাবা তোমাকে বক্ষে ধরে জ্বলন্ত অগ্নি একটু নির্বাপণ করি। (কোলে নিবে)

আলেক: মা, মা, মিয়া ভাই সাধারণ মানুষ নয়। মিয়া ভাই আমাকে দারুণ মগদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

২য় বেগম : আর বলো না আলেক চাঁন, আর বলো না। নিজের ভুলের জন্য এমন সরল, সহজ, সোনার পুতুলকে বিনা দোষে কতই না কাঁদিয়েছি।

মস্তান : সোবাহান আল্লাহ, ধন্য তোমার কারবার। স্বার্থের মোহে মানুষ কতই না ঘৃণ্য কর্ম করে বসে। কিন্তু সত্য আর ধর্ম বলতে যাহা তা যেন উজ্জ্বল পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় জগতে বিরাজমান রয়েছে। হে জগতের লোকেরা তোমরা জেনে রাখ চিরদিনই ধর্মের ও সত্যের জয়, আর অধর্ম ও মিথ্যার কোনো দিনই জয় নেই।

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক : (গান)

১. এবার দেখলি সত্যের লীলা, এবার দেখলি ধর্মের খেলা
দিনকে রাত্রি করতে পারে দিন দুনিয়ার বারে তালা।

২. কাল বেটা তুই বাদশা ছিলি, আজ আবার ফকির হইলি
পালঙ্কে শুয়েছিলি, আজ আবার গাছ তলা।
শত্রু বলে যাহারে তুই দিলি পায়ে ঠেলা–
বন্ধু হয়ে সেই আজ তোর মুছিয়ে দেয় মনের জ্বালা–

বাদশা : বাবা দরবেশ, আমার নিজের ভুলের জন্যই এমনটি হয়েছে।

বিবেক : (গান)

যেদিন সংসার ছাড়তে হবে, সকল ভুল ভাঙ্গিয়া যাবে
এক মুহূর্তে ভেঙ্গে যাবে সকল মায়ার খেলা–
সময় থাকতে কেউ বুঝে না বিধির আজব লীলা–

www.pathagar.com

এক দামে হয় বেচা-কেনা (২)
বাদশা আর ভিক্ষারীর পোলা ॥

২য় বেগম : বাবা দরবেশ, আমি আগে বুঝতে পারি নাই।

বিবেক : (গান)
আজ বুঝবি না বুঝবি কবে, যেদিন এসে ধরবে যমে
সকল সুতায় লাগবেরে আইল
ভাঙ্গবে নেশার খেলা
যেদিন মাটির তলে যেতে হবে থাকবিরে একেলা
সাইদ বলে কাজ দেবে না
মিথ্যাকে যে সত্য বলা। (প্রস্থান)

মস্তান : হা পাগল বেশে দরবেশ বাবাজি যা বলে গেল সবই সত্য। তবে শুনুন বাদশাজি, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে আপনাদের যেতে হবে। কারণ, লাল দিঘির পাড় সদাগর শুফিয়ান সাহেবের একমাত্র কন্যা হামিদা বেগমের সাথে আপনার পুত্র মুলুক চাঁনের শুভ বিবাহ ধার্য করা হয়েছে। আপনি পুত্রের জন্মদাতা পিতা সয়ং হাজির, তাই আপনার অনুমতির প্রয়োজন।

বাদশা : একি বলছেন জনাব, আজ হতে আমার বলতে যাহা কিছু পুত্র, কন্যা, ধন, মাল সকল কিছুর উপর আপনার পূর্ণ অধিকার রইল। আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন। আমার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই।

মস্তান : যদি তাই হয় তবে আর কাল বিলম্ব না করে চলুন আমরা কাল সকালেই যাত্রা করি চিটাগাং লাল দিঘির পাড়ে। (সকলের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(হামিদা ও সখির প্রবেশ)

সখি ওহে শাহজাদি হামিদা বেগম, সত্যিই সত্যিই যে আপনার ফরিয়াদ আল্লাহ্ কবুল ও মঞ্জুর করেছে। যদি বিবাহ হয়ে নতুন সাথী পেয়ে যান, তবে তো আমাদের কথা মনেই থাকবে না।

হামিদা : না গো সাথী, না। নতুন সাথী পেলেই কি বাল্য সাথীদের ভোলা যায়?

সখি : বিবাহের পরে তো আপনি এদেশে থাকবেন না, তাই ভুলে যাওয়াই সত্য।

হামিদা : না গো না, আমারতো আর কোনো ভাই বোন নেই। বিবাহের পর আমার সাথীই যে হবে আমার পিতার সর্ব সত্যবান। সে তো চিরদিনই এখানে কাটাবে।

সখি আচ্ছা তবে একটু আশ্বস্ত হলাম। কাছে যেতে যদি নাই পারি দেখতে তো পাবো। তবে চলি (রওনা দিতে উদ্যত)

www.pathagar.com

হামিদা : একি, কোথায় যাবে শুনি? আমার বিবাহের কথা বলতেই দেখি তোর মন ভার হয়ে গেল। তবে কি তোর রাগ হয়েছে নাকি?

সখি না গো না, রাগ হব কেন? ভাবছিলাম কি, যে বয়সে আপনার বিবাহ হলো এ যে পূর্ণ আনন্দের বয়স, আমারো তো...।

হামিদা : ও বুঝেছি, সেদিনের বেশি দেরি নেই সাথী। মনে রাখবে বাগানে যখন ফুল ফোটে তখনই ভ্রমর আসতে থাকে। তোর জন্যও ভ্রমরের দল গুন গুন শুরু করেছে। কখন যেন দেখবে একটা উড়ে এসে জুড়ে বসে পড়ে। চল যাই দুজনে একটু আল্লাহকে স্মরণ করি গিয়ে।

সখি চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য

(শুফিয়ানের প্রবেশ)

শুফিয়ান : ওগো রহ্মানুর রাহিম আল্লাহ, আমাকে মাত্র একটি কন্যা সন্তান দিয়েছ তুমি। বর্তমানে সে সাবালিকা কন্যা। বায়েজিদ বুস্তানে মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে দেখে এসেছে কোন অজানা এক বরের মুখ। নামটি নাকি তার মুলুক চাঁন। আরো জানতে পারলাম ছেলেটা নাকি একেবারেই যাকে বলে আদর্শ ও উত্তম চরিত্রের। মেয়েটির ভাগ্যে কি আছে তুমিই জানো খোদা।

(হামিদার প্রবেশ)

হামিদা : আব্বা, আব্বাজি, আপনি সব সময় কি যেন একটা গভীর চিন্তায় ব্যস্ত থাকছেন। বলুন না আব্বা, সে কি এমন কারণ?

শুফিয়ান : মা, হামিদা বেগম, কি আর বলতে পারি? তোমার পরিণাম চিন্তায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। তুমি আমার একটি মাত্র কন্যা। কার হাতে তোমাকে তুলে দিব, এতে কি আমার প্রাণে শান্তি পাবো কিনা, তাই ভাবছি।

হামিদা : আব্বাজান, আপনি অনুমতি প্রদান করলে আমি বলতে পারি।

শুফিয়ান : হা মা, তুমি তোমার মন উজাড় করে আমাকে বলতে পার।

হামিদা : (একটা পত্র দেখিয়ে) আব্বাজান, আমি বুস্তান শরিফ থেকে ঐ ছেলেটার নিজ হস্তে লিখিত পূর্ণ পরিচয় ও ঠিকানা নিয়ে এসেছি। এই দেখুন তার পরিচিতির বর্ণনা। (হাতে দিবে)

শুফিয়ান : (পত্রটি পড়ে) বাহঃ বাহঃ চমৎকার, উত্তম, আমি যা আল্লার পাক দরবারে ফরিয়াদ করেছি ঠিক তাই পেয়েছি। আল্লাহ্ তোমার নাম বাঞ্ছাকল্পতরু। তুমি বান্দার সব আশা পূর্ণ করে থাক। আরো উত্তম কাজ হয়েছে। মাজার শরিফের মস্তান সাহেব বিবাহের দিনও ধার্য করে দিয়েছে। তবে আর আমার কোনো চিন্তার কারণ থাকতে পারে না। মা হামিদা, তুমি এ ঘটনা আমাকে আগে জানালেই পারতে। যাক, ভালোই হলো, আগামী শুক্রবার

www.pathagar.com

জুম্মার নামাজান্তে বিবাহের বরযাত্রী মস্তান সাহেব সহ চলে আসবে আমার বাড়িতে। মা হামিদা, চল আমরা বিবাহের সকল আয়োজন করি। (উভয় প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(জামাল বাদশা, মস্তান সাহেব, আলেক চাঁন ও মুলুক চাঁনের প্রবেশ)

বাদশা : আমার মাননীয়, সম্মানিত ধর্মের ভাই মস্তান সাহেব, আমি আপনার মহান উপকারের ঋণ কি দিয়ে পরিশোধ করবো? এমন কি বা আমার আছে, আমি ভেবে স্থির করতে পারছি না। আপনি আমার পুত্র মুলুক চাঁনের ধর্মের পিতা হয়ে তার জীবন রক্ষা করেছেন। এবার বলুন তার দুর্ভাগ্যের অবসান হতে আর কত দেরি হতে পারে?

মস্তান : ভাই জামাল বাদশা, খোদা যার ভাগ্যে যা রেখেছেন তা অবশ্যই হবে। লোকে বলে দুঃখের পরে সুখ, আবার সুখের পরেও দুঃখ আসতে পারে। তাই মুলুক চাঁন তার পরীক্ষায় জয়ী হয়েছে আমার নিকট। আমি তাকে আশীর্বাদ করেছি, মুলুক চাঁন এখন থেকে অতি সত্তর বাদশাহী সুখ ভোগ করবে।

(বনরাজের প্রবেশ)

বনরাজ: কাহা আছে হামার বাপুজি মুল্লুক চাঁন? ও যে হামার কালিজা উন্মাদ করিছে, হামার বনকে অন্ধকার করে চলিয়ে এসেছে।

মুলুক : (জোড় হাত করে পায়ে পড়ে) আব্বাজি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আমার পিতা ও ভাইয়ের সন্ধান পেয়েছি বলে আপনার সাক্ষাতে এতোটা দেরি হয়েছে।

বাদশা : মিয়া ভাই বনরাজ, আপনাদের সকলের কাছেই আমি আমার পুত্রের জন্য কৃতজ্ঞ। আর কি বলব, আপনারা সকলেই আমার পুত্রের শুভ বিবাহে হাজির থেকে আমার পুত্র ও পুত্রবধূকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে যাবেন। আগামী কালই যে ওর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

বনরাজ: একি বলছ ভাই, হামার যে খুশিতে একবার নাচতে ইচ্ছা করছে। কোথায় হামার বাপুজির বাসর হবে? হামি হামার মাইজি আর বাপুজিকে এই দুই হাতে কুলে নিয়ে আশীর্বাদ করিবে।

মস্তান : আপনারা সকলেই মনযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, শাস্ত্রে বলেছে শুভ কাজ অতি সত্তরই সমাধান করা উত্তম। তাই চলুন আমরা সকলেই এই মুহূর্তে বিবাহ কার্য সমাধান করতে যাত্রা করি।

বনরাজ: ঠিক আছে মস্তান ছাহাব, এখুনি যাত্রা করা যাক। (সকলের প্রস্থান)

www.pathagar.com

২য় দৃশ্য

(বর সাজে মুলুক চাঁন সহ বাদশা, বনরাজ, মস্তান সাহেব, ২য় বেগম ও আলেক চাঁনের প্রবেশ)

বনরাজ : কৈ হ্যায়? হামারি মাইজিকে সাজিয়ে নিয়ে এসো।

(হামিদাকে সাজিয়ে নিয়ে শুফিয়ানের প্রবেশ)

শুফিয়ান : ভাই বনসর্দার, মাননীয় মস্তান সাহেব ও আমার সম্মানিত বেয়াই সাহেব, আচ্ছালামো আলায়কোম। আপনারা সকলেই অবগত যে আমার বিশাল সম্পত্তি আছে। তাই বলে আমার একটি মাত্র কন্যা এই হামিদা বেগম ব্যতীত অন্য কোনো সন্তানাদি নেই।

মস্তান : আমরাও এ সমস্ত জেনেই এই মহানুভব, সদাচারী, সদচরিত্রবান ছেলে মুলুক চাঁনকেই আপনার কন্যা হামিদা বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করতে এসেছি। এমন পুত্র সন্তান এক হাজারে একজনও জন্ম হয় না।

বনরাজ : হ্যারে মরদ শুফিয়ান, তোহারি পূর্ব জনমের আরাধনা আছে বলিয়ে এমন দেওতা তুল্য বেটার হাতে তোহার বেটিকে অর্পণ করতে পারলিরে।

২য় বেগম : আপনারা আমার দুটি কথা শ্রবণ করুন। আমি হতভাগী নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে ঘরের চাঁদকে দূরে ফেলে দিয়েছি। বাবা মুলুক চাঁন, আয়, আমার বক্ষে এসে একবার মা বলে ডাক। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও বাবা।

মুলুক : না মা, তুমি আমার জননী, তোমার কোনো অপরাধ নেই। এ সবই আমার ভাগ্যের পরিহাস।

শুফিয়ান : আল্লা রসুলকে সহায় রেখে আপনাদের সর্ব সাক্ষাতে আমার কন্যা হামিদা বেগমকে জামাল বাদশার পুত্র মুলুক চাঁনের হাতে অর্পণ করলাম। সেই সাথে আমার এতো বড়ো জমিদারি ও সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা মুলুক চাঁনকে অর্পণ করলাম। (শুফিয়ান হাত ধরে অর্পণ করবে, হামিদা ও মুলুক চাঁন সকলকে নত মস্তকে সম্মান জানাবে)

সকলে : জয়, মুলুক চাঁন বাদশার জয়।

–সমাপ্ত–

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৭৩ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৭.০৯.২০০৪

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতির একটি বিশাল দিক জুড়ে রয়েছে লোকজ খেলাধুলা। নির্মল আনন্দপ্রাপ্তির জন্যই এসব খেলাধুলার প্রচলন হয়। মানিকগঞ্জের গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নৌকাবাইচ, হাডুডু খেলা, দাড়িয়াবান্ধা খেলা, লাটিম খেলা, লাঠি খেলা, গোল্লাছুট ইত্যাদি। বর্তমানে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে ঐতিহ্যবাহী খেলা ছাড়াও ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

১. নৌকাবাইচ

দাপরে শ্রী কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ষোলশত সখি নিয়ে বা গোপিনী নিয়ে আনন্দ বিহারে মত্ত থাকতেন তখন ময়ূরপঙ্খী নৌকার মধ্যে সখিদের নৌকায় তুলে নিজে ঐ নৌকার পেছনে হালে বৈঠা ধরতেন এবং চোরা মোহন বাঁশি বাজাতেন। নৌকার আগায় গলুইর কাছে তাঁর প্রধান সখি রাধা বসতেন। রাধাসহ সখিগণ কৃষ্ণের বাঁশির সুরের তালে তালে বৈঠা বেয়ে নৌকা চালাতেন নদীতে। এভাবে তাঁরা আনন্দ উপভোগ করতেন। এই অষ্টসখির ময়ূরপঙ্খী নৌকাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে হিন্দু রাজা, জামিদারগণ মনোরঞ্জনের জন্য এই ধরনের বিলাসবহুল নৌকা তৈরি করতেন এবং নদীতে আনন্দ ভ্রমণে বের হতেন। তৎকালীন যুগে গায়করা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নৌকার মাঝখানে নেচে গান গাইতেন। তখন থেকেই ধীরে ধীরে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আজো কোনো স্থানে নৌকাবাইচের মেলা হলে সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন, বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায়ের লোকজন অষ্টসখির নৌকা সাজায়।

সারিগানের প্রসারের ক্ষেত্রে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হিন্দু জমিদার, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হেলাচিয়া নৌকাবাইচ, যাত্রাপুর নৌকাবাইচ, কাষ্ঠাপাড়া নৌকাবাইচ, গৌরিপুর নৌকাবাইচ, ভাঙ্গাভিটা নৌকাবাইচ প্রভৃতি প্রতিবছর জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো। শ্রাবণ সংক্রান্তি থেকে শুরু করে কার্তিক মাসের লক্ষ্মীপূজা, কর্তিক পূজা পর্যন্ত চলত এই নৌকাবাইচ। পাকিস্তান আমলে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কালীগঙ্গা নদীতে নৌকা বাইচ হতো।

পুটাইলের আদম পাগলার ৫৩ হাত লম্বা একটি বাইচের নৌকা ছিল। লেমুবাড়ি গ্রামের ডাক্তার মফিজউদ্দিনের ৫২ হাত লম্বা একটি বাইচের নৌকা ছিল। কবির বেপারি, সোনাতন মিস্ত্রি, ছকেল উদ্দিন মণ্ডল, মোহাম্মদ হোসেন মণ্ডল, আইনউদ্দিন শিকদার, চেন্দু বেপারি, বাছের বেপারি, মিনহাজউদ্দিন গাছি প্রমুখ ব্যক্তির লম্বা ও সুদৃশ্য বাইচের নৌকা ছিল। ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলে এই ধরনের একটি নৌকা

www.pathagar.com

তৈরি করতে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা খরচ হতো। তখনকার দিনে মানুষের অভাব অনটন তেমন ছিল না। ধনী ব্যক্তিদের মান মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতীক ছিল বাইচের নৌকা। যে বাড়িতে বাইচের নৌকা থাকত তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো।

নৌকাবাইচের বিবরণ

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মেলা, পূজা বা অন্য কোনো উৎসব উপলক্ষে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা হয়। একটি বাইচের নৌকায় কমপক্ষে ২০ জন বাইচাল থাকেন। বাইচের নৌকা মালিকের ঘাট থেকে ছাড়া হয়। নৌকা ছাড়ার সময় কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। নৌকার মাঝি, মাল্লা, বাইচাল, সারিদার বা বয়াতিদের নৌকায় উঠার পর বয়াতিরা বন্দনাস্বরূপ গেয়ে উঠে—

আলার নামে নৌকা খুইলা দিও
পরানের মাঝি
দেহের মাঝির খবর রাইখ ভালো
নৌকা খোল খোলরে
আলা রাসুলের নাম নিয়া
...

এই সময় নৌকা মালিকের বাড়ির বৌ-ঝিরা কুলা বা থালার মধ্যে ধান, দূর্বা, কয়েকটা চাউল, সিঁদুর, সামান্য পরিমাণ সরিষার তেল রাখে। তারা পানি দিয়ে নৌকার গলুই ধুয়ে দেয়। তারপর গলুইতে সরিষার তেল লাগায়। এছাড়া তিন, পাঁচ বা সাতফোঁটা সিঁদুর গলুইর মাথায় লাগায়। বাইচের নৌকার পেছনের গলুইতে ঠিকানাসহ মালিকের নাম লেখা থাকে। নাম ঠিকানা রং দিয়ে আকর্ষণীয় করে লেখা হয়। বাইচের নৌকা নদী দিয়ে যাওয়ার সময় তীরবর্তী গ্রামের লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সারিগান শুনার জন্য। তারা ঘাটে নৌকা ভিড়াতে বলে। ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে গান শুনার পর গ্রামের লোকজন বয়াতিদের পুরস্কৃত করে, বাইচালদের খাবার দেয়। এসব গান স্থান কাল পাত্র ভেদে পরিবেশন করা হয়। যেমন—হিন্দু এলাকায় নৌকা ভিড়ালে হিন্দু শাস্ত্র তত্ত্ব বিষয়ক গান গাওয়া হয়।

আজ কেন তোর
বদন দেখি কালা
মা জননী
কে দিয়াছে রঙ্গফুলের মালা
অসুর কাটিয়া মা তুই
করলি রাশি রাশি
স্বামীর বুকে পাড়া দিলি
তাতে না হস খুশি।

www.pathagar.com

মুসলমান এলাকায় নৌকা ভিড়ালে মুসলমান ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় গান গাইতে হয়—
পাঁচমানিক কি
তিরিশ মতি
আখেরাতে তরবা যদি
ভাই মোমিনা
দিন গেল তোর
অবহেলায় বইয়া।

আড়ং বা মেলাস্থানে পৌঁছার পর সব নৌকার তালিকা করেন মেলা বা উৎসব কমিটি। তারপর কোন নৌকার সঙ্গে কোন নৌকার প্রতিযোগিতা হবে তা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক নৌকায় দুইজন বিচারক থাকেন। সাধারণত একমাইল/আধা মাইল জায়গা জুড়ে বাইচ হয়। জায়গা বেশি থাকলে আরো বেশি জায়গা জুড়ে বাইচ হয়। এরপর সালাম ভক্তি করে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হয়। এইসময় বয়াতিরা আলাদা গান ধরে—
একা আইলা বরণ করিতে
মা ভাগ্যবতী
তোমার যেন মিলিবে ফতে...

নৌকা ছাড়ার পর ও কিছুদূর যাওয়ার পর সারিগান গাওয়া হয় —
উড়াল ছাড়িল ছাড়িলরে
খোপের কবুতর উড়াল ছাড়িলরে...
হিন্দু শাস্ত্রে বলে
শ্রীরাম কান্দিয়া বনে যায়রে
শূন্য করে সোনার ঘরবাড়ি।

এরপর নৌকাবাইচের মূল প্রতিযোগিতা যেখানে শুরু হয় অর্থাৎ বাজার, আড়ং বা মেলাস্থলের কাছাকাছি গিয়ে গান গাওয়া হয়। যেমন —
কোথায় রইলা কালাচান
তারে আন
দারুণ কোকিলের রবে
বিদরে পরান...

এই গান শেষ হওয়ার পর নৌকা যখন মেলাস্থলে পৌঁছে তখন ভিন্নরকম গান গাওয়া হয়। যেমন—
শ্যামচান আইসাছে
কদমতলে লো ললিতে...

ধান-দূর্বা দিয়ে নৌকা বরণ করে বাইচ শুরু হয়। বাঁশি বাজিয়ে নৌকা ছাড়া হয়। শুরু এবং শেষের স্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ থাকেন। তারা জয় পরাজয় সম্পর্কে রায় দেন। এই সময়ের মধ্যে ১০ মাইল এমনকি ১৫ মাইল পথ শুধু বৈঠা বেয়ে যেতে হয়।

www.pathagar.com

একটানা বৈঠা বাওয়ার ফলে বাইচালরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। সারিগান গাওয়ার উদ্দেশ্যই হলো বাইচালদের চাঙ্গা করে তোলা। যাতে তাদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। নৌকাতে দুইজন মাঝি থাকেন। নৌকায় দুটি টান দিতে হয়। অর্থাৎ একবার যাওয়া এবং একবার আসা। দুইটানে যে নৌকা জয়ী হয় সেই নৌকাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। তাছাড়া বাইচে অংশগ্রহণকারী সকল নৌকা সান্ত্বনা পুরস্কার পায়। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর সারিদার বা বয়াতিগণ নৌকায় উঠেন এবং পুরস্কৃত জিনিস নৌকাতে নিয়ে এসে সারিগান গাইতে গাইতে বাড়ি রওনা দেন।

যেমন—

রাখাল ডাকিয়া বলেরে
উঠরে ভাই চল যাই ঘরে।

কিছুদূর এসে আবার গাওয়া হয়—

সারাদিন কোথায় ছিলি গোপালরে
একবার মা বোল বলিয়া
কোলে আয়রে...

মালিকের বাড়ির ঘাটে পৌঁছে অন্য গান গাওয়া হয়—

তোমার গোপাল বইরা নাও ঘরে
মা জননী ॥
সকালে নিয়াছি গোপাল
দূর বনান্তরে
আইনা দিলাম তোমার গোপাল
বইরা নাও ঘরে ॥[১]

বুরুণ্ডি খেয়াঘাটে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা

১৪ই ভাদ্র, ১৪১৯ তারিখে সিংগাইর উপজেলার বুরুণ্ডি খেয়াঘাটে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজন করেন কালীগঙ্গা নদীর দু'পাড়ের উৎসাহী জনগণ। এটি ছিল একটি সৌখিন নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা।

বিকেল তিনটায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় চারটি 'খেল্লা' নৌকা এবং ছয়টি 'চইরা' নৌকা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কয়েকটি লম্বা লম্বা বাইচের 'কুশা'। একটি অষ্টসখি ময়ূরপঙ্খী নৌকা আসে শিবপুর মিস্ত্রি বাড়ি থেকে। নৌকার মালিক ছিলেন বলাই সূত্রধর। তাছাড়া বালিরটেক থেকে আসে একটি বিশাল আকৃতির কলাগাছের ভেলা। সিংগাইর উপজেলার কালিয়াকৈর গ্রামের আলাউদ্দিন একটি 'ছিবা' নৌকা নিয়ে আসেন। নৌকাটির দৈর্ঘ্য ৭৬ হাত। এই নৌকা বানাতে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। মাঝি-মাল্লার সংখ্যা ছিল ৫০ জন। আলাউদ্দিনের নৌকা ঘাট থেকে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে নৌকা বরণ করেন তাঁর স্ত্রী রাহিমা। কুলার মধ্যে ধান, দূর্বা, সিঁদুর, সরিষার তেল,

www.pathagar.com

নৌকার গলুইতে দিয়ে আশীর্বাদ করে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতায় আর একটি 'ছিবা' নৌকা অংশ নেয়। পারিল বলধারা গ্রামের চমক আলী বয়াতি এই নৌকা তৈরি করেন। এই নৌকা তৈরি করতে তাঁর তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। নৌকার দৈর্ঘ্য ৭৩ হাত। মাঝি-মাল্লার সংখ্যা ৪৫/৫০ জন।

বুরুণ্ডির খেয়া ঘাটে নৌকাবাইচে অংশগ্রহণকারী নৌকা

নৌকাবাইচের দৃশ্য

www.pathagar.com

বুরুণ্ডি খেয়াঘাটের যেখান থেকে বাইচ শুরু হয়, সেখানে একটি লম্বা রশি টানানো থাকে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীগণ ঐ রশি বরাবর নৌকা দাঁড় করিয়ে রাখেন। নির্দিষ্ট সময়ে বাঁশি বাজানোর পর নৌকা ছাড়া হয়। গন্তব্যস্থানেও এই ধরনের একটি রশি টানানো থাকে। যে নৌকা ঐ রশিকে প্রথম স্পর্শ করবে সেই নৌকাকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। সেই সময় নৌকায় তিন টান দিতে হয়। তিন টানে যে নৌকা জয়ী হয় সেই নৌকাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

সেদিন বুরুণ্ডি খেয়াঘাটের নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় সারিগান গেয়েছিলেন কুন্দুরিয়া নৌকার মাঝি-মাল্লারা। পদ্মার পাড় থেকে আগত একটি 'চইরা' নৌকার মাঝি-মাল্লারা এবং চান মিয়া বয়াতি সারিগান গায়। ময়ূরপঙ্খী অষ্টসখি নৌকাটি অষ্টসখির গান গাইতে গাইতে নদীর দু'পাড় ঘেঁষে আসা যাওয়া করতে থাকে। নদীর দু'তীরে অসংখ্য নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। যুবক ছেলেরা ইঞ্জিন চালিত নৌকার মধ্যে ড্রাম সেট লাগিয়ে তালে তালে নাচতে থাকে। আরেকটি নৌকায় পুরুষরা মহিলা সেজে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নৃত্য করে নদীর এপাড় ওপাড় ঘুরতে থাকে। বাইচ উপলক্ষে নদীর দু'ধারে শিশুদের প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা ও বেলুন বিক্রি হতে দেখা যায়। খাবারের মধ্যে চানাচুর, জিলাপি, খাজা, গজা প্রভৃতি বিক্রি হতে দেখা যায়।

বালিরটেক কালীগঙ্গা নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা

১৬ই ভাদ্র ১৪১৯ প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং লোকশিল্পী ও তথ্য সংগ্রাহক সাইদুর রহমান বয়াতি বালিরটেক কালীগঙ্গা নদীতে নৌকাবাইচ প্রত্যক্ষ করেন। নৌকাবাইচ দেখার জন্য সেদিন হাজার হাজার নর-নারী, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধ নদীর দু'তীরে ভিড় করে। সে সময় খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। পারাপারের জন্য এক মালাইয়া নৌকা চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। কেবল মাত্র ফেরি চালু থাকে। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে মানুষ নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা দেখার জন্য সমবেত হন। সেদিন চারটি 'ছিপা' নৌকা, তিনটি 'চইরা' নৌকা, পুটাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল জলিল মোল্লার ৩০/৪০ হাত লম্বা কলাগাছের ভেলা নৌকাবাইচে অংশ নেয়। সানবান্ধা জাইলা বাড়ি থেকে অষ্টসখির নৌকা আসে। যন্ত্রচালিত 'কোসা' নৌকায় যুবকরা ড্রাম সেট চালু করে গানের তালে তালে নৃত্য করতে থাকে। ধল্লা থেকে বালিরটেক পর্যন্ত বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। চেয়ারম্যান আবদুল জলিল মোল্লাকে কলাগাছের ভেলা ভাসানোর জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। সাটুরিয়া উপজেলার আয়নাপুরের 'ভাই ভাই খেল্লা' নৌকাকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিটি নৌকাই বিভিন্ন ধরনের রং দিয়ে রাঙানো হয়। নৌকার গুলুইতে ময়ূর, কুমির ও হরিণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়। তাছাড়া ফুল ও লতাপাতার নকশাও থাকে। সেদিন পুরস্কার সামগ্রীর মধ্যে ছিল রঙিন টেলিভিশন, ফ্রিজ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

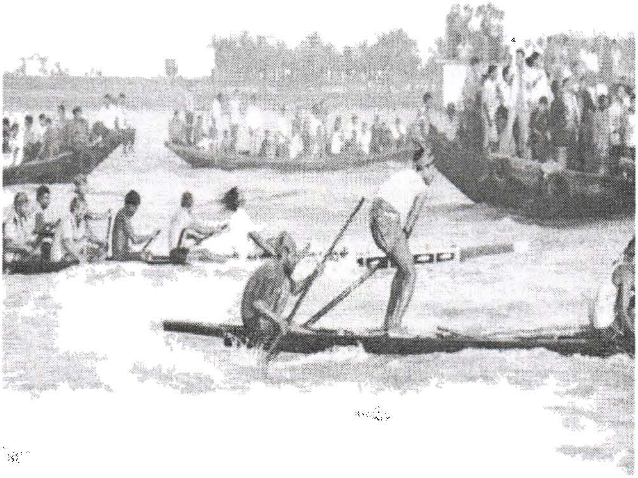

নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা

২. হাডুডু খেলা

বর্তমানে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হাডুডু অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলা গ্রামে বেশি হয়। বিশেষ কোনো উপলক্ষ ছাড়াও যে কোনো সময় এই খেলা হয়। জনগণের আনন্দ বিনোদন ছাড়াও হাডুডু খেলা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হাডুডু খেলায় দুটি দল থাকে। প্রত্যেক দলে ৭জন খেলোয়াড় থাকে। একপক্ষের খেলোয়াড় বিপক্ষের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য করে ডাক দেয়। কেউ বলে হাডুডু বা হা-টিক টিক, কেউ বলে হাছি–এরকম দম বন্ধ করে ডাক দিতে থাকে। ডাক দিতে দিতে যদি এই খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের একজনকে স্পর্শ করে নিজের কোটে এসে দাঁড়াতে পারেন তাহলে তার দল এক পয়েন্ট পাবেন। আর যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় দু'জনে ডাক দেওয়া খেলোয়াড়কে ধরে রাখতে পারে তাহলে তারা এক পয়েন্ট পাবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে। একঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট থাকে। মাঝখানে বিরতির জন্য দশ মিনিট থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কোনো পক্ষের খেলোয়াড় অন্যপক্ষের খেলোয়াড়কে বেশি সংখ্যায় ছুঁয়ে আসতে পারে তবে তারা জয়ী হবে।

২৬.০৮.২০১১ তারিখ পুটাইল ইউনিয়নের কাফাটিয়া বাজার যুব কমিটি হাডুডু খেলার আয়োজন করে। বিজয়ীকে ১৪" রঙিন টেলিভিশন এবং বিজিতকে একটি মোবাইল সেট পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। বিকেল চারটায় খেলা শুরু হয়। কাফাটিয়া বাজারের পূর্ব পাশে মঞ্চ তৈরি হয়। গ্রামের নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়েরা খেলা দেখতে আসে। রেফারি ছিলেন শামছু মেম্বার। দুটি দল–জামসা যুবদল ও কাফাটিয়া যুবদল খেলায় অংশ নেয়।

www.pathagar.com

৩. লাঠি খেলা

আগের দিনে জমিদারি এলাকা, সীমানা, ভূ-সম্পত্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ে জমিদারগণের মধ্যে সংঘাত-দ্বন্দ্ব এবং সম্মুখ যুদ্ধ হতো। সে সময় আজকালের মতো সমরাস্ত্র বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। সেই সময় জমিদারগণ আত্মরক্ষা অথবা কোনো সংঘাত মোকাবেলা করার জন্য নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী লালন করতো বলে জানা যায়। এই লাঠিয়াল বাহিনী বিভিন্ন প্রকার লাঠি চালনার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতো। তাছাড়া প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে অনেক সময় ঢেঁকিও ব্যবহার করতো বলে জানা যায়। জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর অনুকরণেই মূলত লাঠি খেলা সৃষ্টি হয়েছে। লাঠি খেলার যিনি ওস্তাদ তাকে সর্দার বলে। এই জন্য অনেকে লাঠি খেলাকে 'সর্দার বাড়ি' খেলাও বলে।[২]

আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগেও ঈদের দিনে, বিয়ে বাড়িতে অথবা যে কোনো সামাজিক উৎসবের মধ্যে লাঠি খেলা ছিল খুব জনপ্রিয় আয়োজন। তাছাড়া অনেক সচ্ছল ব্যক্তি শখ করেও লাঠি খেলার আয়োজন করতো। কিন্তু বর্তমানে সেই ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা বা সর্দার বাড়ি খেলা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওরের তেরশ্রী গ্রামের তাহেজ ফকির ও সাটুরিয়া থানার জান্না গ্রামের চাঁন মিয়া এই ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলাকে এখনও ধরে রেখেছেন। তাছাড়া উঁচুটিয়া গ্রামের ছবেদ আলীর দল, হরিরামপুরের অহেদ আলীর দল, মানিকগঞ্জের নওখন্তা গ্রামের আলেখ বৈরাগীর দল এই লাঠি খেলা প্রদর্শন করে থাকে। মানিকগঞ্জের জান্না গ্রামেও বর্তমানে লাঠি খেলার দল আছে।[৩]

এই লাঠি খেলায় বিশেষ নৃত্যের তালে তালে লাঠিয়াল দল ঘুরতে থাকে। কাঁসার কলসির উপর কাঁসার থালা বাজিয়ে অথবা কখনো 'চ্যাপ থালা' বাজিয়ে নৃত্যের তাল রক্ষা করা হয়। নাচেরও প্রকার আছে যেমন : 'সাজ' মানে ছোটো নাচ, পায়তারা মানে লম্বা নাচ। তাছাড়া লাঠির বাড়িরও প্রকার আছে যেমন, ছোটো বাড়ি—লাঠির মাথায় মাথায় যে বাড়ি, 'হাব খোলা' মানে শুধু ডানে ডানে বাড়ি মারা। তাছাড়া এক লড়ি, দুই লড়ি, তিন লড়ি, চার লড়ি, ঘুর্ণি প্রভৃতি নাম আছে। লাঠি খেলার অন্যতম বিষয় হলো, 'ডাক'। এই 'ডাক' হচ্ছে লাঠি খেলার আকর্ষণীয় বিষয়। লাঠি খেলার ডাক হচ্ছে মূলত শক্তির উৎস। বিভিন্ন প্রকার 'ডাক' আছে যেমন : কাছ্ বান্ধার ডাক, কোমর বান্ধার ডাক, দেহ রক্ষার ডাক, আত্মরক্ষার ডাক, নদী পাড়ের ডাক, খোলা বান্ধার ডাক ইত্যাদি। এই ডাক দেয়ার আগে মন্ত্র পাঠ করা হয়। এই খেলায় অনেক তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই বিপদ মুক্ত হওয়ার মন্ত্র পাঠ করে দলের সর্দার মাঠ ত্যাগ করেন। যেমন—

জলবন্দি স্থলবন্দি মরুময়া
ডাকিনী যোগিনী বন্দি, বন্দি হবেন কায়া
৬৪ বায় কুওয়ায় দুই দিকে কাটিয়া
মুই চুইগু পুত নামলো খেলায় জ্ঞান ডাকিয়া

www.pathagar.com

মোর বান্দে যে করিবে ঘাও, তাইলা-জিহব্
করম বন্ধন সিদ্ধি গরুর পাও।
যদি আমার জ্ঞান নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জট ছিড়া
কালী চণ্ডীর পায় পড়ে।

লাঠি খেলার জন্য 'কালী সাধন' আছে। এই বিশেষ সাধন করলে শরীর গরম হয়, দেহে শক্তির সঞ্চার হয়। যেমন—

পড় মর্দো মইষের শুঁড়
চার পাও তার ষোল ক্ষুর।[৪]

৪. মোরগ লড়াই

এটি গ্রাম অঞ্চলের একটি অতি পরিচিত খেলা। অবসর সময়ে বাড়ির পাশের খোলা জায়গায় কিশোরেরা এই খেলা খেলে থাকে। বাম পা মাটিতে রেখে ডান পা পেছনে নিতম্বের দিকে এনে ডান হাত দিয়ে টেনে ধরা হয়। বাম হাত পেছন দিক দিয়ে ডান হাতের কনুইয়ে চেপে ধরা হয়। এভাবে সব খেলোয়াড় একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অন্য খেলোয়াড়ের নিকট গিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। যে অপরের ধাক্কায় পড়ে যায় সে খেলা থেকে আউট হয়ে যায়। এভাবে সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত যে খেলোয়াড় টিকে থাকে সে খেলায় বিজয়ী হয়।

৫. সাত পাতা/পাতা খোঁজা খেলা

এই খেলাটি কিশোর কিশোরীদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি খেলা। এ খেলায় একজন চোর/বুড়ি হয় এবং অপর খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট ঘর থাকে। যে চোর/বুড়ি হয় সে অন্যান্য খেলোয়াড়দের বিভিন্ন গাছের পাতা সংগ্রহ করতে বলে। খেলোয়াড়দের এক দমে গিয়ে গাছ থেকে পাতা নিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসতে হয়। ঘরে পৌছার আগেই কারো দম ফুরিয়ে গেলে চোর/বুড়ি তাকে ধাওয়া করে এবং তাকে ছুঁয়ে দিতে পারলে পরবর্তীতে সেই খেলোয়াড় চোর/বুড়ি হয় এবং নতুন করে খেলা শুরু হয়। চোর/বুড়ি সাতটি গাছের নাম বলে যেখান থেকে খেলোয়াড়দের পাতা সংগ্রহ করতে হয়। পাতা সংগ্রহের পর খেলোয়াড়রা নিজ নিজ ঘরের সীমানায় পাতাগুলো লুকিয়ে রাখে এবং চোর/বুড়িকে পাতা খুঁজতে বলা হয়। চোর/বুড়ি যদি কারো ঘরের সাতটি পাতাই খুঁজে বের করতে পারে তাহলে পরবর্তীতে সেই খেলোয়াড় চোর/বুড়ি হয়। এ খেলায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনির্দিষ্ট।

৬. কানামাছি

কানামাছি গ্রাম বাংলার অতি পরিচিত একটি খেলা। এ খেলায় যে চোর/বুড়ি হয় তার চোখ কাপড় দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেয়া হয়। এরপর অন্য খেলোয়াড়েরা চোর/বুড়ির চারিদিক থেকে ছড়া কেটে বলতে থাকে :

www.pathagar.com

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যারে পাবি তারে ছোঁ

চোর/বুড়ি অন্য খেলোয়াড়দের ধরবার চেষ্টা করে। কাউকে ধরতে পারলেই সেই খেলোয়াড় পরবর্তীতে চোর/বুড়ি হয়।

৭. বরফ পানি খেলা

এ খেলায় চোর/বুড়ি অন্য খেলোয়াড়দের ছুঁয়ে দেবার জন্য ধাওয়া করে। কোনো খেলোয়াড়কে ছুঁতে পারলেই চোর/বুড়ি বলে 'বরফ'। তখন যাকে ছুঁয়ে দেয়া হলো সে বরফ হয়ে যায় এবং তার স্থান থেকে নড়তে পারে না। এ সময় অন্য খেলোয়াড়েরা চেষ্টা করে বরফকে ছুঁয়ে দেবার। চোর/বুড়ি খেয়াল রাখে বরফকে যেন কেউ ছুঁয়ে দিতে না পারে। একই সাথে সে চেষ্টা করে অন্যদেরও বরফ করে দেবার। অন্য খেলোয়াড়েরা বরফকে ছুঁয়ে দিতে পারলেই বলে, 'পানি'। তখন বরফ হয়ে যাওয়া খেলোয়াড় মুক্তি পায় এবং নিজ জায়গা থেকে আবার নড়তে পারে। কোনো খেলোয়াড় একাধিকবার বরফ হলে সে পরবর্তীতে চোর/বুড়ি হয়। এ খেলায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়।[৫]

৮. দড়ি লাফানো

এ খেলা একগাছি দড়ি দিয়ে দু'জনে বা অনেকজন মিলে খেলা যায়। এ খেলা এক পায়ে, দুই পায়ে বা ঘোড়া লাফানো ইত্যাদি নিয়মে খেলা যায়। যে যতক্ষণ বা বেশিবার লাফাতে পারে সে জয়ী হয়। দড়ি লাফাতে গিয়ে যদি দড়িতে পা আটকে যায় তবে সে হেরে যাবে এবং পরবর্তী যে থাকে সে খেলতে থাকবে। এভাবে খেলা চলবে।

৯. কুমির কুমির

এটি ১০/১৫ জন খেলোয়াড় মিলে খেলে থাকে। এ খেলায় মাটি থেকে ১০-১৫ হাত দূরে একটি উঁচু স্থান থাকলে ভালো হয়। এক দল ছেলে-মেয়ে এক পাশে থেকে আগে থেকে দাগ টেনে রাখা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের জায়গা দখল করার চেষ্টা করে ও ছড়া কেটে বলে–কুমির তোর জলকে নেমেছি। এই বলার সাথে সাথেই কুমির রূপে আগে থেকেই ঠিক করে রাখা একজন ছুটে গিয়ে তাদের ধরার চেষ্টা করে। এ খেলায় ছেলে-মেয়েরা যখন জলে নামার মতো জলে নেমে গোসল করে ও মাছ ধরে, তখন বুড়ি কুমির হয়ে এসে ধরে।

১০. হাঁড়ি ভাঙা/কলস ভাঙা

মাটির হাঁড়ি থেকে ২০-৩০ গজ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এক জনের চোখ বেঁধে দিয়ে একবার ঘুরিয়ে দিয়ে সামনে ঠেলে দেয়া হয়। এরপর ঐ ব্যক্তি নিশানা করে লাঠি দিয়ে ঐ হাঁড়ি ভাঙতে পারলে জয়ী হবে আর না পারলে পরাজিত হবে। ছোটোদের পাশাপাশি বড়োরাও এ খেলা খেলে থাকে।

www.pathagar.com

১১. টুকি/লুকোচুরি

অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে এটি একটি জনপ্রিয় খেলা। এ খেলায় খেলোয়াড় থাকে ১০-১৫ জন। প্রথমে একজনকে চোর/বুড়ি করে অন্যেরা কোনো গোপন জায়গায় গিয়ে লুকায় এবং সেখান থেকে টুকি বা কু-উ বলে শব্দ করে। চোর/বুড়ি ঐ সংকেত ধরে তাদের খুঁজে বের করে।

১২. চোর চোর খেলা

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়ে জ্যোৎস্না রাতে ও বিকেল বেলা বিভিন্ন খেলা খেলে থাকে। এমনি একটি খেলার নাম হলো— চোর চোর খেলা। একজনে একটি বাঁশের খুঁটির কাছে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আর ৫/৭ জন তার চারদিকে ঘুরে। একজন আবার ছড়া বলে ও ঐ সকলকে ছুঁতে চায়। যাকে ছুঁতে পারে সে মরা হয় বা তার পয়েন্ট হারায়।[৬]

১৩. কুত কুত খেলা

এ খেলায় খেলোয়াড় থাকে ২-৪ জন। একটি পাতলা বা মাটির হাঁড়ির ভাঙা ছোটো একটি অংশ নিয়ে ৫টি ঘর আঁকা হয়। এরপর নির্দিষ্ট ঘরে খোলটি ফেলে একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঐ খোলাকে চারটি ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। এ খেলায় খেয়াল রাখতে হয় যাতে দাগে পা না পড়ে। এরপর আবার খোলা নির্দিষ্ট একটি ঘরে ফেলে ঐ ঘর থেকে এক পায়ে লাফ দিয়ে বাকি ঘরগুলোতে আসে। এ খেলায় দম থাকতে হয় কারণ ঘরগুলো পার হবার সময় কুত-কুত একদমে বলতে হয়। যে ঘর এক লাফে পার হতে পারবে সে ঐ ঘর পেয়ে যাবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

১৪. ইচিং-বিচিং

এ খেলায় ৮/১০ জন খেলোয়াড় থাকে। এ খেলায় সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়াবে। এরপর বুড়ি নির্বাচন করা হয়। বুড়ি প্রথমে এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে বসবে। খেলোয়াড়রা বুড়ির পা ডিঙিয়ে এ পাশ থেকে ও পাশে যাবে। সবার যাওয়া শেষ হলে পায়ের উপর হাতের চাটি আড় করে রাখলে এর উপর দিয়ে খেলোয়াড়রা ডিঙিয়ে যাবে। এরপর বুড়ি পা ফাঁক করে ছড়িয়ে বসবে, এখন একজন একজন করে সেগুলো ডিঙিয়ে এ পাশ থেকে ওপাশে যাবে ও বুড়ির পায়ের ভিতরে এক পা এবং বাইরে এক পা দিয়ে লাফাতে থাকবে এবং ছড়া বলবে–

ইচিং বিচিং চিচিং ছা
প্রজাপতি উড়ে যা
এক ফোঁটা মধু দিয়ে যা।

www.pathagar.com

১৫. ডাং-গুলি

ডাং-গুলি খেলার জায়গায় হালকা মোটা একটি বাঁশের কাঠি মাটিতে লম্বা গর্ত করে তাতে ছোটো একটি কঞ্চি আড়াআড়ি ভাবে শোয়ানো থাকে। তারপর হাতের লাঠি দিয়ে গর্তের লাঠিকে দূরে মেরে পাঠাতে হবে। তারপর লাঠি দিয়ে ঐ কাঠি পর্যন্ত স্থান মাপতে মাপতে যাবে গর্ত পর্যন্ত।

১৬. উপেনটি বাইস্কোপ

দুজন হাত উপরের দিকে তুলে হাতে হাত লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর অন্যান্য খেলোয়াড়েরা হাতের ভিতর দিয়ে ঘরের বাইরে আসবে আবার ভিতরে প্রবেশ করবে। এই সময় ছড়া বলবে–

উপেনটি বাইস্কোপ
টান টানা টাইসকপ
চুল টানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
রাজবাড়িতে যাইতে
পান সুপারি খাইতে
পানের আগায় মরিচ বাটা
ইসপিরিং এর চাবি আটা
আমার নাম মণিমালা
গলায় দিলাম মুক্তার মালা।

শেষের শব্দটি বলার সময় যে হাতের মধ্যে থাকবে তাকে ধরে থাকবে এবং সে-ই খেলার নিয়ম অনুযায়ী বুড়ি হবে বা মার হবে।

১৭. ছি-বুড়ি

এ খেলায় খেলোয়াড় থাকে ৮-১৫ জন এবং দুটি দল থাকে। প্রথমে ছোটো বৃত্তাকারে একটি ঘর দাগানো হয়। তারপর ঐ ঘরে একপা রেখে ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এর সাথে সাথে বিপক্ষে যারা থাকে তারাও ঘুরে আর প্রতিপক্ষ সুযোগ পেলেই বুড়িকে বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। আর ধরা পড়লে যে ধরতে পারবে সে সেই জায়গা থেকে তিন লাফ দিয়ে ঐ বৃত্তাকারে যেতে পারলে তারা জয়ী হবে।[৭]

১৮. ঘুড়ি উড়ানো

চিরায়ত বাংলার একটি জনপ্রিয় খেলা হলো ঘুড়ি উড়ানো। কেবল মানিকগঞ্জ জেলায় নয় সারা বাংলাদেশেই কমবেশি ঘুড়ি উড়ানো জনপ্রিয়। ঘুড়ি মূলত গ্রীষ্মকালে পড়ন্ত বিকেলে রাখালেরা বা স্কুলফেরত ছেলেমেয়েরা খেলে থাকে। এছাড়া ঘুড়ি উড়ানোর যখন প্রতিযোগিতা শুরু হয় তখন গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়ি তৈরির

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। বিভিন্ন ধরনের ঘুড়ি রয়েছে, যেমন– মানুষ ঘুড়ি, মাছ ঘুড়ি, সাপ ঘুড়ি, চিল ঘুড়ি, টং ঘুড়ি, পাতলা ঘুড়ি, মটর ঘুড়ি, প্লেন ঘুড়ি, ঢোল ঘুড়ি, বাড়ি ঘুড়ি, তারা ঘুড়ি ইত্যাদি। ঘুড়ি তৈরিতে বিভিন্ন রঙের কাগজ ব্যবহার করা হয়। বাবলার বা তেঁতুল বিচির আঠা বা ময়দা দিয়ে জোড়া দেয়া হয়। এছাড়া সুতা মাঞ্জা দেবার জন্য অ্যারারুট, মাড়, সাবু ইত্যাদি দিয়ে ধারালো করা হয়। এতে ঘুড়ি কাটাকাটি করতে সহজ হয়।[৮]

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৭৩ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৭.০৯.২০০৪

২. তাহেজ ফকির (লাঠি খেলার সর্দার), বয়স : ৬০ বৎসর, গ্রাম : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৫.১২.২০১২ইং, স্থান : বিজয় মেলার মাঠ

৩. আফছার আলী মেম্বার, বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : মত্তা, উপজেলা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৪. ২ নং দ্রষ্টব্য

৫. বিলকিস বানু, পিতা : মো. একরাম উল্লাহ, বয়স : ১২ বৎসর, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি, পেশা: শিক্ষার্থী, গ্রাম : গঙ্গাধরপট্টি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২২.০১.২০১৩; লিটন, বয়স : ১৮ বৎসর, শিক্ষা : এইচএসসি, পেশা : শিক্ষার্থী, গ্রাম : গঙ্গাধরপট্টি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৬. সুরমা, পিতা : আরিফ হোসেন, বয়স : ১৫ বৎসর, শিক্ষা : একাদশ শ্রেণি, পেশা : শিক্ষার্থী, গ্রাম : বেউথা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৭. নার্গিস আক্তার, পিতা : সূরুজ আলী, বয়স : ১৫ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : শিক্ষার্থী, গ্রাম : বান্দুটিয়া, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৮.০১.২০১৪

৮. আব্বাস, বয়স : ২২ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : নেই, গ্রাম : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৪.০৩.২০১৪, স্থান : বেউথা বাজার

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

ভূ-প্রকৃতি আর জলবায়ুর উপর নির্ভর করে একটি অঞ্চলের মানুষের জীবিকা ও জীবনধারা। মানিকগঞ্জের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন ছিল প্রধানত কৃষি সহায়ক। তাই কৃষিই ছিল শতকরা নব্বই জনের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অবলম্বন। কৃষি এবং কৃষিজাত উপাদান-উপকরণের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল নানা ধরনের পেশা। কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর, পাটনী, দর্জি সহ নানা পেশার অস্তিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এ অঞ্চলে লোকশিল্পের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীর সংখ্যা অনেক বেশি থাকলেও বর্তমানে শিক্ষা ও নগরায়নের প্রসারে এবং জনগণ শহরমুখী হয়ে যাবার কারণে লোকশিল্পে পেশাজীবী লোক তুলনামূলকভাবে অনেক লোপ পেয়েছে। এছাড়াও কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও লোকশিল্পের মূল্যের নিম্নদরের কারণে অনেকেই তাদের পেশা ত্যাগ করেছেন।

১. কামার

মানিকগঞ্জে অনেক স্থানেই পূর্বে কামার পাড়া দেখা যেত। বর্তমানে কামার পাড়া কমে এসেছে। পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়ে অনেকেই পূর্বপুরুষদের পেশা থেকে সরে এসেছেন। তবে হাটে-বাজারে আজো কামারদের কামারশালার হাতুড়ি পেটার শব্দ শোনা যায়। কামারের সংখ্যা হ্রাস পেলেও কামারদের তৈরি সরঞ্জামাদির চাহিদা আজো অটুট রয়েছে, যেমন : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান কাটার সময় ধারালো কাচি লাগে, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসে খেজুর গাছ কাটার জন্য ছেন-এর প্রয়োজন হয়, কোরবানি ঈদের সময় ছেন, চাপাতি, চাকু, ছুরি বেশি প্রয়োজন হয়, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মাটি কাটার জন্য কোদাল-এর কাজ বেশি হয়।

কামারের যন্ত্রপাতি

১. ভাতি হাপর : ভাতি দিয়ে লোহা পোড়ানোর জন্য বাতাস দেওয়া হয়। জ্বালানি হিসেবে বর্তমানে কাঠকয়লা ব্যবহৃত হয়। ভাতি চামড়া, কাঠ, বেত এবং লোহা দিয়ে বানানো হয়। বর্তমানে কোনো কোনো কারখানায় প্লাস্টিক ও পলিথিন কাগজ ব্যবহার করে ভাতি বানানো হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যেও ভাতির কাজ করা হয়।

২. নিয়াই : নিয়াই পাকা লোহার তৈরি। বিশেষ করে রেললাইনের লোহার ভাঙা পাত দিয়েও নিয়াই তৈরি হয়। কর্মকার গরম লোহা নিয়াইর ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেন।

৩. হাতুড়ি : লোহা পিটানোর কাজে হাতুড়ি ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

৪. সাঁড়াশি/চিমটা : সাঁড়াশি দিয়ে গরম বা উত্তপ্ত লোহা সহজেই ধরা যায়।
৫. আঁকড়া : আগুন নাড়ানোর যন্ত্র। ভাতির বাতাসে কয়লা পোড়ানোর সময় আঁকড়ার সাহায্যে কয়লা নাড়ানো হয়।
৬. লোহা কাটার যন্ত্র/ছেনি : ছেনির সাহায্যে বড়ো লোহাকে ছোটো করে কাটা যায়।
৭. রেত : লোহার ময়লা পরিষ্কার করার জন্য রেত ব্যবহার করা হয়।
৮. হারপাট : দা, কাচি ইত্যাদি ধার দেওয়ার জন্য কাঠের তৈরি বস্তু।

বানানোর প্রক্রিয়া

প্রথমে হাপর বা ভাতি দিয়ে কয়লা পোড়ানো হয়। অনেকক্ষণ পুড়িয়ে লোহা লাল করতে হয়। এরপর নিয়াই-এর উপর রেখে পোড়ানো লোহা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি—দা, কুড়াল, ছেনি, ছুরির আকৃতি দেওয়া হয়।

বালিরটেক হাটের বলাই কর্মকার

২৮.১১.২০১২ তারিখ শকিফুর রহমান চৌধুরী (প্রধান সমন্বয়কারী) ও সাইদুর রহমান বয়াতি (তথ্য সংগ্রাহক) বালিরটেক হাটে বলাই কর্মকারের লোহার কামঘর কারখানায় যান। বলাই কর্মকার ২৫ বছর ধরে লোহার কাজ অর্থাৎ দা, কাচি, খন্তা, কোদাল, কুড়াল, ছেনি, ছেন ইত্যাদি বানানোর কাজ করে আসছেন। তিনি তাঁর মামা অতুল কর্মকারের নিকট কাজ শিখেছেন। তিনি নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। সংসারে অভাব অনটনের জন্য লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেন নি। জীবিকা অর্জনের জন্য এই পেশা বেছে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, বলাই কর্মকারের আসল বাড়ি ছিল হরিরামপুর। পদ্মার ভাঙনে বালিরটেক চলে আসেন। এই ব্যবসা দিয়েই তার সংসার চলে।

বলাই কর্মকার বলেন, "এটি আমাদের জাতিগত ব্যবসা। আমার আব্বা নিবারণ কর্মকার এই কাজ করতেন। ছেলেরা এই কাজ করে না। আমার এক ছেলে বিদেশে থাকে। আরেক ছেলে দেশে লেখাপড়া করে। একটি মেয়ে এখনো ছোটো। এই কাজ করে প্রতিমাসে ত্রিশ হাজার টাকা আয় হয়। জ্বালানির জন্য ইটখোলার বাতিল কয়লা বা পরিত্যক্ত কয়লা এক বস্তা ৩০০/- টাকা দিয়ে ক্রয় করা হয়। প্রতিদিন চারটি দাও বানাই। উন্নতমানের দাও এবং বটি বানানোর জন্য লোহা ১৫০/- টাকা কেজি এবং নিম্নমানের জন্য ৭০/- টাকা দিয়ে ক্রয় করা হয়। আমার সাহায্যকারী হচ্ছে বিপ্লব কর্মকার। তাকে বছরে ২৪,০০০/- টাকা, অর্থাৎ প্রতিমাসে ২,০০০/- টাকা দিতে হয়। তার সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করা হয়। কাজটি অত্যন্ত পরিশ্রমের।"

বলাই কর্মকার একজন সংগীত শিল্পীও বটে। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, "আমি হারমোনিয়াম ও খোল বাজাতে জানি। অনেকদিন যাত্রাগানে বিবেকের চরিত্রে অভিনয় করেছি। পঞ্চম শ্রেণিতে যখন পড়ি তখন কৃষ্ণলীলার যাত্রা করেছি। ১০/১২ বছর কৃষ্ণলীলার যাত্রায় গান গেয়েছি। তারপর নাটক করতাম। কোনো কোনো সময় এখনো বিবেকের অভিনয় করি। ২০ বছর আগে সাইদুর রহমান বয়াতির সঙ্গে পরিচয় হয়।

www.pathagar.com

তাঁর সঙ্গে সিলেটে কবি গান করতে গেছি। বিশ্ব বিদ্যালয়ে কবিগান করেছি, ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কবিগান গেয়েছি।"[১]

যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করছেন বলাই কর্মকার

২. কারুশিল্পী

মানিকগঞ্জ জেলার সব থানাতেই কারুশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীরা বংশানুক্রমিকভাবে কাজ করে আসছেন। এ শিল্পের মূল উপকরণ হলো বাঁশ। এই বাঁশ কারিগরেরা মূলত গ্রাম থেকেই বেশি কেনেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তারা ১০০-১২০ টাকা দরে বাঁশ কিনে আনেন। এরপর ঐ বাঁশ ডুমা ডুমা করে কেটে দা দিয়ে চেঁছে চেঁছে রোদে শুকাতে দেয়া হয়। রোদে শুকানোর পর সাইজ অনুযায়ী কেটে কেটে কারিগরেরা মুরগি রাখা টোপ, জালি, চালা, ঝুড়ি, করপা, চালুনি, কুলা, ডালি, ছোটো ডালা ইত্যাদি তৈরি করে। একজন কারিগর প্রতিদিন ১৫-১৬টা ঝুড়ি তৈরি করতে পারে। এসব ঝুড়ি ৩০-৩৫ টাকায় বিক্রি হয়। এসব বাঁশের জিনিস হাটবারে বা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিক্রি করা হয়। এছাড়া মানিকগঞ্জের রথের মেলা, বিজয় মেলা সহ অন্যান্য মেলায়ও বাঁশের তৈরি এসব জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। এ কাজে নারীরাও পুরুষদের সাহায্য করে থাকে। বাঁশের এসব তৈজসপত্র তৈরি করতে দড়ি ও গুনা দরকার যা দিয়ে ঐসব তৈজসপত্র শক্ত করে বাঁধা যায়।

তালেবপুর গ্রামের অন্ধ কারুশিল্পী হাফেজ শফিউদ্দিন

০৮.০৬.২০১৩ তারিখ প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং তথ্য সংগ্রাহক সাইদুর রহমান বয়াতি সিংগাইর থানার তালেবপুর গ্রামে অন্ধশিল্পী হাফেজ

www.pathagar.com

শফিউদ্দিনের বাঁশের ডালা, পাখা, চালুন, মাছ ধরার পলো তৈরির প্রক্রিয়া দেখার জন্য তাঁর বাড়িতে যান। শিল্পীর বয়স যখন ৮-৯ বছর তখন তিনি গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন এবং তাঁর দুটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এই কাজটি বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি জানান, "আমার কাজ করার শখ, তাই এগুলি করার চিন্তা করি। মাঠে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এই চিন্তা করি। মানুষে হাট বাজার থেকে বাঁশের তৈরি জিনিস আনে। আমি এগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করি। মনে মনে নকল করার চেষ্টা করি এবং এসব জিনিস আমি নিজে তৈরি করার চিন্তা করি। হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় ঐ জিনিসের নকশা আমার মানসজগতে ভেসে উঠে। হাতের স্পর্শ দ্বারা আমি সব কিছু বুঝতে পারি। নির্দিষ্ট ডিজাইনকে ফুটিয়ে তুলি হাতের স্পর্শে।"

বানানোর প্রক্রিয়া

হাফেজ শফিউদ্দিন-এর বাড়িতে নিজস্ব মাকলা বাঁশের ঝাড় আছে। উল্লেখ্য, মাকলা বাঁশ দিয়ে ডালা, পাখা, পলো, চালুন ইত্যাদি তৈরি করা হয়। অন্য ব্যক্তি ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে দেয়। এরপর তিনি করাত দিয়ে বাঁশ টুকরা টুকরা করে কাটেন এবং দা দিয়ে ফেড়ে বৈতি তৈরি করেন। ডালা বানাতে হলে প্রথমে ডালার 'জো' উঠাতে হয়। এটি তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করে করেন। একটি ছোটো ডালা বানাতে একদিন লাগে এবং চাক বাঁধতে একদিন লাগে। বাঁশের দুটি শলা দিয়ে ডালার মুখ বাঁধতে হয়। শলাকে চেঁছে মসৃণ করে নিতে হয়। সুইয়ের সঙ্গে সুতা গেঁথে ডালা ও পাখার চাক বাঁধেন। লোকজন তাঁর বাড়িতে এসে অর্ডার দেন। ছোটো একটি পাখার মূল্য একশত টাকা, চালনের মূল্য আশি টাকা, পলো দুশ থেকে তিনশত টাকা। একটি পাখা তৈরি করতে তাঁর চার পাঁচদিন সময় লাগে। পাখার বেতি চেঁছে সূক্ষ্ম ও মসৃণ করতে হয়। তাই সময় লাগে বেশি। কারো সাহায্য না নিয়ে তিনি এসব কাজ করেন। যারা দেখে দেখে বাঁশের জিনিস বানানো শিখেন তাদের চেয়ে তিনি অনেক দক্ষতা, নিপুণতার সঙ্গে, নির্ভুলভাবে সুন্দর চালুন, পাখা তৈরি করেন। বিশেষ করে তাঁর তৈরি হাত পাখা, চালুন ও ডালা উল্লেখযোগ্য। এগুলো দেখতে আকর্ষণীয় ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় বাহী।

উল্লেখ্য, অন্ধ হওয়ার পর তিনি মাইজদির অনন্তপুর গ্রামের মৌলবি সৈয়দ আহমদের নিকট বিশ পারা কোরান মুখস্থ করেন। তিনি তালেবপুর মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাই তিনি হাফেজ নামেও পরিচিত। তিনি অঙ্কের হিসাবও জানেন। টুকটাক ইংরেজি বলতে পারেন। রেডিওতে সংবাদ শুনে শুনে অনেক কিছু শিখেছেন। শিল্পকর্ম কিভাবে শিখেছেন জানতে চাইলে তিনি ইংরেজিতে বলেন "God gifted"।[২]

৩. ছাই থেকে সোনা তৈরির শিল্প

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

www.pathagar.com

কবির এই কবিতাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার চারিগ্রাম, দাশেরহাটি গ্রাম ও গোবিন্দল ইউনিয়নের কয়েকশ পরিবার। বংশ পরম্পরায় চলে আসা এই শিল্পে লোকপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এই গ্রামের মানুষ যে শ্রম ও শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন তা বিস্ময়কর। স্বর্ণের অলংকার গড়ার সময় স্বর্ণের গুড়া ধূলাবালির সঙ্গে মিশে যায়। সোনা মিশ্রিত এই ধূলাবালি ও ছাই থেকে সোনা বের করে আনার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল। চারিগ্রাম ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আফতাব উদ্দিন আহমেদ বলেন, "ব্রিটিশ আমল থেকে এই এলাকায় ছাই থেকে সোনা বানানোর কাজটি করা হচ্ছে। স্বর্ণের দোকানের পরিত্যক্ত ছাই থেকে খুব পরিশ্রম করে কারিগররা সোনা বের করছেন। দেশের অর্থনীতিতে কোটি কোটি টাকার সাপোর্ট দিচ্ছেন।"

ছাই থেকে সোনা শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি আউয়াল হোসেন বলেন, "পূর্বপুরুষদের দেখে আমরা এ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্বর্ণের দোকান থেকে ছাই কিনে এনে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ছাই থেকে সোনা, রূপা, তামা, সিসা, বোঞ্জ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আসছি। এলাকার প্রায় ৯৫ ভাগ লোক এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। ৪০০ বছর আগে থেকে আমাদের এ অঞ্চলে এ শিল্প চলে আসছে।"

ছাই সংগ্রহ

পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, যশোর, ঝিনাইদহ ও খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জুয়েলারি দোকান থেকে waste বা ছাই ক্রয় করে নিয়ে আসেন ব্যবসায়ীরা। তারপর শুরু হয় ছাই থেকে সোনা, রূপা, তামা জাতীয় মূল্যবান ধাতু তৈরির প্রক্রিয়া। প্রায় দেড়শ বছর ধরে সোনা তৈরির কঠিন এই কাজটি করে আসছেন স্থানীয় লোকজন।

দাশেরহাটি গ্রামের স্বর্ণ আহরণকারী আবদুল হালিম মোল্লা বলেন, "স্বর্ণকারের দোকানে পাওয়া যায় এই ছাই। অলংকার গড়ার সময় স্বর্ণের গুড়া ধূলাবালির সাথে মিশে যায়। প্রতিদিন দোকান ঝাড়ু দেয়ার সময় এই ধূলাবালু একটি স্থানে জমিয়ে রাখা হয়। বছরে একবার কিংবা দুইবার এই ধূলা বিক্রি করা হয়। সোনা মিশ্রিত এই ধূলাবালি সব চাইতে বেশি পাওয়া যায় ঢাকার তাঁতি বাজারে। সেখানেই স্বর্ণকারের সংখ্যা বেশি। সিংগাইর থানার দাশেরহাটি গ্রামের সোনা আহরণকারীরাই দেশের পঁচানব্বই শতাংশ ধূলাবালির ক্রেতা। এক একটি দোকানের ধূলা পাঁচ হাজার থেকে দু'লাখ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয় বলে জানা যায়।" সাক্ষাতকার গ্রহণের সময় হালিম মোল্লা এক ভরি এক আনা ওজনের এক টুকরো স্বর্ণ বের করে দেখান এবং বলেন এই স্বর্ণখণ্ডটি বের হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করা ধূলা বা ছাই থেকে।

সোনা তৈরির দক্ষ কারিগর মোহাম্মদ শহীদ বলেন, "আমরা ঢাকাসহ দেশের সব সোনার দোকান থেকে পরিত্যক্ত ছাইমাটি কিনে আনি। দোকানের আকারভেদে এই মাটি আমরা পঁচিশ টাকা থেকে শুরু করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও কিনে থাকি। এই ছাইমাটি থেকে এক আনা থেকে শুরু করে ১০ ভরি পর্যন্ত সোনা পাওয়া যায়।"

www.pathagar.com

ছাই বা ধূলা থেকে সোনা বের করার প্রক্রিয়া

ছাই থেকে সোনা বের করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য। কিনে আনা ধূলা প্রথমে কাঠের বড়ো গামলায় ধুতে হয়। সোনা মিশ্রিত ধূলা নিচে পড়ে থাকে এবং ভাসমান ময়লা ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ধূলা রোদে শুকানো হয়। শুকানোর পর ঐ ধূলা ঢেঁকিতে ফেলে মিহি করে পাউডার করা হয়। এরপর এই মিহি পাউডার পানিতে ভিজিয়ে পাতলা কাপড়ে বা সূক্ষ্ম একটি চালনিতে ছাঁকতে হয়। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মিহি পাউডারের ওপর থেকে ধূলা সরিয়ে নেওয়া হয়। এক পর্যায়ে নিচে পড়ে থাকে সোনা মিশানো কয়েক মুঠো পাউডার। খালি চোখে এই সোনা দেখা যায় না। এই পাউডার রোদে শুকিয়ে একটি আলাদা পাত্রে এর সঙ্গে নাইট্রিক এসিডসহ কিছু কেমিক্যাল মেশানো হয়। এরপর এই পাউডার মাটির গর্তে চুলার মধ্যে রেখে হাওয়া দেওয়ার মেশিন দিয়ে তাপ দেওয়া হয়। ঠিক যেভাবে কামার ভাতির সাহায্যে লোহা পোড়ান। প্রচণ্ড তাপে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় সব পদার্থ ছাই হয়ে উড়ে যায়। প্রত্যাশিত সোনা নিচে পড়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে নেওয়ার জন্য প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে তিনদিন কাজ করতে হয়।

অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য ছাঁকন পদ্ধতির মাধ্যমে ছাই থেকে সোনা ও রূপা তৈরি করে বিক্রি করা হয় স্বর্ণেরহাট খ্যাত চারিগ্রাম বাজারে। গোবিন্দল ও চারিগ্রাম এলাকার ছাই থেকে সোনা শিল্পকে কেন্দ্র করে চারিগ্রাম স্বর্ণেরহাটে গড়ে ওঠেছে ৩০-৪০টি জুয়েলারি দোকান। এখানে নিয়মিত সোনার হাট বসে।

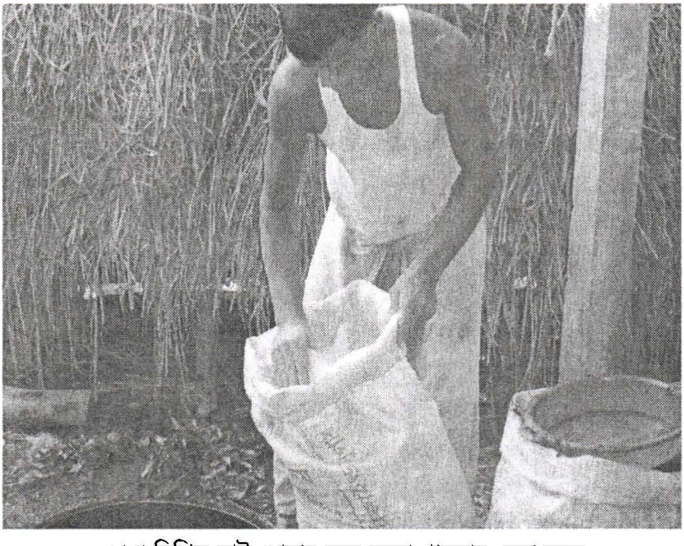

সোনা মিশ্রিত ছাই ধোয়ার জন্য বড়ো গামলায় নেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

বড়ো গামলায় ছাই ধোয়া হচ্ছে

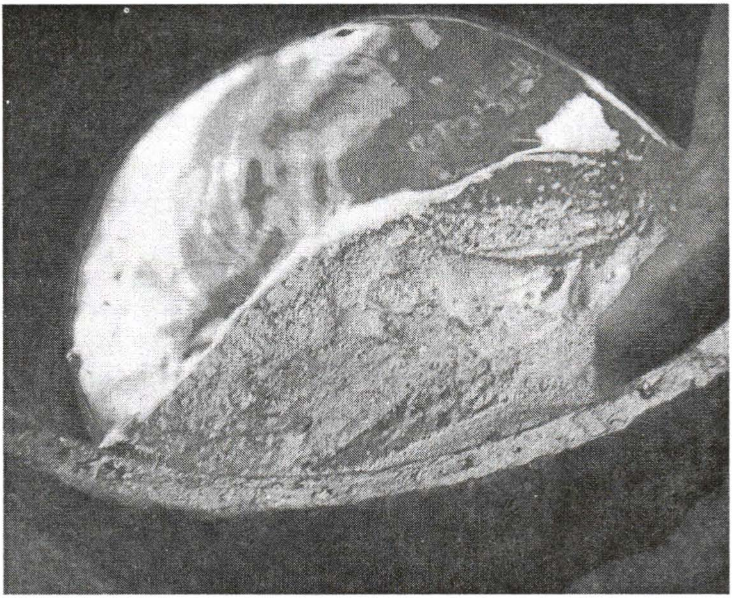

ভাসমান ময়লা ফেলে দেবার পর নিচে জমে থাকা সোনা মিশ্রিত ছাই

www.pathagar.com

সোনা মিশ্রিত পাউডার চুলার মধ্যে তাপ দেওয়া হচ্ছে

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এই ব্যবসা করে এলাকার অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। দাশেরহাটি গ্রামের সাহেদা বলেন, "আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে আমার স্বামী জাগন আলী মারা যায়। পাঁচ মেয়ে এক ছেলে নিয়ে মহা বিপদে পড়ি। উপায়ান্তর না দেখে স্বামীর রেখে যাওয়া সামান্য অর্থ আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্বামীর ব্যবসাতে নেমে পড়ি। ব্যবসার টাকা দিয়ে পাঁচ মেয়েকে ভালো পরিবারে বিয়ে দিয়েছি। একমাত্র ছেলে মিলন এবং মেয়ের স্বামীদের বিদেশে পাঠিয়েছি লাভের টাকা দিয়ে।" দাশেরহাটি গ্রামের বদরউদ্দিন (৫০) বলেন, "দাদার আমল থেকে সোনা তৈরির কাজে নিয়োজিত আছি। প্রথম পর্যায়ে তেমন লাভ হয়নি। লোকসানও হয়েছে কয়েকবার। এখন ভালোই লাভ হচ্ছে। সোনার ব্যবসা করে সুখেই আছি।" চারিগ্রাম মালিপাড়া গ্রামের মোবারক হোসেন বলেন, "আমরা ধূলাবালি থেকে সোনা বের করছি। দেশের অর্থনীতিতে কিছুটা হলেও সম্পদ যোগ করছি। সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেলে এই শিল্পের উন্নতি হবে।"

৪. শাঁখারি

মানিকগঞ্জ সদর থানার বগজুরি (সোনাকান্দন) গ্রামে বর্তমানে ২০/২২ ঘর শাঁখার কাজ করেন। যারা এই পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে শাঁখারি বলা হয়। এই গ্রামের একজন শাঁখারি গনেশচন্দ্র সেন বলেন, "এটা আমাদের জাতিগত ব্যবসা। আমরা আমাদের

www.pathagar.com

ছেলেমেয়েদের আমাদের শাঁখারি গোত্রের সঙ্গে বিয়ে দেই। আমার চার মেয়ে ও এক ছেলে। এই কাজ করতে গিয়ে যখন পয়সা আসে তখন আগ্রহ বাড়ে। তিন মেয়ে বিয়ে দিছি শাঁখারি বাজারে। কিন্তু জাতিগত ব্যবসা করে না কেউ। নতুন প্রজন্ম এই কাজে আসছে না। শাঁখারি সমাজ জাতিগত পেশায় নেই, অন্য ব্যবসায় চলে গেছে। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় নতুন প্রজন্ম এই কাজে আসছে না। আমার জমিজমা নেই, পুঁজি নেই। এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে কাজ করি। গ্রামে বিক্রি করি। মেলায় বিক্রি করি। একজোড়া শাঁখার খুচরা মূল্য ছয়শত পঞ্চাশ টাকা থেকে আটশত টাকা। বর্তমানে আমাদের পাড়ায় সাত-আট ঘর শাঁখারি আছে। অনেকে ভারতে চলে গেছে।"[৩]

৫. প্রতিমা নির্মাণ শিল্পী

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সর্বত্রই পূজাপার্বণ মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে পূজাণ্ডপগুলো ঝলমলে রঙে সেজে উঠে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন পূজায় প্রতিমার ব্যবহার হয়ে থাকে। আর এই প্রতিমা তৈরি ও সাজানোর কাজেও নিয়জিত থাকেন বিশেষজ্ঞ কারিগর। মানিকগঞ্জ জেলায়ও মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন থানায় বিপুল সংখ্যক মণ্ডপ থাকায় পূজার সময় মূর্তি নির্মাতাদের কাজের শেষ নেই। পূজার কয়েকদিন আগে থেকেই তারা মণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বংশপরম্পরায় এই পেশার সাথে জড়িত। ১লা ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার তিল্লি গ্রামে কাত্যায়নী পূজার মূর্তি নির্মাতা পাষাণ জানান প্রতিমা বানানোর জন্য তিনি এবার চার হাজার টাকা সম্মানী নিয়েছেন। পূজার সময় তারা একাধিক মণ্ডপে প্রতিমা তৈরির জন্য চুক্তি করে থাকেন। মণ্ডপ ছাড়াও পূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তিগণ ও ব্যবসায়ীরা তাদের বাড়িতে অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সাজাবার জন্য প্রতিমা তৈরি করিয়ে থাকেন। অনেক মূর্তি নির্মাতা মূর্তি নির্মাণের সাথে জড়িত থাকলেও এ পেশা মৌসুম ভিত্তিক হবার কারণে পাশাপাশি কৃষিকাজের মত অন্যান্য কাজও তারা করে থাকেন।

উপকরণ

মূর্তি নির্মাণের প্রধান উপকরণ খড়, দড়ি, কাদামাটি, রং প্রভৃতি।

নির্মাণ প্রক্রিয়া

প্রতিমা তৈরির জন্য প্রথমে খড় দিয়ে জোট তৈরি করা হয়। একে জোট পাকানো বলে। জোট পাকিয়ে প্রতিমার মূল আকৃতি বা কাঠামো তৈরি করা হয়। এজন্য খড়কে আটি করে দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধতে হয়। মূলত প্রতিমার মস্তক ছাড়া সম্পূর্ণ দেহ কাঠামো এই প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়। এরপর জোটের উপর কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে প্রতিমার আসল অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়। মাটি শুকিয়ে গেলে রং করা হয়ে থাকে। প্রতিমার মস্তক আলাদাভাবে তৈরি করে তা যথাস্থানে বসিয়ে দেয়া হয়। প্রতিমা তৈরির পর শাড়ি, কাপড়, কৃত্তিম গহনা ও নানা উপকরণ দিয়ে তাকে সুসজ্জিত করা হয়।

www.pathagar.com

জোট পাকানো অবস্থায় প্রতিমার কাঠামো (আয়নাপুর, তিল্লি)

প্রতিমার মস্তক আলাদাভাবে তৈরি করে রাখা হয়েছে

www.pathagar.com

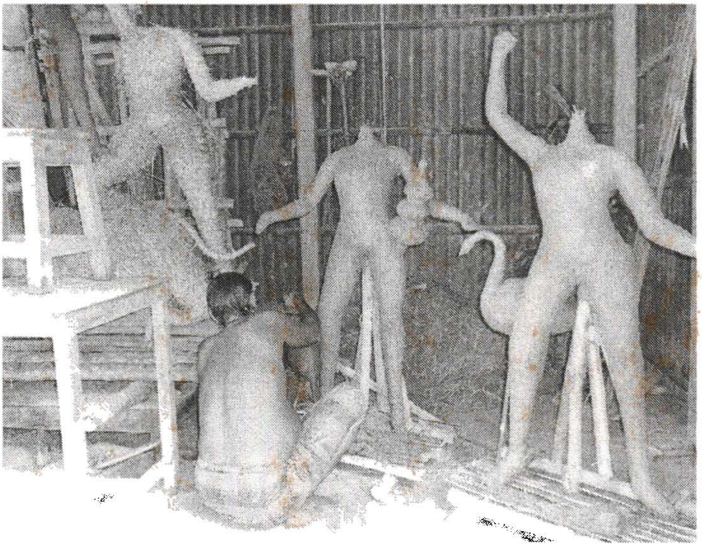

মাটির প্রলেপ দিয়ে প্রতিমার অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে

প্রতিমা রং করা হচ্ছে

www.pathagar.com

সুসজ্জিত প্রতিমা ও পূজা মণ্ডপ

তথ্যনির্দেশ

১. বলাই কর্মকার, শিক্ষা : নবম শ্রেণি, পেশা : কামার, গ্রাম : বালিরটেক, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৮.১১.২০১২, স্থান : বালিরটেক হাট

২. হাফেজ শফিউদ্দিন, পেশা : কারুশিল্পী, গ্রাম : তালেবপুর, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০৮.০৬.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

৩. গনেশচন্দ্র সেন, পিতা : নিমাই চন্দ্র সেন, শিক্ষা : আই. এ পাস, পেশা : শাঁখারি, গ্রাম : বগজুরি (সোনাকান্দন), থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ৩০.০১.২০১৩ ও ২৯.০৫.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্র-মন্ত্র

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা লোকচিকিৎসা এবং তন্ত্র-মন্ত্রের শরণাপন্ন হন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলে লোকচিকিৎসার প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। তবু এই চিকিৎসা বর্তমানে চালু আছে। মানিকগঞ্জ জেলার লোকসমাজেও প্রচলিত রয়েছে নানা রকম লোকচিকিৎসা, কবিরাজি চিকিৎসা এবং তন্ত্র-মন্ত্র।

ক. লোকচিকিৎসা

বিভিন্ন রকম গাছ গাছালি, লতা পাতা ও শিকড়ের ভেষজ গুণ থাকায় স্থানীয় অনেকেই নিজেদের বাড়িতে ঐসব গাছ লাগিয়ে থাকে। সাধারণভাবে মানিকগঞ্জের লোক সমাজে যে সব লোকচিকিৎসা প্রচলিত তা নিম্নরূপ :

১. সকালে লবণ দিয়ে আদা খেলে অরুচি থাকে না।

২. চুন ও চিনি একত্র করে প্রলেপ দিলে ব্যথাস্থানের ব্যথা দূর হয়।

৩. ছোটো এলাচ, লবঙ্গ, আদা, করপুর, তুলসী পাতা এসব দিয়ে পান খেলে সর্দি ভালো হয়।

৪. পেস্তাদানা ও তালমিসরি বেটে জলে মিশিয়ে চেটে চেটে খেলে শুষ্ক কাশি বা বুকে জমা কফ উঠে আসে।

৫. চিনির সাথে এলাচ দানা খেলে হিককা থাকে না।

৬. নিম পাতা বেটে খেলে আর হলুদ গায়ে মাখলে খোস-পাচড়া থাকে না।

৭. নিম গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের রোগ হয় না।

৮. বেলের সরবত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য ভালো হয়।

এছাড়াও অসুখ বিসুখে লোকচিকিৎসক বা কবিরাজের শরণাপন্নও হন অনেকে। মানিকগঞ্জের লোকচিকিৎসকদের কাছে প্রায় সব ধরনের রোগের রোগীই আসেন। সাপেকাটা রোগী, গ্যাসটিকের রোগী, বাও বাতাস লাগা রোগী, পেটে ব্যথা, চোখে ব্যথা, প্যারালাইসিস, জণ্ডিস রোগের রোগীও চিকিৎসার জন্য আসে। কবিরাজরা তাদের দোয়া, তাবিজ ও ঔষধপত্র দেন। গাছগাছালির ফল, মূল, ছালপাতা বানিয়ার দোকান থেকে কিনে ফকিরান্তি চিকিৎসা করেন। শামুক, মেটে সিঁন্দুর, গাছগাছালির শিকড়, লতাপাতা রোদে শুকিয়ে বা ঢেঁকিতে গুড়ো করে পাউডার বানিয়ে পুরিয়া তৈরি করে আবার কখনও বা তেলের মত মাথার তালুতে লাগিয়ে দেন।

বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে নল ভইরা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। নল ভইরা হচ্ছে এক প্রকার গাছ। তার একটা পাইক কেটে এনে অন্য একটা গাছের ঔষধ পাইকের মধ্যে ঢুকিয়ে মোম দিয়ে আটকিয়ে সুতা দিয়ে রোগীর গলায় বেঁধে দিতে হয়।

www.pathagar.com

বাচ্চার গলায় এরকম পাইক বেঁধে দিলে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পর্যন্ত মা বাবা ঐ বাচ্চাকে স্পর্শ করতে পারবে না। বিশ্বাস করা হয় যে, তাহলে বাচ্চার সর্দি কাশি ভালো হয়ে যাবে। বাচ্চার পেটের অসুখ সারানোর জন্য তাবিজ নিলে বাচ্চার মা তিন দিন পর্যন্ত শাক, চুইকা (টক), মাছ এবং দুধ খেতে পারবে না। বাচ্চাদের পাতলা পায়খানা হলে লোহার তাবিজ বাচ্চার মা 'বাওন পৈতা' করে সাথে রাখে।

কেউ যাদু টোনার শিকার হলে এক রঙের গাই বাছুরের এক পোয়া কাঁচা দুধ, একপোয়া চিনি বা গুড় ও গাছন্ত দিয়ে খাওয়ানো হয়। গাছন্ত ছেঁচে তার রস দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এর ফলে বমি হয় এবং পেটে যদি কোনো বিষ থাকে তা বমির সাথে বের হয়ে যায়।

যৌন রোগের চিকিৎসা

যৌন রোগ, যেমন : পুরুষের কাম শক্তি কমে যাওয়া, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্ন দোষ, লিঙ্গ কম জোর হওয়া, পেশাবের আগে ও পরে বীর্য নির্গত হওয়া, হাত পা জ্বালা করা, মেয়েদের শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, জরায়ুতে ঘা হওয়া, ঋতুস্রাবে গোলমাল ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় লোকচিকিৎসকেরা সাধারণত গাছ-গাছন্ত থেকে তৈরি ঔষধ ব্যবহার করেন বেশি। অষ্টমুড়া, শিমুলের মুথা, কাটাকুমড়া গাছ, কালকিসুরির ফল, হরতকি, শালিম মিসরি, তালমিসরি, ঘি, মধু, সবরি কলা, সোনা জারণ, রূপা জারণ, কস্তূরী জাফরান, গোলাপ পানি, দুধ, আলকুসির দানা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পাচন, হালুয়া ও পাউডার তৈরি করেন। ছেলেদের পুরুষত্বহানি ও মেয়েদের শ্বেতপ্রদর রোগে গাছ-গাছন্ত ছেঁচে রস করে জ্বাল দিতে হয়। এরপর হালুয়ার মত করে শুকিয়ে পাউডার বানিয়ে পুরিয়া বানানো হয়। ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে পুরিয়া ঠান্ডা পানি দিয়ে গুলিয়ে খেতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৈল বানিয়ে দেন।

বন্ধ্যা নারীর চিকিৎসা

যাদের সন্তান হয় না বা বন্ধ্যা অথবা সন্তান হয়ে মারা যায় সে সব নারীর চিকিৎসার জন্য গাছের ফল, মূল ও পাতা দিয়ে ঔষধ তৈরি করে সেই ঔষধ দিয়ে বন্ধ্যা নারীর জরায়ু ধৌত করা হয়। দেহে বিশুদ্ধ রক্ত সৃষ্টির জন্য আলাদা ঔষধ দেয়া হয়। দেহে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালনের পর স্বামী-স্ত্রী দৈহিক মিলনের পর সেই নারী গর্ভ ধারণ করে। গর্ভ ধারণের জন্য লোকচিকিৎসকগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসাও করেন। তারা নির্দিষ্ট আসনে বসে ধ্যানস্থ হয়ে কোরান হাদিসের বাণী বা অজিফা পাঠ এবং স্রষ্টার নিকট বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা করে থাকেন।

গরুর চিকিৎসা

গরুর লেংরা বাতাস, তড়কা রোগ, টিটা রোগ, বসন্ত রোগ, কৃমি, জেজি পয়জিরা হলে গরুর পেট ফুলে যায়, ঘাস খায় না, নাকমুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে, ঘন ঘন শ্বাস-

www.pathagar.com

প্রশ্বাস চলতে থাকে। তড়কা রোগ হচ্ছে গরুর জ্বর। টিটা রোগে গরুর সিনা, রান, গলদেশ আক্রান্ত হয়। গরু দুর্বল হয়ে পড়ে। গরুর চিকিৎসায় গাছ গাছন্তের পাতা, ফলমূলের রস, হুঁকার পানি, চাউল ধোয়া পানি, কসুইল্যা গুড়, আদা, লবণ, বিচি কলার কচিপাতা ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো চিকিৎসায় মুরগির ডিম, পিপুল (জঙ্গলে হয়) ও কূপের পানি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বিন্না গাছের মোথা, আকন গাছের পাতা, নিমপাতা, হাতিসুইরা গাছের পাতা, বিষকাটানী, বিট লবণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

লোকচিকিৎসক সাইদুর রহমান বয়াতি

সাইদুর রহমান বয়াতি মূলত জারি ও কবিগানের শিল্পী। বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী এই মরমি কবি ও সংগীতজ্ঞ লোকসংগীতচর্চা ছাড়াও একজন লোকচিকিৎসক হিসেবে সমধিক পরিচিত। আট-নয় বছর বয়সে তিনি লোকচিকিৎসার সঙ্গে পরিচিত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার বাবা জিকির আলী বেপারী এবং চাচা অধর আলী মেম্বর লোকচিকিৎসা করতেন। মানুষের টাকা, পয়সা ও গহনা (স্বর্ণালঙ্কার) হারালে লোকজন তাদের কাছে আসতেন। তখন আমাকে ডেকে নিয়ে হাত চালান দিতেন। সাধারণত তুলা রাশির লোকজনের দ্বারা হাত চালান দেওয়া হয়। আমার রাশিও তুলা রাশি। তাই আমাকে দিয়ে হাত চালান দেওয়া হতো। কাঁসার বাটি দিয়ে এই চালান দেয়া হতো। এছাড়াও সর্প দংশনকারীর গায়ের কোন অংশে বিষ আছে তা শনাক্ত করার জন্য তুলা রাশির লোকের প্রয়োজন হয়। এই কাজেও আমাকে ব্যবহার করা হতো। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার চিকিৎসা পদ্ধতি শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বাজান অনেক মন্ত্র জানতেন। তখনকার দিনে এলাকায় তিনি একজন নামকরা কবিরাজ ও ফকির ছিলেন। বাজান আমাকে সবকিছু শিক্ষা দিতে থাকেন। বাজানের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক শিখি। চাচার কাছ থেকে সাপের মন্ত্র বেশি শিখি। তখন আমার বয়স ১২/১৪ হবে। চাচা একদিন আমাকে ষোলন্ডী গ্রামের বিখ্যাত সাপুড়িয়া কলিমুদ্দিনের নিকট সাপের মন্ত্র শিখার জন্য পাঠান। কলিমুদ্দিনের নিকট আমি সাপের মন্ত্র শিখতে থাকি। তিনি প্রথমে কয়েকটি মন্ত্র খাতায় লিখে দিতেন। সেগুলো মুখস্থ করার পর আরও মন্ত্র লিখে দিতেন। এইভাবে অসংখ্য সাপের মন্ত্র শিখি। আমাদের পাশের বাড়ির নিমাই বেপারীর নিকট গরু বাছুরের রোগব্যাধির চিকিৎসা শিখি। কিছু কিছু ঝাড়ফুঁক আমি আমার মা কুসুমী বিবির কাছ থেকেও শিখেছি, যেমন— আগুনে ঝইলসা গেলে ঝাড়ফুঁক, চক্ষু বাতাস লাগা, চোখ জ্বলা, চোখে ছানি পড়া, হাড় ভাঙ্গার ঝাড়া, দেহ বন্ধন, প্রসব বেদনার চিকিৎসা।"

সাইদুর রহমান বয়াতির বড়ো ভাইয়ের ছেলে মোহাম্মদ আবু জাফর (৪১) বলেন "কাকা (সাইদুর রহমান বয়াতি) কবিরাজ মতে চিকিৎসা করেন। বিষ বেদনা, অর্ধঅঙ্গ, বাউ বাতাসের চিকিৎসা, ভূত, জ্বীন, সাপের বিষ নামানো অত্র এলাকার মধ্যে উনি বেশি জানেন। জাবরা, তিল্লি, আয়নাপুর, শিয়রপুর, গোপালপুর, চারাভাঙ্গা, বয়রা ইত্যাদি এলাকা থেকে মানুষ আসে চিকিৎসার জন্য। জ্যোতিষী বিদ্যায়ও তিনি বেশ অভিজ্ঞ। জিনিস হারিয়ে গেলে, টাকা পয়সা হারানো গেলে লোকে উনার কাছে আসে। উনি ব্যবস্থা করলে অনেকে হারানো জিনিস পেয়ে যান।"

www.pathagar.com

সাইদুর রহমান বয়াতির স্ত্রী ছালেহা খাতুন চিকিৎসা কাজে তাকে সাহায্য করেন। তাঁর বড়ো ছেলে আবুল বাশার আব্বাসীও চিকিৎসা জানেন। সাইদুর রহমান বাড়িতে না থাকলে বড়ো ছেলে বাশার চিকিৎসা করে। প্রতি মাসে বিভিন্ন ধরনের দুই/চারজন রোগী আসে। বর্ষাকালে সাপের রোগী বেশি আসে। যাদের মৃত সন্তান হয় বা সন্তান মারা যায় তাদের জন্য তাবিজ কবজ ব্যবহার করেন এবং আধ্যাত্মিকভাবে দোয়া প্রার্থনা করেন। ফজর, মাগরেব বা এশার নামাজ পড়ে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত হন প্রার্থনার জন্য। ১০০টি রোগীর ক্ষেত্রে তিনি ৯৫% সফলতা অর্জন করেছেন বলে জানান। ঔষধ তৈরির সামান্য ব্যয় যেমন আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য কিছু টাকা পয়সা নেন। নির্দিষ্ট কোনো সম্মানী নেন না। রোগীর মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার পর রোগী খুশি হয়ে চাল, ডাল, মুরগি, খাসি, দুধ, গুড় মানত করে এবং ওরস উপলক্ষে প্রদান করে। খুশি হয়ে অনেকে লুঙ্গি, গেঞ্জি, পাজামা, পাঞ্জাবি এবং অনেকে সোনার আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি দেয়।

১৪.০৭.২০০২ তারিখে সাইদুর রহমান বয়াতির বাড়িতে তাঁর বড়ো ছেলে আবুল বাশার আব্বাসীর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি জানান "গ্রামেগঞ্জে লোকজন লোকচিকিৎসায় বিশ্বাসী, কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের অভাব। ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তি কবিরাজের উপর। ঝাড়ফুঁক পানি পড়ায় অনেক রোগীর অসুখ ভালো হয়ে যায়। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এবং আধুনিক যুগের প্রভাবের ফলে লোকচিকিৎসার ওপর বিশ্বাস অনেকটা কমে গেছে। তথাপি সর্পদংশনের চিকিৎসায় এখনো ওঝাদের ওপর মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। বর্তমানে ইনজেকশন বের হয়েছে। ইনজেকশন দেয়ার পূর্বে কী সাপে দংশন করেছে, সাপটা বিষাক্ত কিনা ইত্যাদি নির্ণয় করতে হয়। ওঝা তার নিজস্ব পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বলতে পারে সাপটা বিষাক্ত কি না। ঠিক সময় যদি আমাদেরকে ডাকে তাহলে ১০০% রোগী আমাদের হাতে ভালো হয়। সাপের মন্ত্র আমার আব্বার কাছ থেকে শিখেছি। তন্ত্র-মন্ত্র যত প্রকার আছে প্রায় সবগুলো আমার জানা। সাপের চিকিৎসাও আমি শিখেছি। গরুর চিকিৎসা, পেটের ব্যথা, ঝাড়ফুঁকও আমি শিখেছি। বর্ষার সময়ে সাপের উপদ্রব বেশি। আমি ও আব্বা রাতে ঘুমুতে পারি না। প্রতি রাতে ১৫/২০ জন রোগী আসে। মন্ত্র পড়তে পড়তে কণ্ঠ শুকিয়ে আসে। খাবার রেখে অনেক সময় চলে যাই।"

সাপে কাটার চিকিৎসা

সাইদুর রহমান বয়াতি সাপের বিষ নামানোর জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করেন তা নিম্নরূপ :

১. প্রথমে তিনি নিজের গামছায় একটি মন্ত্র পড়ে একটি গিরা দেন। যিনি সর্প দংশনের সংবাদ নিয়ে আসেন তাকে কাছে গেলে মন্ত্র পড়ে চপেটাঘাত করেন। সে যদি নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে তিনি মাটিতে চপেটাঘাত করেন।

২. এরপর তিনি রোগীর কাছে যান। সর্বপ্রথম এক তোলা পরিমাণ পানি মন্ত্র পড়ে রোগীকে খাওয়ান।

www.pathagar.com

৩. প্রয়োজন হলে মন্ত্র পড়ে সামান্য পরিমাণ তামাক বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হুঁকা কলকি সাজিয়ে অন্য লোককে টানতে দেন।

৪. রোগীর হাত বা পায়ের আঙুলে পাটের রশি দিয়ে একটি ডোর বাঁধা হয় এবং সেই ডোর অন্য লোককে টানতে দেয়া হয়।

৫. রোগীর মস্তক থেকে মন্ত্র পড়ে ঝাড়া শুরু করেন।

৬. প্রয়োজন বোধে রোগীর ক্ষতস্থান বা রোগীর পিঠে কাঁসার থালা বা বাটি মন্ত্র পড়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

৭. রোগীর হুঁশ ফিরে আসলে একটা গাছের মূলের রস চিনি বা গুড় মিশিয়ে খাওয়াতে হয়।

৮. রোগী কথা বলতে পারলে তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেহের কোন জায়গায় বিষ আছে তা জেনে সেখান থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে হাতে বা পায়ে যেখানে ডোর বাঁধা হয়েছে সেখানে বিষ জমা করেন। তারপর কাইকলা মাছের ঠোঁট দিয়ে ছোটো ছিদ্র করে বিষাক্ত রক্ত বের করে দেয়া হয়।

৯. রোগীকে দুধ, শরবত বা ডাবের পানি খেতে দেয়া হয়। রোগী আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যায়।

খ. তন্ত্র-মন্ত্র

মন্ত্র কোরান-হাদিস, রামায়ণ, মহাভারত-এর কোনো বাণী না। মন্ত্র হচ্ছে বংশপরম্পরায় প্রচলিত বাণী। মন্ত্র ভুল পড়লে কাজ হবে না। গুরু যেভাবে শিখিয়েছেন ঠিক সেইভাবে পড়তে হবে। মন্ত্র শুদ্ধও করা যায় না। মন্ত্রের ভাষা কোনো লিখিত ভাষা নয়। এদেরকে বলা হয় গায়েবি ভাষা। কিছু কিছু মন্ত্র স্বপ্নে জানা যায় বলে মনে করা হয়। কোনো কোনো রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিও স্বপ্নযোগে জানা যায় বলে অনেকে মনে করেন। সাপের মন্ত্রে অকথ্য গালি রয়েছে। সাপের কিছু মন্ত্রেও যেমন—জলছাপা মন্ত্রে এই ধরনের কিছু অকথ্য শব্দ প্রয়োগ করা হয়। সাপের দংশনের ফলে যে বিষক্রিয়া হয় সেই বিষক্রিয়াকে ঘায়েল করার জন্য মন্ত্রের মাধ্যমে গালি দেওয়া হয়। কারণটা হলো সাপের বিষ মন্ত্রের সাহায্যে কেউ কেউ রোগীর দেহে আটকায়ে রাখতে পারে। ফলে রোগী কষ্ট পায় এবং অবশেষে মারাও যায়। আটকানো বিষকে চলমান করার জন্য অশ্লীল ভাষার মন্ত্র ব্যবহার করলে অনেকে কবিরাজকে গালমন্দ করতে থাকে। এর ফলে অতি সহজেই কবিরাজ বিষ নামাতে পারেন। সাপের বিষ-এর চিকিৎসার সময় দর্শক-শ্রোতা অশ্লীল শব্দ শুনার পর তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়াই মন্ত্রকে কার্যকর করার শক্তি দান করে। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। সাধারণভাবে এক বা দেড় ঘন্টার মধ্যে যদি বিষ নেমে যায় এবং রোগী ভালো হয় তাহলে জলছাপা মন্ত্র যা অশ্লীল ভাষাযুক্ত মন্ত্র ব্যবহার করতে হয় না। যদি বিষ নামতে তিন চার ঘন্টা সময় লাগে তাহলে জলছাপা মন্ত্র ব্যবহার করতে হয়।

মন্ত্র হচ্ছে একপ্রকার গুণবাচক শব্দমালা। মন্ত্রের সাহায্যে কোনো কোনো রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। যেমন–কিছু মন্ত্র আছে সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র।

www.pathagar.com

মহাদেবের কন্যা পদ্মাদেবী মনসা মুখাশ্রিত বাণীগুলো পর্যায়ক্রমে মন্ত্রে পরিণত হয়। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি থেকে জানা যায় যে, সাপ হচ্ছে পদ্মাদেবী মনসার সন্তান। কাজেই সাপের মন্ত্রের মধ্যে পদ্মাদেবী মনসার দোহাই আছে। কিছু মন্ত্রে আবার মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের দোহাই আছে।

ইসলামি মতে সুরা এখলাস, সুরা ফাতেহা, সুরা কাফেরুন, দোয়া ইউনুস ও দোয়া ইব্রাহিম পড়েও বহু চিকিৎসা করা যায়। এগুলো এছমে আযম নামে পরিচিত। আল্লার গুণবাচক নামগুলো এছমে আযমের অন্তর্ভুক্ত। এসব নাম পড়ে জটিল ও কঠিন রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্র বিভিন্ন দেব দেবতাদের মুখের বাণী যা মন্ত্ররূপে গণ্য হয়। যেমন হিন্দু দেবতা গোরখনাথের বাণী গরু বাছুরের রোগ উপশমের জন্য উচ্চারণ করা হয়। মহাদেবের মুখের বাণী বিভিন্ন রোগ চিকিৎসায় মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইসলামি মতে, গাজী কালু, খাজা-খিজির, বড়োপির আবদুল কাদের জিলানি সহ বিভিন্ন অলি আওলিয়াদের মুখের বাণী লোকচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে লোক পবিত্র মুখে সত্য জবানে এসব মন্ত্র ব্যবহার করেন, তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হয়। রোগীরও এসব মন্ত্রে অটুট বিশ্বাস থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে লোকচিকিৎসক সাইদুর রহমান বয়াতি বলেন, "আমি ছোটোবেলা থেকেই বিভিন্ন পির, ফকির, দরবেশ, সাধু ও গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেছি। মন্ত্রের প্রথম গুরু আমার মা কুসুমী বেগম। তিনি চোখের রোগ হলে ঝেড়ে দিতেন। ভাঙলে, মচকালে তিনি ঝাড়তেন। গরম পানিতে পুড়ে গেলে মা ঝেড়ে দিতেন। মা বলেছিলেন যে, তিনি তার মায়ের নিকট থেকে ঝাড়ফুঁক শিখেছেন। এ সম্পর্কে কোনো লিখিত বই পুস্তক নেই। এগুলো মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। আমার মন্ত্রের ভাষা শুদ্ধ বা গোছালো কোনো ভাষা নয়। আমার মন্ত্রের ভাষা অগোছালো, সংস্কৃত, উর্দু ও আরবি শব্দের মিশ্রণ। বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণের বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। কিছু মন্ত্র আছে যা রোগীর কাছে না গিয়ে বাড়ি বসে উচ্চারণ করলেও রোগী ভালো হয়ে যায়। আমি আমার পির হজরত এ এস এম আব্দুল জলিল-এর নিকট থেকে এছেমগুলো পেয়েছি। এগুলো আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত। পির প্রদত্ত সাধন ভজনের মাধ্যমে এসব মন্ত্র উচ্চারণ করলে ফল পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামানন্দ চাকমা একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। গান করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমাকে ভালোবেসে পুত্রস্নেহে তিনি বহু মন্ত্র শিখান।"

দেহ বন্ধন মন্ত্র

আদ্যের দেবতা বন্দি, বন্দি নিরাঞ্জন
ধর্মেই বন্দনা করি মন্ত্রেরি কারণ।
বন্দিব জয়দুর্গা আমি হয়ে সাবধান
মনসা মাতায় বন্দি নাগের প্রধান।
শিক্ষা দীক্ষা গুরু বন্দি ব্রহ্মার চরণ
যা হতে দেখিলাম আমি মরত ভুবন

www.pathagar.com

ডাইন যোগিনী বন্দি মন স্থির হয়ে
গুণী জনেরে বন্দি সাবধান হয়ে।
বন্দিতে বন্দিতে কেবা এড়াইয়া যায়
কোটি কোটি প্রণাম আমি করি তার পায়।
লাগ বন্দন আমার অঙ্গে।
আজ দুপুর কাল রাত্রির সাত দিন সাত রাত থাক
এই বন্দন আমার অঙ্গে শীঘ্র করে লাগ।

দেহ বন্ধন মন্ত্র হচ্ছে নিজের দেহকে বিপদ-আপদ বা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা। লোকচিকিৎসক নিজে এই মন্ত্র ব্যবহার করেন এবং অন্যকেও শিক্ষা দেন। এসব মন্ত্র আত্মসাধন মন্ত্র নামেও পরিচিত।

দেহ বন্ধন ২য় মন্ত্র

ঘর থেকে বাহির হয়ে পথে দিলাম পা
তুমি হইলা বসুমতি তুমি আমার মা
কে মরণ মরায় কে সরণ সরায় কে ভাঙ্গে খড়ি
এই সময় আমি তারে হাতে দিয়া দড়ি
কে যায় হাট, (নিজের নাম) অমুকে যায় হাট
আমার কটি গোছা ডাইন যুগিন
দক্ষি দানা বাউ বাতাসে পড়লে যা
রক্ষা করার জগৎ জননী মা
কার আজ্ঞা
কাউরের কামিক্ষা মায়ের আজ্ঞা
কার আজ্ঞা, হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।

বাড়ি বন্ধন

হাট চলতে বাট বন্দি
বাট চলতে ঘাট বন্দি
স্বর্গে রাজা ইন্দ্র বন্দি
পাতালে বাসুকি বন্দি
রাম কথা শিকল তোরি মাছ মারি ট্যাংড়া
গাছ মারি গাছ কুটে ডাল মারি চাকুই উঠে
ডাল খাইয়া বশ করলে ঝাড়
আগু আইলে আগু বন্দি

www.pathagar.com

পিছু এলে পিছু বন্দি
এই বন্দিতে বান্দুম ঈশ্বর মহাদেব
আর বন্দি হিম গড়ে সহদেব।
হাম পরি রাই একেলা
কার দোহাই বড়ো বাপ ধর্মজির দোহাই ।

সাপে দংশন করলে তার চিকিৎসা
পাটার উপরে নেতা কাপড় যে কাচে
পদ্মপাতে সেই স্থানে সর্পবিষ নাচে।
নেতা তুই গুরু মুই তোর শিষ
আঁচলে বান্ধিমু (নাম) অমুকের অঙ্গের কালকুটি বিষ
ওরে বিষ গোখুরা ক্ষয়ে
তোরে রাখিনু আমি কাপড়ে বান্দিয়ে
গুড় গুড় তোমায় পাহাড় যে বাস
উপরে থাকিয়া তুই নিড়ে কবার চাস
ওরে বিষ তোরে বান্ধিলাম মনসার বনে
দুমাস থাক তুই আল ভেতরে
কার আজ্ঞা মা মনসা দেবীর আজ্ঞা।

সাপের বিষ নামানোর জন্য প্রথম পর্যায়ে এসব মন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ডুরি বা তাগা বাঁধন
ধুলিয়া ধুলিয়া তুমি উড়িয়া বেড়াও
আমাকে দেখিয়া তুমি সম্মুখে দাঁড়াও
মনসার বরে বিষ না হাট উপরে
বিষহরির দিব্য আমি কহিতেছি তোরে
আয় বিষ আয় ঘাও মুড়ে আয়
এর ছাইরে উপরে যাও
মা মনসার মাথা খাও ॥

ঘা মুখে বিষ আনয়ন করা মন্ত্র
আফুলা কলাগাছটি বালি ঝুর ঝুর করে
দেবীর কিরণে বিষ ঘাও মুখে নড়ে
কোথায় আছিস বিষ ওরে মনসার দোহাই

www.pathagar.com

গুরুর আজ্ঞায় যাহা কহিতেছি তাই
কাঁপিস না ওরে বিষ শীঘ্র নেমে আয়
শিব ঠাকুরে ডাকে তোরে আর মনসা মায়।

১ম ঝাড়া

হোনেতে বসিয়া, বেহুলা লখিন্দর বাসর ঘরে
ভয়েতে চরকা কাটে হাত পাও নেড়ে
বেহুলা বলে বিষ তোরে আমি জানি
খেয়েছিলি স্বামীকে মোর তুই অভাগিনী
যাহোক এখানে তোরে করি নমস্কার
আমার গৃহেতে তুই না আসিস আর
যা বিষ শীঘ্র যা
না হলে মা মনসার মাথা খা।

বিষ নামানো মন্ত্র

রুনু রুনু করে বিষ উজান ভাটাই টানি
তার মাঝে আছে এক কালের নাগিনী
চিরকাল আছে সেই ধুফুরিয়া কঙ্কা
যাহার মুখেতে দুপাশে রয় দুইটা যশ
তার মাঝেতে বাঁশের ঝাড় তিন ঠাঁই তার বান্ধা
চুরি কইরা বইসা রয় ধুফুরিয়া কঙ্কা
উইড়া যায় উইড়া পাখি করে সাই সাই
তার উপরে তারে অতীব যে যাই
পানি ঝরে পানি পরে পানি করলাম সার
(নাম) ওমুকের অঙ্গের বিষ কিছুই নাই আর
নাই বিষ নাই এই রোগের
অঙ্গে আর বিষ নাই।

ঝাড়ার মন্ত্র

গরুর স্মরণে বিষ নামে ধীরে ধীরে
দোহাই রাম চন্দ্রের তুই যদি চাস ফিরে
গরুড় আসিয়া তোরে করিবে চৌচির
অতএব ঘাও মুখে তুই হয়ে যা স্থির
গরুড় স্মরণে বিষ স্থির হয়ে গেল
অতএব সর্বজনে রাম রাম বলো

www.pathagar.com

নাই বিষ ওমুকের অঙ্গে নাই বিষ আর
সকল বিষ হয়ে গেল সাত সমুদ্র পার।

গামছা পরে ওঝা বিষ নামানোর জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন

গামছা, গামছা তোরে বলিহারি যাই
গামছা পড়া মারলে রোগীর আর বিষ নাই
সুবর্ণের গামছা তুই রূপার বরণ
তোরে পইড়া মারলে রোগীর গায়ে বিষ নাই আর
বিষ নাও তুমি যারে
ফালাইলাম সাত সমুদ্রের পারে
কার আজ্ঞা বিষহরি রাইয়ের আজ্ঞা।

রোগী বেশি কাতর হলে তার মন্ত্র

শ্বেত তুষারময় হের দেখি কার বায়
জগদম্বা ঈশ্বর যে, কেন হেন দুর্গতি হরিষে বিপত্তি
ভূমে গড়াগড়ি কেন সে বিশ্বপতি।
হাতে সে ডুম্মুর খানি শম্ভুর ধরণী গড়াগড়ি যায়
পাইয়া শঙ্কা, জটায় গঙ্গা ত্রিবেণীর পথে ধায়।
মধ্য লোচন রহি ধিকি ধিকি জ্বলে
চন্দ্র আওতান রাম লোচন দক্ষিণ খিলন টলে।
ডালে অবিচল প্রমাদ পরিল, পরিল সিদ্ধির ঝুলি
ভুবন কাতর হয়ে শীঘ্র বলে কোথায় বনমালি।
কাতর দেখিয়া কৃষ্ণ করে আগমন
বলে দেবগণ কেন কর ক্রন্দন।
দেবগণ তবে তারে খুলিয়া বলিল
শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে সব মনেতে বুঝিল।
কৃষ্ণ বলে দেবগণ ভয় কেন আর
তোমরাই নিশ্চয় আমি রাখিব বারবার।
শুনিয়া একেত বাণী কহে পশুর কুমারী
ভয় নাই বচন সবে ধরহ আমারি।
পদুম কুমারির বাক্যে স্থির হইল দেবগণ
কহে যাহা ভালো হয় করগো এখন।
পদুম কুমারী কহে উঠহে শঙ্কর
আমি আসিয়াছি তব ভয় কিবা আর।

www.pathagar.com

বাক্য শুনে শঙ্কর উঠিয়া বসিল
তাহাতেই রোগী মম চাহিয়া দেখিল
নাই বিষ, নাই বিষ, বিষ নাই আর
জয় মা মনসার বাক্যে বিষ হইল ছারখার।

ভুত প্রেত ছাড়ানোর মন্ত্র

কুল, কুল পিশাচী
বলি তোরে সর্বনাশী
করিস তুই কত বল ছাড়িস না কেন এই স্থল
আপনার মান্য যদি রাখিবারে চাও
ঝাটিতি করিয়া তবে কৈলাসেতে যাও ॥
অমুকের স্কন্দ ছেড়ে শীঘ্র যা শীঘ্র যা
দোহাই শের ই আলির ॥

ডাইনির দৃষ্টি ছাড়ানোর মন্ত্র

হরি হরি বলি আমি মন করি স্থির
চাইর ইত্যাদি ফেলে পাথার আদি বীর
দুই তিন দানব দানবী দোষীকে খাইবার
শিশু শিশু কন্যা তারা গলায় পরে হার
রাম লক্ষণ দুই ভাই ধনুক ধরিল
তাই হেরিয়া ডাইনি সব পলাইয়া গেল
পলাইয়া গেল তবে ডাইনি যুগিনী
সাত সমুদ্র পারে গিয়া খায় তারা পানি।

পোড়া ঘায়ের তেল পড়া

তৈল তৈল মহাতৈল তেল জ্বলে
অমুকের (নাম) পোড়াজ্বালা কভু না রহে
মন্ত্র পড়ে নরসিংহ ঘরেতে বসিয়া
রাম চন্দ্র ফুক দেয় থাকিয়া থাকিয়া
না রহে এই পোড়া জ্বালা নীরবে ঠান্ডা হইয়া যাও
সাত সমুদ্রের লোনা পানি তুলিয়া যে খাও
দোহাই, দোহাই, দোহাই।

www.pathagar.com

রক্ত আমাশয়ের পানি পড়া

ক্ষীরোদ সমুদ্র মাঝে উপজিল জল
ওরে রক্ত আমাশয় তোর কোথা স্থল
অমুকের (নাম) কচি নাচি উপজয়ে যাহা
নরসিংহের বরে এবে না রহিবে তাহা
নাই রোগ আর নাই ॥

ঋতুবতীর পেট বেদনার আদা পড়া

বড়ো বড়ো আদার সরু সরু আঁশ
ঋতু বেদনার গলায় তুইলা দিলাম ফাঁস।
আমার এই আদা পড়া যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের পঞ্চ মুণ্ডু বাম পদে পরে ॥

অবাধ্য স্বামীকে বশীকরণ সিঁদুর পড়া

সিঁন্দুর সিঁন্দুর সিঁন্দুর পাতি
কামাখ্যা পর্বতে তোমার উৎপত্তি
আমার এই সিঁন্দুর পড়ায়
অমুকের কপালে দিলে ফোঁটা
(নাম) দেখে হয়ে থাকে বোকা পাঁঠা
হরি সিদ্ধান্ত গুরুর পা
কামরূপ কামিখ্যে মা।
হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে
আমার সিঁন্দুর পড়া অমুকারে (নাম) শীঘ্র লাগগে
আমার সিঁন্দুর কথা যদি লংঘে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়ে ভূমেতে লুটবে।

দুষ্টু স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্র

প্রদীপে রহিয়া তৈল ঝিক্ ঝিক্ করে
জ্বলিতেছে অগ্নিদীপটি মিট মিট করে।
জ্বলুক অগ্নির মত জ্যোতির রূপেতে
অমুকের স্ত্রীর মন পুড়ুক তাহাতে
চঞ্চল ছাড়িয়া তার স্থির হোক মন
আমাকে ভজনা করিয়া কাটুক জীবন।
কার আজ্ঞা, হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।

www.pathagar.com

চোর ধরা বাটি চালান

বিশ্বনাথে স্মরি আমি হাতে লইলাম মাটি
তুলসীকে স্মরিয়া তাহা পরিপাটি রাখি
মূষিকের মাটি ইহা অন্য কিছু নয়
যাহার তরেতে বাটি আপনি চলয়
চল বাটি যেথা চোর করহ গমন
বিশ্বনাথে স্মরি তুমি করহ গমন
কার আজ্ঞা বড়ো বাপ ধর্মের আজ্ঞা।

হাত চালান

অঞ্চ চালান নিঞ্চ চালান
বম্বু চালান কম্বু চালান
জয়দেব কার্পীকে চালান
চল হাত চল যেখানে আছে এই মাল
সেই খানে চল
ভাদ্র মাসে যে দোয়ারি চুরি করে
তার মার্গের তল দিয়া চল
কুমুরে কামিখ্যে যার বিদ্যা তার পাও
সিদ্ধি গুরু ওস্তাদের পাও ॥

উইপোকার চিকিৎসা

আল্লা আলিম ইয়া পাকজাত
কিরাছে তো মুঝে দে নাজাত।
বিছমিল্লা ইয়া আল্লাহ রহম কর
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

ইসলামি মতে বাঘ, কুমির, কুকুর বন্ধ বা খিলনি দেয়া

কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ
বাঘ বন্ধ লাগে ধন্ধ
আল্লাহু ছামাদ
বাঘের চক্ষু হয়ে যায় অন্ধ
ওয়ালাম ইউলাদ।
মাতা কি কুল আজ আহাদ
লাগ লাগ মন্ত্র শীঘ্র করি লাগ

www.pathagar.com

দোহাই তোর ধর্মের জলদি করে লাগ
আমার এই মন্ত্র যদি নড়ে চড়ে
আল্লার আরশ তবে জমিনেতে পরে
কার আজ্ঞা, আল্লা নবীর আজ্ঞা
আমার এই বাঘবন্ধ শীঘ্র করি লাগ ॥

ইসলামি মতে দেহ বন্ধনা

দোয়া, আয়তাল কুরছি বন্দুম কোরান
বাহির ভিতরে হক ছোবহান
লোহা কি ঘর গাম্বেকা কেওয়ার
সামনে কা ছুড়ি পয়গম্বরকা বাড়ি
আমার শরীরের দিনের চারি প্রহর
রাতের চারি প্রহর কিছু নাহি দেখি খালি
বাহাক্কা হাক লা এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদ রসুলউল্লা ॥

বদ নজর দূর করার মন্ত্র

আওয়াল নাম খোদাকা দোয়াম নাম নবীর
চার ইয়ারে পাক তন আয়েত কোরানের
মজিদ মন্তর সাহা সুলতানকা পানি পড়া
হর বালা এক বালাকো দফা করে দেও
খানকারা দোহাই ধর্মকা তেরা
খোদায়ে পাক মোহাম্মদ রসুল
আপনে করমছে করলে কবুল ॥

ইসলামি মতে সর্প বিষ ঝাড়া

সাপ বিষ ঝাড়ি আমি মন্তরের জোরে
চাপড় মারিয়ে আমি রোগীর পিছে পরে
যা বিষ শীঘ্র যা উড়ে
নাহি আসিস ফিরে
দোহাই তোর ধর্মের এলাহির কিরে ॥
সোনার বরণ আহারে রতন
সাপে কাটিয়াছে নীল রঙ্গ হয়ে
তোর দেহ ঝরে গেছে

www.pathagar.com

সোনার জহর নাইত আছর
ইহার উপরে ফিরে নাহি
চড়িস বিষ কহি বারে বারে
দোহাই তোর ধর্মের ইলাহির কিরে ॥

নালি ঘা বা ঘা কেহ নষ্ট করলে তার মন্ত্র

অমুকের ঘায়ে যে মারিয়াছে ভার
শীঘ্র কাটিয়া যা দোহাই আল্লার
আওয়ালেতে ঝাড়ে আল্লা, দ্বিতীয়াতে নবী
তৃতীয়াতে করে দম ফেরেস্তারা সবি
দোহাই তোর ধর্মের ইলাহির কিরে
অমুকের ভার মারা শীঘ্র যা ছেড়ে ।

বাণ মারার মন্ত্র

হারুদ মারুদ বাণ মৃত্যু বাণ আর
তছমির জোরে আমি করি ছারখার
রাম বাণ, পাগরুর বাণ আর আওলিয়া
শীঘ্র কাটিয়া যা দোহাই কিবরিয়া
বিসমিল্লা ইয়া আল্লাহ বাহাক্কে হক
লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।

দুশমন মেহেরবান হবার মন্ত্র

আয় আল্লা রহমানের রাহিম
বান্দার উপরে তুমি বড়োই করিম
দেলের মোখছোদ পুরা করিবে আমার
দোহাই দোহাই আল্লা, দোহাই তোমার ॥

আতুর ঘরে শিশু সন্তানের রোগের মন্ত্র

ঝাড়ুম পেছু, মারুম পেছু তলোয়ারের ধারে
যা পেছু শীঘ্র ছেড়ে যা এলাহির কিরে
দোহাই লাগে তোরে
দোহাই, দোহাই, মহা দোহাই
দোহাই নবীজির
দোহাই তোর ধর্মের ছেড়ে যা শীঘ্র
বা হাক্কে হক লা এলাহা ইল্লাল্লাহু
মোহাম্মদ রসুল ॥

www.pathagar.com

স্বপ্ন দোষের মন্ত্র

মালেক মৌলা হয়েছে আরশে আল্লা
তক্তে রহ হক লা এলাহা ইল্লাল্লাহু
মোহাম্মাদুর রাসুলউল্লা ॥

১. নবীর নামে মানব তরী ছাড়, পাড়ি ধর (২)
পাক পাঞ্জাতন মাল্লা দাড়ি
রসুল যদি হয় কাণ্ডারি
অনায়াসে মিলবে পরওয়ার ॥
২. তিরিশ রোজা, পাঞ্জেগানা
সে পরের ধন বাছবিনা
সময় থাকতে চিনে খরিদ কর
পাক মোহাম্মদ রব কিনিয়া,
দেহ তরী লও সাজাইয়া
লাশারিক মাউলাজির শপথ কর ॥
৩. সামনে আছে বিপদ জারি দিন থাকতে হও খবরদারি
বাহাদুরি থাকবে না কাহারও
বন্ধু বান্ধব যত জনা
সেই দিনে খবর হবে না
নবী বিনে উপায় নাই কাহারও।[১]

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮৩ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৮.০২.২০১৪, স্থান : নিজ বাড়ি; নার্গিস আক্তার, পিতা : সাইদুর রহমান, বয়স : ১৬ বৎসর, শিক্ষা : এস এস সি পরীক্ষার্থী, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, স্থান : নিজ বাড়ি; ছালেহা খাতুন, স্বামী : সাইদুর রহমান, বয়স : ৪৫ বৎসর, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, স্থান : নিজ বাড়ি; মোহাম্মদ আবু জাফর, বয়স : ৪১ বৎসর, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা হলো বুদ্ধির খেলা। ধাঁধার মাধ্যমে শ্রোতার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হয়। এটি লোকসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ উপাদান। ধাঁধা প্রাচীনকালের কিংবা আধুনিক কালের যে যুগেরই সৃষ্টি হোক না কেন নতুন, পুরাতন যে কোনো ধাঁধা থেকে শ্রোতারা সমান আনন্দ লাভ করে থাকে। ধাঁধা মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য। কিন্তু ধাঁধার আবেদন শুধুমাত্র শিশুদের নয় বড়োদের মধ্যেও রয়েছে। ছন্দ ছাড়া ধাঁধা হয় না। ধাঁধাগুলো সব সময় প্রচলিত অর্থ বহন না করে প্রতীকী অর্থ বহন করে থাকে। প্রতিটি ধাঁধায় প্রশ্ন করে তার উত্তর খোঁজা হয়। ধাঁধার মাধ্যমে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা উভয়ে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে শ্রোতাকে ধাঁধার উত্তর বের করতে হয়। মানিকগঞ্জের গ্রামেগঞ্জে মুরুব্বীগণ যখন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে একত্রে কোনো গাছের ছায়ায় বা উঠানে অথবা কারো ঘরের বারান্দায় বসে তখন তারা একে অপরকে হাজার ধরনের ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে আর হাসি-তামাসা করে। তেমনি কিছু ধাঁধার নমুনা দেওয়া হলো।

১. হাত আছে মাথা নাই
পেট আছে আতুরি নাই।
উত্তর : গায়ের জামা

২. মাটির নিচের বুড়ি
সে বড়ো সুন্দরী।
উত্তর : রসুন

৩. ছোটো ছোটো গাছে
কালি ঠাকুর নাচে।
উত্তর : গাছে ঝোলা বেগুন

৪. এক চিমটি মিঠাই
ঘর ভইরা ছিটাই।
উত্তর : প্রদীপ

৫. কান্দার ওপরে কান্দা
না যদি তার শ্বশুর থাকে বান্ধা।
উত্তর : কলার কান্দি

৬. উপর থেকে পড়ে বুড়ি খেতা কাপড় নিয়া
ভাসতে ভাসতে চলছে বুড়ি কানাই নগর দিয়া।
উত্তর : গাছের পাকা তাল পানিতে পড়ে যায়

www.pathagar.com

৭. হাত দিয়া পাড়ে, ছেপ দিয়া শক্ত করে
ছিদ্রটা দেখিয়া মধ্যে দেয় ঢুকাইয়া।
উত্তর : সুঁইয়ে সুতা গাঁথা

৮. তক্তে বসে বলদে টানে
বড়ো লোকের খবর বড়ো লোকে জানে।
উত্তর : তেলের গাছে সরিষা ভাঙানো

৯. ছালার মত বাড়ে
ছুইলেই মরে।
উত্তর : লজ্জাবতী গাছ

১০. মস্ত বড়ো জানুয়ার
হাড় মাংস খায় না রক্ত বড়ো মজা তার।
উত্তর : খেজুর গাছের রস

১১. চার বোতলে মধু ভরা
মাথা ছাড়া উপুড় করা।
উত্তর : গাভীর দুগ্ধের বান

১২. ঘরের মধ্যে বসায়ে ঘর
তার ভেতরে লখিন্দর।
উত্তর : মশারি টানিয়ে শয়ন করা

১৩. ছোটো ছোটো ছেমড়ারা ভাঙ্গা নাও হেছে
বাইরা পুকায় কামুর দিলে তুর তুরাইয়া নাচে।[১]
উত্তর : খই ভাজা

১৪. মাথা মুকুট গোল গোল,
পেটের মধ্যে হাত পা
চলে কিন্তু নড়ে না
এটা কি তা বল না।
উত্তর : শামুক

১৫. কাঁচা খাও পাকা খাও খাইতে রসাল
আমি যদি খেতে বলি চটে হও লাল।
উত্তর : কলা

১৬. নামে আছে কাজে নাই
কিনতে গেলে দাম নাই।
উত্তর : ঘোড়ার ডিম

www.pathagar.com

১৭. জন্ম হতে যতক্ষণ আয়ু হবে তার
মৃত্যুর ততক্ষণ পরে হাসে সে আবার।
উত্তর : সূর্য

১৮. লাথির পরে লাথি মারে, লাজ লজ্জা নাই,
মাথা তবু উঁচু করে, নাইকো শরম নাই।
উত্তর : ঢেঁকি

১৯. কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে।
উত্তর : নাভি

২০. বাঘের মত দেয় লাফ, কুকুর হয়ে বসে
পানির বুকে ছেড়ে দিলে শোলা হয়ে ভাসে।
উত্তর : ব্যাঙ

২১. আকাশে আছি, পাতালে আছি, পৃথিবীতে নাই
চাঁদ আর তারায় আছি সূর্যেতে নাই।
উত্তর : আকাশ

২২. এক গাছে এক বুড়ি
চোখ তার বারো কুড়ি।
উত্তর : আনারস

২৩. হাত নাই, পাও নাই, দেশে দেশে ঘুরে,
অভাব হইলে তার লোকে অনাহারে মরে।
উত্তর : টাকা

২৪. মামা ডাকে মামা বলে, বাবাও বলে তাই,
ছেলেও মামা বলে মাও বলে তাই।
উত্তর : চাঁদ

২৫. গাছ নয় আছে পাতা
মুখ নাই বলে কথা।
উত্তর : বই

২৬. সে এমন রসিক চাঁন
নাকে বসে ধরে কান।
উত্তর : চশমা

২৭. পানির জন্তু নয়, কিন্তু পানিতে রয়
সকলে তার বুকে আসে আর যায়।
উত্তর : নৌকা

www.pathagar.com

২৮. উড়ে এসে জুড়ে বসে
দেখতে পাহাড়
শত শত জীব মারে
না করে আহার।
উত্তর : জাল[২]

২৯. কোন পক্ষীর ডিম নাই
বল দেখি ভাই।
উত্তর : বাদুর

৩০. মাইটা হাঁড়ি কাঠের গাই
বাছুর বিনা দুধ দোয়াই।
উত্তর : খেজুর গাছ

৩১. ছাল খাই না, বাকলা খাই না
খাই কেবল পানি
গ্রীষ্মকালে খেতে মজা
আমরা সবে জানি।
উত্তর : আখ

৩২. তিন অক্ষরের নাম তার সর্ব লোকে খায়
মাথা কেটে নিয়ে গেলে রমণী নাচায়।
উত্তর : খিচুরি

৩৩. ডাক দিয়ে ভয় দেখাই
আলো দিয়ে পথ দেখাই।
উত্তর : বজ্রপাতের শব্দ ও আলো

৩৪. মায়ের পেটে ছিলাম ক'ভাই
মায়ের থেকে বের হয়ে মাকে দিলাম ঘাই
সে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হলাম ভাই।
উত্তর : দেশলাইয়ের কাঠি

৩৫. তিন অক্ষরের নাম তার আছে এক দেশ
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে খাইতে লাগে বেশ।
উত্তর : আসাম

৩৬. শুনরে বেটা এক দৌড়ে বাজারে যা,
'তাক' মধ্যে 'মা' রয়েছে, কিনে আনগে তা।
উত্তর : তামাক

www.pathagar.com

৩৭. বারো মাসের মেয়ে বটে, তেরো মাস গেলে
গণ্ডায় গণ্ডায় জন্ম দেয় অগণন ছেলে।
উত্তর : কলাগাছ

৩৮. বলতে পারো ভায়া এ কেমন ধারা
রাত্রিরে শুইয়া থাকে, দিনে থাকে খাড়া।
উত্তর : পাটি

৩৯. কাটিতে গেলে কাঁদতে হয়
এ জিনিসটা কি হয়?
উত্তর : পেয়াজ

৪০. জীবন্ত মৌন থাকে; মরিলে সে ডাকে,
মঙ্গলের তরে তাকে কেউবা ঘরে এনে রাখে।
উত্তর : শঙ্খ

৪১. জলে রই, স্থলে রই
জল বিনে কিছু নই।
উত্তর : বরফ

৪২. নয়তো দূরে এইতো কাছে,
বন্ধু সে আছে সাথে,
রৌদ্রে গেলে চলে পাছে
প্রদীপ শিখা সদাই নাচে।
উত্তর : ছায়া[৩]

৪৩. সবাই থাকে আমার নিচে মানুষ, গাড়ি, ধরা
রাত্রে আমি কাজের মানুষ, দিনে আমি মরা।
উত্তর : আলো ও বাতি

৪৪. কালো পাহাড়ে কালো হরিণ থাকে
দশজনে ধরে আনে, দুই জনে মারে।
উত্তর : উকুন

৪৫. আচ্ছা বলতো তোমরা এমন কি জীব আছে
একশত ঘর তার এক ভিটায় আছে?
উত্তর : বল্লার বাসা

৪৬. উটের মত বুক টান,
কোন জিনিসের চার কান?
উত্তর : চৌচালা ঘর

www.pathagar.com

৪৭. চোখ খুললে যায় না দেখা, বুজলে পরিষ্কার।
উত্তর : স্বপ্ন

৪৮. হাত কাটে, পেট কাটে, আরো কাটে গলা,
মৃত্যু হয় না তবু, এ এক আজব খেলা।
উত্তর : জামাকাটা

৪৯. যৌবনে অতি ঝাল রস নাহি থাকে,
বৃদ্ধকালে রসে ভরা থাকে লোকের মুখে।
উত্তর : পান

৫০. পানিতে জন্মায় যা
কিন্তু পানিতে পড়লে বাঁচে না।
উত্তর : লবণ

৫১. সারি বেঁধে দুই দল, চলে মুখমুখি,
প্রতিদিন রেষারেষি, চলে ঠোকাঠুকি।
একবার পড়িলে পর ফের উঠে ঝেড়ে
আবার পড়লে যায় দুনিয়া ছেড়ে।
উত্তর : দাঁত[৪]

৫২. এই দিকে শোয়া (সোয়া) শিয়াল
ওই দিকে শোয়া (সোয়া) শিয়াল
মোট কত শিয়াল।
উত্তর : দুই শিয়াল

৫৩. ঘর আছে তার দুয়ার নাই।
উত্তর : কবর

৫৪. আল্লার কি কুদরত
লাঠির ভিতর শরবত।
উত্তর : আখ

৫৫. তুমি থাকো জলে
আর আমি থাকি ডালে
দু'জনের দেখা হবে
মরণের কালে।
উত্তর : মাছ ও মরিচ

৫৬. কোন দেশে মাটি নাই?
উত্তর : সন্দেশ[৫]

৫৭. আছাড় দিলে ভাঙে না নখের টিপা সয় না।
উত্তর : ভাত

৫৮. হাত নাই পা নাই পিঠ দিয়ে চলে।
উত্তর : নৌকা

৫৯. একটাই পুকুর কিন্তু তার দুই রকম পানি।
উত্তর : ডিম

৬০. কোন জিনিস বাড়ে কিন্তু কমে না।
উত্তর : বয়স

৬১. আতিপাতি খুঁজি, খুঁজে পেলে ফেলে দেই।
উত্তর : ভাতের মধ্যে পাথর

৬২. কোন পাখি ডিম পাড়ে না?
উত্তর : বাদুড়

৬৩. তেল ছাড়া বাতি জ্বলে।
উত্তর : জোনাকি[৬]

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুর রহমান, পিতা : মোহাম্মদ জিকের আলি বেপারি, মাতা : কুসুমী বেগম, বয়স : ৮৩ বৎসর, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ ও সংগীত, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৮.০২.২০১৪, স্থান : নিজ বাড়ি

২. মো. আব্বাস আলী, বয়স : ৫২ বৎসর, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : শেওতা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৭.০২.২০১৪

৩. মো.ইদ্রিস, পিতা : আব্দুর রহমান, বয়স : ৩৩ বৎসর, শিক্ষা : এইচএসসি পাস, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : বেউথা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৪. আলেয়া বেগম, স্বামী : সিকান্দার মিয়া, বয়স : ৩৫ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৭.০২.২০১৪

৫. আরিফা বানু, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা : স্বাক্ষর, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ০২.০৩.২০১৪

৬. বেলি, পিতা : শামসুল, বয়স : ১৪ বৎসর, শিক্ষা : নবম শ্রেণি, পেশা : শিক্ষার্থী, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদকে জ্ঞানীজনদের উক্তি বলা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো বিষয় সম্পর্কে একটি বা দুটি বাক্যের মাধ্যমে চিরন্তন কোনো সত্য প্রকাশই হলো প্রবাদ বা প্রবচন। সারা দুনিয়াতেই এই প্রবাদ বা প্রবচন চালু আছে। এই প্রবাদ মূলত গ্রামের সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। লোকসাহিত্যে এর মূল্য অপরিসীম। মানিকগঞ্জ জেলায় অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এসব প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এসব প্রবাদ-প্রবচন হাটে-বাজারে ও গ্রামে-গঞ্জে আজো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবাদ-প্রবচন তুলে ধরা হলো।

১. ডিম পাড়ে হাঁসে
খায় বাগডাসে।
ব্যাখ্যা : একজনের কর্মের ফল ভোগ করে অন্যে।

২. নাড়ি কাটবার যাইয়া 'চ্যান' কাইটা ফালাইছে।
ব্যাখ্যা : অপরিপক্ক লোকের কর্ম।

৩. ডুইবা মরুম, পানি হেচুম না।
ব্যাখ্যা : অলস ব্যক্তির উদাহরণ।

৪. নম্বা বাছলে কম্বল থাকে না।
ব্যাখ্যা : সব কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নিতে হয় না।

৫. তামাক খাইবো সবাই
মাখাইবো ক্যারা?
ব্যাখ্যা : ভোগী আছে ত্যাগী নাই।

৬. গাইয়ের বিয়ান শেষ
আর বিয়ান দেস কিনা দেস।
ব্যাখ্যা : শেষ সুযোগ গ্রহণ।

৭. হাগার আইলসাতে পাইদা মরে।
ব্যাখ্যা : অতিরিক্ত অলস ব্যক্তি।[১]

৮. চোরের নায় বাটপারের নিশান।
ব্যাখ্যা : খারাপ লোকে সাধুর ভান করা।

৯. অকাঠের নায় সুন্দরীর গুলুই।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : সামঞ্জস্যের অভাব।

১০. খাটা-মাইনষের নাটা বুদ্ধি।
ব্যাখ্যা : বেঁটে মানুষের কুবুদ্ধি থাকে।

১১. ঝাঁঝর কয়—সুই তোর পাছায় ছেঁদা।
ব্যাখ্যা : অসৎ লোকের সৎ উপদেশ দেয়া।

১২. কুড়িতে বিদ্যা চল্লিশে ধন
না হলে ঠন্ ঠনাঠন্।
ব্যাখ্যা : সময়ের কাজ অসময়ে হয় না।

১৩. টানে দুপে জমি যার
ভাত আছে তার।
ব্যাখ্যা : উঁচু নিঁচু জমি দরকার আছে।

১৪. খুদ কোন যে বাছে
তার ভাত সব সময় আছে।
ব্যাখ্যা : সবুরকারীর অভাব হয় না।

১৫. চোরের মায়ের বড়ো গলা
খায় দুধ আর কলা।
ব্যাখ্যা : দুরাচারদের চলন উন্নত।

১৬. ক্ষুধা লাগবো বইল্যা
কুইচা হাগে না।
ব্যাখ্যা : কৃপণ ব্যক্তি।[২]

১৭. আইজ বুঝবি না বুঝবি কাইল
পাছা থাপড়াপি আর পাড়বি গাইল।
ব্যাখ্যা : গুরুজনের উপদেশ না শোনা খারাপ।

১৮. খাছলত যায় না মইলে
ইজ্জত যায় না ধুইলে।
ব্যাখ্যা : স্বভাব সহজে পরিবর্তন হয় না।

১৯. দর নাই দাম নাই
থও আমার ধামায়।
ব্যাখ্যা : অবিবেচকের মত কাজ।

২০. কই যাইবো গোপাল
সঙ্গে যাইবো কপাল।
ব্যাখ্যা : অদৃষ্টের লিখন যা তাই হবে।

www.pathagar.com

২১. কুত্তার পেটে ঘি হজম অয় না।
ব্যাখ্যা : আশাতীত কিছু পেয়ে তা হারানো।

২২. ডাইল দিয়া ভাত খামু
সোজা রাস্তায় হাঁইটা যামু।
ব্যাখ্যা : সহজ সরল মানুষের কথা।[৩]

২৩. ভাত দিবার মুরাদ নাই
বউ মারার গুসাই।
ব্যাখ্যা : অকর্মণ্য লোক।

২৪. বসবার দিলে হুইবার চায়।
ব্যাখ্যা : একটু সুবিধা পেয়ে বেশি আবদার করা।

২৫. ভাত পায় না চা খায়
সাইকেল লইয়া হাগবার যায়।
ব্যাখ্যা : অভাবী হওয়া সত্ত্বেও বিলাসিতা করা।

২৬. যে মানুষ যেমন
পরকে ভাবে তেমন।
ব্যাখ্যা : নিজের মতন করে সবাইকে ভাবা।

২৭. ঝড়ে বক মরে
ফকিরের কেরামতি বাড়ে।
ব্যাখ্যা : দৈব ঘটনার সুবিধা নেয়া।

২৮. দুই দিনের বৈরাগী
ভাতরে কয় অন্ন।
ব্যাখ্যা : অল্প জ্ঞানীর বেশি অহংকার।

২৯. খালি কলসি বাজে বেশি।
ব্যাখ্যা : মূর্খের বাচালতা বেশি।[৪]

৩০. চোরের দশ দিন
গেরস্থের একদিন।
ব্যাখ্যা : অপরাধী একদিন না একদিন ধরা পড়েই।

৩১. গুড় থাকলে পিঁপড়ার অভাব নাই।
অথবা,
ভাত ছিটাইলে কাকের অভাব হয় না।
ব্যাখ্যা : গুণ বা প্রতিভা থাকলে তার সমাদরকারীর অভাব থাকে না।

৩২. গলায় গামছা লাগান।
ব্যাখ্যা : অপমানিত করা।

www.pathagar.com

৩৩. আন্ধার ঘরের সাপ।

ব্যাখ্যা : সর্বত্র ভয়ের আশঙ্কা।

৩৪. পিরিতের পেতনি ভালো।

ব্যাখ্যা : কাউকে ভালো লাগলে তার চেহারা বা রূপ কোনো বিষয় নয়।

৩৫. সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।

ব্যাখ্যা : সুখে থাকলেও বাজে কাজে জড়িত থাকা।

৩৬. পরের ধনে পোদ্দারি।

ব্যাখ্যা : অন্যের ক্ষমতায় নিজের বাহাদুরি।

৩৭. গাঁয়ে মানে না

আপনি মোড়ল।

ব্যাখ্যা : নিজেই নিজেকে বড়ো করে তোলা।

৩৮. আলগা গরুকে ডাঁশে কামড়ায়।

ব্যাখ্যা : অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি অমানবিক আচরণ করা।

৩৯. এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো।

ব্যাখ্যা : কোনো বিষয়ে সকলে একমত হওয়া বা একই ধরনের আচরণ করা।

৪০. চোরের উপর বাটপারি।

ব্যাখ্যা : অতি চালাকের উপর চালাকি করা।

৪১. এমনিতেই নাচনেওয়ালী

তার উপর ঢাকের বাড়ি।

অথবা,

এমনিতেই ছাই

তার উপর বাতাস।

ব্যাখ্যা : আহ্লাদী লোককে আরো আহ্লাদ দেয়া।

৪২. পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি করা।

ব্যাখ্যা : অপরের শ্রম কিংবা মেধা কাজে লাগিয়ে নিজে সুবিধা ভোগ করা।[৫]

৪৩. খাওয়ার বেলা আছে

দেয়ার বেলা নাই।

ব্যাখ্যা : নিজের সুবিধা থাকলে এগিয়ে আসে কিন্তু কোনো কিছু দেয়ার কথা আসলে পেছনে আসে।

৪৪. গাছে তুলে দিয়ে মই টান দেয়া।

ব্যাখ্যা : কাউকে কাজে উৎসাহ দিয়ে সটকে পরা।

৪৫. ফুল ফোটা।

ব্যাখ্যা : বিয়ের সময় হওয়া।

www.pathagar.com

৪৬. চোরের মন পুলিশ পুলিশ।

ব্যাখ্যা : অপরাধী ব্যক্তিই বেশি ভালো হবার ভান করে।

৪৭. বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয়।

ব্যাখ্যা : মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার কাজের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে।

৪৮. ন্যাংটার নাই বাটপারের ভয়।

ব্যাখ্যা : সম্মানহীন ব্যক্তির সম্মান হারানোর ভয় নেই।

৪৯. কাজে বেলায় কাজী
কাজ ফুরাইলে পাজি।

ব্যাখ্যা : প্রয়োজনের সময় প্রশংসা ও প্রয়োজন ফুরালেই বদনাম করা।

৫০. উপকারী গাছের ছাল থাকে না।

ব্যাখ্যা : অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজে দুরবস্থায় পড়া।

৫১. রতনে রতন চিনে।

ব্যাখ্যা : গুণী ব্যক্তিই গুণীর কদর জানে।

৫২. যত দোষ নন্দ ঘোষ।

ব্যাখ্যা : সব দোষ একজনের ঘাড়ে চাপানো।

৫৩. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

ব্যাখ্যা : অসাধু ব্যক্তিই সাধু হবার ভান বেশি করে।

৫৪. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

ব্যাখ্যা : ন্যায়ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

৫৫. পাগলে কিনা বলে
ছাগলে কিনা খায়।

ব্যাখ্যা : মূর্খের কথার কোনো মূল্য নেই।[৬]

৫৬. ছাইড়া দে মা কাইন্দা বাঁচি।

ব্যাখ্যা : কোনো রকমে আত্মরক্ষা করা।

৫৭. ঠেলার নাম বাবাজি।

ব্যাখ্যা : বাধ্য হয়ে কোনো কাজ করা।

৫৮. চাচা আপন পরান বাঁচা।

ব্যাখ্যা : আত্মরক্ষাই প্রধান ধর্ম।

৫৯. পুরাইনা চাল ভাতে বাড়ে।

ব্যাখ্যা : পুরনো জিনিসের বিশেষ কদর থাকে।

৬০. সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

ব্যাখ্যা : জোর না খাটালে কোনো কাজ হয় না।

www.pathagar.com

৬১. সস্তায় কিনছি, দামে বেচুম।
ব্যাখ্যা : ব্যবসায়িক মনোভাব পোষণ করা।

৬২. চুলার চেয়ে হাঁড়ির তাপ বেশি।
ব্যাখ্যা : যোগ্য লোকের চেয়ে অযোগ্যের দম্ভ বেশি।

৬৩. বাকির নাম ফাঁকি।
ব্যাখ্যা : বাকি নিয়ে তার মূল্য পরিশোধে অনিহা।

৬৪. পাগলের কথা বাসি হলে ফলে।
ব্যাখ্যা : ন্যায্য কথার মূল্য সময় হলেই বোঝা যায়।

৬৫. ঠেকায় পড়লে বাঘেও ঘাস খায়।
ব্যাখ্যা : বাধ্য হয়ে অপ্রিয় কাজ করা।

৬৬. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।
ব্যাখ্যা : আঘাতের স্থানে পুনরায় আঘাত করা।

৬৭. খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।
ব্যাখ্যা : উপলক্ষের চেয়ে আয়োজন বেশি।

৬৮. যার বিয়া তার খবর নাই
পাড়া পড়শির ঘুম নাই।
ব্যাখ্যা : মূল ব্যক্তির চেয়ে অন্যদের ব্যস্ততা বেশি।[৭]

৬৯. শিয়ালের কাছে মুরগি বাগি দেয়া।
ব্যাখ্যা : লোভী ব্যক্তির অধীনে কিছু জমা রাখা।

৭০. শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।
ব্যাখ্যা : অসাধু লোকের প্রার্থনা কবুল হয় না।

৭১. কপালের নাম গোপাল।
ব্যাখ্যা : মন্দভাগ্য।

৭২. ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।
ব্যাখ্যা : সাধ্যের অসাধ্য চিন্তা করা।

৭৩. সহজ লোকের ভাত নাই।
ব্যাখ্যা : সরল ব্যক্তিদের প্রায়ই ঠকতে হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মো. মোখলেছ উদ্দিন, পিতা : হাফেজউদ্দিন, বয়স : ৪০ বৎসর, শিক্ষা : এসএসসি, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গাজিন্দা, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ

২. জরিনা বেগম, স্বামী : হাসমত আলী, বয়স : ৩৮ বৎসর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : বেতিলা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২২.০১.২০১৪

www.pathagar.com

৩. মো. কুদ্দুস, বয়স : ৫০ বৎসর, শিক্ষা : তৃতীয় শ্রেণি, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : পুটাইল, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৯.০১.২০১৪

৪. আকবর আলী, পিতা : মনসুর আলী, বয়স : ৩৫ বৎসর, শিক্ষা : বিএ, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : পুটাইল, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৫. আবুল হোসেন মিয়া, পিতা : বাচ্চু মিয়া, বয়স : ৩৮ বৎসর, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : গাজিন্দা, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২২.০১.২০১৪

৬. আলোমতি বেগম, স্বামী : মো. কুদ্দুস, বয়স : ৪২ বৎসর, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : পুটাইল, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৭. আলাউদ্দিন আজাদ, বয়স : ৩০ বৎসর, শিক্ষা : বি কম, পেশা : সাংবাদিকতা ও ব্যবসা, গ্রাম : বেতিলা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

মানুষ যখন বিপদগ্রস্থ হয় বা সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যে কোনো বিষয়কে বিশ্বাস ও অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আর এই কারণেই অমঙ্গল থেকে বাঁচার জন্য সৃষ্টি হয়েছে অনেক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। আদিকাল থেকে অব্যাহতভাবে এ বিশ্বাসগুলো চলে আসছে। বর্তমান যুগে কেউ কেউ একে কুসংস্কার বলে দূরে ফেলে দিয়েছে। তবে, অনগ্রসর সমাজে এর প্রভাব এখনো রয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলার মানুষের অন্তরে আজো মিশে আছে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস। এ অঞ্চলের মানুষ এখনো বিশ্বাসগুলোকে মনে-প্রাণে ও হৃদয়ে স্থান দিয়ে রেখেছে।

১. শালিক দেখা প্রসঙ্গে

শালিক দেখা নিয়ে মানিকগঞ্জে কিছু লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। অনেকে মনে করেন এক শালিক দেখলে কষ্ট বা দুঃখ হবে, দুই শালিক দেখলে ভালো কিছু ঘটবে আর তিন শালিক দেখলে বাড়িতে অতিথি আসবে।

২. হোঁচট খেলে

হাটতে গিয়ে হোঁচট খেলে সে স্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা বা দাঁড়িয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে বাড়ি থেকে কোথাও যাত্রা করার সময় দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেলে মুরুব্বীরা মনে করেন তাৎক্ষণিক ভাবে বাড়ির বাইরে যাত্রা করা শুভ নয়। হোঁচট খাবার স্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর রওনা দেয়া উচিৎ। এছাড়া যাত্রাকালে পায়ে বা শরীরে কোথাও আঘাত লাগলে যাত্রা অশুভ মনে করা হয়।

৩. ফল খেয়ে পানি খেতে হয় না

মানিকগঞ্জে এরূপ লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ফল খাবার পর সঙ্গে সঙ্গে পানি পান করতে হয় না, করলে অসুখ হয়।

৪. গোসল করে ফল খেতে হয় না

গোসল করে এসেই ফল খেতে হয় না। গোসল করার পর ফল ছাড়া অন্য কোনো শুষ্ক খাবার খেয়ে তারপর ফল খেতে হয়। গোসল করেই ফল খেলে অসুখ-বিসুখ হয়।

৫. কাগজ ছিড়লে ঋণ হয়

অনেকেই বিশ্বাস করেন রাতের বেলা কাগজ ছিড়লে বা কাচি দিয়ে কাগজ কাটলে ঋণ হয়। তাই তারা ছোটো ছেলে-মেয়েদের রাতের বেলা কাগজ ছিড়তে বারণ করেন।

www.pathagar.com

৬. সন্ধ্যায় মেয়েদের চুল খোলা রাখতে নেই

বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের বাড়ির মেয়েদের এরকম উপদেশ দিয়ে থাকেন যে সন্ধ্যায় চুল খোলা রাখতে নেই বা খোলা চুলে সন্ধ্যায় বাড়ির বাইরে যেতে নেই। গেলে নানা রকম অমঙ্গল হতে পারে। নানা রকম অপশক্তির বিশ্বাস থেকেই মূলত এ উপদেশ দেয়া হয়। সন্ধ্যায় মেয়েরা খোলা চুলে বাইরে গেলে নানা অপশক্তি তাদের ক্ষতি করতে পারে।

৭. জন্মবারে চুল ও নখ কাটতে হয় না

মানিকগঞ্জে এরূপ লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে জন্মবারে চুল বা নখ কাটলে অমঙ্গল হয়।

৮. রাতে নখ কাটতে হয় না

রাতের বেলা কেউ হাত বা পায়ের নখ কাটলে তার হায়াত কাটা যায় বা আয়ু কমে যায় বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

৯. রাতে ঘর ঝাড়ু দিতে নেই

মানিকগঞ্জে আরো একটি লোকবিশ্বাস হলো রাতের বেলা ঘর ঝাড়ু দিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। তাই রাতে ঘর ঝাড়ু দিতে নিষেধ করা হয়।[১]

১০. ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি দিলে অমঙ্গল হয়

ঝাড়ু দিয়ে কাউকে বাড়ি দিলে তার অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। এমনকি অনিচ্ছাকৃত ভাবেও যদি কারো গায়ে ঝাড়ুর বাড়ি লাগে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ু দিয়ে আবার আস্তে করে তার গায়ে টোকা দেয়া হয় এবং মনে করা হয় পূর্বে বাড়ি লাগার ফলে যে অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল দ্বিতীয়বার বাড়ি দিলে তা কেটে যায়।

১১. দাড় কাক ডাকলে অমঙ্গল হয়

বাড়ির আশেপাশের গাছে দাড় কাক ডাকলে তা অমঙ্গলসূচক বলে ভাবা হয় এবং মনে করা হয় নিকট কোনো আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটতে পারে।

১২. চিরুনি পড়লে অতিথি আসে

হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে বাড়িতে অতিথি আসবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। শুধু চিরুনিই নয়, অন্য কোনো গৃহস্থালি জিনিস হাত ফসকে পড়ে গেলেও অতিথি আসবে বলে মনে করা হয়।

১৩. কুটুম পাখি ডাকলে অতিথি আসে

বাড়ির আশেপাশে কুটুম পাখি ডাকলে অতিথি আসবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু কুটুম পাখি যদি রাতের বেলা ডাকে তাহলে চোর আসতে পারে বলে মনে করা হয়।

১৪. সূর্যগ্রহণের সময় খেতে হয় না

অনেকে মনে করেন সূর্যগ্রহণের সময় খেতে হয় না। অনেকে আবার সূর্যগ্রহণের দিন সকাল থেকেই অভুক্ত থাকেন এবং সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেলে খাবার গ্রহণ করেন। সূর্যগ্রহণের সময় খেলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

www.pathagar.com

১৫. গর্ভবতী নারীর সূর্যগ্রহণের দিন মাছ কুটতে নেই

সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত আরো একটি লোকবিশ্বাস মানিকগঞ্জে প্রচলিত রয়েছে, তা হলো সূর্যগ্রহণের দিন বা সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী নারীদের মাছ কুটতে হয় না, কুটলে গর্ভস্থ সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে।

১৬. টিকটিকি ডাকলে ঘটনা সত্য হয়

অনেক সময় ঘরের কোণায় টিকটিকি টিক্ টিক্ করে ডেকে উঠে। তখন যদি কেউ কিছু ভাবতে থাকে তাহলে সে মনে করে তার ভাবনা সঠিক আছে বা সে যা ভাবছে তা সত্য।[২]

১৭. প্রজাপতি গায়ে বসলে বিয়ে হয়

কোনো অবিবাহিত ব্যক্তির গায়ে প্রজাপতি বসলে মনে করা হয় শীঘ্রই তার বিয়ে হতে পারে। মূলত বিবাহযোগ্য যুবক-যুবতীদের গায়ে প্রজাপতি বসলেই এমনটি মনে করা হয়।

১৮. পিঁপড়া খেলে সাঁতার শেখা যায়

অনেক সময় খাবার খেতে গিয়ে কেউ পিঁপড়া সহ খাবার খেয়ে ফেললে বলা হয় পিঁপড়া খেলে তাড়াতাড়ি সাঁতার শেখা যায়।

১৯. শরীরে টিকটিকি পড়লে নতুন পোশাক পাওয়া যায়

কারো শরীরে টিকটিকি পড়লে মনে করা হয় যে সে নতুন পোশাক পাবে।

২০. রাতে কুকুর কাঁদলে দেশের অমঙ্গল হয়

রাতের বেলা যদি কুকুর কাঁদে তাহলে মনে করা হয় যে ঐ অঞ্চলে বা দেশে অমঙ্গলজনক কিছু ঘটতে পারে।

২১. হাতের তালু চুলকালে টাকা আয়/ব্যয় হয়

কারো যদি ডান হাতের তালু চুলকায় তাহলে টাকা আসবে বা আয় হবে আর বাম হাতের তালু চুলকালে টাকা ব্যয় হবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

২২. স্বপ্ন সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস

মানিকগঞ্জে স্বপ্ন সংক্রান্ত বেশ কিছু লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে, যেমন : ভোর রাতের স্বপ্ন সত্য হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। আবার স্বপ্নে কোনো মৃত ব্যক্তিকে দেখলে নিকট কোনো আত্মীয় মারা যেতে পারে বলে মনে করা হয়। স্বপ্নে সাপ মারতে দেখলে শত্রুর বিনাশ হবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

২৩. গলায় খাবার আটকালে কেউ স্মরণ করছে

খাবার সময় গলায় খাবার আটকালে অথবা জিহ্বায় কামড় লাগলে মনে করা হয় কেউ তার নাম নিচ্ছে বা তাকে স্মরণ করছে।

www.pathagar.com

২৪. ভাঙা থালা ও গ্লাসে খেতে নেই

মানিকগঞ্জে আরো একটি লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ভাঙা থালা এবং গ্লাসে খাবার ও পানি খেতে হয় না, খেলে হায়াত বা আয়ু কমে যায়।

২৫. নারীবিষয়ক লোকবিশ্বাস

মানিকগঞ্জে নারীবিষয়ক কিছু লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে, যেমন : স্বামীর আগে স্ত্রীর খেতে হয় না, খেলে অমঙ্গল হয়; স্ত্রী খালি হাতে স্বামীকে খাবার দিলে স্বামীর হায়াত কাটা যায়; মেয়েদের এক হাতে চুড়ি পড়তে হয় না; স্বামীর সামনে খালি নাকে যাওয়া উচিৎ নয়।[৩]

২৬. বিয়ে সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস

বিয়ের দিন সকালে অন্য বাড়ি থেকে খাবার আনতে হয়। এক গালে চড় দিলে অন্য গালেও চড় দিতে হয়, না হলে বিয়ে হয় না। মেহেদি পাতা হাতে পরে বিয়ে করতে হয়। তবে পায়ে মেহেদি দিতে হয় না, দিলে অমঙ্গল হয়।

২৭. প্রাণীবিষয়ক লোকবিশ্বাস

মানিকগঞ্জে এরূপ লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে মৃতপ্রায় মুরগিকে কুলা দিয়ে ঢেকে কুলার উপর ভাতের বাড়ন দিয়ে বাড়ি দিলে মুরগি বেঁচে যায়। এছাড়া জোনাকি পোকা মাথায় বসলে তা মঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়।

২৮. হাতপাখার বাড়ি লাগলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়

বাতাস করার সময় কারো শরীরে হাতপাখার বাড়ি লাগলে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে বলে মনে করা হয়। এজন্য বাড়ি লাগার পর হাতপাখা দিয়েই আবার তার শরীরে তিনবার টোকা দিতে হয়।

২৯. সন্তানের কপালে ও পায়ে টিপ দেয়া

সন্তানের উপর যেন চোখ না লাগে বা সন্তানকে কুনজর থেকে বাঁচানোর জন্য সন্তানের কপালের একপাশে এবং পায়ের পাতায় কাজল দিয়ে টিপ দেয়া হয়। এছাড়াও কুনজর থেকে বাঁচানোর জন্য সন্তানের গলায়, কোমরে ও হাতে তাবিজ বেঁধে দেয়া হয়।

৩০. সাপা বাতাস লাগা

কারো যদি পাতলা পায়খানা ও বমি হয় তাহলে মনে করা হয় যে তার সাপা বাতাস বা সাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাস লেগেছে বলে এমনটি হয়েছে।[৪]

৩১. জুতো উল্টে থাকলে ঝগড়া হয়

কারো জুতো যদি উল্টে থাকে তাহলে ঐ বাড়িতে ঝগড়া হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। এজন্য উল্টো জুতো সোজা করে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৩২. পিঁপড়া সারি বেঁধে চললে বন্যা হয়

পিঁপড়া যদি সারি বেঁধে দ্রুত চলতে দেখা যায় তাহলে প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং বন্যার আশঙ্কা করা হয়।

৩৩. চোখের পাতা লাফানো

অনেক সময় চোখের পাতা লাফালে অসুখ হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। এছাড়া ডান চোখ লাফালে সুসংবাদ আর বাম চোখ লাফালে দুঃসংবাদ আসবে বলেও বিশ্বাস করা হয়।

৩৪. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে হয় না

মানিকগঞ্জে এরূপ লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে হয় না। কারণ ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে বুদ্ধি লোপ পায়।

৩৫. শিশুদের লাথি মারতে হয় না

শিশুদের লাথি মারলে জীবন দুঃখময় হয় বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে।

৩৬. কুলা ও ঝাড়ু একত্রে রাখতে হয় না

কুলা ও ঝাড়ু একত্রে রাখলে দুঃখ বাড়ে বা অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। এজন্য কুলা ও ঝাড়ু আলাদা আলাদা স্থানে রাখা হয়।

৩৭. ঘরে আবর্জনা রাখতে হয় না

ঘর ঝাড়ু দেবার পর আবর্জনা ঘরের ভেতর জমা করে রাখতে হয় না, রাখলে দেনা বাড়ে। এছাড়াও ঘরের ভেতর আবর্জনা জমা হয়ে থাকলে ঘরের দুঃখ কখনও মোচন হয় না বলে বিশ্বাস করা হয়।[৫]

৩৮. যাত্রাকালে হাঁচি দেয়া অশুভ

মানিকগঞ্জে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে যাত্রাকালে হাঁচি পড়লে যাত্রা নাস্তি বা অশুভ হয়।

৩৯. গালে হাত দিয়ে বসতে হয় না

গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে দুঃখ বাড়ে বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

৪০. গামছা সেলাই করে পড়তে নেই

মানিকগঞ্জে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ছেঁড়া গামছা সেলাই করে পড়তে হয় না, পড়লে দুঃখ বাড়ে।

৪১. দরজার সামনে আবর্জনা ফেলতে হয় না

ঘরের দরজার সামনে আবর্জনা ফেললে রোগ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। এজন্য দরজার সামনে আবর্জনা থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করা হয়।

৪২. চিবিয়ে চাল খেতে হয় না

গর্ভবতী নারী চিবিয়ে চাল খেলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

www.pathagar.com

৪৩. ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভাতে হয় না

ফুঁ দিয়ে মোমবাতি, হারিকেন বা কুপির আগুন নেভাতে হয় না, নেভালে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি রোগ হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

৪৪. যাবার সময় পিছু ডাকতে হয় না

কেউ বাড়ির বাইরে কোথাও রওনা হলে তাকে পিছু ডাকতে হয় না, ডাকলে তার অমঙ্গল হয়।

৪৫. একবার খেতে হয় না

কোনো খাদ্য কেউ একবার নিয়ে খেলে বা এক লোকমা খেলে তাকে দ্বিতীয়বার খেতে বলা হয় এবং বলা হয়–একবার খেলে পানিতে পড়বে।[৬]

৪৬. ডিঙিয়ে গেলে বেঁটে হয়

কারো শরীরের উপর দিয়ে কেউ ডিঙিয়ে গেলে বলা হয় সে আর লম্বা হবে না।

৪৭. সন্ধ্যায় উঠোন ঝাড়ু দিতে নেই

বেলা শেষে সন্ধ্যের সময় বাড়ির উঠোন বা আঙিনা ঝাড়ু দিতে হয় না, দিলে ঐ বাড়িতে অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।

তথ্যনির্দেশ

১. নূরজাহান, স্বামী : বরকতউল্লাহ, বয়স : ৪০ বৎসর, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি পাস, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : হাসুলি, ডাকঘর : লেমুবাড়ি, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২০.১২.২০১৩, স্থান : নিজ বাড়ি

২. মায়মুনা বেগম, স্বামী : মো. কাউসার আহমেদ, বয়স : ৩৩ বৎসর, শিক্ষা : এসএসসি পাস, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : বেউথা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

৩. মো. আফসার মিয়া, পিতা : শওকত মিয়া (মৃত), বয়স : ৫২ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : দক্ষিণ খল্লী, ইউনিয়ন : ধানকোড়া, উপজেলা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ

৪. লালু মিয়া, বয়স : ৪০ বৎসর, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : দক্ষিণ খল্লী, ইউনিয়ন : ধানকোড়া, উপজেলা : সাটুরিয়া, জেলা : মানিকগঞ্জ

৫. আসমা বেগম, বয়স : ৪০ বৎসর, শিক্ষা : স্বাক্ষর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : বেতিলা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ২৮.১২.২০১৩

৬. রহিমা বেগম, স্বামী : আব্দুল আওয়াল, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ৩০.১২.২০১৩

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

বহু যুগ আগে থেকেই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের খাতিরে কিংবা পেশাগত কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনে ছোটোখাটো লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার করে আসছে। ঐসব সহজ সরল লোকপ্রযুক্তি মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও তাদের সহজলভ্যতার জন্য গ্রামীণ অনেক প্রযুক্তিই হারিয়ে গেছে। তাই লোকজীবনে এমন অনেক লোক উপাদান রয়েছে বর্তমানে যার ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এক সময় জাঁতা ছিল সংসারজীবনে নিত্য দিনের বস্তু, একটি সহজলভ্য লোকপ্রযুক্তি। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুৎ চালিত মেশিন হওয়ায় এর দরকার হয় না। মানিকগঞ্জ জেলায় ব্যবহৃত কয়েকটি লোক প্রযুক্তির বর্ণনা করা হলো :

১. ঢেঁকি

মানিকগঞ্জ জেলার প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে একসময় ঢেঁকিঘর ছিল। ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা হতো। পিঠা তৈরির জন্য চালের গুঁড়ি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হতো ঢেঁকি। বর্তমানে বিদ্যুৎ চালিত ধান ভানার কল তৈরি হওয়ায় ঢেঁকির ব্যবহার কমে গেছে।

ঢেঁকিতে চাল গুড়ো করা হচ্ছে (হরিরামপুর)

তৈরির উপকরণ

ঢেঁকি তৈরির জন্য প্রধান উপকরণ হলো কাঠ ও লোহার কালী।

www.pathagar.com

তৈরির প্রক্রিয়া

পাঁচ হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি কাঠকে চারভাগে ভাগ করে নিয়ে মাঝখানে দুই ভাগ এবং ঢেঁকির অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগের দিকে একভাগ করে মেপে নেয়া হয়। যেদিকে পা রেখে ঢেঁকি পাড় দিতে হয় সে দিকে কাঠটির মধ্যদিয়ে ছিদ্র করে পারাকাঠি ঢোকানো হয়। পারাকাঠি দুই পাশে দু'টি খুঁটির সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঢেঁকির সামনের অংশে কাঠের উপর নিচ বরাবর গোলাকৃতির একটি ছিদ্র করে সেখানে 'চুরুন' যুক্ত করা হয়। এই চুরুনটিও কাঠের তৈরি। চুরুনের অগ্রভাগে লোহার কালী লাগানো থাকে। ঢেঁকির চুরুন লাগানো অংশটি অপেক্ষাকৃত সরু হয়ে থাকে।

২. লাঙল

কৃষিকাজে ব্যবহৃত লাঙল গ্রাম বাংলার একটি অতি পরিচিত লোকপ্রযুক্তি। তবে বর্তমানে চাষাবাদে কলের লাঙলের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় কাঠের লাঙলের উপযোগিতা অনেক কমে গেছে।

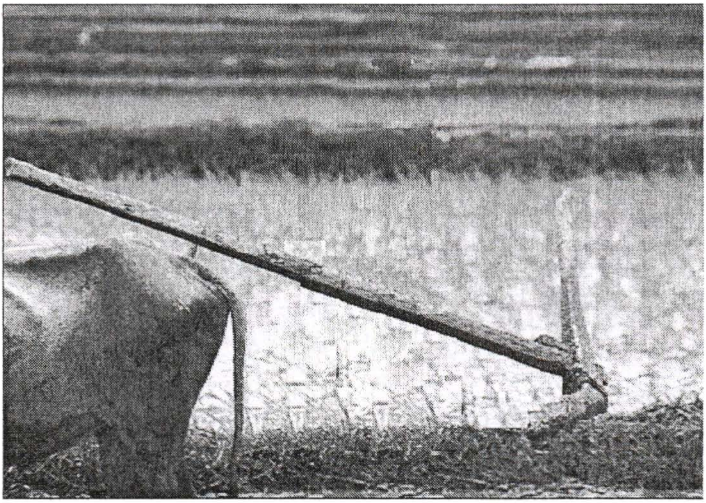

লাঙল

তৈরির উপকরণ

লাঙল তৈরির প্রধান উপকরণ বাবলা গাছের কাঠ ও লোহা।

তৈরির প্রক্রিয়া

দুই ফুট বেড় বিশিষ্ট একটি কাঠকে লাঙলের বাঁকা অংশ থেকে সামনের দিকে দুই পা লম্বা এবং পিছনের দিকে বাঁকানো খুঁটি পর্যন্ত তিন পা পরিমাণ কেটে ও চেঁছে লাঙল তৈরি করতে হয়। বাঁকানো অংশে ছিদ্র করে চার হাত লম্বা একটি ইশ যুক্ত করতে হয়।

www.pathagar.com

ইশের অগ্রভাগের কিছুটা নিচের অংশে খাঁজকাটা থাকে। ইশের খাঁজকাটা অংশগুলো জোয়ালকে আটকে রাখে। তাছাড়া লাঙল কতটুকু খর হবে তা নির্ধারণ করা হয় এই খাঁজকাটা অংশের মাধ্যমে। বাঁকানো দুই পা পরিমাণ অংশের সামনে লোহার সুঁচালো ফাল যুক্ত করা হয়।[১]

৩. তাঁত

কাপড় বোনার জন্য তাঁত তৈরিতে প্রয়োজন হয় কাঠের বীম, বাঁশের মালসি, সুতি কাটনি, সানা বাঁশের চিরুনির মত সলা, দক্তি, খিলি, ডাঙি, মাকু প্রভৃতি। তাঁতের নিচ থেকে হাঁটু সমান গর্ত থাকে। দুই পায়ের নিচে দুইটি বাঁশের সরু নল থাকে যা পায়ের চাপে ওঠা নামা করে। মাকুতে থাকে সুতা প্যাঁচানোর নলী। হাতে মাকু চালিয়ে কাপড় বোনা হয়। মানিকগঞ্জে পূর্বে অনেক তাঁতি পরিবার থাকলেও বর্তমানে এর ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে।

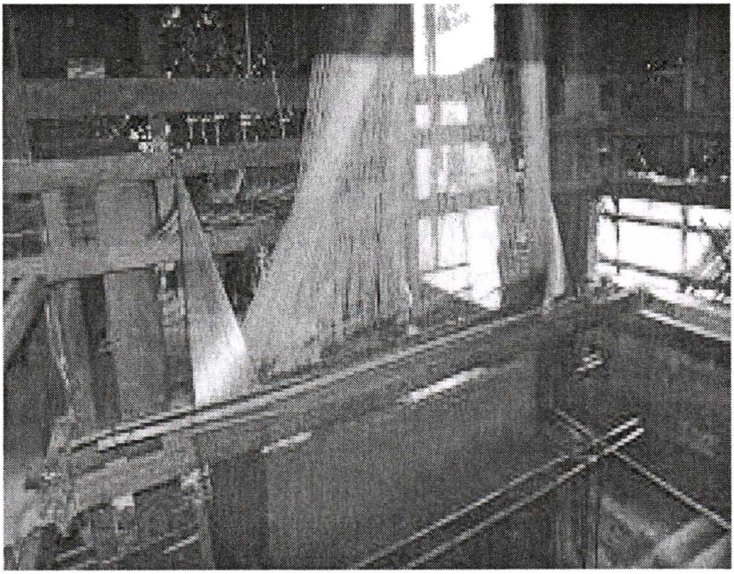

তাঁত

৪. হুঁকা

এক সময় ধূমপানের জন্য হুঁকার ব্যবহার গ্রাম বাংলার একটি অতি পরিচিত চিত্র ছিল। বর্তমানে বিড়ি বা সিগারেট সহজলভ্য হওয়ায় হুঁকার ব্যবহার তেমন একটি চোখে পড়ে না। সম্পূর্ণ দেশি প্রযুক্তি ও উপকরণে প্রস্তুত হুঁকা গ্রামীণ পুরুষদের অবসর ও আয়েশের সঙ্গী ছিল।

www.pathagar.com

হুঁকা তৈরির উপকরণ

হুঁকা তৈরিতে প্রয়োজন কলকে, নারকেল-খোল ও কাঠের নল।

তৈরির প্রক্রিয়া

প্রথমে নারকেলের ভেতর থেকে পানি ও শাঁস বের করে নারকেল-খোলটি কয়েক দিন রোদে শুকাতে হয়। নারকেল খোলে একটি ছিদ্র বা মুখ থাকে, সেটিকে গোল করে কাটতে হয়। উপরের ছিদ্র থেকে একটু নিচে আরেকটি গোলাকার ছিদ্র করা হয়। এরপর একটি সরু কাঠ পরিমাণ মত কেটে ভেতরে গোল করে ফাঁকা করা হয়। কাঠের নলটি নারকেল খোলের মুখে বসিয়ে নলের উপরে কলকে বসাতে হয়। কলকে সাধারণত কামারদের দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। হুঁকার কাঠের নলটিতে নানা রকম নকশা কেটে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়।[২]

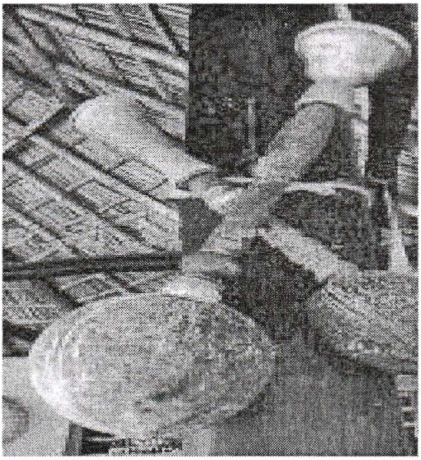

হুঁকা

৫. সরিষা ভাঙার ঘানি

সরিষা, তিল প্রভৃতি ভাঙার জন্য বা পিষে তেল বের করার জন্য যে দেশীয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ঘানি বলা হয়। পূর্বে মানিকগঞ্জে সরিষা, তিল প্রভৃতি ভাঙানোর জন্য ঘানির ব্যাপক প্রচলন থাকলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিক কলের মেশিন আসায় এর ব্যবহার অনেক কমে গেছে। তবে প্রত্যন্ত-গ্রামাঞ্চলে, যেখানে বৈদ্যুতিক সুবিধা সহজলভ্য নয়, সে সব স্থানে এখনো ঘানির মাধ্যমে সরিষা ভাঙানো হয়।

তৈরির প্রক্রিয়া

ঘানি মূলত কাঠের তৈরি যন্ত্র। এটি প্রস্তুতের জন্য তেঁতুল, বকুল প্রভৃতি গাছের মূলসহ সাত হাত গুঁড়ি দরকার হয়। পাঁচ হাত গুঁড়ি থাকে মাটির নিচে প্রথিত অবস্থায় আর দুই

www.pathagar.com

হাত পরিমাণ গুঁড়ি থাকে মাটির উপরে। গুঁড়ির উপরের অংশে এক হাত ব্যাসের একটি বৃত্তাকার গর্ত থাকে যার গভীরতা প্রায় দুই হাত মতো হয়। ঘানির সাথে যুক্ত থাকে কাঠের জাইট, বাঁশের নাইল পাত। জাইটের মাথায় থাকে মাকড়ি, মোতালোম, ওজনের ভারসাম্য রক্ষার কাতলি। সরিষা নাড়ার জন্য মাকড়ির সাথে আড়ানি লাগানো থাকে। সরিষা ভাঙানোর সময় ঘানির গর্তে সরিষা রাখতে হয়। সরিষা থেকে তেল প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন হয় কাঠের তক্তা, তক্তার উপর ভারি পাথর এবং ঘানি টানার জন্য গরু। ঘানি থেকে তেল প্রস্তুত হয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে পাত্রে জমা হয়।

৬. মাছ ধরার বাঁশের পলো

মানিকগঞ্জে হরিরামপুর থানার কালই গ্রামে মাকলা বাঁশ, জাওয়া বাঁশ দিয়ে উন্নতমানের পলো তৈরি হয়। গ্রামের বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কিনতে হয়। একটা পলো তৈরির জন্য একটি বাঁশ লাগে। একটি বাঁশের মূল্য প্রায় ১০০/-টাকা। বাঁশ থেকে তৈরি পলো বিক্রি হয় ১৫০/- থেকে ১৭৫/- টাকায়। কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ মাসে মাছ ধরার মৌসুমে এই পলো ২০০/- টাকায় বিক্রি করা যায়।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. শিকদার হোসেন, বয়স : ৪৮ বৎসর, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১২.০৩.২০১৪, স্থান : নিজ বাড়ি

২. মো. আসলাম, পিতা : মো. সালাম (মৃত), বয়স : ৪৮ বৎসর, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, পেশা : কাঠমিস্ত্রি, গ্রাম : হাসুলি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, তারিখ : ১৪.০৩.২০১৪

৩. আমজাদ হোসেন, পিতা : আবুল হোসেন, বয়স : ৩৮ বৎসর, শিক্ষা : এসএসসি, পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষিকাজ, গ্রাম : বেউথা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ, স্থান : বেউথা বাজার

www.pathagar.com

লোকভাষা

মানিকগঞ্জ অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ এবং শব্দের ব্যবহারজাত কিছু স্বকীয়তা রয়েছে, যেমন থাকে প্রতিটি আঞ্চলিক এবং উপভাষার ক্ষেত্রে। মানিকগঞ্জের সাতটি উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও এর একটি সাধারণ স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ সাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপটিই হচ্ছে মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা বাংলা ভাষার গবেষকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল তার নিজস্বতার বলেই।

মানিকগঞ্জের ভাষায় স্বরধ্বনি ব্যবহারের নিজস্ব একটি রূপ লক্ষ্য করা যায়। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় 'ই' 'এ' 'এ্যা' 'আ' 'অ' 'ও' 'উ' স্বরধ্বনিগুলি আদিতে, মধ্যে, অন্তে বসে উচ্চারণের আলাদা দ্যোতনা এবং নিজস্বতা সৃষ্টি করে। যেমন– একটু শব্দকে ইটু, নিকাহ্ শব্দকে নিহ্যা, উই শব্দকে উচ্চারণ করে উলু হিসাবে। প্রায় সর্বত্র স্বরধ্বনির এমন ব্যবহার মানিকগঞ্জের ভাষাকে নিজস্বতা দিয়েছে, যদিও সময়ের পরিক্রমায় এমন প্রবণতা ক্রমশঃ কমে আসছে। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় অনুনাসিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি। এ দিকটিও মানিকগঞ্জের ভাষার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। যেমন 'পায়ে কাটা বিন্ছে' এখানে কাঁটা শব্দ উচ্চারণে অনুনাসিক স্বরধ্বনি নেই। বাঁধন শব্দটি উচ্চারিত হয় বান হিসাবে। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, মরছিই্, করছিই্, দ্যায়, ন্যায়্, দ্যাও্, ন্যাও্, (নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনি) ইয়া (ইহা), দিয়া, বিয়া, নিও, দিও (নিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনি), কাইয়্যা (কাক), বিয়াই (বেহাই), কুইয়্যা (কুয়ো) (ত্রিস্বরধ্বনি) ইত্যাদি। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় কখনো কখনো পদের আদিতে 'ই' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন, ইঁদারা > এন্দারা, ইজমালি > এজমালি। পদ মধ্যেও এমন প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ঢিল > ঢেল, মিল > মেল। পদান্তিকে 'ই' ধ্বনি আ-কারও হয়, যেমন, পিড়ি > ফিরা, তেমনি > ত্যাম্বা, এমনি > এ্যাম্বা ইত্যাদি। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষার আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন, "প্রচলিত বাংলা বর্ণমালায় ৩৮টি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলেও মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় মাত্র ২২ টি ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যবহৃত হয়"। মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থান বিভিন্ন শব্দের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, শকুন উচ্চারিত হয় হকুন, সকাল উচ্চারিত হয় হকাল, গল্প উচ্চারিত হয় গপ্পো, চাউল উচ্চারিত হয় চাইল, ঘর উচ্চারিত হয় গর হিসাবে। এমন অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে মানিকগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা বাংলা ভাষার মূল স্রোতধারায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।[১]

www.pathagar.com

মানিকগঞ্জে ব্যবহৃত কিছু আঞ্চলিক শব্দ

ডাংগা	>	পুকুর
কাইজা	>	বিবাদ
চক	>	ফসলের মাঠ
পাইলা	>	পাতিল
দাড়ি	>	পাটি বা বিছানা
বিচন	>	পাখা (বাঁন বা সুতার)
গাই	>	গাভী গরু
সালুন	>	মাছের বা যে কোনো রান্না বা তরকারি
নাইত	>	রাত
হইসা	>	সরিষা
বেলা	>	সূর্য
পথ	>	রাস্তা
দুয়ার	>	বাড়ির মধ্যের স্থান
হাসুড়ি	>	শাশুড়ি
জামাই	>	স্বামী
মিঠাই	>	গুড়
ক্ষীর	>	পায়েস
ইষ্টি	>	মেহমান
হাওলাত	>	কর্জ
হাইনজা বেলা	>	সন্ধ্যা বেলা
উরুম	>	মুড়ি
এহন	>	এখন
গোস্বা করা	>	রাগ হওয়া
পালানে	>	উঠানে
পোলাপান	>	ছেলেমেয়ে
কামাই করা	>	রুজি করা
অহন	>	এখন
আজাইরা	>	অহেতুক

www.pathagar.com

ইরা	>	সে
উন্ন্যা	>	শুষ্ক মৌসুম
উষার	>	প্রশস্থ
নূর দে	>	দৌড় দে
ওতা	>	ওটা
বহ	>	বসো
ঘেটি	>	ঘাড়
হুস্ব	>	শুষ্ক
ওস	>	কুয়াশার বিন্দু
ছকছক	>	চঞ্চলতা
টাটান	>	অনেক ব্যথা
ঠাওর	>	অনুমান
মেলা দিছি	>	রওয়ানা দিয়েছি
ডালা	>	উপঢৌকন
ধুনফুন	>	টালবাহানা
ফাউ	>	অতিরিক্ত পাওয়া
ভাওর	>	চাষ
যহন তহন	>	যখন তখন
ল	>	চল
হালা	>	শ্যালক
হে	>	সে
নাড়ি	>	রাড়ি
খৎ	>	প্রায়শ্চিত্ত
ফাল	>	লাফ
দুক্কু	>	ব্যথা
অস্তে	>	আস্তে
এনহে	>	এখন
দিয়ার	>	দুয়ার
নু	>	চল
পাজি	>	দুষ্ট

www.pathagar.com

চেহুন	>	চিকন
ফিরা	>	পিঁড়া
ত্যাম্বা	>	তেমনি
এম্বি	>	এমনি
বাগুন	>	বেগুন
ইটু	>	একটু
কেরা	>	কে
ক্যাদা	>	কাদা
ড্যানা	>	কাধ
নিহ্যা	>	নিকা
পিলা	>	প্লিহা
হমান	>	সমান
গুইনা	>	পাপ/গুনাহ
হুশা	>	শসা
গুম	>	গম
খরজুবা	>	গৃহস্থালী জ্বালানী
নিত্তি নিত্তি	>	প্রতিদিন
চালু	>	চালুনী
ব্যালন	>	ব্যালুনী
এ্যালহা	>	একলা
হাছা	>	সত্য
ইটা	>	ইট
হ্যাছা	>	ঝাপটা
হুকাইনা	>	শুকনো
হুনে	>	শোনে
কাইঠ্যা	>	কচ্ছপ
আকাম	>	কুকর্ম
অগা	>	বোকা
মাকাই	>	অকাজের
ক	>	বল

www.pathagar.com

হ	>	হ্যাঁ
বালো	>	ভালো
উলু	>	উই
চঙ্গ	>	মই
উইদাম	>	খোলা
ঝানু	>	দক্ষ
নেড্ডু	>	রেডিও
হকুন	>	শকুন
উচ্যা	>	উঁচু
কুদুনী	>	আস্ফালন
কালি	>	অনুমান
পেলেট	>	প্লেট
ব্যাল মাথা	>	ন্যাড়া মাথা
ম্যারা	>	দুর্বল
ময়া	>	মায়া
হুয়া	>	শয়ন
গুয়া	>	নিতম্ব
কাইয়া	>	কাক
বাওই	>	বাবুই
আওয়া	>	গহ্বর
বীচন	>	বীজ
ইন্দারা	>	ইঁদারা
ন্যাহা	>	লেখা
কিব্যা	>	কে
ইড্যা	>	এটা
দর	>	নেও
ছেরি	>	মেয়ে
লাথ্থি	>	লাথি
কইলে	>	বলিলে
ইশ্শিরে	>	দুঃখ প্রকাশ

www.pathagar.com

গিট্টু	>	গিড়া
নাওয়া	>	গোছল
বান	>	বাঁধ
বাইশ্যা	>	বর্ষা
নক্ত	>	রক্ত
মাইল	>	শরীর
আন্ডা	>	ডিম
আস	>	হাঁস
কাইলা	>	কালো
ঢক	>	ঢং
হাছা মিছা	>	সত্য মিথ্যা
নুম্বা	>	লোম
নাল	>	লাল
নোয়া	>	লোহা
লগ্নি	>	লগি
আইল	>	হাল
নোল	>	ফাঁপা
নান্দা	>	রান্না
বাজান	>	বাবা
হইচ	>	জিজ্ঞাসা
ব্যাবাক	>	সব
হিখা	>	শিক্ষা
গাইল পাড়া	>	বকা দেয়া
হাক পারা	>	ডাক দেয়া
টাল ধরা	>	ঠান্ডা লাগা
বিহান বেলা	>	সকাল বেলা

মানিকগঞ্জের কিছু আঞ্চলিক কথা

১. এহন চকে যামু = এখন মাঠে যাব। (এহন= এখন, চকে = মাঠে)

২. কাইন্দ্যা কাইট্যা আকুল অইছে = কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়েছে।

www.pathagar.com

৩. ইচা মারার দিশা নাই, বর্তা খাইবার গাড়া = কাজে কর্মে দুর্বলরা অকর্মণ্য, কিন্তু খাবার সময় ভালো খাবার চায়।

৪. নাইত নাই পোহাইতে, পুলা পানে বাতের কথা মুখে = ভোর না হতেই বালক বালিকারা খাবার চায়।

৫. কাইয়ার কা, কা, আর বাল নাগে না = কাকের কা কা শব্দ ভালো শুনায় না।

৬. বাত পায় না, ফেনা চায় = অভাবের সংসারে ছোটোরা মুড়ি, পিঠা, ভালো মাছ খেতে আবদার করলে মা তার সন্তানদের বলে ভাত পাওয়া যায় না, তার উপরে ভাতের মাড় পাব কেমনে।[২]

তথ্যনির্দেশ

১. http://www.manikgonj.gov.bd/node/44504

২. *মানিকগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্য* নূরুল আলম খান, সৈকত আসগর সম্পাদিত; মিয়াজান কবির, থানা : সিংগাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ; মোঃ শাহ জাহান, গ্রাম : কুটাই, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ; আঃ গফুর, গ্রাম : বেংরই, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ; কাশেম দেওয়ান, গ্রাম : লেমুবাড়ি, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ; মোঃ মোশাররফ হোসেন, গ্রাম : চরখোস্তা, থানা : মানিকগঞ্জ সদর, জেলা : মানিকগঞ্জ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি